mv¤c‘wqKm¤cxwZ I Bmjvg : †c¶vcUevsjv‡‘k

(1900-2000)

XvKwekwe‘¨vj‡qwcGBP.wW. wWMxiRb¨ Dc¯wcZAwfm›‘f

ZËveavqK
W. gnv¤§‘ Avãiikx‘
Aa¨vcK I †Pqvig¨vb
BmjwgK ÷wWRwefvM
XvKwekwe‘¨vjq
XvKv-1000

M‡elK
wkDjx †eMg
wcGBP.wW. M‡elK
†iwR. bs- 54/2012-13
BmjwgK ÷wWRwefvM
XvKwekwe‘¨vjq
XvKv-1000

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
অক্টোবর ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

mv¤c‘wqK m¤cxwZ I Bmjvg : †c¶vcU evsjv‡‘k

(1900-2000)

XvKv wekwe‘¨vj‡q wcGBP.wW. wWMxi Rb¨ Dc¯wcZ Awfm›‘f

ZËveavqK
W. gnv¤§‘ Avãi ikx‘
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

M‡elK
wkDjx †eMg
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি. নং- ৫৪/২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

XvKv wekwe‘¨vjq, XvKv 1000, evsjv‡‘k
A‡±vei 2016

Dhaka University Institutional Repository

cZ¨qbcÎ

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক শিউলী বেগম কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত Òmv¤c‘wqK m¤cwZ I Bmjvg : †c¶vcU evsjv‡‘k (1900-2000)Ó শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমি এর পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং গবেষককে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(W. gnv¤§‘ Avãi ikx‘)
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

†NvlYvcÎ

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত Òmv¤c‘wqK m¤cxwZ I Bmjvg : †c¶vcU evsjv‡‘k (1900-2000)Ó শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, চেয়ারম্যান ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জন বা প্রকাশনার জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

(wkDjx †eMg)

পিএইচ.ডি গবেষক

রেজি. নং- ৫৪/২০১২-১৩

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী মা ও বাবা-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

KZÁZv ¯xKvi

পরম করুনাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে অবশেষে “সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ইসলাম : পেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯০০- ২০০০)” শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে পেরেছি। যথাসময়ে বিধি মোতাবেক অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি এবং নবী করীম (সা.) এর শানে দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

এ সময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন, অধ্যাপক ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি। কর্মব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতা স্বত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই ছিল আমার গবেষণা কর্মের পাথেয়। গবেষণার বিষয় নির্বাচন এবং বার বার কাজটি করার জন্য তিনি আমাকে তাগিদ দিয়েছেন। গবেষণা চলাকালীন বিগত ৭ই মে ২০১৫ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। আমি তাঁর পবিত্র আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দিন স্যারের ইন্তেকালের পর আমি গবেষণা কর্মের সফল সমাপ্তি জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। তখন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, আন্তজার্তিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের স্বরণাপন্ন হই। তিনি আমাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণার সুযোগ দিয়ে স্থবির হয়ে যাওয়া গবেষণা কর্মে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলেই অভিসন্দর্ভটি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাঁর আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায় আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। বার বার তাগিদ দেয়ার কারণেই আমি গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে শেষ করতে পেরেছি। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁর যথাযথ তত্ত্বাবধানের কারণেই গবেষণা কর্মটি শেষ পর্যন্ত জমা দিতে পেরেছি। আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

অভিসন্দর্ভটি রচনার শুরুতে যার পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণায় সহায়ক হয়েছে, যার কাছে আমার ঋণ অনেক, তিনি হলেন আমার অপর শিক্ষক মরহুম ড. আব্দুস সামাদ, অধ্যাপক ভূ-তত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা ও বাবাকে । তাঁরা আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁদের দু‘আ আজও আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় হয়ে রয়েছে। তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

আজ এমনই এক স্মরণীয় মুহুর্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের পবিত্র আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন ।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লেখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে 'পাদটিকা' 'উদ্ধৃতি'তে সেসকল লেখকের নাম ও তাঁদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবু এখানে আরেকবারে ঐ সকল লেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যেসব প্রতিষ্ঠান ও সূধীজন আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অভিসন্দর্ভটির বর্ণ বিন্যাসে সহযোগিতার জন্য আমার স্নেহধন্য আবু বকর, বাপ্পি, শফিক, রুবেল, রনি ঘোষ ও জনিকে আন্তরিক দোয়া ও ধন্যবাদ।

আমার শ্রদ্ধেয় শশুর-শাশুরী, ভাই-বোন, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী যারা সবসময় আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার ছোট্ট মেয়ে মাইশা ইসলাম মুনিয়া গবেষণা কাজের জন্য আমার সাহচর্য থেকে অনেক সময় বঞ্চিত হয়েছে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

সবশেষে আমার স্বামী এ. এস. এম. মঞ্জুরুল ইসলাম খাঁন এর কাছে আমি অনেক ঋণী। গবেষণাকালীন সাংসারিক দায় দায়িত্ব পালন ছাড়াও গবেষণা কাজে আমাকে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর সহযোগিতা না পেলে গবেষণা কর্মটি শেষ করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না। আমি তাঁর প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আল্লাহ সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন ।

শিউলী বেগম
পিএইচ.ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

e¨eüZ kã ms‡KZ

সা.	=	সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
রা.	=	রাদিয়ালাহু আনহু
র/রহ.	=	রহমতুল্লাহি আলাইহ
আ.	=	আলাইহিস সালাম
ইং	=	ইংরেজি
বা/বাং	=	বাংলা
হি.	=	হিজরি
খ.	=	খণ্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার/ চিকিৎসক
অনু.	=	অনুবাদ
জ.	=	জন্ম
মৃ.	=	মৃত্যু
অনু	=	অনুদিত
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
বি.দ্র.	=	বিস্তারিত/বিশেষ দ্রষ্টব্য
P.	=	Page
PP	=	Pages
Op.cit	=	Operae-citrae
Ed.	=	Edition/Editor/Edited
JASE	=	Journal of Asiatic Society of Bangla.
Ibid	=	(Ibidem) in the same place; from the same source.

Dhaka University Institutional Repository

mPxcÎ

পৃষ্ঠা

প্রত্যয়নপত্র	ii
ঘোষণাপত্র	iii
উৎসর্গ	iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	v
ব্যবহৃত শব্দ সংকেত	vii
সূচীপত্র	viii
সারণী সমুহের তালিকা	xiii
ভূমিকা	(১-৬)
c_g Aa¨vq : M‡elYv wk‡ivbv‡g e¨eüZ cZ¨qmg‡ni msÁvqb I cwiwPwZ	(৭-৫৪)
* সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	৮
* ইসলাম	১৫
* বাংলাদেশ	৪৫
wØZxq Aa¨vq : mv¤c‘wqKZv, ag I ms¯wZ	(৫৫-৮৬)
*সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও স্বরূপ	৫৬
* ধর্মীয় সহণশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	৬৭
* সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	৭৫
*বাঙ্গালী সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক উপাদান	৮৩

ZZxq Aa¨vq : Bmjv‡g ms¯‹wZ, gvbevwaKvi, gj¨‡eva I mv¤c‘wqK m¤cxwZi avivYv	(৮৭-১৬৯)
* Bmjvgx ms¯‹wZ I Gi wewfbœ w‘K	৮৮
ব্যক্তিগত জীবনে-	৯৪
সামাজিক জীবনে -	৯৯
রাজনৈতিক জীবনে-	১০১
অর্থনৈতিক জীবনে -	১০৭
* Bmjv‡g gvbevwaKvi	১০৯
জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা	১০৯
জাতিসংঘের ঘোষণার অসম্পূর্ণতা	১১০
মানবাধিকারের সংজ্ঞা	১১২
ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার	১৪০
* Bmjvgx mgv‡Ri gj¨‡eva	১৫১
মূলবোধের সংজ্ঞা ও পরিচিতি	১৫১
ইসলাম সমাজের মূল্যবোধ	১৫৩
মানুষের মর্যাদা	১৫৩
আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার	১৫৫
সকলের জন্য সমান সুযোগ	১৫৬
সামাজিক দায়িত্ব	১৫৭
সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টন	১৬০
সামগ্রিক জীবনবোধ	১৬১
ভ্রাতৃত্ববোধ	১৬২
সাম্য ও গণতন্ত্র	১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ন্যায়বিচার	১৬৭
ইসলামে সমাজবদ্ধ জীবন	১৬৮
PZ_ Aa¨vq : Bmjv‡gi wekRbxb ‘wófw½ I mv¤c‘wqK m¤cxwZi aviYv	(১৭০-২৬৫)
* ms¯‘vi, cbMVb I mv¤c‘wqK m¤cxwZi ev¯Íevq‡b Bmjvgx Av‘‡ki wekRbxbZv	১৭১
ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক বন্ধন	১৭১
সহাবস্থান ও সম্প্রীতি	১৭৪
সামাজিক সহাবস্থান	১৭৫
অমুসলিমদের সাথে সহাবস্থান	১৭৬
ইয়াতিম, দুঃস্থ্য ও মাযলূম মানুষের প্রতি কর্তব্য	১৭৬
সম্পদের নিরাপত্তায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা	১৮৩
ইসলামী সমাজে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্যদের অধিকার	১৮৬
আদর্শ সমাজ গঠনে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা	১৯০
সামাজিক অপরাধ দমণে ইসলামী বিধান	২০৩
ইসলামী সমাজে নারীর সম্মান ও স্বাধীনতা	২১৮
* wekgvbeZvi ghv‘v, Kj¨vY I mv¤c‘wqK m¤cxZ cwZôvq Bmjv‡gi Av‘k	২২৪
মানবতা ও সাম্প্রদায়িকতা : ইসলামের আদর্শ	২২৪
মানব সভ্যতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের আদর্শ	২৩১
পরমত সহিষ্ণুতা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের আদর্শ	২৩৫
* mv¤c‘wqK m¤cxZ cwZôvq gnvbex (mv.) Gi Av‘‡ki wekRbxbZv	২৪১
অমুসলিম সম্প্রদায় এর প্রতি মহানবী (সা.) এর সদাচার ও সৌহার্দ্যবোধ	২৪১
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ	২৪৯
মদিনা সনদ : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অভূতপূর্ব দলিল।	২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কুরআন ও হাদীসের ভূমিকা	২৬২

cÂg Aa¨vq : evsjv‡'‡k Bmjv‡gi Awwefve Ges mv¤c'wqK m¤cwZ cwZôvq mdx I 'i‡ekM‡Yi Ae'vb	(২৬৭-৩৩১)
ইসলামপুর্ব বাংলাদেশের ধর্মসমূহ	২৬৭
ইসলামের আবির্ভাবকালে বাংলাদেশের সামাজিক নৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট	২৮৫
বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ধরণ ও প্রকৃতি	২৯১
বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সূফী সাধক ও তাঁদের তরীকার বিকাশধারা	৩০০
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সূফীসাধকদের অবদান	৩০৭
শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সূফী সাধকদের অবদান	৩১১
সমাজ জীবনে সূফীদের অবদান	৩১৬
শাসন কর্তৃপক্ষের উপর সূফী-দরবেশগণের প্রভাব	৩২৩
lô Aa¨vq : evsjv‡'‡k mv¤c'wqK m¤cwZ weKv‡ki †c¶vcU	(৩৩৩-৩৬৪)
* বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (১৯০০-২০০০)	৩৩৩
* সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিকাশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ফলাফল সম্পর্কিত প্রশ্নপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সারণীর আকারে প্রকাশ এবং বিশ্লেষণ।	৩৪৫
mßg Aa¨vq : evsjv‡'‡ki msL¨vjN m¤c'vq I mv¤c'wqK m¤cwZi eZgvb wPÎ	(৩৬৫-৪১৪)
* বাংলাদেশে মানবাধিকার	৩৬৫
* বাংলাদেশের সংবিধানে অধিকার	৩৬৬
* বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ এবং বাংলাদেশে তাদের অবস্থান	৩৭১

* সংখ্যালঘুদের মর্যাদা ও অধিকার	৩৭৯
* বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও রাজনৈতিক দল প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র, ইশতেহার ও গঠনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	৩৮৩
* ইসলামী রাজনৈতিক দল, অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক দল	৩৮৬
* বাংলাদেশের বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বর্তমান চিত্র	৩৯৫
Aóg Aa¨vq : Bmjv‡gi ‘wô‡Z evsjv‡‘‡k we‘¨gvb mv¤ú‘wqK m¤úxwZi chv©‡jvPbv	(৪১৬-৪৪৪)
* ইসলামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তি	৪১৬
* ইসলামী নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন	৪২৫
beg Aa¨vq : M‡elYvi mvgwMK gj¨vqb I mcwikgvjv	(৪৪৫-৪৫৫)
* গবেষণার সামগ্রিক মূল্যায়ন	৪৪৫
* বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও দিক নির্দেশনামূলক সুপারিশমালা	৪৫০
Dcmsnvi	৪৫৪
পরিশিষ্ট	৪৫৭
গ্রন্থপঞ্জি	৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সমূহের তালিকা

সারণী নং		পৃষ্ঠা
১.	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর বয়স ও লিঙ্গ সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ	৩৪৫
২.	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ	৩৪৭
৩.	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর আয় সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ	৩৪৮
৪.	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ধর্ম সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ	৩৪৯
৫.	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর এলাকা সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ	৩৫০
৬.	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তিগুলোর অবস্থান সম্পর্কে মতামতের বিন্যাস	৩৫১
৭.	ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক কি-সে সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের অভিমতের বিন্যাস	৩৫২
৮.	সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক রাজনৈতিক প্রভাব কোনটি সে সম্পর্কে সংগৃহীত মতামতের বিন্যাস	৩৫৩
৯.	সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রভাব কোনটি সে সম্পর্কে প্রদত্ত মতামতের বিন্যাস	৩৫৪
১০.	সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাব কোনটি সে সম্পর্কে প্রদত্ত মতামতের বিন্যাস	৩৫৫
১১.	সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাব কোনটি সে সম্পর্কে প্রদত্ত মতামতের বিন্যাস	৩৫৬
১২.	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তিগুলো নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে সে সম্পর্কে মতামতের বিন্যাস	৩৫৭
১৩.	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধীদের মূল চালিকা শক্তি কোনটি সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	৩৫৮
১৪.	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির বিরোধী শক্তিগুলোর বর্তমান ক্ষমতা সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের অভিমতের বিন্যাস	৩৫৯
১৫.	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তি অদুর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে কিনা সে সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৩৬০
১৬.	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে মতামতের বিন্যাস	৩৬১
১৭.	eাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য উত্তরদাতারা যে সকল সুপারিশ প্রদান করেছেন, সে সম্পর্কে তাদের অভিমতের বিন্যাস	৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

fwgKv

তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে সাম্পদায়িকতার ব্যাপকতা কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশেই সাম্প্রদায়িকতা জনজীবনে এক জটিল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার লোকের হতাহত হওয়া এবং শত শত কোটি টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হওয়া এখন এ দেশগুলোর জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা থেকে শুরু করে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলিম কেউ আজ আর নিরাপদ নয়। সবার মনেই প্রজ্জ্বলিত প্রতিরোধ স্পৃহা ও বিশ্বাসহীনতা। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতার সংগে ধর্ম পালনের কোন সম্পর্ক নেই। সাম্প্রদায়িকতা একটি বিষয়, ধর্মপালন ভিন্ন আরেকটি বিষয়। উভয়ের উদ্দেশ্য ও পরিনতিও এ কারণেই অবশ্যই ভিন্ন। ধর্মপালনের উদ্দেশ্য প্রধানত সৎ থাকা, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভ। সাম্প্রদায়িকতা ধর্মপালনকে উৎসাহিত করে না, অধর্ম ও দুরাচার ডেকে আনে। এর উদ্দেশ্য বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি, স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা। আর এটি করা হয় ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে, ধর্মের নামে লোক ক্ষেপিয়ে। গুঢ় চক্রান্তকে সফল করার জন্য এটি বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং এক সম্প্রদায়ের লোককে অপর সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে পরস্পরকে দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে লিপ্ত করে। এভাবে স্বার্থান্বেষী, সুবিধাভোগীশ্রেণি জনতার ঐক্যকে বিনষ্ট করে এবং তাদের শক্তিকে খর্ব করে চরমভাবে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ঐতিহ্য হাজার বছরের। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এ দেশে সমস্ত বিপদেআপদে শ্রেণি, বর্ণ- বৈষম্য, ভেদাভেদ ভুলে এদেশের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গড়ে তুলেছে বাংলাদেশ। মুসলিম, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এক সারিতে দাঁড়িয়ে বার বার রুখে দিয়েছে আগ্রাসী হামলা, ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা, রক্ষা করেছে সার্বভৌমত্ব। এ কথা ঠিক যে, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করেই এদেশে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং তাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল্যবান আত্মদানের ঘটনা এবং সর্বোপরি ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের জনগণ গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছেন। এদেশে একই সাথে মসজিদে আজানের ধ্বনি ও মন্দিরে শাখের আওয়াজ বাজে। মুসলমানরা মসজিদে যায়, হিন্দুরা মন্দিরে। কোথাও এতটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি। এ দেশের সংবিধানের তৃতীয়ভাগে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে যে, "আইন, জনশৃংখলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে সকল

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন, প্রচার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার রয়েছে, কাউকেও অন্য ধর্মের শিক্ষা গ্রহণে বা অন্য ধর্মের অনুষ্ঠান বা উপাসনায় যোগদান করতে বাধ্য করা যাবে না"। এ দেশ গণতন্ত্রের দেশ এখানে প্রত্যেক নাগরিক পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে নিজ নিজ ধর্ম পালন করছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা এদেশের ভাবমূর্তিকে, এদেশের মানুষের মানবিক চেতনাকে কলুষিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কুটচক্রান্ত করছে। সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের অতিরঞ্জিত প্রচার প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে মহল বিশেষ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করছে। দেশে মিথ্যাচর্চা-প্রচারণা যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে সচেতন মহল বিভ্রান্তনা হলেও দেশের সরল জনসাধারণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির আশংকা রয়েছে। স্বার্থান্বেষী মহল এদেশের ইসলামী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিত্ব ও সার্বিকভাবে আলেম সমাজকে নির্বিচারে মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, ধর্মব্যবসায়ী, স্বাধীনতাবিরোধী, ফতোয়াবাজ, মধ্যযুগীয়, প্রগতিবিরোধী ইত্যাদি আপত্তিকর পরিভাষায় আখ্যায়িত করে আসছে।

এ কথা সত্য যে সম্প্রতি এদেশে কতিপয় অসৎ ফতোয়াবাজের দাপটও বেড়েছে, এদের কর্মতৎপরতায় বহু কর্মজীবী মহিলা নির্যাতিত হয়েছেন, তালাকপ্রাপ্তা হয়েছেন। এদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হলো সাবলম্বী নারী সমাজ, মুক্তমতি চিন্তাবিদ ও ভাবুক, প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক। জাতীয় পর্যায়ে এ ফতোয়াবাজির মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে আঞ্চলিক ও গ্রাম পর্যায়ে। গ্রামে গঞ্জে এক শ্রেণির অসৎ লোক ফতোয়ার আবরণে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। বর্তমানে এর মাধ্যমে যে অমানবিক নারী নির্যাতন চলছে তা ইসলাম সম্মত নয়। ফতোয়াবাজরা আসলে ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ একধরণের কুট মতলববাজ। এরা এ মতলববাজির উদ্দেশ্যে ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আর তা সম্ভব হচ্ছে সমাজে সিংহভাগ মানুষ নিরক্ষর, অশিক্ষিত এবং প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকার কারণে। বস্তুত কারোর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগকারীর কঠোর শাস্তির বিধান ইসলামে রয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারে জীবন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার জোর জবরদস্তি ইসলাম সমর্থন করে না। একমাত্র ইসলামই সর্বোত্তমভাবে অন্যের অধিকারকে হিফাজত করে এবং একজন প্রকৃত মুসলমান কখনই সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। কেননা সাম্প্রদায়িকতা যেকোন অর্থে ধর্মেরই লংঘণ ও বিরুদ্ধাচারণ। ইসলাম ঘোষণা করে বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ তা'আলা সুন্দর ভাষণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি মানুষকে আহবান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে ব্যাখ্যা করে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি ইসলামের একটি অসহিষ্ণু ও অনড়চিত্র উপস্থিত করেন প্রকৃত ইসলামের সাথে

যার কোন সম্পর্ক নেই। যারা নিজ নিজ স্বার্থে কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে স্বঘোষিত বিজ্ঞ সেজে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে তাদের যেমন সমর্থন করা যায় না তেমনি আবার যারা ধর্মের নামে উম্মাদনা সৃষ্টি করে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এবং ইসলামের নামে মানুষকে সহিংসতার প্রতি উস্কে দিয়ে, সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে. সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তাদেরকেও সমর্থন করা যায় না। তাই বর্তমানে সঠিকভাবে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার ধারায় যদি জনমতকে উদ্বুদ্ব করা না যায় তাহলে সকল পর্যায়ের উন্নয়নের উদ্যোগ পদে পদে হোঁচট খেতে বাধ্য। আর এ কারণেই ব্যাপক সচেতন উদ্যোগের প্রয়োজন। তাই বর্তমানে এ গবেষণা কর্মটির যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত। সাম্প্রদায়িকতা যেহেতু গোটা সমাজকেই কলুষিত করে এবং এর বিষবাষ্পে কলুষিত হয় সমাজের আবহ, ভেঙ্গে পড়ে সামাজিক মূল্যবোধ, তাই এ সমস্যা যাতে ব্যাপকতা লাভ করতে না পারে তার একটি দিক নির্দেশনা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা বর্তমান সময়ের জন্য একান্তআবশ্যক। আর এ গুরুত্বের বিষয়টি গবেষণাকর্মটির যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা থেকে দেশের সিভিল সমাজ,মানবিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতকে রক্ষা করতে হলে সে সম্পর্কে যত বেশি আলোচনা হবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তত বেশি সামাজিক চেতনা ও প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। তাই এ সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ পরিনতি কি, এর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল কি, সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকতার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়ই বা কি, এ সম্পর্কে মতামত যাচাই করে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা বর্তমান সময়ের জন্য অতীব জরুরী। এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি, নতুন আইন তৈরী, পুরাতন আইন সংস্কার করার লক্ষ্যে সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদসহ সরকারি, বেসরকারি ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাই সঙ্গত কারণেই এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই এ সব সমস্যা ও প্রশ্নগুলোর সঠিক সমাধান ও উত্তর খুঁজে বের করাই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

c_gZ : এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ইসলামী দৃষ্টিকোণের আলোকে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রাজনীতি যে মানব সেবার ব্রত এ বিষয়ে সকলকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহান ব্রতে উজ্জিবীত করে দলীয়, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় হানাহানি এবং সংঘাত বন্ধের স্থায়ী সমাধান বের করা।

wØZxqZ : সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে উদারনৈতিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম বাঁধা। এ গবেষণার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক থাবা প্রসার রোধের এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধির নতুন দিগন্তের উম্মোচন ঘটানো।

ZZxqZ : সাম্প্রদায়িকতার ফলে যে, ধর্মন্ধতা, দাঙ্গা ও উম্মাদনার সৃষ্টি হয় তা সভ্য মানব সমাজের জন্য কলংক জনক এবং উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পরিপন্থি। সাম্প্রদায়িকতার এ কুফল সম্পর্কে জনগণকে জ্ঞাত ও সচেতন করে তোলা এ গবেষণাকর্মের অপর একটি উদ্দেশ্য।

PZ_Z : সাম্প্রদায়িকতার কারণে সৃষ্ট প্রগতিশীল রাজনীতিতে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়, এ গবেষণার ফলে ইসলামী চিন্তার আলোকে সে সমস্যার সমাধানের কৌশল উদ্ভাবনের রূপ রেখা তৈরি করা যাবে।

উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বিষয় বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবসৌন্দর্য ও অবয়ব কে সুন্দর ও সুচারুরূপে বিন্যাস করার নিমিত্তে এটাকে ৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। অধ্যায়গুলো আবার একাধিক পরিচ্ছেদ নিয়ে গঠিত।

c_g Aa¨v‡q, গবেষণা শিরোনামে উল্লিখিত প্রত্যয় ও পরিভাষাসমূহের পরিচয় দেয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সংজ্ঞা, ইসলাম ধর্মের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, মূলনীতি এবং বাংলাদেশের পরিচয় ইত্যাদি এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

wØZxq Aa¨v‡q, সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও স্বরূপ, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা ও সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে যেমন সাম্প্রদায়িকতার তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি এর বাস্তব চেহারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সাম্প্রদায়িকতার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সে সাথে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠার পার্থক্য আলোচনা করে ধর্মনিষ্ঠার উপর সাম্প্রদায়িকতা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

ZZxq Aa¨v‡q, ইসলামের সংস্কৃতি তথা সামাজিক শিক্ষা ও মানবাধিকার এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

PZ_ Aa¨v‡q, ইসলামের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্পীতির ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে সমাজ সংস্কার, পুনর্গঠন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাস্তবায়নে ইসলামের আদর্শ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বিশ্বমানবতার মুক্তি ও কল্যাণে ইসলামের মানবতা, সংযম, মমত্ববোধ, পরমতসহিঞ্চুতার আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলোৎপাটনে ইসলামের

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং অবদান পর্যালোচনা করা হয়েছে।

cÂg Aa¨v‡q, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সূফী দরবেশগণের অবদান পর্যালোচনা করা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বণিক, ধর্ম প্রচারক, পীর আওলিয়া ও দরবেশগণের আগমনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলামের সুমহান শিক্ষা, অনন্য আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্যের উদারবাণী, মানবতাবোধ, অনাড়ম্বর জীবন যাপন প্রভৃতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এ অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সূফী দরবেশগণের প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

lô Aa¨v‡q, প্রাক বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে (১৯০০-২০০০ইং) স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহাসিক পেক্ষাপটের ধারাবাহিক বিবরণ দেয়া হয়েছে। এবং রাজনৈতিক, সাংবিধানিক, সামাজিক পঠভূমি ও ইতিহাস আলোচনা করে এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদাতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। এপর্যায়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শ্রেণির অবস্থান, ক্ষমতা, সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন প্রভাব, প্রতিক্রিয়া, ভবিষ্যৎ পরিণতি ও ফলাফল এর চিত্র সারণী আকারে প্রকাশ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

mßg Aa¨v‡q, বাংলাদেশের মানবাধিকার তথা সংবিধানে অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহ, তাদের সংখ্যা ও অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র, ইশতেহার ও গঠনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং ইসলামী রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্য ধর্ম, সম্প্রদায়ভিত্তিক দল ও দলীয় জোটসমূহের লক্ষ্য ও কর্মসূচীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপস্থিতির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সবশেষে বাংলাদেশে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বর্তমান চিত্র উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Aóg Aa¨v‡q, ইসলামী নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাস্তবায়নের কতিপয় দিকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। beg Aa¨vq অর্থাৎ গবেষণার শেষ অধ্যায়টিতে বিশ্লেষিত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণার সামগ্রিক মূল্যায়ন ও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাস্তবায়নের সম্ভাবনা এবং দিক নির্দেশনামূলক সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে।

"পরিশিষ্টে" গবেষণার জরিপ কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা সংযোজিত করা হয়েছে। সবশেষে, গবেষণায় সহায়ক গ্রন্থাবলির তালিকা "গ্রন্থপঞ্জি" শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমি প্রত্যাশা করি যে, এ অভিসন্দর্ভের দ্বারা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হবে এবং ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের উপর গবেষণা করার জন্য প্রেরণা যোগাবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণা কর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে এবং সেই সাথে এটি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ গবেষণা কর্মের অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ আমাকে এবং এ অভিসন্দর্ভের পাঠককুলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন। আমিন।

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায়
c_g cwi‡”Q‘
mv¤ú‘wqK m¤úxwZ

গবেষণা শিরোনামের অন্যতম প্রধান ও প্রথম প্রত্যয় হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সুতরাং আলোচ্য অধ্যায়ে গবেষণা শিরোনামের পরিভাষাগুলোর পরিচয় প্রদানে প্রথমেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা পেশ করা হলো।

বিশেষ কোন দল বা ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে বিচার, অধিকার, সুযোগ, মূল্যায়ন, স্বার্থ ইত্যকার বিষয়ে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল পর্যায়ে নিরপেক্ষতাই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা। এটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকার ঠিক উল্টো। সাম্প্রদায়িকতার শুরুটা ধর্মের সংকীর্ণতায় হলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধর্মের পবিত্র প্রকাশ। সেখানে ধর্ম বিশ্ব মানবতাকে করে রাখিবন্ধনে আবদ্ধ। পারলৌকিক স্বার্থে ও আনন্দে ইহলোককে করে রাখে আনন্দময়, বন্ধুময়। সেখানে থাকেনা হিংসা বিভেদ, অবিচার। ন্যায়, অহিংসা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মানুষের মানবতা প্রষ্ফুটিত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যে কোন মানবগোষ্ঠির আর্থ-সামজিক, রাষ্ট্রিক, ইহজাগতিক, পারলৌকিক সকলক্ষেত্রে কল্যাণকর চিন্তার প্রতীক। তাই অধুনা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মের নিরীক্ষে ইহজাগতিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক স্বার্থকে উদ্ধার করার মানষিক চেতনাকে কখনও স্বীকার করেনা। এখানে সম্প্রদায়কে প্রাধান্য না দিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্টির স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সাম্প্রদায়িকতায় ধর্মের বিকৃত করা হয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে। অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নূন্যতম সৌজন্যবোধ প্রদান করা হয় না। মানুষকে নিরপেক্ষভাবে গুণ ও কর্মের এবং যোগ্যতার প্রেক্ষিতেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মূল্যায়ন করে, ধর্ম কিংবা গোষ্ঠির পক্ষপাতিত্বে নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেক মতাদর্শের মধ্যে যেখানে সার্বজনীন স্বার্থের মতাদর্শকে পাথেয় করে সেখানে সাম্প্রদায়িকতা নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতাদর্শকে একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে কার্যকর করে, অন্যান্য সম্প্রদায় তথা মতাদর্শকে করে পদদলিত। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনাই এরূপ রাষ্ট্রের লক্ষ্য, সাফল্যের অন্যতম নিয়ামক। [১]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এমন এক চেতনা ও আদর্শ মত যেখানে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে

১। Asgar Ali Engineer, *The making of riot narrative*, Seminar. November, 2002, Dellhi.

Dhaka University Institutional Repository

সকলের স্বার্থকে নিরপেক্ষভাবে ন্যায়তা, দক্ষতা, যোগ্যতা ও সার্বজনীনতার প্রেক্ষিতে প্রাধান্য দেয়া হয়।[২]

সুতরাং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মত, পথ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক সৌহার্দ্যবোধ এবং এর বহিঃপ্রকাশ। সেখানে বিভিন্নজাতি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে, সেখানে জাতিগত-ধর্মগত- বর্ণগত কোন দ্বন্দ্ব, বিভেদ, রেষারেষি এমনকি নীচু করে দেখার মত মানষিক অবস্থা ও পরিবেশ থাকবেনা। পরস্পর পরস্পরের কৃষ্টি, রীতি-নীতি প্রথা নিয়মনীতি ও জীবন পদ্ধতিতে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ ও সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সম্প্রীতি ও সৌজন্যবোধের মধ্যে দিয়ে সমাজে সহাবস্থান করবে। এমন পরিবেশে থাকবেনা পরস্পরের প্রতি অন্যায় অবিচার শোষণ বঞ্চণা। উঁচু-নীচুর বিভেদ এবং একে অপরের ক্ষতি করার মানষিক অবস্থা এবং বল প্রয়োগের প্রচেষ্টা।[৩] কাজেই পারস্পরিক হৃদ্যতা সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সংযম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে এবং কোনরকম ধর্ম, জাত-পাত, বর্ণ-গোত্র ও গোষ্ঠিগত দ্বন্দ্ব বিভেদ সৃষ্টি না করে একত্রে বসবাস ও সহাবস্থান করাই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।[৪]

Peter Harrison communal harmony সম্পর্কে বলেন ,"Communal harmony refers to the principle that different people within a community or society must live together peacefully and in pursuit of mutual goals. Disharmony, therefore, is the product of alienation of group from one another based on differences. In addition to this general definition, the term communal harmony has taken on special meaning in the nation of India, where it represents an overcoming of traditional separations within society based on religion and caste.

India is one of the most deeply divided societies in the modern world. For thousands of years, Indian culture has largely embraced a strict caste system governing professional and social conduct. Initially rooted in

---

২। সুজিত সেন, mv¤cª`wqK mgm¨v I D‡ËviY, পুস্তক বিপণী, কলকাতা : ১৯৯১, পৃ . ২৫

৩। বিপান চন্দ্র, AvawbK fviZ I mv¤cª`wqKZvev`, কে,পি,বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা : ১৯৮৯, পৃ . ১

৪। বদরুদ্দিন উমর, mv¤cª`wqKZv, মুক্তধারা, ঢাকা : 1985, পৃ . ১১

Hindu scripture and pertaining primarily to the professions, morality and ethics, the system grew to encompass religion, wealth, prestige, education and virtually all other aspects of life. Historically, the system has offered little chance of meaningful interaction or upward mobility between certain castes. The social situation is further complicated by the increasing prevalence of the Muslim, Christian and Sikh faiths in the traditionally Hindu and Buddhist country. The term "communal harmony," as well as the principles behind it, has become commonplace in Indian society, despite strong opposition from traditionalists. Although India is an extreme case, similar circumstances can be seen all over the world."[৫]

Ring Lardner. communal harmony সম্পর্কে বলেন, "They gave each other a smile, with a future in it. persons belong to different religions having their own faith, belief & worship are living together as a community at large without any hatredness or contempt towards each other is communal harmony."[৬]

Prof. B. M. Hegde এর মতে, "Communal disharmony in the society is a social disease. This needs to be probed into very deeply to look for the aetiologic factors and then we, as a society, should strive to have the best management strategy possible with radical surgery when needed. Quick fix methods like draconian laws would only be counter productive in the long run, to say the least. Hatred begets hatred and does not cure

---

৫| http;//www.googleadsevices.com

৬। Marjan Haque, `A Triangle of communal Harmony, communal violence and political power: A sociological analysis', *Banglavision Research Jaurnal*, vol. 14, No. 1, 2014, P. 85

Dhaka University Institutional Repository

the malady. Love might do that. Health is defined as physical, mental, social, spiritual and communal well being. Disease is not just the absence of physical disability. In that sense communal disharmony is a disease which originates in the minds of the perpetrators and their henchmen. Most of the time the organizers of the crime have some vested interest in the happenings."[৭]

জাতীয় সংহতি ও জাতি গঠনের অন্তরায় হচ্ছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি জাতীয় সংস্কৃতির জন্য হুমকি স্বরূপ এবং এর বড় শত্রু।[৮] আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, গোত্র জাতি নির্বিশেষে সকলের নিজস্ব কৃষ্টি স্বীকার ও অক্ষুন্ন রেখে একটি জাতীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে সকলকে একত্রিত করে বিশ্বে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। যা তৈরী না হলে জাতীয় ঐক্যমত গঠন ও সংহতি অর্জন সম্ভব নয় এবং এর ফলে কৃষ্টিদ্বন্দ্ব রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোষ্টিকে দাঁড় করায় পরস্পরের প্রতিপক্ষে ।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আত্মন্নোয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য সরকারের তথা রাষ্ট্রের সর্বাত্মক সহোযোগিতা ও স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। দল, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নিরীক্ষে নয়, মানবতা ও যোগ্যতার নিরীক্ষে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পুরণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, রাজনীতি তথা মানবিক প্রয়োজনের সবকিছুতে রাষ্ট্রের সকল জনগণের ন্যায্য ও সমান স্বাধীনতা, অধিকার, সুযোগ উপভোগ ও সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় সেটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সে কারণে গণতান্ত্রিক রাজনীতি সমগ্র বিশ্বে অধিক জনপ্রিয় ও মানব কল্যাণের সেরা গ্যারান্টী। অন্যক্ষেত্রে বিশেষ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়াই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। কাঙ্খিত ধর্মীয় সম্প্রদায় ব্যাতীত অন্য সকল ধর্মহীন, পরিত্যাক্ত এবং সহাবস্থানের অযোগ্য, সর্বোপরি ভিন্ন মতাবলম্বীদের

৭| http;//www.googleadsevices.com
৮। শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, 'ʋ½ʋi BʋZnvm, ʋমত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা : ১৪০১, বাংলা, পৃ . ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্ব হীনতাই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাম্য। সাম্প্রদায়িকতার ফলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে দল, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে ন্যায্য অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের এ সংকট জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ। এ প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এবং রাষ্ট্রের বিকাশ সাধনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রধান অন্তরায়। কাজেই গণতন্ত্র ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য।[৯]

পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত । বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, গোষ্টি, আদর্শের দল, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, সম্প্রদায় ভাষা জাতি উপজাতির সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হবে এটাই বাস্তবতা। এ বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সেতু বন্ধন রচনাই গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে নিজস্ব দলীয়, মতাদর্শীক, গোষ্ঠি, জাতি সর্বোপরি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছাড়া অন্য সব কিছুকে নিষিদ্ধ এবং নিশ্চিহ্ন করা হয়, যে কারণে রাজনৈতিক চর্চার পরিবর্তে এখানে চলে ক্ষমতাধরদের প্রতাপ ।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মানুষ ও মানবতা নিধনের উৎস। ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে এর পরিণতি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ধর্মীয় পূণ্যের আলোকে এক সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিরীহ, নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করে রক্তের হোলি খেলার উৎসব সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্যতম স্বীকার্য। মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার বিশ্বায়নের এ যুগে এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে মানবতার চরম লংঘণ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় প্রথমতঃ এটি বিপক্ষ প্রতিবেশীর মধ্যে ঘটে, দ্বিতীয়তঃ এর সমাপ্তি হয় অমীমাংসিত। যে কারণে এলাকার লোকদের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন ভাব থাকে নিরন্তর। অন্যদিকে পরবর্তী দাঙ্গার জন্য মানুষের মধ্যে চলতে থাকে জোর প্রস্তুতি। সুযোগ পেলেই একপক্ষ অন্যপক্ষকে ঘায়েলে সঙ্গীণ থাকে। এটি একটি মারাত্মক সামাজিক ক্যান্সার। রাজনীতির আড়ালে সাম্প্রদায়িকতার এ যে, প্রকাশ্য নরহত্যা, মানুষের ভিটেমাটি উচ্ছেদ, মানুষের সাথে মানুষের চির শত্রুতার সম্পর্ক তা শুধু কোন রাষ্ট্রের সুস্থ্য রাজনীতির জন্য হুমকি নয়, মানবতারও চরম লঙ্ঘণ। বিভেদ নয়, মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশ্বয়কর বিজ্ঞানের এ যুগে পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করাই বর্তমান বিশ্বায়নের লক্ষ্য। কিন্তু বিশ্বমানবতাকে এক সূত্রে গাঁথার পথে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হচ্ছে দুর্লঙ্ঘ বাঁধা কাজেই কল্যাণের লক্ষ্যেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য ।

৯। বদরুদ্দিন উমর, C\/¸ ³, পৃ.২৮

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের পরিপন্থি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। সামাজিক যোজনা (Social mobilization), অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development) এবং জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রের (Nation state) গোড়াপত্তন, রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের অন্যতম নিয়ামক । এ নিয়ামকগুলোকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কতগুলো সমস্যা ও সংকট কাটিয়ে উঠতে হয়, এ গুলো হচ্ছে একাত্মতার সংকট, বৈধতার সংকট, অনুপ্রবেশের সংকট, অংশগ্রহণের সংকট এবং বণ্টন সংকট । সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এ সমস্যা ও সংকটগুলোকে সক্রিয় মদদ দিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণকে বাঁধা দান করে।[১০]

আর তাই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি (Inter Religion Harmony) সাম্প্রতিক বিশ্বের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি, নিরাপদ সহাবস্থান, বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সারা পৃথিবীতে আজ অনেক খ্যাতনামা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ তাদের লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্মান্ধতা, গোড়ামী ইত্যাদি দূর করার চেষ্টায় নিয়োজিত। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলিম সবাই নিজের ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মকে আন্তরিকভাবে অধ্যায়ন করেছেন। তাদের প্রায় সবাই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য কাজ করেছেন এবং করছেন। মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী ৮ই জানুয়ারি ২০১৫ মক্কা নগরীতে ‘আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পরিচিতি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি’ শীর্ষক সেমিনারে i‡eZv Avjg Avj Bmjvgxi উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, “ইসলামকে যারা সমর্থন করে না তাদের সাথে বিতর্ক করতে হবে উত্তম পন্থায়। বির্তকের সঠিক ব্যাপার হলো উত্তম পন্থা। অর্থাৎ নম্র পন্থায় ভদ্রচিতভাবে এমন ভাষায় যা অন্তরে দাগ কাটে। মার্জিত সম্বোধন, কৌশল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপস্থাপন, অযাচিত তর্কবিতর্ক বর্জন, বিনয়-নম্রতা, যে সকল বিষয় ঐক্যমত রয়েছে সেগুলো থেকে সংলাপের সূচনা, ক্ষমা, মার্জনা, উদারতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন, পরমত অনুসারীর প্রতি গালমন্দ বা কটাক্ষতা বর্জন, বুদ্ধিভিত্তিক ও প্রমাণ্য যুক্তি স্থাপন, জ্ঞানের গভীরতা ইত্যাদির মাধ্যমে । পরমত সহিষ্ণুতা সংলাপের অনন্য ভূষণ। পারস্পরিক ক্ষমা, মার্জনা, উদারতা ইত্যাদি গুণাবলীর মাধ্যমে পরমত সহিষ্ণুতা অর্জিত হয়।

১০। মাওলানা আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলী), B¯Ûqv DBbm wdWgm, স্বপ্নিল প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৮৯, পৃ.৬

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বায়নের এ যুগে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা সহ ব্যবসা-বাণিজ্য, সভা-সমাবেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষ পরস্পরের কাছে আসছে, একত্রিত হচ্ছে ও এক সঙ্গে কথা বার্তা বলছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন যেমন সহজতর হয়ে উঠছে তেমনি বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি ইত্যাদির মাঝে মত পার্থক্য দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও পরমত সহিষ্ণুতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতি অবসান পূর্বক পারস্পরিক অনুপম পরিবেশ সৃষ্টির অনন্য মাধ্যম হলো সংলাপ, যার মাধ্যমে পরস্পরের ভুল বোঝা বুঝির অবসান হয়ে মনের সংকীর্ণতা দূর করে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা যায়" ।[১১]

সুতরাং বলা যায়, মানব জীবনের পরম কল্যাণ ও শান্তি নিশ্চিতকারী জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম সুপরিচিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকলের মাঝে শান্তি স্থাপন এর মূল লক্ষ্য। পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুপম জীবনীতে লক্ষ্য করি। পবিত্র কুরআনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কারো প্রতি অসম্মানজনক আচরণমূলক কোন শব্দ খুজে পাওয়া যায় না।

মুসলিমরা সাধারণত কখনো কারোর ধর্মকে দমণ করে রাখেনি, বা ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি, সম্মান দেখিয়েছেন। ইসলামী সাম্রাজ্যের সব নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে আন্তঃধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলিম খলিফা হারুনুর রশিদ অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে বিভিন্ন ধর্মের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা করতেন ধর্মনীতি। বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন এবং সংলাপীয় পদ্ধতিতে কুরআনের অবতরণ কুরআনুল কারীমের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম বিশ্বাস করে, মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে কোন বিভেদ থাকতে পারে না। কিন্তু তারা সবাই এক স্রষ্টার সৃষ্টি। তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ভাষাগত পাথর্ক্য, ভৌগলিক অসংলগ্নতা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা কোন অন্তরায় নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ সংস্কৃতি নির্বিশেষে পারস্পরিক সদাচার, ন্যায় বিচার, সার্বজনীন মানবীয় মূল্যবোধ নিশ্চিত করে মানব জাতির বিশ্বজনীন ঐক্য বন্ধনকে সুদৃঢ় করে ইসলাম।

১১। http;//www.googleadsevices.com

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡”Q`
Bmjvg

Bmjvg cwiwPwZ

আলোচ্য গবেষণার দ্বিতীয় প্রত্যয় হচ্ছে ইসলাম। আলোচ্য পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলাম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো।

শান্তির আশ্রয় ইসলাম। অন্ধকার যুগের ইতিহাসকে মুছে দিয়ে পৃথিবীর বুকে শান্তি ও নিরাপত্তার যে অধ্যায় প্রায় ১৫০০ বছর আগে ইসলাম রচনা করেছে, আজকের পৃথিবীতে তার আবেদন এখনো ফুরিয়ে যায়নি, নিঃশেষ হয়নি তার বিমল আদর্শের প্রয়োজনীয়তা। কেয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বে তা কখনো হবেও না। সে জন্যই ইসলাম স্বীকৃতি পেয়েছে একটি সর্বকালীন সার্বজনীন ধর্ম বা বিধান হিসেবে। ইসলামের প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টি নিবন্ধন করলে সে সত্যই উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাই সমাজের চাহিদা মেটাতে ও যুগ সমস্যা সমাধানের বিধান হিসেবে ইসলামের কোন বিকল্প নেই।[১২]

ইসলাম আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পন করা, শান্তির পথে চলা, মুসলমান হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করা, বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করেন তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে একজন মুসলমানকে জীবন যাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা, রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচার ভিত্তিক শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ গতিশীল সুন্দর সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই। ইসলাম ধর্মের মর্ম হল আল্লাহর পরিপূর্ণ গতিশীল আনুগত্য করা। আর প্রত্যেক নবী-পয়গম্বরই যেহেতু নিজে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য থাকার সাথে সাথে উম্মতকেও এর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন তাই সকল নবীর দ্বীনই ইসলাম। ইসলাম শব্দটি 'সলম' ধাতু হতে উৎপন্ন। 'সলম' ধাতুর মূল অর্থ হচ্ছে শান্ত হওয়া, বিশ্রামে থাকা, কর্তব্য নিষ্পন্ন করা, পূর্ণ শান্তিতে থাকা।[১৩] এর বুৎপত্তিগত অর্থ শান্তি, আপোষ, বিরোধ পরিহার। কুরআনে এর কয়েকটি পদের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যেমন-

---

১২। ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত), mšvm cwZ‡iv‡a Bmjvg, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৯, পৃ. ১০৭

১৩। Sayed Amir Ali, *The Spirit Of Islam*, Kitab Bhaban, Delhi : 1947, P.168

Dhaka University Institutional Repository

১। যুদ্ধ বিরতির জন্য শান্তির প্রস্তাব;

২। ইসলামী বিধান;

৩। যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব;

৪। শান্তি অথবা শান্তি কামনামূলক মুসলিম অভিবাদন; [১৪]

সুতরাং ইসলাম অর্থ (১) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কছে আত্মসমর্পন করা।[১৫] (২) শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা অর্থাৎ আত্মসমর্পনে আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সাথে একাত্মতার অনুভূতিতে, সাম্য নীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।[১৬]

ইসলাম একটি 'দ্বীন' এবং দ্বীন অর্থ পারস্পরিক ব্যবহার, লেনদেন ইত্যাদি। এ দ্বীনের প্রধান উৎস কুরআন। কুরআনে বিধৃত দ্বীন ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা, যা বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি মানবের কর্ম জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে।

ইসলাম মানব জাতির জন্য চিরন্তন ধর্ম। এর মূল কথা- (ক) আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস (খ) মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস এবং (গ) সৎকর্মে (আমালে সালেহ) আত্মনিয়োগ। বিশ্বাসের পর্যায়ে আল্লাহর সাথে যোগসূত্ররূপে (১) ফিরিস্তাগণ (২) আসমানী কিতাবসমূহ (৩) সকল নবী-রাসূল (৪) আল্লাহর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ (তাকদীর)-এ বিশ্বাস ও উপরিউক্ত তিনটি মৌলিক উপাদানের সাথে যুক্ত হয়। আদি পিতা ও নবী হযরত আদম (আ.) হতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত কুরআনে উল্লেখিত বা অনুল্লিখিত সকল নবী-রাসূলগণ পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র ও জাতির কাছে উপরিউক্ত তিনটি উপাদান সম্বলিত ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এ তিনের ভিত্তিতে কুরআন সমসাময়িক ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, সাবিঈ ও মাজুসী তথা অপর সকল ধর্মাবলম্বীকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিল এবং এ আহবানে সাড়া দিলে নিরাপত্তা ও মুক্তির নিশ্চয়তা দান করেছিল। এখনও সে আহ্বান কার্যকর।

১৪। বিস্তারিত দ্র. আল কুরআনুল করিম, ৮:৬১,২:২০৮,৪:৯০-৯১,১০:২৫,৫১:২৫ (বঙ্গানুবাদের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুদিত আল কুরআনুল করিম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৩ অনুসরণ করা হয়েছে।)

১৫। আল কুরআন, ২ : ১১২

১৬। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারী, mnxûj eLvix (২য় খ.), ৩য় বাব, বায়তুল আফকার আদ দৌলিয়া, সৌদি আরব : ১৯৯৮, পৃ. ৬০২

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, ইসলাম একটি দ্বীন এবং দ্বীন শব্দের অর্থ পারস্পরিক ব্যবহার, লেনদেন ইত্যাদি। কুরআনে বিধৃত দ্বীন ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা, যা বিশ্বাস আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, দার্শনিকতত্ত্ব ইত্যাদি। এটা মানুষের কর্মজীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। উপরে ইসলাম শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, এটা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর ব্যাপকার্থক হওয়ার আরও একটি প্রমাণ এ যে, ইসলামকে দ্বীন নামেও অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত দ্বীন সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাপকতর অর্থ বহণ করে। দ্বীন শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ আনুগত্য ও ইখলাস হলেও এর মমার্থ হচ্ছে মিল্লাত ও শরীয়ত। আল কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম"।[১৭] এভাবে কুরআনে মহান আল্লাহ ইসলামকে সত্য দ্বীন, আল্লাহর দ্বীন, এবং মজবুত দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দশম হিজরিতে যে আয়াতে আল্লাহ দীনের পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ হবার সুসংবাদ শোনান, সেখানে ইসলামকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে 'দ্বীন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম"।[১৮] ইমাম আবু হানিফার মতে, দ্বীন শব্দটি ঈমান, ইসলাম এবং শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান এ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৯]

সুতরাং দেখা যায় যে, ইসলাম আকীদা, মৌখিক স্বীকৃতি, ঈমান, আমল, আবার পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানও। আর তাদের সবগুলোর সমষ্টির নাম হচ্ছে দ্বীন। এ দ্বীনে রয়েছে- (১) আকীদা (২) ইবাদাত এবং (৩) পারস্পরিক সম্পর্ক (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, আইন বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক)।

মূলত মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান অনুমোদন করেছেন তাই ইসলাম। আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলামই গ্রহণযোগ্য দ্বীন। অন্য কোন দ্বীন বা জীবন বিধান তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।[২০]

১৭। আল কুরআন, ৩:১৯
১৮। আল কুরআন, ৫:৩
১৯। msw¶ß Bmjvgx wek‡Kvl, (৫ম খ.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৭ , পৃ . ২৯৯
২০। আল কুরআন ৩ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের (তাওহীদ) ধারণা অসংখ্য নবী-রাসূলের মাধ্যমে পেশ করেছেন। কিন্তু যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পথনির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নাযিল করেছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মাধ্যমে। শান্তি, সাম্য ও বিশ্বমানবতার ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল লক্ষ্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানব জাতির সর্বস্তরে শান্তি স্থাপন করা। এ শান্তি স্থাপনের মাধ্যমেই পারলৌকিক শান্তি লাভের প্রচেষ্টাই ইসলামের মূলকথা। মহানবী (সা.) মানব জাতির জন্য এ ইসলাম প্রচার করেছেন। মহান আল্লাহ আল কুরআন নাযিল করেছেন স্পষ্ট প্রমাণসহ যাতে সে আলোকে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভুল-নির্ভুল ও ন্যায়-অন্যায় পৃথক করতে পারে।[২১] একটি সম্পূর্ণ সংযুক্ত অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে আল্লাহ এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি প্রজাতি পরস্পরযুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ধর্ম ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের তাৎপর্য বহণকারী এবং সে দ্বীনকে তাঁর ফিতরাত অনুযায়ী সাজিয়েছেন। সেজন্যই মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"।[২২]
ইসলাম; এর শাব্দিক অর্থ আত্মসমর্পন। সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন হলো ইসলাম। অপর অর্থে শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা অর্থাৎ আত্মসমর্পণে আল্লাহর সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতিতে, সাম্য নীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইসলাম নির্দেশিত শান্তির পথে আল্লাহ ও মানবাত্মার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মানবতার উন্নয়নে সৎকাজ করা এবং মানুষের অকল্যাণ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকাই হল মুসলমানের মূলনীতি।[২৩] তাদের সম্পর্কেই আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না"।[২৪]

শান্তিই ইসলামের মূলকথা। এর অন্যতম মৌলিক নীতি আল্লাহর একত্ববাদ ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন শান্তির সাক্ষ্য বহণ করে। ব্যাপক অর্থে ইসলামের তাৎপর্য

২১। msw¶ß Bmjvgx wek‡Kvl, (৫ম খ.), cÖv¸³, পৃ.২৯৯
২২। আল কুরআন, ৩০:৩০
২৩। Sayed Amir Ali, *Op.cit.*, P.168
২৪। আল কুরআন, ২ : ১১২

দু'টি: আল্লাহর একত্ববাদ ও মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এভাবে একজন শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই মুসলমান এবং আর একজন আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যেই নিজের বাসনা ও কামনাকে বিসর্জন দিয়ে মুসলমান।[২৫]

মানব জাতির সৃষ্টির সঙ্গেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। হযরত আদম (আ.) ছিলেন এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নয়, হযরত আদম (আ.) এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন তাঁদের সকলেই ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা লাভ করে। এ ধর্মের কোন প্রচারকের নামানুসারে এর নাম হয়নি। এর নাম হয়েছে ইসলাম। হযরত আদম (আ.) এর পর যত নবী-রাসূল আল্লাহর মহান বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,"তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কুব তাঁর বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী"।[২৬]

মুসলমানগণ শুধু শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,"আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সর্তককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নি"।[২৭] মুসলমানগণই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহ সকল নবী-রাসূলকেই বিশ্বাস করেন। ইসলাম কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না; কোন ধর্মনেতাকেও অশ্রদ্ধা করে না। বিশ্বের সকল ধর্মের মহামিলন ঘটেছে এ মহান ধর্মে। বিশ্ব সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর তাকেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, মানব সভ্যতার যা কিছু মহান তাই ইসলামে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো। মানুষকে সবচেয়ে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা। প্রকৃতির সব কিছুর মত মানুষের মধ্যেও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষকে তাই কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় এবং এরূপ নিয়ম-কানুন প্রদান করাই হল ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দান করেছে

২৫। কে আলী, gm¨jg ms¯‹Zi B¨Znvm, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৭৯, পৃ.১
২৬। আল কুরআন, ২ : ১৩৬
২৭। আল কুরআন, ৩৫ : ২৪

Dhaka University Institutional Repository

এবং তার দ্বারা সে সুপ্ত মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে।[২৮] যা মানুষকে পূর্ণতা ও মুক্তির পথে নিয়ে যায়।

ইসলামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহণ দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি"।[২৯] সৃষ্টির সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্বীয় সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা মানুষের কর্তব্য। মানুষ যদি প্রকৃতি তাড়িত হয়ে অন্য কোন শক্তির নিকট মাথা নত করে তা তার অবনতির কারণ হয় এবং আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে তা মানুষের মানষিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, মানুষ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ইবাদাত করবে, তাঁর নিকট সাহায্য ও দয়া প্রার্থনা করবে এবং কোন অবস্থাতেই তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা পছন্দ করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে"।[৩০] এভাবে মহান আল্লাহ নির্দেশিত পথের অনুসরণের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনের তথা মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

ইসলামের তৃতীয় লক্ষ্য হল মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন। ইসলাম শুধু আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের কথা বলে না, পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার কথাও বলে যার মূলমন্ত্র হল মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ। এ মূলনীতির আলোকেই মানুষ একজন অপরজনের কাছে নিরাপদ থাকবে। শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করবে। কোন জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার কেউ হবে না। ইসলামে শান্তি ভঙ্গকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ করতে হবে।

যারা যুদ্ধক্ষম নয় যথা; অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, নারী, মঠ-মন্দিরাশ্রয়ী সাধু তাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ অথবা তাদের শস্য ও সম্পদ ধ্বংস করা, তাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করা যাবে না। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তোমার

২৮। কে, আলী, C\/¸ ³, পৃ . ৫
২৯। আল কুরআন, ১৭ : ৭০
৩০। আল কুরআন, ৪ : ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।[৩১] "যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে এবং যতক্ষণ তাকে তার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে না দেয়া হয়, ততক্ষণ তাকে আঘাত করা যাবে না"।[৩২] "মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, মুসলিমগণ অভাবগ্রস্ত ইয়াতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে"।[৩৩]

পরিবার ও সমাজে বসবাসরত জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। এ সকল নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আসল উদ্দেশ্য সমাজে শান্তি স্থাপন করা ও তা বজায় রাখা। সুতরাং ইসলাম একদিকে স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে, অপর দিকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষের সাথে সৃষ্ট জগতের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্ক সজ্ঞায়িত করে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সমগ্র জীবনকে বেষ্টন করে আছে ইসলাম। ইসলামে পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। মানব জীবনের প্রতিটি দিক ইসলামে মিশে গেছে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে ঐশীবাণী এলেও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ আল কুরআনের মাধ্যমেই মানব জাতির জন্য এ জীবন বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে। মানব জাতির পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোন কিছুই কুরআন থেকে বাদ দেয়া হয় নি। এ কিতাবে কোন কিছুই অবহেলিত হয় নি। ইসলাম প্রদত্ত জীবন বিধান সর্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জীবনের অপরাপর স্তরগুলোর এক অভিভাজ্য, পরিপূর্ণ ও পরিকল্পিতরূপ। ইসলাম পার্থিব এবং অপার্থিব জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ইসলাম ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে।

কুরআন অনুসৃত নীতিমালার বিপরীতে কোন মৌলিক আইন প্রণয়নের সুযোগ থাকে না কারও হাতে। ইসলামই সরকার, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে নৈতিক মূল্যবোধের অধীনস্ত করেছে। সাধারণ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম অখণ্ডতা, পবিত্রতা ও নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে ইসলাম শাসক ও শাসিতের বিচার সমানভাবেই করে। এমনকি রাসূল (সা.)-এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। এভাবে ইসলাম সকল দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সুষ্ঠু সমাজ সৃষ্টি করেছে।[৩৪]

৩১। আল কুরআন, ৮ : ৫৮
৩২। আল কুরআন, ৯ : ৬
৩৩। আল কুরআন, ৭৬ : ৮
৩৪। মুজিবুর রহমান, Bmjv‡gi ‘ÿô‡Z mve‡fŠgZ, বাংলাদেশ-সৌদী আরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ঢাকা : ১৯৯১, পৃ . ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম দেশ-কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এর ব্যপ্তি ও প্রয়োগ বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। তাওহীদ ভিত্তিক ধর্ম বলে ইসলাম কখনও আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কিংবা ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। ইসলাম জীবনকে দেখেছে সার্বিক ও সর্বাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে। ইসলামী আইন-কানুনও প্রণীত হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এবং জগৎ ও জীবনের মৌল স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে। ইসলাম শুধু সাধু-পুরুষ বা মহাজ্ঞানী মণীষীদের কথাই বলে না, বরং সঠিক পথ নির্দেশ করে পাপ-পূণ্য ও সুখ-দুঃখ নিয়ে যাদের জীবন সে সাধারণ মানুষকেও।[৩৫]

বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলাম ভেতরের সাথে বাইরের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। বহির্জাগতিক সমস্যাবলীও যে মানুষের অন্তর জীবন, আধ্যাত্মিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার চরিত্র ও আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, ইসলাম সে সম্পর্কে অবহিত। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের স্বভাব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা যে কোন যুগের উপযোগী, জীবনের যে কোন গতিশীল অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সৈয়দ আমীর আলী বলেছেন, "ইসলাম শুধু একটা মতবাদ নয়, এটা বর্তমানকালের জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সৎচিন্তা ও সত্য কথনের ধর্ম। এটা ঐশীপ্রেম, সার্বজনীন বদান্যতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত"।[৩৬] গীবের ভাষায়, "বাস্তবিক ইসলাম ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক কিছু বেশি, এটা একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা। ইসলামের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম বিকাশের এত বৃহত্তর সম্ভাবনা নেই, কোন ধর্মই অধিকতর বিশুদ্ধ অথবা মানব জাতির প্রগতিশীল আবেদনের সাথে এত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়"।[৩৭] ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করেছে। এতে অন্য কারোর ইচ্ছা বা নির্দেশের কোন অবকাশ নেই। আল কুরআন ঘোষণা করেছে, "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাঁদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। তাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর"।[৩৮]

৩৫। আমিনুল ইসলাম, gm¨jg agZË I ‘kb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯৫, পৃ . ২৫
৩৬। Sayed Amir Ali, Op.cit., P . 175
৩৭। রশীদুল আলম, gm¨jg ‘k‡bi f¨gKv, সাহিত্য কুটির, ঢাকা : ১৯৮৬, পৃ . ১০
৩৮। আল কুরআন, ৪ : ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে সে বিষয়ে কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তা স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।[৩৯] যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশের আলোকে তার সমস্ত কাজ ও সমস্যার মীমাংসা না করে তাহলে অবশ্যই সে একজন কাফির, জালিম, ফাসিক ছাড়া আর কিছু নয়। আল কুরআন ঘোষণা করেছে,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।[৪০] ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা অবাধ্যতার শামিল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন"।[৪১]

Bmjv‡gi AvKx‘v

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যে সব প্রধান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে (১) আল্লাহর একত্ব, বিমূর্ততা, ক্ষমতা, ক্ষমাশীলতা ও পরম প্রেমের প্রতি বিশ্বাস (২) দান ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব (৩) রিপু দমণ (৪) যিনি সব কল্যাণ ও নিয়ামত দান করেছেন, তাঁর প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং (৫) পরলোক মানুষের কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহির ধারণা।[৪২]

আর ইসলামী আকীদা ও ইবাদতসমূহের একদিকে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার মাধ্যম ও উপায়, অন্যদিকে তা উক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে জীবনের কার্যাবলীকে সুমহান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার মহান লক্ষ্যের ধারকও বটে। এরূপ কার্যাদি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা আনয়ন করে। মোট কথা, ইসলামের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, আত্মার পবিত্রতা অর্জন, আত্মার শান্তি লাভ, অন্তরের পরিতৃপ্তি সাধন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান।

৩৯। আল কুরআন, ৩৩ : ৩৬
৪০। আল কুরআন, ২ : ২০৮
৪১। আল কুরআন, ২ : ৮৫
৪২। Sayed Amir Ali, Op.cit., P.176

Dhaka University Institutional Repository

Bmjvg I ZvInx'

ইসলামের আকীদাসমূহের মধ্যে তাওহীদই বুনিয়াদী আকীদা। তাওহীদের অর্থ ও তাৎপর্য হল আল্লাহ এক, তিনি পবিত্র ও সর্বদোষমুক্ত, তিনিই সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা ও পালনকর্তা, জীবন দান ও জীবন হরণ তাঁরই অধিকারে রয়েছে, তিনিই সকল প্রয়োজন পুরণকারী, তিনিই ইবাদত পাবার যোগ্য এবং সাহায্য কেবল তাঁরই নিকট চাইতে হবে। তাঁর কোন শরীক নেই। তাওহীদ সর্বপ্রকার শিরকের সম্পূর্ণ বিরোধী। তা সর্বপ্রকার শিরকের বাতিল ঘোষণা করে। তাওহীদে বিশ্বাস মানুষের অন্তরে সৃষ্টির দাসত্ব না করার এবং মাথা উঁচু করে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার সাহস সৃষ্টি করে। তাওহীদের কল্যাণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বিশৃঙ্খলা হতে মুক্ত হয়ে শৃঙ্খলা ও সংযমের গুণে বিভূষিত হয়। তাওহীদে বিশ্বাস বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণাকে মজবুত করে। তাওহীদে বিশ্বাসের কল্যাণে মানবাত্মা জীবনে সম্ভাবনাসমূহ সমন্ধে তাওয়াক্কুল ও আত্মপ্রত্যয় লাভ করে। আল কুরআনের মূল সুর হলো আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ। আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের প্রচারকে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য বলে নির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক নবীই তাঁর জাতিকে সর্বপ্রথম তাওহীদের বাণী শুনিয়েছেন। রাসূল (সা.) তাঁর মক্কা জীবনের তেরটি বছরে বিশেষত তাওহীদের প্রচার করেছেন।

তাওহীদের আকীদা ভিন্ন আল্লাহ তায়লার অনেকগুলো গুণবাচক নাম রয়েছে, যা 'আসমাউল হুসনা' (সুন্দরতম গুণবাচক) নামে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল গুণবাচক নামের মধ্যে রাব্ব (প্রতিপালন), হায়াত (প্রাণ), ইলম (জ্ঞান), কুদরত (শক্তি), ইরাদা (ইচ্ছা), সাম (শ্রবণ), বাসার (দর্শন), বাচন (কালাম) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রেম আল্লাহর একটি বিশিষ্ট গুণ। কুরআনে তাই আল্লাহকে বলা হয়েছে প্রেমময় (আল ওয়াদুদ) বলে। তিনি আদি স্রষ্টা, বিশ্বজগতের চালক ও নিয়ন্তা। তিনি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মধ্যে কাজ করেন। তিনি জগতে যেমন উপস্থিত তেমনি উপস্থিত জগতের বাইরেও।

আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রেম সম্পর্কে যে উচ্চ ও মহান ধারণা কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে, তার তুলনা অন্য কোন ভাষায় নেই। অত্যন্ত কাব্যময় ও চিত্ত আলোড়নকারী অনুচ্ছেদগুলোর বিরাম-বিচ্ছেদহীন মূলসুর হচ্ছে আল্লাহর একত্ব, তাঁর বিমূর্ততা, মহিমা ও ক্ষমাশীলতা। জীবন, জ্যোতি আর আধ্যাত্মিকতার প্রবাহে যার শেষ নেই। কিন্তু আগা-গোড়া কোথাও অন্ধবিশ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই। আবেদন রাখা হয় শুধু মানুষের অন্তরের বিবেকের কাছে, তার সহজাত যুক্তির কাছে।[৪৩]

"বল! তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ, কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি জন্ম দান বা জন্মগ্রহণ করেন না, আর কিছুই তার সমকক্ষ হতে পারে না"।[৪৪]

"তিনিই আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন, যাতে করে জাহাজসমূহ তাঁর আদেশের মধ্য দিয়ে চলতে পারে; যাতে করে তোমরা তাঁর কৃপা ভিক্ষা করতে পার এবং তোমরা

৪৩। Sayed Amir Ali, Op.cit., P.177
৪৪। আল কুরআন, ১১২ : ১-৫

Dhaka University Institutional Repository

হতে পার কৃতজ্ঞতাভাজন। আর তিনি তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর বুকে অবস্থিত সমগ্র বস্তুকে। দেখ, এর মধ্যে রয়েছে যথার্থ নিদর্শনাবলী তাদের জন্য যারা গভীরভাবে চিন্তা করে"।[৪৫]

"এক ইলাহ; তিনিই তোমাদের ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই, তিনিই পরম দয়ালু ও দাতা। আসমান-যমীনের সৃষ্টিতে আর দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে, আর সাগরের বুকে চলমান মানুষের জন্য কল্যাণকর পণ্যবাহী জাহাজের মধ্যে; আর আসমান থেকে আল্লাহর প্রেরিত বৃষ্টির পানিতে যা মৃত মৃত্তিকা আর মৃত্তিকার বুকে বিচরণকারী সব রকম জীব জন্তুকে আবার সঞ্জীবিত করে তোলে; আর আসমান ও যমীনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী বায়ু ও মেঘের সঞ্চালনে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। তবুও কতক মানুষ আল্লাহর সমকক্ষ বলে অপরকে গ্রহণ করে আর আল্লাহকে ভালোবাসার মত তাদেরকে ভালোবাসে"।[৪৬]

"যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুনতে চাও, তবে তা হিসেব করে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহ বাস্তবিক ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তোমরা যা গোপন কর, তার সবই আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং এগুলোকে তো সৃষ্টি করা হয়, মৃত ও প্রাণহীন"।[৪৭]

"আল্লাহ তো শস্যকণা আর আঁটি ভেদ করে অঙ্কুরের পথ নির্গম করেন। তিনি জড় থেকে জীবন আবার জীবন থেকে জড়কে নির্গত করেন। ইনিও তো তোমাদের আল্লাহ। তারপরেও তোমরা পথহারা হয়ে কোথায় যাচ্ছ? অন্ধকার ভেদ করে ভোরের আলো ফুঁটিয়ে তোলেন তিনিই; তিনি রাত্রিকে বিশ্রামের জন্য আর সূর্য ও চন্দ্রকে সময়ের হিসেবের জন্য স্থাপন করেছেন। এ হচ্ছে মহাশক্তিমান, মহাজ্ঞানবাদী আল্লাহর অলঙ্ঘ নিয়তি"।[৪৮]

"সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক পরম দয়াশীল ও করুণাময়, শেষ দিনের মালিক, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি, কেবল তোমারই সাহায্য চাই। তুমি আমাদের সরল-সহজ পথে চালাও যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ, যারা পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত তাদের পথে নয়"।[৪৯]

"তোমাদের রবকে বিনীতভাবে আর নীরবে আহ্বান কর; যারা বাড়াবাড়ী করে তাদের তিনি ভালোবাসেন না। আর পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হবার পর আবার সেখানে বিপর্যয় ঘটিও না, আর ভীত চিত্তে তাঁকে আহ্বান কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ করুণাকামী লোকদের খুবই নিকটবর্তী"।[৫০]

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। সে তার পূণ্য কর্মের পুরস্কার পাবে, আর দুষ্কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। হে আমার রব! যদি আমরা ভুলে যাই বা অপরাধ

৪৫। আল কুরআন, ৪৫ : ১২-১৩
৪৬। আল কুরআন, ২ : ১৬৩-৬৫
৪৭। আল কুরআন, ১৬ : ১৮
৪৮। আল কুরআন, ৬ : ৯৫-৯৬
৪৯। আল কুরআন, ১ : ১-৭
৫০। আল কুরআন, ৭ : ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

করি সে জন্য আমাদের শাস্তি দিও না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে ভার চাপিয়ে ছিলে তা আমাদের উপর দিও না। হে আমাদের রব আরো যা আমাদের বহণ করার শক্তি নেই। তাও আমাদেরকে বহণ করতে দিও না; আমাদেরকে পাপমুক্ত কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি করুণা কর”।[৫১]

এভাবেই চলছে এ বিস্ময়কর গ্রন্থের বর্ণনা। আর মহানবী (সা.) এর প্রচারের বিষয়বস্তুও তাই। বৃহত্তর জগত আর অধিকতর অগ্রগামী মানব সমাজের প্রতি এ ছিল তাঁর দাওয়াতের ভাষা। বিশ্ব মানবের মহান প্রেমাকুল চিত্তের কছে সত্য, বিশুদ্ধ আর পবিত্রের জন্য কঠোর সাধনা ও ব্যাকুলতার কাছে এ বাণী ছিল উচ্চ পর্যায়ের এক কোমল আবেদন। এ বাণী আবেদন করছে মানুষের মহৎ অনুভূতির কাছে, তার অন্তর চেতনা ও তার নীতিবোধের কাছে; আর প্রমাণ করছে, প্রকাশ করে দেখাচ্ছে পৌত্তলিক বিশ্বাসের অস্বাভাবিকতা। ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সাদরে অঙ্গীভূত আল্লাহর ক্ষমতা, দয়া ও স্নেহ কোমলতা সম্পর্কিত এ উপদেশমালা ইসলামী জগতের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কর্তব্য হিসেবে নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়ে থাকে।

wimvjv‡Z wekvm

রিসালাতে বিশ্বাস ইসলামের একটি বুনিয়াদী আকীদা। আল্লাহর সত্তা অদৃশ্য। তাই তাঁর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানের প্রচারের জন্য কোনও দৃশ্যমান মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল। নবী-রাসূলগণই হচ্ছেন (আল্লাহর) দ্বীনের প্রচারের উক্ত মাধ্যম। তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যাদেশ বাণীর (অহী) সাহায্যে লোকদের চিন্তা ও কর্মের বিভ্রান্তি হতে মুক্ত করে সঠিক ও নির্ভুল পথে আনয়ন করেন। একথা সত্য যে, ইসলামে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে। কিন্তু তাতে মানবীয় বুদ্ধিকে জ্ঞান লাভের ও সুক্ষ্ম তত্ত্ব অর্জনের একমাত্র উৎস বলে নির্দেশ করা হয়নি, বরং ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান লাভ ও সুক্ষ্মতত্ত্ব অর্জনের বিশুদ্ধতম উৎস হচ্ছে অহী, নবুওয়াত ও রিসালাত।[৫২]

একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত অহীর সাহায্যেই মানুষ তাওহীদের নিগূঢ় তত্ত্বকে হৃদয়াঙ্গম ও উপলব্ধি করতে পারে এবং পাপাচার, অন্যায়, ফ্যাসাদ ও অন্য যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনাচার সম্বন্ধে অবগত হয়ে তা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ কর্তৃক নবীগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য হল মানব জাতির হিদায়াত এবং তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের পথনির্দেশ। নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন সমাজ হতে গোমরাহী ও সর্বপ্রকার অনাচার দূর করার জন্য, লোকদেরকে আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকলাপের সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে; পৃথিবীর আরম্ভ ও পরিণতির সাথে সম্পর্কিত অহীর মারফত প্রাপ্ত জ্ঞান সম্পদকে তাদের নিকট পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে। উক্ত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালেচনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক ও বুনিয়াদী তথ্য আমাদের

৫১। আল কুরআন, ২ : ২৮৬
৫২। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৩০০

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারে নেই। প্রত্যেক নবী-রাসূলই লোকদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।[৫৩] দ্বীনের ব্যাপারে পয়গাম্বরগণ নিজ হতে কিছুই বলেন না, বরং তাঁরা কেবল আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানের প্রচার করেন।[৫৪] রিসালাতে বিশ্বাসের কল্যাণে মানুষের অন্তরে আল্লাহর শিক্ষা ও হিকমাতের বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ন সৃষ্টি হয় এবং রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়।

wdwi¯Ív‡‘i cwiZ wekvm

ইসলাম আল্লাহ ছাড়াও বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে ফিরিস্তাদের সম্পর্কে। জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল, আযরাঈল সহ অসংখ্য ফেরেস্তায় বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "তিনি (আল্লাহ) স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নির্দেশসহ ফিরিস্তাদেরকে নাযিল করেন যে, হুঁশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর।[৫৫] " বরং সৎকাজ হল এ যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং ফিরিস্তাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর"।[৫৬]

ফিরিস্তাদের মধ্যে পদমর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের কাজই হল আল্লাহর হুকুম তামিল করা এবং আল্লাহর প্রশংসায় নিয়োজিত থাকা। এছাড়া তাঁরা নিয়োজিত থাকেন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহকে উদ্বুদ্ধ করে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টিতে। এরা মানুষের মত মাটি থেকে সৃষ্ট নয়, সৃষ্ট আলোক দ্বারা। এদের মধ্যে কোন লিঙ্গ ভেদ নেই এবং কোন রকম পাপও তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না।

আল্লাহর আদেশ পালন, প্রশংসা জ্ঞাপন এবং মানুষের কল্যাণ বিধান ফিরিস্তাদের কর্তব্য। আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হলেও তিনি সরাসরি কিছু করেন না। আল্লাহর নির্দেশে ফিরিস্তাগণ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের কার্যে রত থাকেন এবং নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টিতে এবং পৃথিবীর বিবর্তন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁরা নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আল্লাহর নির্দেশকে মেনে চলেন এবং সে সব নির্দেশকে কার্যকর করেন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শুভ-অশুভ এ দু'টি দ্বন্দ্ব বর্তমান। শুভশক্তির পরিচালক ফিরিশতাগণ আর অশুভ শক্তির চালক শয়তান। ফিরিশতাগণ মানুষকে অশুভ আচরণ থেকে বিরত রাখে এবং শুভ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। তবে এটা সত্য যে, এ সব অদৃশ্য আধ্যাত্মিক সত্তা আল্লাহর সন্তান নয়, এরা আসলে তাঁর দূতস্বরূপ। এরা আল্লাহর আজ্ঞাবহ এবং তাঁর প্রতি অনুগত। আল্লাহ এদেরকে তাঁর সৃষ্টি বিশ্ব শাসনে নিযুক্ত করেন। নিজেদের বিচার বুদ্ধি মত স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না। তাঁরা নিজেদের

৫৩। আল কুরআন, ১৬ : ৩৬
৫৪। আল কুরআন, ৫৩ : ৩-৪
৫৫। আল কুরআন, ১৬ : ২
৫৬। আল কুরআন, ২ : ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রণীত কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা আল্লাহর কাছে পেশ করতে পারে না। এমনকি এরা মানুষের হয়ে আল্লাহর কাছে কোন সুপারিশও করতে পারে না। তাঁরা আমাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করছেন, তাঁরা প্রত্যেকের ব্যক্তি জীবনের ভাল-মন্দ কর্মের পূর্ণ তালিকা রক্ষা করেন। মৃত্যুর পর আমাদের যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন তাঁরা পৃথিবীতে আমাদের সব প্রকাশ্য ও গোপন কৃতকর্মের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত উপস্থাপন করবেন।[৫৭]

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "দু'জন লিখক ফিরিস্তা মানুষের ডান ও বাম পাশে বসে প্রত্যেকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখছে। এমন কোন শব্দ তার মুখে উচ্চারিত হয় না, যার সংরক্ষণের জন্য একজন সদা উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওযূদ না থাকে। সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি এ অবস্থায় আসবে যে, তার সাথে একজন পরিচালক এবং একজন সাক্ষ্যদাতা ফিরিস্তা বর্তমান থাকবে" ।[৫৮]

ZvK‘xi ev HkxwbeÜ

ইসলাম এমন এক পরম বুদ্ধিমান সত্তার উপস্থিতি স্বীকার করে যিনি সমগ্র জগতকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করেন। সে বুদ্ধিমান পরমসত্তাই আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তিনিই আদি সক্রিয় কারণ। মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রিত সত্তা হতে পারে না কারণ, তাহলে জগতে যত মানুষ আছে, ঠিক ততটি আদি কারণ স্বীকার করতে হয় এবং তাতে করে আল্লাহর ক্রিয়াপরতাকে সীমিত ও বিঘ্নিত করা হবে। কিন্তু ইসলামের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তা পরম ঐশী শক্তি ও ইচ্ছার সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও স্বাধীনতার সংযোগ ও সমন্বয় সাধনে সক্ষম। ইসলামের মতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী হল আল্লাহর নির্দেশ বা বিধান। আর প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনা কিছু নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। এ সব প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমেই ঐশ্বরিক কার্যকারণ অগ্রসর হয়ে থাকে।

মানুষ প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় তার কার্যকলাপ কতিপয় বাহ্য ও আন্তর নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও মানুষ তার সীমিত অস্তিত্বের আওতায় তার কর্ম ও আচরণের কর্তা। সে একটি নৈতিক সত্তা, আর সুনীতি ও দুর্নীতির পার্থক্য করা এবং স্বেচ্ছায় ভাল কিংবা মন্দ কর্মপন্থা নির্বাচন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।[৫৯] মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ কাউকে এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে যা ভাল উপার্জন করে সেটা তারই এবং সে যা মন্দ উপার্জন করে সেটাও তারই" ।[৬০]

৫৭। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খ.), প্রাগুক্ত, পৃ . ৩০২

৫৮। আল কুরআন, ৫০ : ১৭-২১

৫৯। S. Rahman, *An Introduction to Islamic Culture and philosophy,* Mullick Brothers, Dhaka : 1963, P.52

৬০। আল কুরআন, ২ : ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক মানুষ জন্মায় স্বাধীন ও নিষ্পাপ হয়ে এবং একটি নৈতিক কাঠামো নিয়ে। কিন্তু জন্মের পর তাকে নানা রকম কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে তার নৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে বিকশিত করতে হয়। মানুষের নিজস্ব আচরণই তাকে দোজখে কিংবা বেহেস্তে নিয়ে যাবে এবং তার কোন আচরণই তকদীর কিংবা অদৃষ্টের ফল নয়, কিংবা সে বেহেস্ত বা দোযখে যাওয়া কোন অনিবার্য ডিক্রী নিয়ে জন্মায় না। তার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে তারই কর্ম ও আচরণ দ্বারা। তাই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "যে সৎ পথে চলে সে নিজের মঙ্গলের জন্যই তা করে। আর যে বিপথে চলে সে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেই তা করে। একের বোঝা অপরে বহণ করবে না। সর্তককারী না পাঠিয়ে আমি (কোন জাতিকে) শাস্তি প্রদান করি না"।[৬১]

"জেনে রেখো, যতদিন পর্যন্ত কোন জাতি তাদের নিজেদের প্রকৃতির পরিবর্তন না করে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাদের পার্থিব অবস্থারও পরিবর্তন করে না"।[৬২]

সুতরাং দেখা যায় যে, জগত একটি আত্মগঠনের স্থান। এখানে ভাল-মন্দ উভয় পথই রয়েছে। এ দু'য়ের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব মানুষের। আর মানুষ তা নির্ধারণ করবে প্রজ্ঞার সাহায্যে। জীবন মানুষকে কাজ করার এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান করে। একমাত্র কর্মই মানুষের উত্থান কিংবা পতনের জন্য দায়ী। সুতরাং পূর্ণতা প্রাপ্তি কিংবা অধঃপতন মানুষের নিজেরই কর্মফল। তাই বুঝা যায় যে, মানব জীবনকে ইসলাম দেখে এমন অসীম শক্তি হিসেবে, যা কোন রকম অনতিক্রম বাঁধা-বিপত্তি স্বীকার করে না।

be I qv‡Zi mgwß

নবুওয়াতের চূড়ান্ততায় বিশ্বাস ইসলামের অপর একটি মৌল উপাদান। মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও অনুভূতিতে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রাচীন বাইবেলে নতুন নবীর আগমনের পূর্বাভাস রয়েছে। কিন্তু কুরআনে তো নেই। কুরআনে বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে আল্লাহর তরফ হতে পৃথিবীতে নবী প্রেরণ মুহাম্মদ (সা.)-এ সমাপ্তি হয়েছে।[৬৩] মহানবী (সা.) স্বয়ং বলেছেন, "যখনই কোন নবী পরলোক গমণ করেছেন, তারপর অবতীর্ণ হয়েছেন অন্য একজন। কিন্তু আমার পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবে না"।[৬৪]

ইসলামের এ নির্দেশ নিয়ে মতদ্বৈততার কোন অবকাশ নেই। একে যে-ই অন্যভাবে বা অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করবে, সে-ই পরিগণিত হবে অবিশ্বাসী বলে।[৬৫] মহান আল্লাহ যুগে যুগে পথহারা দিগভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথ আনয়নের জন্য অসংখ্য নবী পাঠিয়েছেন এ ধরাধামে। আল্লাহ তাদেরকে

৬১। আল কুরআন, ১৭ : ১৫

৬২। আল কুরআন, ১৩ : ১১

৬৩। আল কুরআন, ৩৩ : ৪০

৬৪। আবু মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বোখারী, Avm mwnxn, দারু ইবন কাসির, বৈরুত : ১৯৮৭, পৃ.৪১৯

৬৫। S. Mahmudunnasir, *Islam : Its concepts and History*, Kitab Bhaban, New Delhi : 1981, P.52

পাঠিয়েছেন মানুষকে সুসংবাদ কিংবা সর্তক করার জন্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাও ছিল অন্যান্য নবীর পালিত সে ঐতিহাসিক দায়িত্বেরই অংশ, যদিও এখানে এসে নবুওয়াত উপনীত হয়েছে তার শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-পয়গাম্বরের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীতে যে ধর্মীয় সত্য বা ভাবাদর্শ প্রেরণ করেছেন এবং যা নিয়ে ধর্মবিশ্বাস গঠিত, তাই পূর্ণতা ও চূড়ান্ততা অর্জন করেছে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এ। মহান আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন এজন্য যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির সবচেয়ে মহৎ ও পূর্ণাঙ্গ পুরুষ।[৬৬]

মহানবী (সা.) যে বাণী বহণ ও প্রচার করেছিলেন, তা ছিল পৃথিবীতে নবী-পয়গাম্বরদের শিক্ষা। আর এ বাণীই সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে আল কুরআনে, “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দ্বীb হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম”।[৬৭] শেষনবী (সা.) এর অমীয় বাণী ও শিক্ষা অতীতের ন্যায় আজও সজীব এবং তা চিরভাস্কর হয়ে থাকবে মানুষের অনন্ত প্রেরণার উৎস ও প্রাণ শক্তি হিসেবে।

cv‡ijŠwKK Rxeb

ফিরিশতায়, ভাল-মন্দ বিষয়ক তকদীরে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানব জীবনের জন্য একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত করে দেয় এবং তাকে নেক আমল করতে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, “তোমরা কি মনে করেছো যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না?”[৬৮] ইসলামে মানব জীবনের একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত রয়েছে। যা আখিরাত বা পরকালের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের পারলৌকিক জীবন সম্পর্কিত প্রধান ও সবচেয়ে শক্তিশালী ধারণা গড়ে উঠেছে একটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। সে হচ্ছে পরলোকের জীবনে প্রত্যেক মানুষকে পার্থিব জীবনের সকল কাজের হিসেব দিতে হবে, আর ব্যক্তির সুখ বা দুঃখ নির্ভর করবে স্রষ্টার আদেশ কতখানি কী প্রকারে পালন করেছে তার উপর। এতদসত্ত্বেও তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অসীম আর তাঁর সৃষ্টি জীবের উপর তা সমভাবেই বর্ষিত হবে। এ কেন্দ্রীয় স্তম্ভের উপরই ইসলামের সমস্ত পারলৌকিক জীবনের ধারণাটি আবর্তিত হচ্ছে। আল কুরআনের বহু আয়াতে কিয়ামত বা শেষ দিবসের কথা বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন মানুষকে আবার জীবিত করা হবে। আল্লাহ সব মানুষের বিচার করবেন এবং প্রত্যেককে তার কর্মফল অনুযায়ী পুরুস্কৃত কিংবা তিরস্কৃত করবেন। তারও আগে কবরে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে যুক্ত করা হবে আত্মাকে। মুনকার ও নকির এ দু‘জন ফিরিস্তা হাজির হবেন কবরে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন তাঁর ইহজাগতিক কৃতকর্ম সম্পর্কে। কেবল নেক ব্যক্তিগণই পারবেন সঠিক উত্তর দিতে। বিশ্বাসীগণ

৬৬। আমিনুল ইসলাম, cÖv¸³, পৃ. ৩৩
৬৭। আল কুরআন, ৫ : ৩
৬৮। আল কুরআন, ২৩ : ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

নিজ নিজ কবরেই অবস্থান করবেন শান্তিতে, আর অবিশ্বাসীগণ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হাতে দেয়া হবে তাঁর পার্থিব জীবনের আমলনামা। পূণ্যবানদের আমলনামা থাকবে ডান হাতে। আর পাপাত্মাদের বাম হাতে ।[৬৯] এবং তার ভিত্তিতেই আল্লাহ সকলের বিচার করবেন। পরকালে নেককার লোকদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ এবং বদকার লোকদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম ও তার শাস্তি। কুরআনে বেহেস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে পাহাড়, নদী, ছায়াময় বৃক্ষ ও প্রীতিদায়ক জলবায়ু পরিবেষ্ঠিত একটি নয়নাভিরাম উদ্যান হিসেবে।[৭০] আর দোযখকে (জাহান্নামকে) চিত্রিত করা হয়েছে একটি উত্তপ্ত বিভীষিকাময় স্থান বলে।

নেককারগণ পাবে বেহেস্তের চির শান্তি, আর পাপাত্মাগণ ভোগ করবে দোযখের অসহ্য যন্ত্রণা। বেহেস্তের অধিবাসীগণ থাকবেন এক অত্যন্ত প্রীতিকর ও মনোরম পরিবেশে এবং তারা উপভোগ করবে সুখ।

ইসলামে বেহেস্তের সুখ-শান্তি ও দোজখের দুঃখ-কষ্টের যে ধারণা পেশ করা হয়েছে সে ধারণার সঙ্গে গুনাহ ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) এর ধারণাও ইসলামের একটি অন্যতম দিক। এ বিষয়েও ইসলাম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এমন মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও যুক্তিসঙ্গত। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোনও গুনাহ করে বসে এবং অতঃপর সে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে লিপ্ত না হবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তবে আল্লাহ তার গুণাহ মাফ করে দেন। আর এটাই হচ্ছে তাঁর রহমত ও মাগফিরাতের দাবী। মানুষের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজার তার জন্য সব সময় খোলা থাকে এবং আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন।

mvjvZ

ইসলামে সালাত বা নামায এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যা ব্যক্তির আত্মাকে পবিত্র করে। মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় চেতনা মাত্রই নিজের অপূর্ণতা সম্পর্কে ব্যক্তির অনুভূতি এবং জগতের সাথে নৈতিকভাবে যুক্ত ও জীবন সংগ্রামে মানুষের সহায়তা প্রদানকারী এক অধিকতর শক্তিশালী সত্তার উপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতাকে বুঝায়। এ অনুভূতিই মানুষকে চালিত করে সে সত্তার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনার কাজে এবং সে সত্তার প্রতি প্রেম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে। প্রার্থনা বলতে উল্লেখিত অনুভূতিসমূহের প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকে বুঝায়। যথার্থ অর্থে ইসলামে প্রার্থনা আল্লাহর ও মানুষের মধ্যে এক ধরণের যোগাযোগ স্বরূপ। আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় হিসেবে প্রার্থনার মূল্য সব মহলে স্বীকৃত। সালাত প্রবর্তন করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রতি মানবাত্মার প্রেম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাকুলতাকে স্বীকৃতি দান করেন, আর নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করে তিনিই ইবাদতে এমন একটি শৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন যা মনকে বস্তুজগতের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সালাতের প্রক্রিয়াসমূহ তাঁর নিজের উদাহরণ তার

৬৯। আল কুরআন, ৬৯ : ১৯-২৫
৭০। আল কুরআন, ১৩ : ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আচরণের মাধ্যমেই পবিত্রতা লাভ করেছে, আর প্রক্রিয়াগত বিধান সম্পর্কে দ্বন্দ্বের কুফল থেকেও মুসলিম জগতকে রক্ষা করেছে এবং তাতে বান্দার জন্য সর্বশক্তিমানের দরবারে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভক্তি ও বিনয় প্রকাশের ব্যাপকতম সুযোগ রাখা হয়েছে। "তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর। আর সালাত কায়িম কর; সালাত অশ্লীলতা আর অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর আল্লাহর যিকর সর্বশ্রেষ্ঠ"।[৭১]

ইসলামের জন্মভূমির স্মৃতিকে মুসলিম জগতের মনে জাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) নির্দেশ দেন যে, সালাতের সময়ে প্রত্যেক মুসলমান মুখ করে দাঁড়াবে মক্কার দিকে। যে মক্কা, যে গৌরবময় কেন্দ্র, পুনরুজ্জীবিত সত্যের প্রথম আলোক রশ্মি দেখেছিল। নবুওয়াতের সহজাত প্রবণতা দ্বারা তিনি উপলব্ধি করেন যদি একটি স্থানকে কেন্দ্র করে চিরকাল তাঁর উম্মাতের ধর্মানুভূতি আবর্তিত হয় তবে তার সংহতিমূলক প্রভাব কতটা বড় হতে পারে। এ জন্য তিনি আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে আদেশ করেন যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, মুসলমান সালাত আদায় করবে কাবার দিকে মুখ করে।[৭২]

ইসলামে সমষ্টিগতভাবে সালাত আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এরূপ সালাত আদায় সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে এবং মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে, মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত ও সংরক্ষণ করে। সমষ্টিগতভাবে মুসলমানগণ যখন নিয়মিত প্রার্থনায় মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ ও সমতাবোধ সৃষ্টি হয়। এখানে পরিবার ও বংশ, সম্পদ ও ক্ষমতার অহমিকা, গরীব ও দুর্বলদের প্রতি ঘৃনা এর সবই বিলীন হয়ে যায় এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের পারস্পরিক আলিঙ্গনের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমতাভিত্তিক আনুগত্য গড়ে ওঠে। এভাবেই সালাতের মাধ্যমে সংকীর্ণ পারিবারিক বা গোত্রীয় ঐক্যের স্থলে গড়ে উঠে মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের এক উচ্চতর চেতনা ও ঐক্যবোধ।[৭৩]

wmqvg mvabv

বছরে একমাস রোযা রাখার বিধান ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। কুরআনে সিয়ামের বিধান সংক্রান্ত তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি লক্ষণীয়। হে মুমিনগণ, "তোমরা যদি বুঝতে, তবে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য ভাল। তোমাদের পক্ষে যা সহজ, আল্লাহ তাই-ই চান"।[৭৪] সিয়ামের বিধান হচ্ছে দিবাভাগে

৭১। আল কুরআন, ২৯:৪৫

৭২। সৈয়দ আমির আলী (অনু. দরবেশ আলী খান), '¨w¯ÍúwiU Ae Bmjvg, BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡'k, ঢাকা : ১৯৯৩, পৃ . ২০৪

৭৩। S. Rahman, Op.cit., P . 38

৭৪। আল কুরআন, ২ : ১৮৩-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

যাবতীয় জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ থেকে এবং পানাহার থেকে বিরত থাকা। রাত্রিকালে ইবাদত বন্দেগীর ও ভক্তি নিবেদনের ফাঁকে মুসলমান কিছু পানাহার করে বা অন্যপ্রকার আইনসঙ্গত আনন্দ উপভোগ করে দেহ-মন সতেজ করে নিতে পারে। সম্ভবত নিতে সে বাধ্য। নবীর সত্যিকার নীতি অনুসরণ করে ফকীহগণ অলঙ্ঘণীয় নিয়ম করেছেন যে, সিয়াম পালনকালে শারীরিক বর্জনের মত মন থেকেও মন্দ চিন্তা বর্জন করা বাধ্যতামূলক।[৭৫]

hvKvZ

ইসলামের পূর্বে কোন ধর্ম যাকাত দান, বিধবা, ইয়াতীম ও অসহায় দরিদ্রের ভরণ-পোষণকে নীতিমালায় বিধিবদ্ধ করে ধর্মের অঙ্গে পরিণত করেনি। যাকাতের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা স্বার্থপরতার দিকে। এ প্রবণতাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন তা থেকে মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ইসলাম সমাজের দরিদ্র ও অক্ষমদের সাহায্যার্থে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। ইসলামের বিধান মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পত্তির কিয়দংশ তার অধিকতর হতভাগ্য প্রতিবেশীর সাহায্যের জন্য দান করতে বাধ্য। এ অংশ হচ্ছে যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির, উৎপন্ন শস্যের, ব্যবসায়ে লাভের, মজুদ মালের ইত্যাদির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ। কিন্তু এ দান যাকাত দিতে হবে যদি সম্পত্তির মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে হয়।[৭৬] আর তা মালিকের হাতে পুরো এক বছর থাকে। আর যে সব পশু কৃষিকাজ ও ভার বহণে ব্যবহৃত হয়, তার জন্য যাকাত দিতে হবে না। তাছাড়া রমযান মাসে সীয়াম শেষে আর ঈদুল ফিতরের দিনে প্রত্যেক পরিবারের প্রধানকে তার নিজের, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আর রমজান মাসে তার বাড়ীতে সিয়াম পালন করে ইফতারকারী ও রাত্রি যাপনকারী এমন অতিথিদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গম, যব, খেজুর, কিসমিস, চাউল বা অন্য যে কোন জিনিস অথবা তার মূল্য ফিতরা হিসেবে দিতে হয়। ইসলামের বিধান মতে, এ সব দানের ন্যায্য অধিকারী হচ্ছে- (১) দরিদ্র (২) অভাবগ্রস্ত, (৩) যাকাত আদায় ও বিতরণে যারা সাহায্য করে, (৪) ক্রীতদাস-দাসী, যারা নিজেদের স্বাধীনতা খরিদ করতে চায়, কিন্তু সঙ্গতী নেই, (৫) ঋণগ্রস্ত, যার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নেই, (৬) মুসাফীর আর বিদেশী।[৭৭]

নামাজ ও রোজার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু যাকাত ও হজ্জের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকা অনুচিত। কিন্তু এ ধরণের দ্বন্দ্ব নিরন্তর লেগেই আছে। যেহেতু ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমান সুযোগ সুবিধাসহ

৭৫। সৈয়দ আমির আলী, cÖ¸ ³, 206

৭৬। মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, hvKvZ wK I †Kb ? ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা : ১৯৯১, পৃ . ৭৫

৭৭। আল কুরআন, ৯ : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পরামর্শ দেয়া। মানুষে মানুষে যে প্রভেদ বিদ্যামান তা হ্রাস করা ইসলামের লক্ষ্য এবং জীবনে সবাইকে সমান সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইসলাম সমাজের দরিদ্র ও অক্ষমদের সাহায্যার্থে রাজভাণ্ডারের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বাধ্যতামূলক অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রেখেছে। প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির পক্ষে তা বছরান্তে সম্পদের $\frac{১}{৪০}$ ভাগ দরিদ্র্যের জন্য পৃথক করে রাখা বাধ্যতামূলক। এ ব্যবস্থা দরিদ্র্যদের শোষণের উপর বিত্তবান সমাজ গড়ে উঠাকে বন্ধ করতে না পারলেও অন্তত নিরুৎসাহিত করে।

সমাজের সব মানুষের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টনকে উৎসাহিত করার জন্য ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করেছে। এভাবে ইসলাম মানুষকে সামাজিক সমতা প্রদানের চেষ্টা করে। গরীবদের দেখাশোনা করা একটি পবিত্র দায়িত্ব। যাকাত প্রদানের ব্যাপারে ব্যক্তিকে তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের সুযোগ দেয়া হয়নি। যাকাত বাধ্যতামূলক। একে সংগ্রহ করে জমা দিতে হয় কেন্দ্রীয় রাজভাণ্ডারে এবং একে বণ্টনও করতে হয় রাজভাণ্ডার (বায়তুলমাল) থেকে। প্রত্যেক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান, যাকাত প্রবর্তন ও সুদ প্রথা বিলোপের মাধ্যমে ইসলাম তা দূর করার চেষ্টা করেছে। এসব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পদের অতিশয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সামাজিক অনিয়ম ও অব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ। মোটকথা ইসলাম এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনকে উৎসাহিত করে যেখানে সব মানুষকে মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার দিক থেকে সমতা প্রদান করা হয়ে থাকে।[৭৮]

n¾

"আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহে হজ্জ উদযাপন করা মানুষের জন্য ফরজ। অবশ্য যে ব্যক্তি পথ ভ্রমণে সমর্থ। যদি কেউ এ দায়িত্ব অস্বীকার করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ মানবের মুখাপেক্ষী নন"।[৭৯] মক্কায় ও কাবায় বাৎসরিক হজ্জের কালজয়ী প্রথা ইসলামে অঙ্গীভূত হয়েছে। আর এ হজ্জে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসেবে ঐক্য আর বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব সঞ্চারিত হয়েছে। সে অন্ধকার যুগে পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করেছিল একটি বেহেশতের জ্যোতি, সমগ্র মুসলিম জগত কাবার কেন্দ্রবিন্দুতে চক্ষু নিবন্ধ রেখে হৃদয়ে জাগিয়ে রাখে সে জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ। এখানেও আবার সে অনুপ্রাণিত বিধানদাতার জ্ঞানবত্তার আলোক রশ্মি দেখতে পাই হজ্জের শর্তাবলী প্রণয়নের মধ্যে (১) বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির পরিপক্কতা, (২) পূর্ণ ও অবারিত স্বাধীনতা, (৩) ভ্রমণকালে যান বাহণে ও আহার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের মালিক থাকা, (৪) হজ্জ যাত্রীর অনুপস্থিতিকালে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট সম্বল থাকা এবং (৫) ভ্রমণের সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতা এ শর্তাবলী পূর্ণ হলে হজ্জ করা বাধ্যতামূলক হবে।[৮০]

মক্কায় হজ্জ পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো জীবনের প্রথা প্রচলনের দিক থেকে যাদের মধ্যে খুব বেশি মিল ছিল না, এমন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের ইসলাম গ্রহণের ফলে নতুন ধর্মের অনুশীলনের দিক থেকে তাদের মধ্যে বিভিন্নতার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। এজন্যই পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষ বছরে একবার যেন

৭৮। ড. আমিনুল ইসলাম, gmॏjg 'kb I ms¯ॏZ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা : ১৯৯৬, পৃ. ৩৬

৭৯। আল কুরআন, ৩ : ৯৭

৮০। সৈয়দ আমির আলী, cÖ¸³, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

মিলিত হতে পারে, সে ব্যবস্থা করা হয়। এ সম্মিলনে সবরকম মতবিরোধ নিরসনেও পরস্পর বিরোধী ধারণা নিয়ন্ত্রণের পথ উদ্ভাবন করা হয়। এদিক থেকে বলা যায় যে হজ্জের উদ্দেশ্যই হল সামাজিক ঐক্য বিধান ও সংহতি অর্জন। সারা পৃথিবী মানুষের নিজের দেশ, সমগ্র মানবজাতি তার ভাই এবং অপরের মঙ্গল সাধন তার ধর্ম এসব ধারণা সৃষ্টিও হজ্জের লক্ষ্য।

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলাই যেহেতু ইসলামের লক্ষ্য, সেজন্যই তা এমন ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিরোধী, যা পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যকার বিরাজমান সব অস্থিরতা, সংঘর্ষ ও সর্বনাশা যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলে ছিল। যে উদ্ধত জাতীয়তাবাদ অপর জাতিকে ধ্বংস করে তার নিজের লোকজনকে সাহায্য করতে চায়, তা ইসলামের কাঙ্খিত আদর্শ নয়। ইসলাম বর্ণগত জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে, কারণ তা আরব ও পারসিক, মিসরীয় ও সিরীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না। ইসলাম তার অনুসারীদের এসব সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠার শিক্ষা দেয় এবং এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেয়, যেখানে জাতিগত ও ভৌগোলিক বৈষম্য মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্ববোধের উচ্চতর আদর্শে মিশে যাবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, হজ্জ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মূলনীতিই হচ্ছে একটি উদার ও মহান নীতি এবং মুসলিম জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্য বিধানই এর প্রধান লক্ষ্য।[৮১]

শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধানের একটি প্রগাঢ় অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে। সালাত বা নামায বলতে বুঝায় বিস্মৃতির স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হওয়া তথা আল্লাহর ও মানুষের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করাকে। রোযা সচল ও সুদৃঢ় করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছাকে এবং নির্দেশ করে প্রবৃত্তি দমণের মাধ্যমে সে ব্যক্তির এক নতুন পবিত্রতার শক্তিতে উজ্জীবিত হওয়াকে। যাকাত নির্দেশ করে আধ্যাত্মিক বদান্যতা ও মহত্ত্বকে এবং তাতে করে তা নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক। হজ্জ নির্দেশ করে আপাত অস্তিত্বের পর্যায় থেকে আধ্যাত্মিক কেন্দ্রীয় অস্তিত্বে উত্তরণ লাভকে। সূফীদের ভাষায় এ কেন্দ্রীয় অস্তিত্ব অধিষ্ঠিত সে অন্তঃকরণে যা কিনা পরিচিত আধ্যাত্মিক কাবা বলে। মানুষের মধ্যে এ ধরণের আধ্যাত্মিক গুণাবলী সৃষ্টি করা এবং মানুষকে উন্নত জীবনের সন্ধান দেয়াই ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল লক্ষ্য।[৮২]

Bmjv‡gi ‰ewkó¨

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রচারিত ইসলাম সমসাময়িক ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা হতে বহু বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইসলামের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে বহু মানবগোষ্ঠি বা অপর ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামের অনেকগুলি নীতি সাকুল্যে বা আংশিকভাবে তাদের সমাজ বিধানের অন্তর্ভূক্ত করার ফলে ইসলামের সে বৈশিষ্ট্যগুলো এখন আর তেমন প্রকটভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এরূপ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে চিহ্নিত করা হলো-

(১) ইসলামে আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক, কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত মানবগোষ্ঠির উপাস্য নয়। তিনি সর্বগুণে বিভূষিত, সর্বদোষমুক্ত সর্বশক্তিমান নিরাকার এবং সাদৃশ্যবিহীন সত্তা। তাঁর পরিচয়

৮১। ড. আমিনুল ইসলাম, gmwjg agZË I ‘kb, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা : ১৯৯১, পৃ. ৪৫

৮২। ড. আমিনুল ইসলাম, cÖv¸³, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় তাঁর ‘আসমাউল হুসনা’য় যা সীমিত শক্তির আওতায় মানবের অনুকরণীয়। সুতরাং তিনি একাধারে মানবের উপাস্য এবং আদর্শ।

(২) ইসলামের দৃষ্টিতে কোন নবী অতি মানব নন, তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ধর্মাধিকরণরূপে অভ্রান্ত বিধান দেয়ার কোন অধিকার লাভ করেনা, অনুসারীরা পাপ মোচনের ক্ষমতা অর্জন করে না। পৌঁরহিত্যকে ইসলাম স্বীকার করে না। কুরআন অধ্যয়ন ও তার ব্যাখ্যা দান কোন বিশেষ গোষ্ঠির আওতাভূক্ত নয়, বরং ইবাদাত এবং নীতিনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজনে কিছুটা কুরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক।

(৩) সকল সম্প্রদায়ের নবী-রাসূলকে, সকল নবীর প্রাপ্ত আসমানী কিতাবকে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে ইসলাম অপূর্ব ঔদার্যের পরিচয় দেয়, দ্বীনের ঐক্য এবং বিবর্তনমূলক শরীয়ত বিকল্প ঘোষণা করে, মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং মানবজীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য অহী প্রসূত প্রজ্ঞার অপরিহার্যতা ঘোষণা করে।

(৪) ইসলামের দৃষ্টিতে মানবসত্তা উৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্ট, পাপের পঙ্কে তার জন্ম নয়, আদি পিতার পাপের বোঝাও সে বহণ করে না। সে তার আপন কর্মের জন্য দায়ী, মানবসত্তা সসম্মানিত, জ্ঞানে-গুণে সে ফিরিশতাকে অতিক্রম করতে পারে, সে সৃষ্টিকর্তার প্রতিভা সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের সহজাত প্রবণতা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে।

(৫) ইসলাম ইহজীবনের পর অনন্ত পারত্রিক জীবনের পক্ষে রায় দেয়, এতে জন্মান্তরবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না, মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দান করে না।

(৬) ইসলাম মানবাধিকারের অভূতপূর্ব ব্যবস্থা দান করেছে।

(ক) নারীর মানবাধিকার ও মর্যাদা বিধান ইসলামের বিধান। সম্পত্তির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণে সে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করেছে। স্বামী ও পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেছে। সেক্রামেন্টের শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করে সামাজিক চুক্তির আওতায় (বিবাহ) তার ব্যক্তি সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনকি নারী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পর্যন্ত পেয়েছে।

(খ) গোলাম ইসলামী বিধানে তার মানবিক মর্যাদা পেয়েছে। গোলামকে স্বাধীনতা প্রদান ইসলামের একটি পূণ্যময় অনুষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে।[৮৩]

৮৩। রশীদুল আলম, C৺¸ ³, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

Bmjvgx mgv‡Ri cwiwPwZ I cwiwa

সাধারণ সমাজ ব্যবস্থা বলতে বুঝায় কোন বিশেষ রীতিনীতি, আইন-কানুন ও এমন একটি অবকাঠামো, যা দ্বারা সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলামী পরিভাষায় সমাজকে 'উম্মত' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তাই আদর্শ সমাজ বলতে এমন সমাজকে বুঝায়, যেখানে নাগরিকবৃন্দ আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় ঈমান এবং পরজগতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে সৎকাজে উদ্যোগী হয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। এখানে বিদ্বেষ, পরনিন্দা, অভাব-অভিযোগ ও অপসংস্কৃতি থাকবে না। মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসবে। একে অপরের বিপদে আপদে, সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং সুখে-দুঃখে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করবে। সব মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে। আদর্শ সমাজে উপযুক্ত নেতিবাচক দিকগুলো সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো সর্বোচ্চ স্তরে পরিলক্ষিত হবে।[৮৪]

আদর্শ সমাজ গঠন মূলত আল কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ-নিষেধের উপর ভিত্তিশীল। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সর্বক্ষেত্রে 'মধ্যপন্থা' অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে। মানুষের সাধারণ রুচি ও স্বভাব প্রবণতার সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলামের আদর্শ সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে উপযোগী। তাই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা স্বয়ং এমন একটি উন্নত ও যুক্তি সম্মত সমাজ, যেখানে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের উত্তম দিকগুলোর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। বস্তুত মানব জীবনকে সার্বিকভাবে সৎ ও সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুখময় করার জন্য ইসলাম এক সর্বোত্তম আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রদান করেছে। তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজে কোন অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নির্যাতন ইত্যাদি মানবতাবিরোধী অপরাধ সমাজে সংঘটিত হতে পারে না।

মুসলমানদের সামাজিক জীবন আল্লাহ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তিকে নিশ্চিত করা। শ্রেণি সংগ্রাম, বর্ণাশ্রম এবং সমাজের উপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব কিংবা তার বিপরীত অবস্থা ইসলামের সামাজিক জীবনের পরিপন্থি। কুরআন বা হাদীসের কোথাও শ্রেণি, বংশ বা সম্পদের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের কোন উল্লেখ কেউ খুঁজে পাবে না, বরং এর বিপরীত কুরআনের বহু আয়াত ও মহানবীর (সা.) বহু বাণী মানবজাতিকে জীবনের অপরিহার্য বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে বিষয়গুলো একই সঙ্গে ইসলামের সামাজিক কাঠামোর মূলনীতিরূপে কাজ করছে। এর মধ্যে প্রধান বিষয় হলো এ যে, মানব জাতি এক ও অভিন্ন পিতা-মাতা থেকে উদ্ভুত এবং একই চরম লক্ষ্যের দিকে উদ্বুদ্ধ একটি পরিবার সদৃশ।

মানব জাতির ঐক্যের ধারণা গড়ে উঠেছে আদম ও হাওয়ার অভিন্ন পিতৃ-মাতৃত্বের আলোকে। প্রতিটি মানব সন্তানই প্রথম পিতা ও প্রথম মাতার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বপরিবারের একজন সদস্য। অতএব অভিন্ন

৮৪। তফাজ্জল হুসাইন, nhiZ gnv¤§` (mv.): mgKvjxb cwi‡ek I Rxeb, ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ঢাকা : ১৯৯৮, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারে তার তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন তার উপর অভিন্ন দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। লোকেরা যখন উপলব্ধি করে যে, তারা সকলেই এক আল্লাহর সৃষ্টি আদম ও হাওয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত, তখন আর বর্ণ বিদ্বেষ, সামাজিক অবিচার কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্বের কোন অবকাশ থাকবে না। অভিন্ন পিতৃ-মাতৃত্বের দরুণ লোকেরা যেমন প্রকৃতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ তেমনি সামাজিক আচরণে তারা হবে ঐক্যবদ্ধ। কুরআন ও হাদীসে প্রকৃতি ও উৎসের দিক থেকে মানবীয় ঐক্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দিকটির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হল বর্ণগত অহমিকা ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে নির্মূল করা এবং যথাযথ ভ্রাতৃত্বের পথকে সুগম করে তোলা।[৮৫]

হাদীসে আছে, "যে কেউ অন্যকে সৎকর্মের আহ্বান জানায়, সে নিজেই সৎ কর্মশীলদের মত এবং তাকে পুরষ্কৃত করা হবে সে অনুসারে আর যে কেউ অন্যকে দুষ্কর্মে প্ররোচিত করে, সে ঠিক দুষ্টকর্মকারীর মত এবং তাকে শাস্তি দেয়া হবে সে অনুসারেই"।[৮৬]

অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে এ ধরণের অসংখ্য বাণী লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

"হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর এবং ইসলামের অবস্থায় থাকা ছাড়া মৃত্যু বরণ করো না। তোমরা সবাই মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ কর। কেননা, তোমরা প্রথমে পরস্পর শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের হৃদয়কে ভালোবাসার দ্বারা যুক্ত করে দিয়েছেন। এভাবে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়েছ। তোমরা এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের গভীরে দাঁড়িয়েছিলে, তারপর তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর নিদর্শনকে সুস্পষ্ট করে তোলেন, যাতে করে তোমরা পথ নির্দেশ পেতে পার। তোমাদের মধ্যে একদল লোক থাকা প্রয়োজন, যারা সবাইকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকর্মের আদেশ দিবে এবং দুষ্কর্মের থেকে বিরত রাখবে। বস্তুত তারাই হল কল্যাণ লাভকারী"।[৮৭]

"হে ইমানদার লোকেরা, অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং তোমরা পরস্পরকে সৎকর্ম ও পুণ্যশীলতায় সাহায্য কর। কিন্তু পাপাচার ও ঘৃণা-বিদ্বেষে সাহায্য থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহ শাস্তির ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর"।[৮৮]

ইসলাম আসলে অপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ মানবতাকে সর্বোতভাবে পূর্ণ করার আদর্শ বাস্তবায়নের একটা উপায় স্বরূপ। উচ্চতর ও নিম্নতর এ দুটি দিক রয়েছে মানব স্বভাবের। নিম্নতম প্রকৃতিকে উচ্চতর প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করাই জীবনের লক্ষ্য। মানুষকে এ ধরণের রূপান্তর সংঘটনে সহায়তা করাই ইসলামের কাজ। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলাম যে সব বিশ্বাস ও অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছে

৮৫। তফাজ্জল হুসাইন, cÖv¸³,c .74

৮৬। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ , wgkKvZj gvmvwen, কিতাবুল আদাব ও বাবুল বিররি ওয়াসিলা দ্রষ্টব্য।

৮৭। আল কুরআন, ৩ : ১০২- ১০৪

৮৮। আল কুরআন, ৫ : ১-২

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলো ইসলামের আরকান বা স্তম্ভ নামে পরিচিত। যেসব সূত্র চিন্তা ও কর্মের উৎস এবং যেগুলো মানুষকে সার্বিক পূর্ণাঙ্গতার দিকে পরিচালিত করে, এগুলো তাই। এ স্তম্ভগুলো হল, কালিমা, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ। এগুলো মানুষকে তার পরিবেশ, আদর্শ ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও শান্তির সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করার একটি উত্তম বাহণ স্বরূপ। মানুষের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব প্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য শৃঙ্খলার উপর। এসব নিয়ম যদি যথার্থভাবে পালিত হয়, তাহলে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় আত্মশৃঙ্খলা এবং সামাজিক, জাতীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের এক উচ্চতর চেতনা। এভাবেই ইসলাম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে চায়।
সেজন্যই ইসলাম এমন ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিরোধী, যা পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যকার বিরাজমান সব অস্থিরতা, সংঘর্ষ ও সর্বণাশা যুদ্ধবিগ্রহের মূলে ছিল। যে ঔদ্ধত্ব জাতীয়তাবাদ অপর জাতিকে ধ্বংস করে তার নিজের লোকজনকে সাহায্য করতে চায়, তা ইসলামের কাঙ্খিত আদর্শ নয়। ইসলাম বর্ণগত জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে, কারণ তা আরব ও পারসিক, মিশরীয় ও সিরীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেনা। ইসলাম তার অনুসারীদের এসব সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠার শিক্ষা দেয় এবং এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেয়, যেখানে জাতিগত ও ভৌগোলিক বৈষম্য মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্ববোধের উচ্চতর আদর্শে মিশে যাবে।[৮৯]
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ বলতে পৃথক কোন গোত্র বা সম্প্রদায় নয়, বরং গোটা মানব জাতিই একটি সমাজ। এ সমাজের উৎপত্তি আদি পিতা (আ.) হতে। আর এর বিস্তৃতি ও প্রসারতা বিশ্বব্যাপী। মানব ইতিহাসে প্রাথমিক যুগ হতে মানব সমাজের ক্রমবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং ক্রমশ তা প্রয়োজনের তাগিদে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়ার তারতম্য এবং আঞ্চলিক ও প্রাকৃতিক নানা প্রভাব থাকা সত্ত্বেও গোটা মানব সমাজের দৈহিক গঠন ও সৃষ্টির মৌলিক উপাদানের যেমন প্রভেদ নেই, তেমনি তাদের জীবনের গতিধারা, মৌলিক চাহিদা এবং হৃদয়ের অনুভূতিতেও এক। অন্যদিকে মানবিক গুণাবলী অর্জন এবং মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কেও বিশ্বের সকল মানুষ একই মনোভাব পোষণ করে থাকে। মানুষ যেখানেই এবং যে অঞ্চল বা প্রত্যন্ত অঞ্চলেই বাস করুক না কেন তাদের মৌলিক সমস্যাও সকলের একই। তাই বিশ্বের সমগ্র মানব জাতিই একটি সমাজ। 'মানব জাতি একই সমাজভূক্ত ছিল'।[৯০] এ মতের উপরই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ বা ভিত্তি স্থাপিত।
আল্লাহপাক সর্বপ্রথম এক জোড়া মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সে জোড়া হতে বিশ্বের সকল মানুষের জন্ম হয়েছে। প্রথম দিকে একজোড়া মানুষের সন্তানগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত একই দল ও একই সমাজের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে

৮৯। ড. আমিনুল ইসলাম, gm‖jg ‘kb I ms¯‖Z, নওরোজ কিতাববিস্তান, ঢাকা : ১৯৯৬, পৃ . ৩২
৯০। আল কুরআন, ২ : ২১৩

একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত করেছি"।[৯১] সুতরাং তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি একই ধরণের ছিল। একই ভাষাও ছিল তাদের। কোন রকম বিরোধ-বৈষম্য তাদের ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। আর এ বিস্তৃতির ফলশ্রুতিতে তারা স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বংশ, গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

তাদের ভাষা ও পোশাকের বৈষম্য ও বৈচিত্র্য দেখা দিল। দৈনন্দিন জীবনধারা আলাদা হয়ে গেল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আবহাওয়ায় তাদের রূপ, রং ও আকার আকৃতি পর্যন্ত বদলে যায়। এসব পার্থক্য অতি স্বাভাবিক। বাস্তব দুনিয়ায় এটাই বর্তমান। কাজেই ইসলামও এসবকে ঠিক একটা বাস্তব ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে। ইসলাম এসবের নির্মূল চায় না, বরং এসবের দ্বারা মানব সমাজের পারস্পরিক পরিচয় লাভ করা যায় বলেই এগুলো স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু এ পার্থক্য বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে মানব সমাজে বর্ণ, বংশ ভাষা, জাতীয়তা এবং স্বদেশীকতার যে হিংসা-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, ইসলামে তার মোটেই কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, উঁচু-নীচু, আশরাফ-আতরাফ এসবের পার্থক্যকে ইসলাম জাহিলিয়াত বলে মনে করে। ইসলাম বিশ্বাসীকে সম্বোধন করে বলে, তোমরা এক মাতা ও এক পিতার সন্তান। তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই এবং মানুষ হবার দিক দিয়ে তোমরা সকলেই সমান। ইসলাম মনে করে মানুষের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থেকেই থাকে তবে তা কেবল তাকওয়া, মনোভাব, চরিত্র ও জীবনাদর্শের দিক দিয়ে। অন্য কোন দিক দিয়ে নয়।[৯২] তাই ইসলাম এমন এক সমাজ গঠন করে, যার চিন্তাধারা, বিশ্বাস, মত, চরিত্র ও জীবনাদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা।

যাহোক, নানা জাগতিক মোহ, প্রলোভন, সংস্কার ও অসুরিক শক্তির প্রভাবে মানুষ ভৌগোলিক সীমারেখা, গোত্র, সম্প্রদায় ভেদে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং একে অপরের শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে। মানবজাতি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে আল্লাহর নির্দেশিত মানবিক গুণাবলী ভুলে গিয়ে নানা অপরাধমূলক কার্যকলাপ ও উশৃঙ্খল জীবন-যাপনে মেতে উঠে। এতে মানব সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে থাকলে আল্লাহ তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন, সমাজের ন্যায়নিষ্ঠা, বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি হতে বিরত থাকার জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "মানব জাতি একই সমাজভুক্ত ছিল। কিন্তু যখন তারা পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করল তখন আল্লাহ সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী নবীগণকে প্রেরণ করলেন এবং যে

৯১। আল কুরআন, ৪৯ : ১৩
৯২। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, Bmjvg cm½, রেঁনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা : ১৯৬২, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

সকল ব্যাপারে তারা বিভেদ সৃষ্টি করত সে সব ক্ষেত্রে মানবজাতির মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যের বাণী (কিতাব) অবতীর্ণ করলেন"।[৯৩]

মানব জাতির উদ্দেশ্যে নবী- রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করার ধারাবাহিকতা হযরত আদম (আ.) হতে শুরু হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। এমন কোন জনপদ নেই যেখানে আল্লাহপাক কোন নবী বা রাসূল প্রেরণ করেননি। যেহেতু মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ রাসূল, তাই তাঁর পূর্ববর্তীকালে যতগুলো দেশ, গ্রাম, অঞ্চল বা জনপদ ছিল তাদের প্রতিটি জায়গায় আল্লাহ নবী-রাসূল প্রেরণ করে পৃথিবীর সর্বশ্রেণির মানুষকে একই জীবন-বিধানে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সমাজে যেসকল লোকজন সীমালঙ্ঘণ করে কিংবা আল্লাহর বিধান অমান্য করে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "কোন নবী-রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি (আল্লাহ) কোন মানুষ বা সম্প্রদায়কে শাস্তি দেইনা"।[৯৪]

আবহমানকাল ধরে আল্লাহ মানব সমাজকে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নবী-রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মানবজাতি তার স্বভাব অনুযায়ী এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। তথাপি আল্লাহ সকল নবী-রাসূলকেই সমগ্র মানব জাতিকে একটি মাত্র সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে এবং সে লক্ষ্যে শিক্ষা দিতে ও পথ প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতীতে একই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে, দেশে ও জনপদে এমনকি প্রতিটি গোত্রে বহু সংখ্যক নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। তাই যাতে নবী-রাসূল ভিত্তিক মানবসমাজে বিভেদ সৃষ্টি না হয় কিংবা একে অপরের প্রতি অহংকারী হয়ে না পড়ে, সে উদ্দেশ্যে আল্লাহতা'আলা এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। তাই দেখা যায়, মানব জাতির ইতিহাস যত পুরাতন, ইসলামী সমাজও ততই প্রাচীন। আর সর্বকালের মানব সমাজের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ যে একটি মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন সেটাই ইসলাম। সুতরাং ইসলামী সমাজই জগতে একমাত্র সমাজ।

এ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের প্রবর্তন হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির সূচনাকালেই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে চাই"।[৯৫] তিনিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের

৯৩। আল কুরআন, ২ : ২১৩

৯৪। আল কুরআন, ১৭ : ১৫

৯৫। আল কুরআন, ২ : ৩০

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর মর্যাদাগতভাবে উন্নীত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়েই তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন"।[৯৬]

আল্লাহপাক আরও ঘোষণা করেন, "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি। সুতরাং মানব সমাজে যথার্থ ন্যায়বিচার কর এবং নফসের অনুসরণ কর না। তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করবে"।[৯৭] তাই অন্যান্য অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানবজাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ তার এ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবে তাওহীদ বা একত্ববাদের সুমহান ও একক অখণ্ড শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের সমগ্র মানবজাতি একই প্রতিপালকের একত্ববাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এবং রিসালাতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে একটি মাত্র সমাজভুক্ত হবে। আর এটাই ইসলামী সমাজের স্বরূপ।

মানব জাতির কল্যাণ, সেবা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি। বিশ্বের জড়জগত, প্রাণী জগত, উদ্ভিদ জগত, ভূ-গর্ভস্থ ও সমুদ্র তলস্থ যাবতীয় সৃষ্টি, বায়ুমণ্ডল এবং আকাশমণ্ডলী ও তার যাবতীয় সৃষ্টি একমাত্র মানবজাতির কল্যাণেই নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, তারা মহান আল্লাহর প্রতিনিধি আর তাই আল্লাহর দৃশ্য অদৃশ্য যাবতীয় সৃষ্টিই তাদের সেবায় অনুগত। এমনকি ফিরিস্তাকূল পর্যন্ত মানবজাতির সেবায় নিরন্তর নিয়োজিত। এভাবেই ইসলাম প্রতিটি মানুষকে আল্লাহপাক সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। স্থলে ও সমুদ্রে তাদেরকে চলাচলের বাহণ দিয়েছি। তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি"।[৯৮]

"তোমরা কি দেখনা! আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন"।[৯৯]

"তিনি রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রালোককে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তাঁরই আদেশে নক্ষত্রমণ্ডলীও (তোমাদের) অনুগত"।[১০০]

৯৬। আল কুরআন, ৬ : ১৬৫
৯৭। আল কুরআন, ৩৮:২৬
৯৮। আল কুরআন, ১৭ : ৭০
৯৯। আল কুরআন, ৩১ : ২০
১০০। আল কুরআন, ১৬ : ১২

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র বিশ্বের মানবজাতিই মহান আল্লাহর অপরিসীম দান উপভোগ করে থাকে। এসব নিয়ামতের একটি অংশ পরিমাণও যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে বিশ্ববাসীর জীবন অবশ্যই বিপন্ন হতে বাধ্য। যার প্রতিকার করা মানবগোষ্ঠির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাকে অপরিহার্যভাবে এমন কিছুর কাজ করতে হয় যা মহান আল্লাহর শাশ্বত নির্দেশ। আর তাহলো ইসলামী সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য শ্রদ্ধাশীলতা, সংবেদনশীলতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও দানশীলতা, সমবেদনা, সহ্ণশীলতা, ওয়াদা পালন, একাত্ববোধ, এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী অর্জন। আর এটাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'হক্কুল ইবাদ।'

ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ অপরের সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলে মনে করবে এবং অধিকার আদায়ে কোন পার্থক্য করবেনা। সমগ্র বিশ্বের মানবজাতি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ সংযোজিত একটি দেহের ন্যায় হৃদয়ানুভূতি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করবে।[১০১]

বিশ্বের মানুষ যাতে ভৌগোলিক সীমারেখা, আঞ্চলিক প্রভাব ও পরিবেশ, ভাষা, বর্ণ ও গোত্র প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি না করে এবং ইসলামী সমাজে ফাটল ধরাতে না পারে, তার প্রতি সর্তক করে দিয়ে এবং ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও পরিবেশের প্রাকৃতিক বিভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা করে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার"।[১০২]

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের মধ্যে ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। নিশ্চয় এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য ইঙ্গিত রয়েছে"।[১০৩]

আবার ইসলাম যেমন একদিকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলী অর্জন করতে উপদেশ দিয়েছে, অন্যদিকে অমানবিক ও নৈতিকতা বিবর্জিত কার্যকলাপ ও অসৎ গুণাবলী হতে বিরত থাকাকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং একে মারাত্মক অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। এসব অনৈতিক পাপাচার ও অপরাধের মধ্যে চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, লুণ্ঠন, নিষ্ঠুরতা, অশালীনতা, অসাধুতা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা, ঘৃনা, অপবিত্রতা, দলত্যাগ, অবিশ্বস্ততা, শোষণ, পীড়ন ইত্যাদি অসংখ্য

১০১। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
১০২। আল কুরআন, ৪৯ : ১৩
১০৩। আল কুরআন, ৩০ : ২২

সামাজিক অপরাধ হতে মানুষ অবশ্যই বিরত থাকবে। কেননা, এসকল কার্যলাপের ফলেই সমাজের বিশৃঙ্খলা ও ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মোটের উপর ইসলামী সমাজের প্রত্যেক মানুষকে তাওহীদ ও রিসালাতের মহান শিক্ষায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে এবং ছোট বড় যাবতীয় সামাজিক অপরাধ হতে বিরত ও পবিত্র থাকতে হবে। আর এ কল্যাণকামী সমাজের প্রতিটি মানুষের কথা হবে, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার ত্যাগ, আমার জীবন এবং মৃত্যু সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।[১০৪]

১০৪। খুরশিদ আহমদ, Bmjv‡gi AvnŸvb, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮২, পৃ . ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡”Q`
evsjv‡`k

গবেষণা কর্মটির তৃতীয় প্রত্যয় হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এর রাষ্ট্রীয় নাম "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" বা 'Peoples Republic of Bangladesh'।[১০৫] এটি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান মধ্যপন্থি মুসলিম দেশ। আয়তনের দিক হতে এটি পৃথিবীতে ৯০তম। জনসংখ্যার দিক হতে বিশ্বে অষ্টম এবং মুসলিম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ।

Ae¯'vb

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এর ভৌগোলিক সীমারেখা ২০°–৩৪′ থেকে ২৬°–৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°–০১′ থেকে ৯২°–৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

mxgvbv

বাংলাদেশের সীমানা মূলত ১৯৪৭ সালে বৃটিশ কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশের দেশ বিভাগকালীন সীমানা। সেসময় পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাংশের জন্য নির্ধারিত সীমারেখাই বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ সংবিধান মতে, "১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল"।[১০৬] এ হিসেবে এদেশের বর্তমান আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬৯৭৭ বর্গমাইল। বাংলাদেশের প্রায় তিন দিক জুড়ে রয়েছে ভারত। আক্ষরিকভাবে এর সীমানা হলো উত্তরে জলপাইগুড়ি, আসাম, মেঘালয়, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দক্ষিণপূর্বে মায়ানমার ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। সাথে সুদীর্ঘ সীমান্তের অনেকাংশ নদী ও পর্বতের দ্বারা বেষ্টিত হলেও, সীমান্ত রেখার বেশিরভাগ অংশ প্রাকৃতিক ভাবে চিহ্নিত নয়।[১০৭]

RbmsL¨v

জনসংখ্যা বিচারে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম বৃহত্তম দেশ। এর মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬কোটি।[১০৮] এর অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৯.৩৮ শতাংশ মুসলিম, আর বাকী ১০.৬২ ভাগ

১০৫। সালাম নাসির নজরুল, ¯^vaxb evsjv‡`‡ki Af¨`‡qi BwZnvm, এন, এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ২০১৪, পৃ. ৫

১০৬। মোজাম্মেল হোসাইন চৌধুরী, evsjv‡`‡ki A_©bwZK, AvÂwjK I gvbweK f‚‡Mvj, bI‡ivR wKZwe¯Ívb, ঢাকা : ১৯৯৪, পৃ. ২২

১০৭। *Bangladesh Population Census-2001, National Series*, Vol-1, Analytical Report. Bangladesh Burean of Statistics, October-2007. p. X1

১০৮। Ibid, p.XI-XIV

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৪৩ জন।[১০৯]

f-cKwZ

ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশ তিন ভাগে বিভক্ত।[১১০] যথা :

(K) cvevZ¨ I wbg cvnwoqv AÂj : এটি ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড়, সিলেটের পার্বত্যভূমি, কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়, চট্টগ্রাম হুমাই এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ পাহাড়িয়া অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

(L) DcKjxq AÂj : দেশের দক্ষিণ সীমান্তের বঙ্গোসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ তথা বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম জেলা এ ভূ-ভাগের অন্তর্গত। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ছোট বড় অনেকগুলো দ্বীপও এ ভূভাগের অন্তর্গত।

(M) wbg Mv‡½q AeewnKv AÂj : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির সবচেয়ে বড় অংশ এ নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকা। মূলত এটি পালন সমভূমি। নদীমাতৃক এদেশের নদীগুলো দ্বারা আনীত পলি দ্বারাই এ অঞ্চল গঠিত। সমুদ্র পৃষ্ট হতে যার উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার বা ১০০ ফুট।

এতদ্ব্যতীয় বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে আরো নানা ধরণের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। যেমন-প্লাবন সমভূমি, ব-দ্বীপ অঞ্চল, সক্রিয়-বদ্বীপ, মৃত প্রায় ব-দ্বীপ, স্রোতজ সমভূমি ইত্যাদি। বাংলাদেশে এসব অঞ্চলে অবস্থিত বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার একর। যা মোট ভূমির শতকরা ১৬.১২ ভাগ।

Rjevq

বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এখানে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকালে ঠাণ্ডা ও শুস্ক আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

এদেশে বর্ষাকাল বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫৪ (সেন্টিমিটার)। এদেশে মোট ৬টি ঋতু আছে। যথা-গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বসন্ত। ঋতু বৈচিত্র্যের সাথে সাথে এদেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে থাকে। তবে বর্তমানকালের বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব কমবেশি বাংলাদেশের জলবায়ুতেও প্রভাব ফেলেছে। ফলে এদেশে বর্তমানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এ তিনটি ঋতুর প্রভাবই বেশি অনুভূত হয়।

A_bxwZ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এখনো সুসংহত হয়নি। এদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন-

---

১০৯। মোজাম্মেল হোসাইন চৌধুরী, cv¸ ³, পৃ . ৭

১১০। *Bangladesh Economic Review 2007*, Economic Advisers wing, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the Peoples Republic of Bangladesh , March-2008, p.XIX

জীবিকা এখনো কৃষি নির্ভর। অবশ্য শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের পাশাপাশি বৃহৎ শিল্পেরও প্রচলন রয়েছে এদেশে। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ৫২০ মার্কিন ডলার।[১১১] এদেশের প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ দরিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে।

তবে আশার কথা হচ্ছে-পূর্বের তুলনায় এদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও তা প্রত্যাশার তুলনায় সামান্যই মাত্র।

wk¶v

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সার্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। নারী শিক্ষাকেও এদেশে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। মেয়েদের শিক্ষায় বয়স্ক উপবৃত্তি ও অবৈতনিক পদ্ধতি বিদ্যমান। এদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষার হার ৩৭.৭%, আর বয়স্ক শিক্ষার হার ৪৭.৯% । বাংলাদেশ সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কে বলা আছে-"রাষ্ট্র-

(ক) একই পদ্ধতির গণমূখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের।

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সে প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রনোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য।

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[১১২] বর্তমান বাংলাদেশে নানা মাধ্যমের শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও বিদ্যমান। এছাড়া নবতর যুগের ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতিও এদেশে, বিশেষত নগরাঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

ckvmwbK KvVv‡gv

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিগত দু'দশক ধরে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার এদেশ পরিচালনায় নিয়োজিত। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো হলো- "সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণআস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এ নীতিসমূহ এবং তৎসহ এ নীতিসমূহ হতে উদ্ভূত এভাবে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত হবে"।[১১৩] প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ৮টি বিভাগে বিভক্ত। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল রংপুর ও ময়মনসিংহ। বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় প্রশাসনকে বেশ কতিপয় স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এতে সর্বমোট ৬৪টি জেলা ও ৪৯৩টি

১১১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, cv¸ ³, দ্বিতীয় ভাগ, ivó Pvjbvi gjbxwZ, অনু, ১৭, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অংশ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫-৬

১১২। Bangladesh Population Census-2001, Ibid, p.XI-XIV

১১৩। *Statistical Year Book of Bangladesh-2006* (26Th edition) Bangladesh Burean of statistics, Planning Division, Ministry of Planning, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka. p.27

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা/থানা রয়েছে।[১১৪] ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৫৫৩টি, পৌরসভা ২২৩টি এবং গ্রামের সংখ্যা ৮৭৬৩২টি।[১১৫]

¯^vaxbZv jvf

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বীজ নিহিত ছিল মূলত ব্রিটিশ কর্তৃক ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশকে বিভক্তিকরণের মধ্যে। ধর্ম বিবেচনায় হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য পৃথক দুটি রাষ্ট্রের ধারণা হতেই এসময় ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম। ১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'Two Nation Theory' বা 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' আলোকে পরবর্তীতে আন্দোলনের ফসল হিসেবে ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান পৃথক সত্ত্বা লাভ করে। বলা যায়, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও তৎকালীন নেতৃবৃন্দের তীব্র রাজনৈতিক পদক্ষেপে বিনা রক্তপাতে বিনা যুদ্ধে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র তার মানচিত্র নিয়ে বিশ্ব পরিবারে স্থান করে নেয়।[১১৬]

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ফলে মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয়। একটি পশ্চিম পাকিস্তান যা বর্তমানে পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত। আর অন্যটি পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশ। শুধু ধর্মের ভিত্তিতে হাজার মাইল দুরত্বের দুটি অংশকে একত্র করা ব্যতীত পাকিস্তান রাষ্ট্রের আগের দু'অংশের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই বিদ্যমান ছিলনা। সমাজ কাঠামো, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থা সবকিছুতেই প্রদেশ দুটো ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তার উপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক সকল দিক হতেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করলে এদেশে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়। এর সর্বপ্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এসময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য করতে সরাসরি অস্বীকার করেন।[১১৭] ফলে স্বভাবতঃই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষার দাবীতে রাস্তায় নেমে আসেন। এসময় পাকিস্তানী শাসকদের গুলিতে শাহাদতবরণ করেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ বাংলার অকুতোভয় দামাল সন্তানেরা। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি এ আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করে বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

মূলত ১৯৫২ সালের এ ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালীদেরকে তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট করে, অনুপ্রাণিত করে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের শত অত্যাচার-নির্যাতন উপেক্ষা করে চলতে থাকে বাংলার

১১৪। সুব্রত বড়ুয়া, Avgv‡`i evsjv‡`k, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা : ১৯৯০, পৃ.২৮
১১৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, cv¸ ³, দ্বিতীয় ভাগ ivó cwiPvjbvi gjbxwZ, মূলনীতিসমূহ, অনু-৮, পৃ.৪
১১৬। আবদুল মমিন চৌধুরী, evsjv mvwn‡Z¨i BwZnvm, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ.৫৬
১১৭। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, cv¸ ³, প্রথম ভাগ, প্রস্তাবনা অংশ, পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার আদায়ের আন্দোলন। কালক্রমে ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণভ্যূত্থান ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙ্গালীদের জয়লাভ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মাইলফলক হিসেবে কাজ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে গোটা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা নির্বাচনের এ রায় মেনে নিতে পারছিল না। তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে নিরীহ ও গণতন্ত্র প্রিয় বাঙ্গালীদের উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকবাহিনী এদেশে যে বর্বরতম হত্যাকাণ্ড চালায় তা আজো বাংলার ইতিহাসে কালরাত্রি হিসেবে চিহ্নিত। পরদিন ২৬শে মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে- "আমরা, বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছি"।[১১৮]

স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে শুরু হয় বাংলার মুক্তিসংগ্রাম। এদেশের আপামর জনসাধারণ সাধারণ অস্ত্র শস্ত্র নিয়েই এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীতে ভারত সরকারের সহযোগিতায় এ মুক্তিসংগ্রামে তীব্র গতি লাভ করে। পরিশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রায় নয় মাস যুদ্ধের পর পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এদেশ পরিত্যাগ করে চলে যায়। জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত আর লক্ষাধিক মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশের এ মুক্তিসংগ্রাম ছিল এদেশের আপামর জনসাধারণের মুক্তি ও চেতনার উৎস। এটি আমাদের গর্ব ও অহংকারের সোনালী স্বাক্ষর। বস্তুত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়ের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে আমরা হয়তো এখনো আমাদের সব বাঁধা কাটিয়ে উন্নতির শীর্ষে উঠতে পারিনি, তবে ১৯৭১ সালে অর্জিত স্বাধীনতাই আমাদের সে স্বপ্ন দেখায়; সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখায়।

evsjv‡`‡ki cvPxb BwZnvm

বর্তমান বাংলাদেশ বলতে আমরা যে ভূখণ্ডকে বুঝি প্রাচীন বাংলা বলতে শুধু এ ভূখণ্ডটিই বুঝানো হতো না। বরং প্রাচীন বাংলার সীমানা ছিল আরো অনেক বড় ও বিস্তৃত। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি জানার জন্য তাই এর প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থান জানা প্রয়োজন। কেননা ইতিহাস, যেখানে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশের মানুষের বর্ণনা লিপিবদ্ধ থাকে, ভূগোলের ভিত্তি ব্যতীত তা গড়ে ওঠতে পারে না বাংলার প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত থাকলেও এর সীমানা কখনোই এক ছিল না।[১১৯]

১১৮। H.PR. Finbery (ed), *Approaches to History*, London : 1962, p.155
১১৯। J. Rennl, *Memorieo of a Map of Hindoostan*, London : 1783, p.89

Dhaka University Institutional Repository

অতি সাম্প্রতিক রাষ্ট্রগুলোর জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ সংক্রান্ত কোন বিশেষ পদ্ধতির অভাব, নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তন, রাজন্যবর্গের দ্বারা সাম্রাজ্যের দখলকৃত অঞ্চলের ভিন্নতা ইত্যাদি মূলত প্রাচীন বাংলার অস্থিতিশীল রাষ্ট্র সীমানার জন্য দায়ী। এজন্য দেখা যায় যে প্রাচীন বাংলার সীমানা স্থির থাকেনি কোন যুগে। বিভিন্ন রাজবংশের আগমনে এর সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে বারবার। অবশ্য রাজনৈতিক ভাবে প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্ধারণ করা না হলেও প্রাকৃতিকভাবে অর্থাৎ পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল, নদী-সাগর ইত্যাদি দ্বারা বাংলা চিরকালই সীমাবদ্ধ ছিল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে। তন্মধ্যে বাংলার সীমানা পরিবর্তনে নদ-নদীর ভূমিকাটাই ছিল মূলত প্রধান। নদী বিধৌত এ ব-দ্বীপ অঞ্চলে ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তন, মজে যাওয়া, নতুন নদীর জন্ম হওয়া, নদীবাহিত পলি দ্বারা নতুন ভূমির উৎপত্তি ইত্যাদি কারণে বাংলার ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রধান নদীগুলোর স্রোতধারাই বাংলাকে মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত করেঃ উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বভাগ।[১২০] বাংলার প্রাচীন মানচিত্রে যা স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে রেনেলের মানচিত্র উল্লেখযোগ্য।[১২১]

নানা কারণে বাংলার রাষ্ট্র সীমা পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, সংকুচিত হলেও ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট যে অঞ্চলটি বাংলা বলে প্রাচীন যুগে পরিচিত ছিল তা ঐতিহাসিকগণ চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত নদীবিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এ বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা, উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপাল তরাই অঞ্চল, পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পবর্তরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[১২২] আরেকটু বিস্তারিত ভাবে বলা চলে উত্তরে হিমালয়, উত্তরপূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ও তরাই উপত্যকা, পূর্বে গারো, খাসিয়া, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের গিরিরাজি উত্তর পশ্চিমে দ্বারাভাঙ্গা পর্যন্ত গঙ্গার উত্তর তীরবর্তী সমতল ভূমি, পশ্চিমে রাজমহল, সাঁওতাল, পরগনা, ছোট নাগপুর, মালভূম, ধলভূম, ময়ূরভূঞ্জ ও কেওঞ্জরের জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমি ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এ চৌহদ্দির মাঝে যে বিরাট ভ-ূভাগ এটাই হলো বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালীর বাসস্থান, তাদের কর্মক্ষেত্র।[১২৩] বাংলার এ বিশাল ভূ-ভাগ আবার বেশ কিছু জনপদে বিভক্ত ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়- "একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দু দিকে কঠিন শৈলভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, মাঝখানে সমভূমির সাম্য এটাই বাঙ্গালীর ভৌগোলিক ভাগ্য"।[১২৪]

১২০। ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, cvPxb evsjvi BwZnvm I ms¯‹wZ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা : ২০০৯, পৃ. ২০

১২১। আবদুল মমিন চৌধুরী, cv¸³, পৃ. ১৪

১২২। অজয় রায়, ev½jv I ev½vjx, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৭৭, পৃ. ৩

১২৩। নীহাররঞ্জন রায়, ev½vjxi BwZnvm, (আদি পর্ব), পশ্চিম বঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি. কলিকাতা : ১৯৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৬

১২৪। অজয় রায়, cv¸³, পৃ.৫১

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন বাংলা বলতে এটুকুই। সময়ের কালক্রমে রাষ্ট্র সীমায় সংকোচন, সংযোজন, বিয়োজন যা কিছু সবই এর অভ্যন্তরে। এর মধ্যেই গড়ে উঠেছে হাজার বছরের বাঙ্গালী সংস্কৃতি। যার ভিত্তি ছিল বাংলার জনপদগুলো। বাঙ্গালীদের সভ্যতা সংস্কৃতি, সমাজকাঠামো, মন-মানষিকতা ইত্যাদির ক্রমবিকাশে এ জনপদগুলোর অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলার এ জনপদগুলোর জন্ম প্রসঙ্গে এক বিস্ময়কর ও মজার পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। মহাভারত ও মৎসূপুরানের পুরাকাহিনী মতে অপুত্রক বলিরাজা পুত্র সন্তান লাভের আশায় দৃঘতমাস নামের এক অন্ধ মুনি তাপসের শরণাপন্ন হন। রাজার আকুতিতে মুনির দয়া হয় এবং পরবর্তীতে রানীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। তারা ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সুহ্ম। আর এদেরই নামে এদের বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরযুগের পাঁচটি বিখ্যাত জনপদ গড়ে ওঠে।[১২৫]

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ প্রাচীন বাংলার যেসব জনপদের নাম উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, সুহ্ম, রাঢ়, গৌড় বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি। আর্যপূর্ব যুগ হতে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত এ জনপদগুলো নিজ নামেই কার্যকর ছিল। কিন্তু সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে গৌড়ের রাজা শশাংকের শাসনামলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জনপদগুলো প্রভাবশালী জনপদের মধ্যে মিশে যেতে শুরু করে। পরবর্তী পাল ও সেন আমলেও জনপদগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত মুসলিম পূর্ব বাংলায় গৌড়, পুন্ড্র ও বঙ্গ এ তিনটি জনপদই প্রধানত টিকে ছিল। বাকী অন্যান্য জনপদ এ তিনটির সীমানায় বিলীন হয়ে যায়। এদের মধ্যেও পুণ্ড্রবর্ধন গৌড়ের মধ্যে অনেকটা হারিয়ে যায়। যাহোক এ সময় বাংলা বলতে গৌড় বা বঙ্গ বুঝানো হতো। এভাবে খণ্ড খণ্ড জনপদগুলো একত্রিত হয়ে গড়ে উঠেছে অখণ্ড বাংলা। মুসলিমদের আগমনের পর পাঠান আমলে বিশেষ করে ইলিয়াস শাহী শাসনে সমগ্র অঞ্চল বঙ্গ বা বাংলা নামে সর্বপ্রথম একীভূত হয়। মোগল আমলেও এ ধারা বজায় থাকে। মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে যার নাম দেয়া হয় সুবাহ-ই-বাঙ্গালাহ। শেষ পর্যায়ে ইংরেজগণ যার নামকরণ করে বেঙ্গল (Bengal)।

bvgKiY

বাংলাদেশ শব্দটির উৎপত্তি তথা নামকরণের ইতিহাস পর্যালোচনায় বাংলা গবেষকগণ ব্যাপক বিশ্লেষণাত্মক মতামত পেশ করেছেন। যদিও তারা এর মূল উৎসের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন, তথাপিও একটা বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত যে বাংলাদেশ বা বাংলা শব্দটি মুসলিম কর্তৃক

১২৫। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক), evsjv‡`‡ki BwZnvm, দ্বিতীয় খ. (মধ্যযুগ), কে.বি.প্রিন্টার্স কলিকাতা : ১৯৭৪ , দ্বিতীয় সংখ্যার ভূমিকা দ্র.

Dhaka University Institutional Repository

প্রদত্ত। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন "বাংলার পুর্বরূপ বাঙ্গালা নাম মুসলিমদের দেয়া নামটি বাংলার একটি ক্ষুদ্র অংশের নাম বঙ্গাল শব্দের অপভ্রংশ। এটা বঙ্গ শব্দের মুসলমান রূপ নয়। মুসলিমরা প্রথম হতে সমগ্র বঙ্গদেশকে মুলক বাঙ্গালা বলত"।[১২৬] বাঙ্গালা বা বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি কোথায় কিংবা মুসলিমগণ ও নাম কিভাবে প্রচলন করলেন এর কারণ অনুসন্ধানে প্রধানত তিনটি মতই দৃষ্টিগোচর হয়।

c_gZ, বাঙ্গালা শব্দটি 'বঙ্গ' শব্দ হতে উৎপন্ন। আর এটা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে বঙ্গ ছিল অন্যতম। এ বঙ্গ শব্দ হতে বঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি বলে অধিকাংশ গবেষকগণ মনে করেন।

বঙ্গ শব্দটি সুপ্রাচীন। আর্য ধর্ম ব্রাক্ষণ্যবাদের ঋগবেদে এ শব্দের উল্লেখ না থাকলেও 'ঐতরেয় আরন্যক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তীতে বোধায়ন ধর্মসূত্র, পুরাণ, রামায়ন মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থেও এ শব্দের উল্লেখ লক্ষণীয়। এসব গ্রন্থে বঙ্গের নির্দিষ্ট সীমানা উল্লেখ করা না থাকলেও এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত যে বঙ্গ তৎকালীন সময়ের একটি পৃথক রাজ্য ছিল।[১২৭] পরবর্তীতে মুসলিম ঐতিহাসিক, পর্যটক ভূগোলবিদদের বর্ণনাতেও বঙ্গ নামক জনপদ ও রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা বঙ্গ অঞ্চলের রাষ্ট্র সীমা চিহ্নিত করেন। এ বঙ্গ রাজ্য তথা জনপদ হতেই বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি।[১২৮] ঐতিহাসবিদ আবুল ফজল এর মতে "বাঙ্গালার আদি নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড 'আল' নির্মাণ করতেন, এ থেকেই বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি। অজয় রায়ের মতে,"বঙ্গ যা থেকে এসেছে বাঙ্গালা দেশের নাম শব্দটির মূলে ছিল চীন তিব্বতি গোষ্ঠির শব্দ। আর এ বঙ্গ শব্দের 'অং' অংশের সাথে গঙ্গা, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ইত্যাদি নদী নামের সম্বন্ধ ধরে তারা অনুমান করেছেন যে শব্দটির মৌলিক অর্থ ছিল জলাভূমি"।[১২৯]

প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশ প্রাচীনকাল হতেই নদী বিধোত বদ্বীপ অঞ্চল। সুতরাং বন্যা ও জোয়ারের পানি রোধের জন্য ছোট বড় আল (বাঁধ) নির্মাণ এদেশের বৈশিষ্ট্যই ছিল বলা চলে। এ প্রেক্ষিতে 'বঙ্গ+আল' শব্দযোগে বঙ্গাল ও পরবর্তীতে বঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বঙ্গ শব্দ হতে বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তির আরো একটি ব্যাখ্যা দেখা যায়। যথা সেমেটিক শব্দ আল শব্দের

১২৬। ড. আব্দুল করিম, e½, e½vj : evsjv‡'k, gvbe we'¨v e³Zv, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ.৪-৫

১২৭। H.S. Jarrett, *Ain-I-Akbari by Abul Fazal*, Reviewed by J.N.Sarkar, Calculta : 1984, Vol.11, p.120

১২৮। অজয় রায়, cv¸³, পৃ . ১

১২৯। গোলাম হোসাইন সলীম, wiqv'm mvjvZxb (অনু, আব্দুস সালাম), ঢাকা : তারিখ বিহীন, পৃ . ২০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ আওলাদ বংশধর। এ হিসেবে বাঙ্গাল বা বঙ্গ (বং+আল) এর অর্থ বং এর আওলাদ বা বংশধর। হযরত নূহ (আ.)-এর সময়ে মহাপ্লাবনের ফলে মাত্র গুটিকয়েক প্রাণী ছাড়া সব প্রাণীকূল ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে এদের দ্বারাই পুনরায় মনুষ্য বসতি গড়ে ওঠে। হযরত নূহ (আ.) মহাপ্লাবনের পর তাঁর পুত্রদেরকে দুনিয়ার নানা দিকে বসতি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর পুত্র হাম এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন হিন্দ। আর হিন্দের এক পুত্রের নাম ছিল বং। তিনি বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর উত্তম পুরষরাই এদেশের অধিবাসী হিসেবে বেড়ে ওঠেন। এ প্রেক্ষিতে বং-সন্তান উত্তরাধিকারীদের সূত্রে আল (বংশধর) শব্দ যোগে বঙ্গালা বা বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[১৩০]

ØZxqZ, বঙ্গালা বা বাঙ্গালা শব্দটির উৎপত্তি বঙ্গাল শব্দ হতে। ড. হেমচন্দ্র চৌধুরী, ড. ডি সি সরকার প্রমুখ গবেষক এমত পোষণ করেন। তাদের মতে প্রধান বাংলার জনপদ বঙ্গাল হতে বঙ্গালা নামের উৎপত্তি। তারা নানা যুক্তি ও প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতে বঙ্গাল জনপদের অবস্থান ও বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেন এবং এ দৃঢ়ভাবে বলেন যে, এ বঙ্গাল শব্দগত ও ভৌগোলিকভাবে বঙ্গালা-এর অধিকতর নিকটবর্তী।[১৩১] সুতরাং এ শব্দ হতেই বাঙ্গালা বা বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি।

ZZxqZ, বঙ্গাল বাঙ্গালা নামটি 'বঙ্গালা' নামক শহরের নাম হতে উদ্ভুত। ষোল শতকের ইউরোপীয় লেখক বারবোসা, ভারথেমা প্রমুখের বর্ণনায় এ শহরের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া গাসতালদি, মজুমদার বাঙ্গালা নামের উৎপত্তির কারণ হিসেবে 'বেঙ্গালা' নামকএ শহরের নামকেই গ্রহণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিচারে বঙ্গালা বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি সূত্র হিসেবে প্রথমোক্ত মতটিই গ্রহণযোগ্য। কেননা প্রাচীনযুগে বঙ্গাল দেশের নাম উল্লেখ আছে সত্য, তবে তা থেকে সারাদেশের নামকরণ হওয়ার মতো গুরত্ব তার ছিল-এমন কথা বলার অবকাশ নেই। বাংলার প্রাচীন জনপদ সমূহের মধ্যে বঙ্গাল-এর মূল নাম 'বঙ্গ' অধিক খ্যাতিমান ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১৩২]

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষ্য ঐতিহাসিক বিচারে গ্রহণীয় নয়। কেননা 'বঙ্গলা' শহরের অস্তিত্ব ও পরিচিত নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হলেও, আজ পর্যন্ত এর কোন সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। বরং রেনেল, ওভিংটন প্রমুখ গবেষকগণ-এর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। অবশ্য একদল গবেষক মনে করেন যে, বঙ্গ 'বঙ্গাল' কিংবা 'বেঙ্গালা' অভিন্ন। নানা সময়ে নানা লেখনীতে এগুলো ভিন্নতা পেয়েছে মাত্র।

১৩০। D.C. Sarkar, *Studies, in the Geography of Ancient and Medival India*, Delhi : 1971, p. 36
১৩১। ড.আব্দুল করিম, cÖv¸³, পৃ.১৬
১৩২। ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, cÖv¸³, পৃ . ১৬

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত বঙ্গ, বঙ্গাল বা বেঙ্গালা হতেই মুসলিমগণ সর্বপ্রথম বঙ্গালা বা বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বঙ্গালা নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ইবনে বতুতার ভ্রমণলিপিতে।[১৩৩]

পরবর্তীতে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী ও শামস সিরাজ আদি বাঙ্গালা শব্দের উল্লেখ করেন। শামস সিরাজ তৎকালীন বাংলার শাসক ইলিয়াস শাহকে 'শাহ ই-বাঙ্গলা', 'শাহ্-ই-বাঙ্গালিয়ান' বা 'সুলতান ই-বাঙ্গালা' নামে আখ্যায়িত করেন। উল্লেখ্য যে সেসময় ইলিয়াস শাহ শুধু বঙ্গ জনপদের শাসক ছিলেন না বরং সমস্ত জনপদের একীভূতরূপ বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক শামস-সিরাজ তাঁর গ্রন্থে বাঙ্গালা বলতে গোটা বাংলা অঞ্চলকেই বুঝিয়েছিলেন।

বঙ্গ হতে বঙ্গাল বা বঙ্গালা লিখার ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ মূলত ফার্সী ভাষা লিপি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যেমন মুসলিম আগমনের সমকালীন বাংলার জনপদ যথা বরেন্দ্র, রাঢ়, সমতট, কামরূপ ইত্যাদিকে তারা ফার্সী লিপি প্রভাবে যথাক্রমে বরিন্দ, রাল, মনকলত এবং কামরূপ বা কামরু নামে অভিহিত করতেন। এরই ফলে বঙ্গ হতে ক্রমান্বয়ে বঙ্গালাহ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে বঙ্গালা, বঙ্গালাহ বা বাঙ্গালা এদেশীয় হিন্দু-বৌদ্ধদের মাঝেও প্রচলিত হয়। পরবর্তীতে পর্তুগিজরা এ শব্দ হতেই এ অঞ্চলের নাম দেন বঙ্গালা (Bengal)। সুকুমার সেনের মতে "বঙ্গ হতে বাঙ্গালা বা বঙ্গালহ উৎপত্তি হয়েছে। বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকার বলে সৃষ্ট এবং ফারসী বাঙ্গালস হতে পর্তুগিজ বেঙ্গালা ও ইংরেজি বেঙ্গল শব্দের উৎপত্তি"।[১৩৪] শেষ পর্যায়ে ইংরেজদের প্রচলিত বেঙ্গল শব্দ হতে ক্রমান্বয়ে বাংলা এবং বাংলাদেশ শব্দের রূপান্তর ঘটে। গবেষক আবদুল করিম ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নামের উৎপত্তি ও রূপান্তরের বিষয়টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ ও যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন। তা হলো-

বঙ্গ-প্রাচীন কালের বঙ্গ

বাঙ্গালা- মুসলমান ঐতিহাসিকদের দেয়া নাম এবং মোগল সুবা বঙ্গালা

বাঙ্গালা- বাংলায় লিখিত বঙ্গলার রূপ

বঙ্গাল- প্রাচীন তাম্রলিপিতে পাওয়া বঙ্গাল এবং বঙ্গ-এর অধিবাসী বঙ্গাল

বাংলা- ১৯৪৭ সালের বিভাগপূর্ব বাংলাদেশ

বাংলাদেশ - বর্তমান বাংলাদেশ।[১৩৫]

১৩৩। H.A.R Gibb, *Ibn Battuta : Travels in Asia and Africa*, London : 1963, P . 267

১৩৪। ড. আবদুল করিম, evsjvi BwZnvm, mjZvbx Avgj, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৭৭, পৃ . ১৯৮

১৩৫। সকুমার সেন, ev½vjv †'‡ki bv‡gi civZZ BwZnvm, wW.Gb.we,G. ev'vm, কলিকাতা : ১৯৯৩, পৃ . ১৭

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq

c_g cwi‡”Q‘

mv¤c‘wqKZvi cKwZ I ¯i/c

সাম্প্রদায়িকতা ও বিশ্ব প্রগতি পরস্পরের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত। বিশ্বের বহু দেশে সাম্প্রদায়িকতা একটি অভিশপ্ত অভিজ্ঞতা। সাম্প্রদায়িকতা পৃথিবীর অনেক দেশেই বিরাজ করছে। এটি কোথাও জাতিভিত্তিক, কোথাও ধর্মভিত্তিক, কোথাও ভাষাভিত্তিক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণও একযোগে কাজ করে চলেছে।[১] তবে বাংলাদেশ বিশ্বে সম্প্রীতি ও সংমিশ্রণের শ্রেষ্ঠ স্বর্গভূমি। এ সম্প্রীতি বাংলাদেশের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের একটি। এদেশের মাটিতে সকল জাত-পাত ও মতের ঘটেছে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়-ককেশীয় নৃ-গোষ্ঠির বিরল মিলনে এখানে জন্ম নিয়েছে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নতুন নৃ-গোষ্ঠি। এ নৃ-গোষ্ঠির সংস্কৃতি ও স্বভাবে নিজ নিজ ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি এ সংমিশ্রণের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। এক কথায় প্রান প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও জলবায়ুর বহমুখী ধারার এ অপূর্ব সম্প্রীতি ও সংমিশ্রণ বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বে আর কোথাও নেই। [২]

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে আলোচনা করতে হলে তার আগে সাম্প্রদায়িকতা কি- সে বিষয়ে জানতে হবে। আর তাই আলোচ্য অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিষয়েও আলোচনা হওয়া দরকার। এ অধ্যায়টিতে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হলো।

কমিউনালিজম' শব্দটি খুব সম্ভব 'কমিউন' শব্দটি থেকে এসেছে। শেষোক্ত শব্দটির অর্থ এক ক্ষুদ্র স্থানিক বিভাগ যেখানে একজন মেয়রসহ সায়ত্ত্বশাসন বর্তমান। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের প্যারিস কমিউন ছিল জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এ বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ যে, প্রত্যেক নগর বা জিলা তার নিজস্ব কমিউন কর্তৃক স্বাধীনভাবে শাসিত হবে। সে সময় থেকেই কমিউনালিজম বা সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি এক বিশেষ অর্থদ্যোতক হয়ে উঠে ও কলঙ্ক চিহ্নটি অর্জন করে। বর্তমান কালেও সে অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে।[৩]

১। সুজিত সেন (সম্পাদিত), mv¤c‘wqKZv mgm¨v I DËiY, পুস্তক বিপণি, কলকাতা : ১৯৯১, পৃ.৭
২। মেহেদী হাসান পলাশ (সম্পাদিত), msL¨vjN iVRbxwZ, বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা : ২০০১, পৃ.৬
৩। সুজিত সেন, cv¸ ³, পৃ.১২

বর্তমানে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন ভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে বিশ্লেষণ করেছেন:

সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক গবেষক প্রমোদ কুমার সাম্প্রদায়িকতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন,

"Communalism means to believe or to propagate that the socio-economic and political interests of one religious, caste or an astrictive group are dissimilar, divergent and antagonistic to those of another. Communalism is an ideology. It is not a total ideology and it is not an ideology of a particular class. Communalism is a distorted ideology as it reflects objective reality not inadequately by in a distorted way."[8]

প্রমোদকুমার আহমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকরা শ্রেণি বিচারে একই শ্রেণিভুক্ত হলেও ধর্মের ভিত্তিতে তারা দু'টি ভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সামিল হয়েছে। তার মতে, সাম্প্রদায়িকতা বিশেষ কোন শ্রেণির মতাদর্শ নয়।

তিরিশের দশকে জওহরলাল নেহেরু সাম্প্রদায়িকতাকে বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের দৌড় প্রতিযোগিতা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী গঙ্গাধর অধিকারী। তার মতে ঔপনিবেশিক পর্বে সাম্পদায়িকতার মূল ছিল, mainly in the competition for jobs and favours in the struggle for distribution of the little political power which is to be obtained through compromise with imperialism.

চল্লিশের দশকে ভারতীয় কমিউনিস্টরা সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকে জাতীয়তার সমস্যা বলে দাবি করেন। সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা নির্ণয়ের উপরোক্ত প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। প্রত্যেকেই সমস্যাটিকে দেখতে চেয়েছেন সামাজিক-অর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে, উৎস খুঁজেছেন ঔপনিবেশিক বর্তমান অর্থনীতিতে। প্রত্যেকে সাম্প্রদায়িকতাকে বিশেষ এক ধরণের চেতনা বলেছেন। এ চেতনার সুসংহত প্রকাশকে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ বলেছেন। এদের মতে, ভ্রান্ত এ মতাদর্শ বিকৃত চেতনার সূচক।

৪। Pramod kumar, *'Communal Ideology: Its basis, dimensions, and social appeal',* teaching politics, vol. XIII, No . 3 & 4, 1987, P. 179

চেতনা সংস্কৃতি সঞ্জাত। মতাদর্শ বৃহত্তর সমাজ-সংস্কৃতির অংশ। সাম্প্রদায়িকতাকে বিকৃত ধর্মীয় মতাদর্শ হিসেবে বর্ণনা করলে অনিবার্যভাবে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাগুলোকে সমাজের প্রচলিত সংস্কৃতির প্রকৃতির আলোকে বিচার করতে হয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে সংস্কৃতি হলো কোন সমাজের ভিত্তি (= উৎপাদন শক্তি + উৎপাদন সম্পর্ক)-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা উপরিকাঠামো (super-structure)। সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একক হিসেবে ধর্মীয় মতাদর্শ সাম্প্রদায়িক সত্তার জন্ম দেয়।[৫] মতাদর্শগত দিক থেকে অনেকেই সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তাবাদের বিপ্রতীপে সংস্থাপিত করেছেন। ফলে সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ অনুধাবনে মতাদর্শগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই সাম্প্রদায়িকতার কারণ হিসেবে জাতীয় চেতনার অভাবের কথা বলেন। এরা মতাদর্শগত দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকে এভাবে আলোচনা করতে চেয়েছেন :

ক) সাম্প্রদায়িকতাবাদ জাতীয়তাবাদ(বিশেষতঃ প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে)।

খ) সাম্প্রদায়িকতাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা (বিশেষতঃ রাজনীতিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের রচনায়) অথবা

গ) সাম্প্রদায়িকতা/ জাতীয় ঐক্যের/সংহতির প্রয়োজনীয়তা।[৬]

গতানুগতিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলতে বুঝায়- সংখ্যাগুরুর সাথে সংখ্যালঘুর দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলমান বিভেদের অক্টোপাসি ছোবল।

হ্যানসক্রুজ বলেন যে, যখন কোন গোষ্ঠির সদস্যরা রাজনীতিকে আইনগত জাতিসত্তার আনুগত্যের উর্ধ্বে স্থান দেয় সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ ও অন্ধ আনুগত্যকে, তখন সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়।

পামারের মতে, সাম্প্রদায়িকতা ভারত বর্ষে অন্যতম শক্তিশালী উপাদানসমূহের একটি। এটা বিভাজন ও অগণতান্ত্রিক রাজনীতি বিস্তারে প্রভাব রেখেছে।

গোপাল কৃষ্ণের মতে, সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে রাজনীতিতে ধর্মের একটা অদ্ভুত ধ্বংসাত্মক ভারতীয় প্রকাশ, যেটা ধর্মীয় পরিচিতিকে প্রাধান্য দেয় এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর কনফেডারেশন বা রাষ্ট্র সমবায় হিসেবে রাজনীতি সমাজ গঠনের প্রয়াস পায়।

ডোনাল্ড ইউজি স্মিথ বলেন, সাম্প্রদায়িকতা বলতে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর এমন ক্রিয়াশীলতা অথবা তাদের প্রতিনিধিত্ব দাবীকারী এমন সংগঠনকে বোঝায়, যেটা এক দিক দিয়ে অন্যান্য গোষ্ঠি বা সমগ্র

5| mnRZ †mb, cÖ¸³, c .77

6| cÖ¸³, c . 82

দেশবাসীর স্বার্থের পরিপন্থি। কেনেথ জোনস সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে চেতনার ভিত্তিতে সমাজের কোন এক অংশের একাত্মবোধ বলে উল্লেখ করেন। এভাবে নিজ ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে অপর সম্প্রদায়ের সাথে পার্থক্য চেতনা ও রেষারেষি গড়ে ওঠে।

প্রভা দীক্ষিতের মতে, সাম্প্রদায়িকতা ধর্মাদর্শ ও সামাজিক আচরণে বিভেদ ও সংঘাত তৈরী করে এবং রাজনীতিক জীবনে আনয়ন করে ভয়াবহ বিপর্যয়। সাম্প্রদায়িকতা এমন একটা আদর্শ যা প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী গোষ্ঠিকে পৃথক সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক একক বলে বিবেচনা করে এবং এ ধরণের বিভিন্ন গোষ্ঠির ভেতর বিভেদ ও সংঘাতকে উস্‌কানি দেয়।

রিচার্ড ডি. ল্যামবার্ট এরমতে, কারও নিজ ধর্মের বিষয়ে গর্ব বোধটা সাম্প্রদায়িকতা নয়, অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করাই সাম্প্রদায়িকতা। ল্যামবার্ট আরো বলেন, গোড়ামী যখন ধর্মান্ধতার পর্যায়ে পোঁছায় তখনও সেটা সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়।[৭]

বিপান চন্দ্র বলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠিকে পৃথক সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বার্থাধীন করতে চায় যার ফলে মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নষ্ট হয় এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা এতে করে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়।[৮]

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, আপামর জনসাধারণের জীবন-যাপনে, বিশ্বাস ও দৈনন্দিন আচরণে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রাখে। যে জনসমষ্টি কোন বিশেষ ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক আচ্ছাদনে জীবন-যাপনের নিশ্চত ছক অভ্রান্ত বলে মেনে নেয়, তাদের চেতনা জগতকে তা শাসন করে একক অবিসংবাদিতায়। এরকম প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই তাকে ঘিরে জনসমষ্ঠির এক একটি রুদ্ধদল গড়ে তোলে। তাদের একটির মঞ্চে অন্যটির রূপকল্প নির্মাণে পার্থক্যও থাকে। প্রকৃতি, পরিবেশ, লোককথা, সংস্কারের ঐতিহ্য গুলোই প্রধানত শুরুতে ঐ পার্থক্যের বীজ বুণে দেয়। শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বেড়ে উঠে অনেক প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে।

ঐ ধর্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনেক নায়ক-মহানায়কের বীর গাঁথা ঐ ধর্মানুসারীদের বিমোহিত ও গৌরবান্বিত করে। ধর্ম রক্ষায় অথবা তার সম্প্রসারণে আত্মনিবেদন, প্রয়োজনে আত্মবলিদান, তাদের কাছে যদি পূর্ণ বলে বিবেচিত হয় তবে তার প্রেরণা তারা পায় ধর্মযোদ্ধাদের ঐ সব বিরত্ব কাহিণী থেকে। অন্যান্য ধর্মের অনূসারীদের বেলাতেও অনুরুপ ঘটনা ঘটে। ফলে সাম্প্রদায়িকতা যখন

৭। হাসান উজ্জামান, agwb‡c¶Zv I evsjv‡`k HK¨g‡Z¨i BwZnvm AbmÜvb, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা : ১৯৯২, পৃ.১১ - ১২
৮। বিপান চন্দ্র (অনুবাদক ঃ কুনাল চট্টোপাধ্যায়), AvawbK fviZ I mv¤cª`vwqKZvev`, কে,পি, বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা : ১৯৮৯, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

সংঘাতের আকার নেয়, তখন অতি সাধারণ মানুষও নিজেদের বিরত্ব দেখাবার সুযোগ এসেছে মনে করে বিভ্রান্তির মায়াজালে চরম কাপুরুষতার ও অমানবিকতার প্রদর্শনী ঘটায়।[৯] এ ধর্ম শুধুই ন্যায় অন্যায়ের সমষ্ঠিগত বোধ নয়, তা ঐতিহ্য শাসিত শিলীভূত প্রাতিষ্ঠানিক আকারে নিয়ন্ত্রনরত বিশ্বাস ও নির্দেশের নামাবালী। তার কেন্দ্রভূমিতে থাকে কোন ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে উদ্ভাসিত ঈশ্বরে বা ঈশ্বরের প্রতিকল্পের ধারণা, সে ধারণা সাকার বা নিরাকার যাই হোক না কেন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তাকে ঘিরে এক রূপকল্পনার বাস্তব নির্মাণ রচনা করে। এ রচনায় মিশে যায় ঐতিহ্য লালিত বিশ্বাস, প্রথা প্রকরণ, খাদ্যভ্যাস, স্থাপত্যকলা নান্দনিকবোধ এমনকি অকল্যাণের ধারণাও।

ধর্ম যেহেতু বিশ্বাসের ভূমিতে এক অপত্যয় আসন দখল করে রাখে তাই কট্টর বিশ্বাসীদের কাছে এ সকল পার্থক্য বিশেষ গুরুত্ব বহণ করে। ধর্মকে অবলম্বন করে আপন আপন বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় যখন একত্রে বসবাস করে, তখন তাদের ভিতর নানাবিধ আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অনায়াস হলেও পরিচয়ের পার্থক্যগুলো বিমোচিত হয় না। বাইরে থেকে যখন সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি ঐ সমাজের ভিতরে ছড়ানো হয়, তখন যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে চিন্তাহীনতায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পরিচয়ে আলাদা আলাদাভাবে একাত্মবোধে জাগ্রত হয়। তবে তাকে অস্বাভাবিক মনে করা যায় না। [১০]

তবে ধর্মজাত সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি অনুধাবনের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তা উদ্ভুত হয় এবং কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংগ এ সমস্যা নির্ণয় করা। অর্থাৎ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মাত্রা সহযোগে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটিকে বুঝতে হবে, প্রয়োজন একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণের।[১১] ভারতে ও বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উৎস হিসেবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চাকুরির তীব্র প্রতিযোগিতা অন্যতম কারণ হিসেবে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। [১২]

ধর্মীয় পার্থক্য কিংবা ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য কোন সাম্প্রদায়িকতা নয়, কিন্তু অর্থনৈতিক বিভক্তি এর সংগে যুক্তাক্ষরে প্রকাশিত হলে তখন তা সাম্প্রদায়িকতা হয়ে উঠে।[১৩] ভারতবর্ষে বিভিন্ন

৯। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদক), evsjv‡`‡ki ev×eiË: ag- mv¤cª`wqKZvi msKU, , জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ১৪৬

১০। লতা হোসেন (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ: mv¤cª`wqKZv : M‘¨ weivbeŸB, সানন্দ প্রকাশ, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ . ১২

১১। হাসান উজ্জামান, cv¸³, পৃ.১১

১২। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, cv¸³, পৃ.২৯০

১৩। সুজিত, cv¸³, পৃ.১৪২

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মবিশ্বাসীদের বসতি ছিল, কিন্তু কেবল হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হলো অন্য কারো সঙ্গে হলো না, এর সঙ্গে আরো কিছু ইতিহাস জড়িত হলো, তা কেবল পৃথক পৃথক ধর্ম বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়।[১৪]

বদরুদ্দীন উমর তার বহুল আলোচিত নিবন্ধ 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতায়' বলেছেন, "ধর্মকে শোষণের কাজে ব্যবহার কোন নতুন কথা নয়। ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায়ে যেটা হয়েছে, প্রত্যেক পর্যায়েই দেখা গেছে যে, অধিক সংখ্যক মানুষ ধর্মে সততার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অল্প সংখ্যক লোকে সে বিশ্বাসকে ব্যবহার করেছে। তিনি বলতে চেয়েছেন ধর্মচর্চাকারী এবং ধর্মকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার এ দু'মনোবৃত্তির মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। বদরুদ্দীন উমর সিদ্ধান্ত টেনেছেন এ ভাবে ,সংস্কৃতির মুল ভিত্তি ধর্ম, বর্ণ, বংশ ইত্যাদি নয়-সে ভিত্তি মানুষের আর্থিক জীবন" ।[১৫]

বদরুদ্দীন উমর সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি অনুধাবন করতে গিয়ে বলেন, "ধর্মের আচার বিচার এবং তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তাকে আমরা বলি ধর্মনিষ্ঠা, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পৃথক জিনিষ, কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনি সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতিসাধন করার মানষিক প্রস্তুতি সে ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় অথবা বিরুদ্ধতা থেকে সৃষ্টি নয়। ব্যক্তি বিশেষ এ ক্ষেত্রে গৌণ, মুখ্য হলো সম্প্রদায়। ধর্মনিষ্ঠার সাথে সম্পর্ক আছে ধর্মীয় তত্ত্ব এবং আচার-বিচারের, সাম্প্রদায়িকতার যোগ হচ্ছে সম্প্রদায়ের সাথে।

অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের আচরণ ও ধর্ম বিশ্বাসের গুরুত্ব বেশি। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ এক জাতীয় আনুগত্যের গুরুত্ব বেশি। অন্যের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ এবং পরিণতি। ধর্মের সাথে তাই সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই। ধর্মীয়তত্ত্ব এবং আচার-আচরণকে ভিত্তি করে যে সমাজ ও সম্প্রদায় গঠিত হয় সে সম্প্রদায়ের ঐহিক স্বার্থই সাম্প্রদায়িকতার জনক। সাম্প্রদায়িকতার জন্য তাই ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাম্প্রদায়িকতা এ অর্থে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িকতার এ প্রভেদ সত্ত্বেও অনেকের ধারণায় তারা অবিচ্ছেদ্য। এ ধারণাকে একটি সংস্কার

১৪। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম , C¸ ³, পৃ.১৪৭
১৫। লতা হোসেন, C¸ ³, পৃ.১১৬

হিসেবে গণ্য করা চলে। কিন্তু এ সমস্যার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর থেকে এক দিকে বিকৃত সামাজিক চিন্তা এবং অন্য দিকে সক্রিয় রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির উৎপত্তি”। [১৬]

মার্কসবাদী তাত্ত্বিক প্রয়াত তাঁরাপদ লাহিড়ী বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা শব্দের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার মতে, “গোষ্ঠি স্বার্থ চেতনার ভিত্তিতে সাঙ্ঘিক উম্মাদনার সৃষ্টি যা অপর এক বা একাধিক সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণশীল, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা আহরণের চেষ্টা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে উত্তেজনা সৃষ্টি করে অশান্তি বিস্তার, অপরাপর সম্প্রদায় ও গোষ্ঠির প্রতি সৌহার্দ্র্যবোধের অভাব, গোষ্ঠিগতভাবে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা সৃজন ইত্যাদি অসামাজিক প্রবণতা এ মুহুর্তে সমষ্টিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতা বলে আখ্যায়িত করা যায়”।[১৭] তিনি সবকিছু ব্যাখা করতে চেয়েছেন, মার্কস এঙ্গেলস এর ‘Communist Manifesto’ কে ভিত্তি করে। কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে বলা হয়েছে ‘The History of the all hither existing society is the history of the class struggles.’ তার ব্যাখায় এ ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে শোষক ও শোষিতের সংকট ও সংগ্রামে শোষক নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেছেন এবং কোন কোন সময় ব্যবহৃত হয়েছে ধর্ম । নিজ স্বার্থ বা নিজস্ব শ্রেণি স্বার্থ রক্ষার জন্য ধর্মকে ব্যবহারের প্রক্রিয়া থেকেই জন্ম নিয়েছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা।

সাম্প্রদায়িকতা সামাজিকও বটে। একটা গোটা সম্প্রদায় অথবা এর একটা বড় অংশ এ চেতনায় জারিত না হলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সময়। আর বহিঃপ্রকাশ কখনো সতঃস্ফূর্তভাবে ঘটলেও মূলে থাকে কোন উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড।[১৮]

তবে বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক কারণ বা ভিত্তিকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

এক সাম্প্রদায়িকতা অন্য সাম্প্রদায়িকতাকে বারবার সুযোগ করে দেয়, আপাত দৃষ্টে পরস্পর প্রতিপক্ষ হলেও এক অন্যকে পরিপুষ্ট করতে থাকে। এটা লক্ষণীয়, এ উপ-মহাদেশের কোন এক দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি বলবান হলে অন্য দেশে প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িক শক্তি তা থেকে মাথা চাড়া দেবার একটা কারণ খুঁজে পায়। এ ভাবে গোটা উপ-মহাদেশেই সাম্প্রদায়িকতা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পথে সমাজের উপর থেকে নীচে ছড়িয়ে মানুষের মনকে বিষাক্ত করে তোলার সুযোগ পায়।[১৯]

১৬। বদরুদ্দীন উমর, mv¤c ‘wqKZv, মুক্তধারা, ঢাকা : ১৯৮০, পৃ.৯

১৭। লতা হোসেন, cv¸ ³, পৃ.১৯

১৮। সুজিত সেন, cv¸ ³, পৃ.১৪২

১৯। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, cv¸ ³, পৃ.১৪২

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার একটি প্রত্যক্ষ উৎস হলেও ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা সমার্থক নয়। সাম্প্রদায়িকতা একটি মনোভঙ্গি, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি। মনোবিদের কাছে সাম্প্রদায়িকতা এক ধরণের চেতনা, সম্প্রদায় চেতনা। প্রচলিত মার্কসবাদী দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতা হলো 'ভ্রান্ত- চেতনা'। মার্কসবাদীরা মনে করেন, সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটাকে শুধু হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ হিসেবে আজকের পটভূমিতে অন্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করাটা ঠিক হবে না। জাতপাতের দ্বন্দ্ব, অস্পৃশতার অমানবিকতা, ধর্মতান্ত্রিক মৌলবাদের দাপট, ভাষাভিত্তিক বিরোধ, জনগোষ্ঠিগত সংঘাত, বিছিন্নতার জটিলতা, পেটি বুর্জোয়া সুলভ বিপদজনক মানুষতার প্রকোপ, অসুস্থ্য সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ আঞ্চলিকতাবাদী/ বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক, আঞ্চলিক বুর্জোয়ার সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়ার সংঘাত, সংরক্ষণমূলক সংস্কারবাদের অনিশ্চিত বিস্তার, সংস্কৃতায়নের ধারণা, লেবার অ্যারিসটোক্রেসি'র বদপ্রবণতা-ইত্যকার উপাদানগুলোও সাম্প্রদায়িকতার অর্ন্তভুক্ত। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়ের (অ্যালিয়েনেশন) মনোভাবই সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকে ভীষণ গর্জনে জাগিয়ে তুলেছে। আসলে মানুষকে বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্যুত করে তাকে কোন সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে সংজ্ঞায়িত করার মানষিকতাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা।[২০] শেণি বিভক্তির উপসংহার সুচারুভাবে চিহ্নিত করা না গেলে যে সকল রোমান্টিক ভ্রান্তি বিলাস সমাজ দেহকে আচ্ছন্ন করে সাম্প্রদায়িকতা সে সবের অন্যতম কারণ।[২১]

ঐতিহাসিকভাবে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা হলো, মধ্য শ্রেণি বা বুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তি ও নানা সুযোগ সুবিধাকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ।

ধর্মীয় মৌলবাদ এদিক দিয়ে স্বতন্ত্র জিনিস। এ কারণে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে একাধিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের যে ব্যাপার অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা যায় সেটা মৌলবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় না। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে অর্থাৎ বিশেষ অবস্থায় ব্যতিক্রম হিসেবে সেটা দেখা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মৌলবাদের এ পার্থক্যের কারণ মৌলবাদ একই শ্রেণিভুক্ত একাধিক সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার কোন দৃষ্টিভঙ্গি অথবা দর্শন নয়। এটা হলো শোষিত, নির্যাতিত ও শাসিত শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষক নির্যাতক ও শাসক শ্রেণির একটি আদর্শগত ও রাজনৈতিক হাতিয়ার। তাই সাম্প্রদায়িকতা যেখানে পরোক্ষভাবে শোষিত শ্রেণির বিরুদ্ধে আঘাত

২০। সুজিত সেন, CV¸ 3, পৃ.৮০
২১। CV¸ 3, পৃ.৮০

Dhaka University Institutional Repository

করে সেখানে মৌলবাদে সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে সর্বহারা শ্রেণিসহ সকল শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে আদর্শগত ও শ্রেণিগত দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থেকে সরাসরিভাবেই শেষোক্ত শ্রেণিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত থাকে। মৌলবাদের এ চারিত্রিক গুণের কারণে তা সরাসরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্মদান করে না অথবা সে উদ্দেশ্যে মূলত নিযুক্ত থাকে না। তার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে এ ক্ষেত্রে হলো শ্রমিক কৃষকসহ সবধরণের শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে শ্রেণি সংগ্রামে নিযুক্ত থাকা এবং ধর্মের জিগীর তুলে শোষিত ও নির্যাতিত শ্রেণির লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও বিপদগামী করা। [২২]

সাম্প্রদায়িকতাকে বুঝতে হলে, বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতার সর্ম্পক আলোচনা করা দরকার। সাধারণ অর্থে বিচ্ছিন্নতা হলো এক থেকে অন্যের আলাদা হয়ে যাওয়া, তা একটি বস্তু থেকে আলাদা হওয়া বোঝাতে পারে, বোঝাতে পারে এক চেতনা থেকে ভিন্ন কোন চেতনার অবস্থান্তর আর সাম্প্রদায়িকতা হলো এক ধারার অনুসারীদের অন্য ধারার অনুসারীদের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্ষতিসাধন করার জন্য মানষিক প্রস্তুতিসহ বাস্তবে তার রূপদান। সাম্প্রদায়িকতা প্রথমে চেতনাতে সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরিনামে তা চেতনা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাস্তব রূপ নেয় কার্যকলাপের মধ্যে। দু'এর উৎপত্তি অবশ্য বাস্তব অবস্থা থেকে, জড়িতও থাকতে পারে ওতপ্রোতভাবে। তবে প্রথমেই বিচ্ছিন্নতার ভাব না এলে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিতে পারে না। পার্থক্য এ যে, বিচ্ছিন্নতা যেখানে কোন বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে কেবল চেতনার স্তরেই সীমিত থাকতে পারে, সাম্প্রদায়িকতা তা পারে না, বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয়, না হলে সাম্প্রদায়িকতা বলা যায় না। বড় জোর চেতনার বিচ্ছিন্নতা বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলা যেতে পারে। সুতরাং বিচ্ছিন্নতা মূলত একটি মনোগত ব্যাপার, সাম্প্রদায়িকতা বর্হিগত বিষয়।

সাম্প্রদায়িকতায় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকে ঘৃনা ও বিদ্বেষ, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সামাজিক বঞ্চণার জ্বালা থেকে তা হয় উৎসারিত। বিচ্ছিন্নতায় এগুলোর সব কিছুই বর্তমান থাকতে পারে, আবার এর কোন কিছুই নাও থাকতে পারে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে, বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে সাতচল্লিশে উপ-মহাদেশ ভাগ হয় তাতে জড়িত ছিল উপরের সবগুলো কারণ।

সাম্প্রদায়িকতার জন্য ধর্মই একমাত্র কারণ নয়, তবে গোষ্ঠি, ভাষা, বর্ণ বা জাতিগত বিভেদ ও এর জন্ম দিতে পারে স্বচ্ছন্দে। বিচ্ছিন্নতার জন্য এ সবের কোনই প্রয়োজন নাও হতে পারে। অর্থাৎ এটি হতে পারে একেবারেই মানষিক একটি ব্যাপার, যেমন- একই ব্যক্তি এক সময়ে ঈশ্বরবাদী থেকে ক্রমে নিরীশ্বরবাদীতে রূপান্তরিত হয়। এ তার একান্তভাবেই মনোগত বিষয়। অথচ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়

২২। বদরুদ্দিন উমর, evsjv‡'‡k a‡gi ivR‰bwZK e¨envi, চিরায়ত প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৮৯, পৃ.৪৯

Dhaka University Institutional Repository

আগের মানুষটি থেকে পরের মানুষটি। এ পরিবর্তনের সাথে বহিঃবিশ্বের সংযোগ থাকতে পারে, সংঘাতও হতে পারে পরস্পরের মধ্যে, কিন্তু তার কোন বহিঃপ্রকাশ নাও ঘটতে পারে বা ঘটলেও কোন বাহ্যিক সংঘর্ষের রূপ নাও দিতে পারে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংঘর্ষের মাধ্যমে।[২৩]

সুতরাং বলা যায় সাম্প্রদায়িকতা হলো এক মানষিক অবস্থা যা সব সময় অবচেতন মনের গভীরে লুকিয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার আকষ্মিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তা কেবল অপর ধর্মের বেলার প্রযোজ্য নয়। একই ধর্মের বেলায়ও প্রযোজ্য, যদি কেহ মনে করে যে, ঐ ধর্মী মানুষটির চেতনা তার সাথে এক নয়, তবে বিষয়টি চেতনাগত বলে সুযোগ না পেলে প্রকাশিত নাও হতে পারে। সুযোগটি আসে সাধারণত রাজনীতির পথে। অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সাম্প্রদায়িকতার একটি প্রধান উৎস। এর তলদেশে অর্থনৈতিক ফায়দা লোটার বিষয়টি থাকলেও রাজনীতি ইন্ধন হিসেবে না এলে তা প্রকাশ পায় খুব কম।[২৪] আর তাই সাম্প্রদায়িকতা নিঃসন্দেহে বিপদজনক, কারণ তার সাথে রাজনীতির সম্পর্ক হলো প্রত্যক্ষ।

সাম্প্রদায়িকতা একটি রাজনৈতিক পরিভাষা এবং বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যান্ত জটিল একটি রাজনীতি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই সাম্প্রদায়িক চেতনার লালন ও বিকাশ। অতএব বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার আলোচনা কোনভাবেই কোন ধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়। বরঞ্চ এটি একটি সামাজিক, মানষিক এবং রাজনৈতিক আলোচনা। মতাদর্শ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা হলো কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণির রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি দিক। সাম্প্রদায়িকতা বলতে অতীতে সাধারণত হিন্দু মুসলিম বিরোধকে বুঝানো হতো, এ দু'সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ধর্মের প্রতি, উভয়ের আচার-আচারণ ও জীবনবোধের প্রতি এবং দু'টোর ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি সহজাত ঘৃনা ও বিদ্বেষকেই সাম্প্রদায়িকতা বলে চিহ্নিত করা হতো। এ ঘৃনা বিদ্বেষের ফলে উভয়ের মনের মধ্যে পরস্পরের ক্ষতি করার যে মানষিকতা তৈরী হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে একের দ্বারা অন্যের যে ক্ষতি সাধিত হয় সেটিও সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তবে বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতাকে আরো অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবেই দেখা হয়ে থাকে। এটিকে আজ কেবল হিন্দু মুসলিম ঘৃনা বিদ্বেষ আর ক্ষতিসাধনের মানষিকতার মধ্যে আবদ্ধ করে দেখা হয়

২৩। সুজিত সেন, C\/¸ ³, পৃ.১৪১

২৪। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, C\/¸ ³, পৃ.২৯০

Dhaka University Institutional Repository

না। বর্তমানে জাতীয় চেতনার বিরুদ্ধে যে কোন প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীলতা, মৌলবাদী মনোভাব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বৈরিতা, নারী স্বাধীনতার প্রতি বিরোধিতা, প্রগতির প্রতি সকল প্রকারের প্রতিবন্ধকতা, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস, সুস্থ্য গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি বিরোধিতা করার সর্বপ্রকার মনোভাব ইত্যাদিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq

wØZxq cwi‡”Q‘

agxq mnYkxjZv I mv¤ú‘wqK m¤úxwZ

সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম মানব সমাজের সঙ্গে সর্বযুগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসারে এমন কোন মানব সমাজের অস্তিত্ব বিরল যেখানে ধর্মের প্রভাব ছিল না। প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠির জীবনধারায় কোন না কোন ধর্মের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মানুষের অন্য সকল আচার ব্যবস্থা হতে ধর্মীয় আচার ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির। অন্যান্য আচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণীত। কিন্তু ধর্মীয় আচার-ব্যবহার, লক্ষ্য ও কর্মসূচী তর্কাতীত এবং অতীন্দ্রিয় আদর্শ দ্বারা চালিত। সকল সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের প্রকৃতি ও অর্থ এক না হলেও সকল সমাজে ধর্ম বিদ্যমান। এ সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী মর্ডাক (Morduck) এর অভিমত হলো, সকল সমাজই কোন না কোন পদ্ধতিতে অতি প্রাকৃত শক্তিকে তোষামোদ করে এবং নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে। সকল সমাজে নিজের বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা আছে এবং ছিল। এ সকল বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণাকে ধর্ম আখ্যায়িত করা যায়।[২৫]

ধর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যায়, ধর্ম শব্দের উৎপত্তি ধৃ-ধাতু থেকে। এ অর্থে যা মানুষকে ধারণ করে তাই হলো ধর্ম। তবে ব্যাপক অর্থে ধর্মের ধারণাটি অত্যন্ত জটিল। কেননা, বাস্তবে রূপ ও প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের। কোন ধর্ম একেশ্বরবাদী ও কোনটি বহু ইশ্বরবাদী আবার কোনটিতে ঈশ্বরের ধারণা অনুপস্থিত। আবার কোন ধর্মে সবার অবাধ অন্তর্ভুক্তি স্বীকার্য, কোনটা আবার নিতান্তই ব্যক্তিগত। ফলে ধর্মের সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা দেয়া কষ্টসাধ্য।

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ণ ও নিমকফের মতে, “ধর্মের সংজ্ঞা সকল ধর্মের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। কেবল আপন ধর্মের উপাদান নিয়ে নির্ধারণ করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাদের কথায়, অতিমানবিক শক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির অপর নাম ধর্ম”।[২৬] অধ্যাপক এমিল

২৫। আহমদ শরীফ, mgvR ms¯‹wZi ¯‹i|c, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা : ২০১২, পৃ.৯০

২৬। ফারহানা হক (সম্পাদনায় ড. মো.নুরুল ইসলাম),স্বাধীন evsjv‡`‡ki Af¨`‡qi BwZnvm, সমাজ কল্যাণ ও

Dhaka University Institutional Repository

ডুর্খাইম এর মতে, Religion is a unified system of beliefs and practices relative to scared thins, that is to say, things set apart and forbidden. তিনি আরো বলেন, "প্রত্যেক ধর্মেই পূণ্য এবং পাপের প্রভেদ করা হয়। পূন্য অর্থ পবিত্র। ধর্ম হলো পবিত্র বিশ্বাস ও আচরণের একীবদ্ধ নীতি যা অন্যকিছু হতে পৃথকীকৃত এবং যা সকলের জন্য নয়; এ বিশ্বাস ও আচরণ সে (ধর্মে) বিশ্বাসী ও আচরণশীল মানুষদের একটি নৈতিক সমষ্টিতে পরিণত করে। এটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচিত হয়"।[২৭]

সামনার ও কেলারের মতে, "Religion in history from the earliest to very recent days has not been a matter of morality at all but of rites, ritul observance and ceremony."[২৮] সমাজবিজ্ঞানে Religion শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। বিংশ শতাব্দীর নব্বই এর দশকে প্রকাশিত সমাজবিজ্ঞানের একটি গ্রন্থে ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়, "Religion has been defined as those institutionalized system of beliefs, symbols, values and practices that provide groups of men with solutions of their questions of ultimate being."[২৯]

আর্নল্ড গ্রীণ এর মতে,"ধর্ম হচ্ছে একটি বিশ্বাস-ব্যবস্থা এবং প্রতিকী প্রথা-পদ্ধতি ও বস্তুর সাথে সম্পর্কিত বিষয়। আর এসব আস্থা বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে জ্ঞানের ভূমিকা নেই বললেই চলে"।[৩০] ম্যালিনোস্কী-এর মতে,"ধর্মের মধ্যে রয়েছে একদিকে একটি

গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : ২০১৪, পৃ.৫৯

২৭। Durkheim, *The elementary forms of religious life.* English trans, London : 1947, P.47

২৮। Sumner and keller. *Folkways : A study of sociological imporce of usage, manners, customs and morals*, Quated in Samuel Koening. Sociology, : Boston : 1906, P.109

২৯। C.Y Glock and Rodney Stork, *Religion and society in tension*, London : 1991, P.17

৩০। ফারহানা হক, c৷¸ ³, পৃ.৬০

Dhaka University Institutional Repository

কর্মপ্রণালী ও বিশ্বাস ব্যবস্থা আর অন্যদিকে আছে সমাজতাত্ত্বিক প্রপঞ্চ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা" ।[৩১]

তাই ধর্ম হচ্ছে আধ্যাত্মিক শান্তি অন্বেষার একটি নিবচ্ছিন্ন প্রয়াস, যার মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবনের বিপদ-আপদ ও বিফলতা অতিক্রম করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে গিলিন এবং গিলিনের মতামত প্রাণিধানযোগ্য। তাদের মতে, ধর্মের সামাজিক ক্ষেত্রের ভেতর অনুভূতিসূচক বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত, যা একটি সামাজিক গোষ্ঠির মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এ ধরণের বিশ্বাস একদিকে যেমন অতিপ্রকৃত সত্ত্বা সংক্রান্ত আর অন্যদিকে একটি প্রকাশ্য আচরণ, বস্তুগত বিষয় এবং প্রতীক কেন্দ্রিক যে সবের সাথে রয়েছে এরূপ বিশ্বাস ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।[৩২] পরিশেষে বলা যায় যে, ধর্ম হচ্ছে এমন এক ধরণের পবিত্র বিশ্বাস ও আস্থা যার দ্বারা মানুষ অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার জীবনের চরম সমস্যাবলি মোকাবেলায় সহায়তা পাবে বলে ধারণা পোষণ করে । ধর্মের সঙ্গে মানুষের হৃদয় ও বিশ্বাসের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি মানুষ বিশেষ সংবেদনশীল। এ কারণে নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি প্রকাশ করে থাকে।

ev½vjxi wewfbœ a‡g© agx©q mnYkxjZv

আগে মানুষ গোত্র প্রধানের নেতৃত্বে সর্দারতন্ত্রের আওতায় যৌথ জীবনযাপন করত। বৈদ্যিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাংলাদেশে আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অনুসৃত হত। পরবর্তীতে এ বাংলা ভূ-ভাগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মমতের আগমন ঘটে। এ পর্যায়ে বাঙ্গালীর ধর্মীয় সহণশীলতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মমত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো :

1| Bmjvg ag© I agx©q mnYkxjZv : বখতিয়ার খলজির বাংলা জয়ের পর এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও তারও আগে আরব্য বণিকরা ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে বাংলায় এসেছিল বলে মনে করা হয়। মুসলিম শাসকদের পাশাপাশি পীর, সূফী, আওলিয়াদের প্রভাবে এদেশে অর্থাৎ বাংলায় ইসলাম সম্প্রসারিত হয়।

৩১। Malinoueski, *Magic, Science and Religion and other Eassays*, N.C. University of North Cardian press.Chapel Hill, USA : 1948, P.24

৩২। ফারহানা হক, c~¸³, পৃ.৬১

Dhaka University Institutional Repository

2| wn›‘ag I agxq mnYkxjZv : নানা রূপান্তর গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর অন্যতম প্রধান ধর্ম হিন্দুধর্ম গড়ে উঠেছিল। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের ধর্ম গড়ে উঠেছিল প্রধানত কেঠম সমাজ থেকে আগত সংস্কার, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদির একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। গুপ্ত শাসনামল থেকে মুসলমান শাসনামল পর্যন্ত বাংলার হিন্দু সমাজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নানা অনার্য উপকরণের সাথে এ সমাজে এসেছিল বৈদিক পেঠেরানিক, বৈষ্ণব, শৈবশক্তি ও পৌর উপকরণ। একদিকে লৌকিক দেববেদী অন্যদিকে ব্রাক্ষ্য শাস্ত্রীমত এ দুয়ের সমন্বয় ও মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল হিন্দু ধর্ম।

3| ˆew‘K ag I agxq mnYkxjZv : প্রায় ২৫০০ বছর আগে আমাদের এ অঞ্চলে বৈদিক ধর্ম বাংলা ভূ-ভাগের পশ্চিম প্রান্ত স্পর্শ করে। এ বৈদিক ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রভাব আমাদের সমাজে কমবেশি বিদ্যমান।

4| ˆRb ag I agxq mnYkxjZv : খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকের পূর্বে বাংলাদেশে বেদজ্ঞ ব্রাক্ষণ ধর্মের কিছু যাতায়াত থাকলেও বৈদিক ধর্ম তেমন প্রসার লাভ করেনি। এদেশে জৈন ধর্মের প্রসার ঘটে প্রথম, তারপর বৌদ্ধ ধর্ম এবং পরে গুপ্ত যুগে ব্রাক্ষণ ধর্ম।

5| evþag I agxq mnYkxjZv : মধ্যযুগের হিন্দু জমিদার ভুস্বামী ও রাজস্ব বিভাগের প্রভাবশালী করণিক কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্ম নিজেকে রক্ষা করেছে। মেলবন্ধনের মাধ্যমে হিন্দু সমাজ সংকুচিত না হয়ে বরং বিস্তার লাভ করে। উনিশ শতকের ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার মোকাবেলা করতে গিয়ে সংস্কার করা উপনিষদের রূপান্তর ঘটালেন রাজা রামমোহন রায়। সংরক্ষণবাদীদের অপেক্ষা সংস্কারবাদীরাই হিন্দু সংস্কৃতিকে বেশি সমৃদ্ধ করেছে।

6| bv_ag I agxq mnYkxjZv : বাংলার আরেকটি জনপ্রিয় ধর্মের নাম 'নাথধর্ম'। এগারো শতকের শেষে ও বারো শতকের প্রথমে এ ধর্মের সূচনা হয়। এটি শৈবধর্মেরই প্রশাখা। এর ওপর বৌদ্ধ ও তন্ত্র ধর্মের প্রভাব ছিল। নাথদের আরাধ্য দেবতা শিব। কায়া সাধনই নাথ ধর্মাবলম্বী গুরুদের উপাধি হিসেবে 'নাথ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর সেজন্যই এ ধর্মের নাম নাথধর্ম। নাথ ধর্ম এক সময়ে সুদূর পেশওয়ার থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের নাথধর্মীরা অধিকাংশই জাতিতে যুগী ও তাদের জীবিকা কাপড় বোনা।

7| ˆeòe ag I agxq mnYkxjZv : গুপ্ত আমলে সমাজের উঁচু স্তরে বৈদ্যিক ধর্ম প্রাধান্য পেলেও সাধারণভাবে পৌরাণিক ধর্মের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। বৈদ্যিক যাগযজ্ঞের পরিবর্তে বাংলাদেশে পূজার আকর্ষণ মানুষকে বেশি করে টানে। পূজার আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে উপাস্য ও উপাসকদের মধ্যে একই ব্যক্তিগত যোগ স্থাপন সহজেই গড়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

8| e¨þY¨ a‡gi Abc‡ek : পাঁচ ছয় শতকে গুপ্ত যুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ঘটে। আর্যাবর্তে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগে বহিরাগত ব্রাহ্মণরা সদলবলে বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। দশ শতকের একটি তাম্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, মাত্র শ্রীহট্টেই (বর্তমান সিলেট) এক সাথে ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে ভূমিদার করা হয়েছিল। পৌরিহিত্যে, শাস্ত্রের ব্যাখায়, রাজার বংশ নির্ণয়ে (চন্দ্র না সূর্য বংশ), ভাগ্য গণনায়, উৎসবে, পূজাপার্বণ্যে দুর্গতি নিবারক যাগযজ্ঞে, প্রশাসনে, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণরা নিজেদের অপরিহার্য করে তোলে। চারবর্ণের দু বর্ণ-ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। এখানে শুধু ব্রাহ্মণ ও শুদ্রদের পদচারণা।

9| %PZb¨ a‡gi c‡ek : মধ্যযুগে বিজাতি-বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মীর ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ব্রাহ্মণ্য আদলে সমাজের নির্জিত শ্রেণির মধ্যে যে চেতনা, চাঞ্চল্য ও দ্রোহ দেখা দিল, উত্তর-ভারতীয় আদলে ইসলামী সূফীতত্ত্বের অনুসরণে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের দেশ বাংলায় চৈতণ্যদেবের প্রেম ধর্ম প্রভাবের মাধ্যমে তা রূপ পেল। ঐ বৈরাগ্যপ্রবণ প্রেমবাদ সেদিন ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙ্গন এবং ইসলামের প্রসার রোধ করেছিল বটে, কিন্তু তা পরিনামে বাঙ্গালীর পক্ষে কল্যাণকর হয় নি।

10| †eŠ× ag I ‘kb : সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ (আনুমানিক ৫৬৩-৫৮৩ খ্রি.পু.) নেপালের লুম্বিনী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা লক্ষ্য করে তিনি সংসার ত্যাগী যোগী হয়ে নানা দেশ ও জনপদ পরিদর্শন করেন। আলেকজান্ডার, মেগাস্থিনিস, বার্দেসানেস, হিউয়েন সাঙ, জালালুদ্দিন, আলবেরুনি, মার্কোপলো, ইবনে বতুতা প্রভৃতি সবারই দৃষ্টি আকর্ষন করেছে যোগীরা। নেপাল ও তিব্বত আজো গুহ্যসাধকদের শিক্ষা এবং প্রেরণার কেন্দ্র। এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারই বহিরাগত ধর্মমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে এবং কালিক অনুশীলনে ও বহু মননের পরিচর্যায় সুক্ষ্ম ও সুমার্জিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে এনেছে ঔজ্জ্বল্য। [৩৩]

কাজেই বলা যায় যে, বাঙ্গালী জাতি বিভিন্ন ধর্মের লোকের সমন্বয়ে সৃষ্ট এক জাতি। আবহমান কাল থেকে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সাথে সহণশীলতার সাথে এ জাতি বসবাস করে আসছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, শিখ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের লোকের ধর্মীয় আচার-আচরণ আজ এ জাতির একটি নিজস্ব সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় সহণশীলতা হলো নিজ ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও অন্য ধর্মকে মেনে নেয়ার মানষিকতা। ধর্ম ও সংস্কৃতি পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অর্থাৎ ধর্ম একদিকে যেমন সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে

৩৩। ফারহানা হক, C¨, ³ , পৃ.৬৩-৬৫

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি সংস্কৃতিও ধর্মকে প্রভাবিত করে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। বাঙ্গালীর মনের কেন্দ্রে আছে ধর্ম এবং তা অস্বীকার করার উপায় নেই। হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের জন্যই একথা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে এ ভূখণ্ড হিন্দু মুসলমান বা বৌদ্ধ ছিল না। ছিল অনার্য, জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধ এবং তারপর বৈদিক প্যাগান ধর্মের আবির্ভাব হয়। নীহাররঞ্জন রায় তার বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, প্রাক-আর্য নানা কৌম, ধর্ম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ব্রাক্ষণ্য ধর্মের নানা মত, পথ ও অনুষ্ঠান, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, প্রভৃতি নানা আদর্শ ও আচার বাঙ্গালী জীবনে প্রচলিত ছিল।

সমন্বয় এবং সহণশীলতার যে চর্চা যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালী করে এসেছে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন কারণে তার মধ্যে ছেদ ঘটানোর প্রচেষ্টাও হয়েছে। শশাঙ্ক যখন বোধি বৃক্ষ ধ্বংস করেন এবং বৌদ্ধ নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেন, সেন আমলে ধর্মীয় গোঁড়ামি, জালালুদ্দিন যদুসহ কোনো কোনো মুসলিম শাসকের বিভিন্ন সময়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন, হিন্দু জমিদারদের মুসলিম প্রজাদের ওপর নির্যাতন, ব্রিটিশদের ভাগ কর শাসন কর নীতির প্রয়োগ, দ্বি-জাতিতত্ত্ব এবং ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় বিভাজনের মতো ঘটনা বাঙ্গালীর জীবন ও চিন্তায় সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাধাঁর সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বাঙ্গালী বারবার রুখে দিয়েছে এ অপচেষ্টা এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, উদারনৈতিকতা, সহণশীলতার প্রমাণ দিয়ে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালী ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা। সুতরাং বলা যায়, বাঙ্গালী জাতি প্রাচীনকালে আর্য, অনার্য, জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধ, প্যাগান ইত্যাদি ধর্মের সাথে যেভাবে সমন্বয় রেখে বসবাস করত, ঠিক তেমনি বর্তমানেও হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও শিখ ধর্মের সাথে সমন্বয় রেখে বসবাস করছে।

agxq mnYkxjZvi KviY

সাংস্কৃতিক সমন্বয়বাদিতা ও ধর্মীয় সহণশীলতার বিষয়টি একে অপরের পরিপূরক। ধর্ম ও সংস্কৃতি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বাঙ্গালীর ধর্মীয় সহণশীলতা যেসব কারণে হয় তা হলো:-

১. বাঙ্গালীর প্রাণে কেন্দ্রে আছে ধর্ম এবং তা অস্বীকার করার উপায় নেই। হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের জন্যই একথা প্রযোজ্য।[৩৪]

২. প্রাচীনকালে এ ভূখণ্ডে হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল না। ছিল অনার্য, জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধ এবং তারপর বৈদিক প্যাগান ধর্মের আবির্ভাব হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন, প্রাক-আর্য নানা রকম ধর্ম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা মত, পথ ও অনুষ্ঠান, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রভৃতি নানা আদর্শ ও আচার বাঙ্গালী জীবনে প্রচলিত ছিল।

৩. এখনও এদেশের মাজারের প্রতি হিন্দু-মুসলমানদের অগাধ বিশ্বাস। কবজ, তাবিজ, তন্ত্রমন্ত্র সব বাঙ্গালীর কম বেশি আস্থা আছে। হিন্দু মুসলমানরা সবাই সবার বিয়ে বা অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদ, আল্পনা, এমনকি পহেলা বৈশাখের মতো অনুষ্ঠানেও একত্রে আল্পনা ও অনুষ্ঠান পালন করে ধর্মীয় সহণশীলতার কারণে।

৪. ধর্ম নিয়ে বিবাদ– বিরোধও ছিল কিন্তু যা ছিল বৈশিষ্ট্য, তাহলো, রাজা বা রাজবংশের ব্যক্তিগত ধর্ম যাই হোকনা কেন তাতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ সংস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অন্তত পান পর্ব পর্যন্ত সে আদর্শ অক্ষুণ্ন। সেন যুগে বৈদিক ধর্মই শক্তিশালী হয়ে ওঠে রাজকীয় পৃষ্টপোষকতায় যাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মও বলা হয়।[৩৫]

৫. তাছাড়া অন্যান্য ধর্মমত যেমন বৈষ্ণব, সৌর, জৈব প্রভৃতির বিকাশ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যও ধর্মের আধিক্য হলেও সকল ধর্মে এর প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয়নি। অন্তত সাধারণ স্তরে। আব্দুল করিম বলেছেন, "বাংলায় শুধু স্থানীয় উপাদানই ইসলামে প্রবেশ করেনি, স্থানীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকেও ইসলাম গভীরভাবে প্রকাশিত করেছিল। এনামুলকে বলেছেন, "বঙ্গে ইসলামের স্থায়িত্ব প্রাপ্তির ইতিহাস প্রধানত এ মৌলিক ইসলামেরই ইতিহাস"।[৩৬]

৩৪। রমাকান্ত চক্রবর্তী, evsMvjxi ag, mgvR I ms¯'wZ, পুস্তক বিপনী, কলকাতা : ২০০২, পৃ.২২
৩৫। হাবিবুল্লাহ, আবু মহামেদ, evsjvi gmjgvb mgvR, ms¯'wZ, B wZnvm, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা : ১৯৭৪, পৃ.১০
৩৬। ফারহানা হক, cv¸³, পৃ.৬২

Dhaka University Institutional Repository

৬. সূফীবাদের প্রভাবের কথা সবাই উল্লেখ করেছেন। যার ফলে এ দেশে সাধারণ মানুষ ইসলাম যেভাবে পালন করেন বহু ইসলামী দেশে সেভাবে পালিত হয় না। সবকিছু মিলিয়ে এদেশের ইসলাম মৌলিক ইসলাম।

৭. আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছেন, বাঙ্গালী চরিত্র মোটামোটি ধর্ম নিরপেক্ষ। বাঙ্গালী মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে পাকিস্তানীদের চেয়েও বেশি ধার্মিক কিন্তু তারা ধর্মান্ধ নয়। বাস্তবে বাংলাদেশের সমাজ অত্যন্ত উদার, সর্বগ্রাহী এবং এক হিসেবে সার্বজনীন।

৮. ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রেও এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যাপক লেনদেন করে আসছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শ সুলতানী আমলে বাংলায় প্রতিষ্ঠা পায় এবং পরবর্তীতে আরো শক্তি সঞ্চয় করে।

৯. বিভিন্ন ধর্মের মিলনস্থান বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব এবং সেসব অনুষ্ঠান, রীতিনীতি প্রবাহিত হয়েছে এ দেশে অনার্য সংস্কৃতির দ্বারা। বাঙ্গালী মানষ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধের চিন্তা-চেতনা এক বা পরস্পর প্রভাবিত বা প্রবিষ্ট।[৩৭]

সুতরাং মুসলমান এবং হিন্দু দু'টি আলাদা সম্প্রদায় হলেও প্রাক ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তান ঔপনিবেশিক আমলে পাশাপাশি অবস্থান করেছে। ধর্মবোধ এবং ধর্মীয় চেতনা তাদের কখনোই বিপরীতমুখী অভ্যুথান সৃষ্টি করতে পারেনি। হিন্দু সমাজ সংস্কারকরা শুধু নিজেদের সামাজিক অসঙ্গতি ও কুসংস্কারের বিপক্ষে আন্দোলন করেছিলেন। বাঙ্গালী পরিচয়টাই ছিল হিন্দু ও মুসলমানের প্রধান পরিচয়। সত্যিকথা বলতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতাই এ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মুসলমানদের একই সূত্রে গেঁথে ছিল।

৩৭। প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস, ¯^axb evsjv‡`‡ki Af¨'`‡qi BwZnvm, গ্রাজুয়েট পাবলিকেশনস্, ঢাকা : ২০০১,পৃ.২৫

ZZxq cwi‡"Q'

ms¯'wZi mgšqew'Zv I mv¤ú'wqK m¤úxwZ

মানুষের সামাজিক পরিচিতি হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো নিরন্তর সংস্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত মানষ গুণ। যে কোন সমাজে প্রচলিত সামগ্রিক সামাজিক আচরণ ও কার্যকলাপের মার্জিত রূপই সংস্কৃতি। অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, বিশ্বাস, শিল্পকলা, অভ্যাস, এসকল উপাদানের মার্জিত বা সমাজ অনুমোদিত রূপই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি সামাজিক জীবনবোধ থেকে উদ্ভূত একটি সামাজিক প্রপঞ্চ। মানুষ একত্রে বসবাসের ফলেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। Cooley, Angel এবং Corr বলেন, "Culture is the sum total of transmittable result of living together." অর্থাৎ একত্রে বাস করার ফলশ্রুতি যা বংশ পরস্পরা উৎকীর্ণ করা যায়। তাকেই সংস্কৃতি বলা যায়।[৩৮]

C.G. Worth বলেন, "Culture consist in instruments constituted by man to assist him in satisfying his wants."[৩৯]

অন্যদিকে, Anderson এবং Parker বলেন, "Culture in the total content of physion social, bio-social and psychosocial universes man has produced and socially created mechanism through which these social products operate."[৪০]

যে কোন সমাজের সার্বিক চিত্র সংস্কৃতির মাধ্যমে ফুটে ওঠে। প্রাচীনকাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল যুগের এবং সকল স্থানের মানব সমাজেরই স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতি মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যা তাকে বিশেষ মর্যাদায় আসীন করে। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ম্যালিনাউস্কি বলেছেন,"Culture is the head work of man and the medium through which he achives his ends."[৪১]

৩৮। নাজমুল করিম, mgvR weÁvb mgx¶b, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা : ১৯৮৪, পৃ.৪৯
৩৯। Hans Raj, *Introduction to sociology,Chand and co.ltd,* Delhi : 1983, P.2
৪০। ফারহানা হক, cv¸³, পৃ.৪২
৪১। B.Malnowski, *Scientific theory of culture and other Essays,* chapel hill, N.C univesity of North cardian press,USA : 1948, P.142

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো মানুষের প্রধান কর্ম এবং একই সাথেই এটা তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক মাধ্যম। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিসের অভিমত অনুসারে সংস্কৃতি হলো প্রাণী হিসেবে মানুষের অসামান্যতার ভিত্তি। সংস্কৃতি মানুষের অস্তিত্ব, সমাজ জীবন, চিন্তাচেতনা, আচার-আচরণ সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে। সংস্কৃতির প্রভাবেই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে। মানুষ জন্মসূত্রে সংস্কৃতির অধিকারী হয় না বরং তাকে এটা অর্জন করতে হয়। কোন জাতির অগ্রতির প্রধান মাপকাঠি হলো সংস্কৃতি এবং এর মাধ্যমেই সে বিশ্ব দরবারে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সকল প্রানীর কিছু জৈবিক মৌল চাহিদা থাকে যা তার জীবন রক্ষার জন্য অপরিহার্য। খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, বংশ বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে তার বংশগত বৈশিষ্ট্য ও সহজাত প্রবৃত্তির পূরণ করে তার বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে। প্রয়োজন পূরণের তাগিদে মানুষ তার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উদ্ভাবন করে বিভিন্ন উপায়। এ প্রক্রিয়াটি তার জন্মসূত্রে গড়ে ওঠে না এবং এর পীছনে থাকে সংশিষ্ট সংস্কৃতির কার্যকারী প্রভাব। মানব সংস্কৃতির দুটি দিক বিদ্যমান যথা : বাসগৃহ ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, বইপুস্তক, চিত্রকর্ম ইত্যাদি সংস্কৃতির পার্থিবরুপ। অপরদিকে মানুষের চিন্তা, ধ্যান- ধারণা, সামাজিক প্রথা, কলাকৌশল, মূল্যবোধ, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইনকানুন, ধর্ম ইত্যাদি সংস্কৃতির অপার্থিব দিক।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক ব্যবহৃত একটি প্রত্যয় হলো সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া কষ্টকর। কেননা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Colere থেকে। এ Colere শব্দের অর্থ কর্ষণ করা। উৎপত্তিগত দিক হতে সংস্কৃতি বলতে বুঝায় সংস্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়।[৪২]

অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, মানুষের শিক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-প্রথা, রীতিনীতি আদর্শ মূল্যবোধ ইত্যাদির মার্জিত রূপই সংস্কৃতি। অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্ট সবকিছুই মিলেই সংস্কৃতি। জোনস্ বলেন, Culture is the sum of man's creation.

৪২। Black well, *social problems and social planning*, Oxford university press, USA : 2000, P. 19

সংস্কৃতির সংজ্ঞায় অধ্যাপক ম্যকেঞ্জি বলেছেন, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয় বহণ করে, শুধু সমাজ জীবনের প্রস্তুতি নয় ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো মানব জীবনের চরম লক্ষ্য, মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশ। আবার, সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে ম্যাথু আরনল্ড তার গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, Culture, which is the study of perfection leads us to conceive true human perfection, as a harmonious perfection, developing all sides of our society.

সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী টেইলর (Tylor) বলেছেন, Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. সংস্কৃতি হলো এমন এক জটিল সামগ্রিক সত্ত্বা, যার ভেতর রয়েছে জ্ঞান, আস্থা, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন, প্রথা, পদ্ধতি এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত অন্য সকল দক্ষতা ও অভ্যাস।[৪৩]

সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যালিনোস্কি বলেন, সংস্কৃতি হলো মানুষের কর্মের সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে সে তার লক্ষ্য পূরণ করে। দার্শনিক জন ডিউই John Dewey সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন, সংস্কৃতি বলতে এমন একটি বিষয়কে নির্দেশ করে যা অনুশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা পেয়েছে, এটি অপরিপক্ক ও অশোধিতের বিপরীত।[৪৪] সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট "সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন, মানুষের আচরণের ফল, জটিল উপায় ও উদ্দেশ্য যা তার বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা পূরণ করে, এটাই নৃবিজ্ঞানীরা সংস্কৃতি নামে অভিহিত করেছেন"।[৪৫] সংস্কৃতি সম্পর্কে Margaret Mead বলেন, "A culture may be said to be just as much the expression, their mode of human psychodynamic adjustment, as it is a condition for the grooming of successive generations of individuals in this mode".[৪৬] নৃবিজ্ঞানী Hobel সংস্কৃতি

৪৩। ফারহানা হক, cÖv¸³, পৃ.৪৪
৪৪। প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস, cÖv¸³, পৃ.২৬
৪৫ রমাকান্ত, চক্রবতী, cÖv¸³, পৃ . ২৩
৪৬। আহমদ শরীফ, mgvR ms¯‥wZi ¯‥i/c, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা : ২০১২, পৃ.৯০

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে বলেন, "সংস্কৃতি হলো আয়ত্তকৃত আচরণ কাঠামোর সমষ্টি যা সমাজের সদস্যরা অনুশীলন করে এবং এটি বংশগতভাবে কেউ অর্জন করে না" ।[৪৭]

সমাজ বিজ্ঞানী র‍্যালফ লিন্টন (Ralph Linton) সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন, "সংস্কৃতি হলো গণআচরণ যা সমাজের সদস্যরা প্রবীণদের কাছ থেকে আয়ত্ত করে এবং নবীণ গোষ্ঠির জন্য সযত্নে সংরক্ষণ করে"।[৪৮] সমাজ বিজ্ঞানী কোয়েনিগ (Koenig) বলেন, "সংস্কৃতিকে মানুষের সকল প্রচেষ্টার সমষ্টি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় এবং এর উদ্দেশ্য হলো পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও জীবনযাত্রার প্রণালীর উন্নতি বিধান" । [৪৯]

অপরদিকে, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংস্কৃতি হলো উপরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক কাঠামো হলো সমাজের মৌলভিত্তি। সামাজিক মৌল কাঠামোর উপর গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি উপরিকাঠামো। এ উপরিকাঠামোই হলো সংস্কৃতি। এ অর্থে রাষ্ট্র, আইন, ধর্ম, শিল্পকলা, দর্শন, প্রথা-আচার সবই সংস্কৃতি । আবার সংস্কৃতির নৃ-তাত্ত্বিক সংজ্ঞা বেশ ব্যাপক। নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সৃষ্ট সবকিছুকেই সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাই সংস্কৃতি হলো পরিবেশের পরিসরে মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রচেষ্টা, পারস্পরিক সর্ম্পক-রীতি এবং কল্পনার জগৎ অর্থাৎ সাহিত্য, ধর্ম জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি।[৫০] উল্লেখ্য, সংস্কৃতি কোন স্থিতিশীল বা অনড় বিষয় নয়। এর রূপ ও প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল। মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ জীবনে নতুন নতুন চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটছে। ফলে সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হচ্ছে তবে সংস্কৃতির মূল বিষয়গুলো উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে বর্তায়। এ কারণেই মানুষ সংস্কৃতিসম্পন্ন জীব।

সুতরাং বলা যায়, মানুষের জীবন প্রণালীর সামগ্রিক রূপই হলো সংস্কৃতি। অর্থাৎ সমাজ ও সমাজের ব্যক্তিবর্গের বহুবিধ বিষয়ের এক জটিল রূপকে সংস্কৃতি হিসেবে ধরা হয়। এ সকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সমাজের সমষ্টিগত জ্ঞান, নীতিবোধ, বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান, বিধি-বিধান ইত্যাদি। আবার সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের পরিচিতিও সংস্কৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৪৭। হাবিবুল্লাহ, Cv¸ ³, ঢাকা : ১৯৭৪, পৃ.৬৭
৪৮। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ev½vjxi RvZxqZvev', ইউপিএল, ঢাকা : ২০১১, পৃ.৫
৪৯। ফারহানা হক, Cv¸ ³, পৃ.৪৫
৫০। আহমদ শরীফ, Cv¸ ³, পৃ.১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ms¯‹…wZi ˆewkó¨

সংস্কৃতির ধারণা ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা বিশেষণের মাধ্যম সংস্কৃতির কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতির এ বৈশিষ্ট্যসমূহ হলোঃ

(ক) সংস্কৃতি হচ্ছে অর্জিত গুণ, সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সংস্কৃতি আত্মীকরণ করা সম্ভবপর।

(খ) সংস্কৃতি সামাজিক অবস্থা হতে সৃষ্ট, এটা ব্যক্তিগত কিছু নয়।

(গ) সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ প্রতিফলিত হয়।

(ঘ) সংস্কৃতি সামাজিক অস্তিত্বের সামগ্রিক রূপ। এটি অতীতের সাথে সংশিষ্ট এবং এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়।

(ঙ) সংস্কৃতি একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। এর বিভিন্ন উপাদান পরস্পর সর্ম্পকযুক্ত।

(চ) ভাষা সংস্কৃতির প্রধান বাহণ। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার অতীতের ধ্যান-ধারণা বর্তমান সময়ে ব্যবহার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত করে।

(ছ) সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল, সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে এটি পরিবর্তিত হয়।

সুতরাং সংস্কৃতি হলো মানুষের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও জীবনাচারের প্রতিচ্ছবি। বাঙ্গালী জাতি দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। জীবন চলার পথে এ দেশের জনগণ যে সংস্কৃতি লালন করছে তাই বাঙ্গালী সংস্কৃতি। সাধারণত বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলতে বাংলা ভাষাভাষী লোকদের বহুরূপী মনোভাব, ভাবধারা, সাহিত্য ও শিল্পকলার সংমিশ্রণকে বুঝায়। ব্যাপকার্থে, বাঙ্গালী সংস্কৃতি হচ্ছে বাংলার সমাজ বা মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিপ্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ, আদর্শ এবং লোকাচার বা আচরণের উৎসাহ, প্রতীক বা লক্ষণ বা চিহ্ন, ভাষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির জটিল সমন্বয়। অর্থাৎ বাঙ্গালী সংস্কৃতি বাংলা ভাষাভাষী গোষ্ঠির আবির্ভাবের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাঙ্গালী গোষ্ঠির বিভিন্ন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য বিশেষ এক কথায় বলা যায়। পরিশেষে বলতে পারি যে, বাঙ্গালীদের দীর্ঘদিনের জীবনাচারে খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, ধর্ম, মূল্যবোধ, সাহিত্য ইত্যাদিতে বাঙ্গালী সংস্কৃতি ফুটে উঠে।[৫১]

৫১। ফারহানা হক, CÖ¸ ³, পৃ.৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ms¯ÍwZi mgš^qevw`Zv

সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা হলো বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে খাপখাইয়ে সাংঘর্ষিক পথে না যেয়ে উভয়কে মেনে নিয়ে বসবাস করা। এক্ষেত্রে কাজটি সাধারণত দু 'ভাগে হয়ে থাকে। ১. সাংস্কৃতিক সঙ্গীকরণ অর্থাৎ যখন একটি দল অন্য একটি দলের সান্নিধ্যে আসার পর এ দল থেকে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ গ্রহণ করে নিজ দলের সাথে সঙ্গীকৃত করে নেয় এবং সেভাবে নিজ দলের সংস্কৃতিতে রুপান্তর ঘটায় তখন সাংস্কৃতিক সঙ্গীকরণ সাধিত হয়। যদিও পরস্পরের সান্নিধ্যে আসা দলগুলো একে অন্যকে প্রভাবিত করার প্রয়াস পায় তথাপি অপেক্ষাকৃত উন্নত বা আধিপত্যশীল দলের সংস্কৃতির উপাদান বা নমুণাসমূহ অনুন্নত বা অধীন দল কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে। ২. সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ অর্থাৎ সংস্কৃতির ব্যক্তিবর্গ বা দলের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে থাকে। আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার এক সংস্কৃতির ব্যক্তিবর্গ অথবা দল বিশেষ অন্য সংস্কৃতির ব্যক্তিবর্গ বা দলের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে থাকে। এভাবে অন্য দলের নিয়মাচার, মূল্যবোধ, জীবন ধারণ প্রণালী গ্রহণ করে তারা সে দলের মধ্যে সম্পূর্ণ মিশে যায়। এভাবে ব্যক্তি বা দল কর্তৃক নিজস্ব সংস্কৃতিকে পরিহার করে সম্পূর্ণভাবে অন্য সংস্কৃতি গ্রহণ করাকে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ বলে এবং সেভাবে এটি বিজাতীয়করণ ও নবজাতীয়করণের সমার্থক।[৫২]

৫২। প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস, C\/¸ ³, পৃ.৩৪

Dhaka University Institutional Repository

ev½vjx ms¯‹…wZi mgš^qev`xZvi KviY

সংস্কৃতি বিমূর্ত বিষয়, উপলব্ধির বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় এবং বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। সংস্কৃতির কোন বস্তুগত অস্তিত্ব না থাকায় সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা অনেকটা অন্ধের হস্তী দর্শনের মতো ব্যাপার। বস্তুত সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশ্রুত জীবনচেতনা।[৫৩] অন্যান্য প্রানী ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এ যে, অন্য প্রানী প্রকৃতির অনুগত জীবন ধারণ করে আর মানুষ নিজের জীবন রচনা করে। প্রকৃতিকে জয় করে, বশীভূত করে প্রকৃতির প্রভু হয়ে সে কৃত্রিম জীবন যাপন করে-এ-ই তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা। অতএব, এভাবে জীবন রচনা করার নৈপুণ্যই সংস্কৃতি। স্বল্পকথায়, সুন্দর ও সামগ্রিক জীবন চেতনাই সংস্কৃতি। চলনে-বলনে, মনে-মেজাজে, কথায়-কাজে, ভাবে-ভাবনায়, আচার-আচরণে, অনবরত সুন্দরের অনুশীলন ও অভিব্যক্তিই সংস্কৃতিবাণতা।[৫৪]

সংস্কৃতির সচল প্রবাহই বাঙ্গালী সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতার কারণ। বাঙ্গালী সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা কিভাবে ঘটে তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

1| Ab¨‡'k KZK kvmb : বাঙ্গালী চিরকাল বিদেশী ও বিজাতি শাষিত। সাত শতকের শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত এবং পনেরো শতকের যদু-জালালুদ্দীন ছাড়া বাঙ্গলার কোনো শাসকই বাঙ্গালী ছিলেন না। এটি নিশ্চিতই লজ্জার এবং বাঙ্গালী চরিত্রে নিহিত রয়েছে এর মূল কারণ। দীর্ঘকাল বিদেশী শাসিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই শাসক শ্রেণির সংস্কৃতির অবাধ-অনুপ্রবেশ যে, আমাদের বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

2| ev½vjx wPšÍvfvebv I 'kb : আবহমান বাংলার সংস্কৃতি, কৃষ্টি, চিন্তা, চেতনা, মনন-সাধনা ও ধর্ম এসব মিলিয়েই গড়ে উঠেছে বাঙ্গালীর দর্শন। বাঙ্গালীর উল্লেখযোগ্য দর্শনসমূহ হলো-লোকায়ত দর্শন, বৈষ্ণব দর্শন, সূফী দর্শন, বাউল দর্শন, চার্বাক দর্শন প্রভৃতি। যা প্রকাশ পেয়েছে মানবতাবাদ ও ভক্তিবাদের মধ্য দিয়ে। বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতার ক্ষেত্রে এটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৫৩। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা,' cwÎK RYKÚ, ঈদসংখ্যা, ২০০৩

৫৪। ড. কবিরুর রহমান ও অন্যান্য, ¯vaxb evsjv‡'‡ki Af¨'‡qi BwZnvm, MšKwVi, ঢাকা : ২০১৪, পৃ.১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

3| chUK‡‘i AvMgb : অতীতে ধর্মপ্রচারক, পরিব্রাজক, বিদ্যজন ও পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দেশে গমনাগমনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। বিভিন্ন সাম্রাজের মধ্যে বিরোধের ফলে বিজয়ী এবং বিজেতার সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল।

আমাদের এ অঞ্চলে চীনের তিউয়েন সাঙ, মরক্কোর ইবনে বতুতা, ইতালির মার্কোপোলো প্রমুখ বিদেশী পর্যটক তথা পরিব্রাজকের আগমন ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমম্বয় সাধনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

4| ms¯‹…Zi Abc‡ek : অস্ট্রিক-মঙ্গোলদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। সেটাই চিরকাল বাঙ্গালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা। তার প্রভাব থেকে বাঙ্গালী কখনো মুক্ত হতে পারবে না। সে পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা করলেও মুছে দেয়া যাবে না। বাঙ্গালীর চেতনায়, স্নায়ুতে, রক্তধারায় তা মিশে আছে-যুগ যুগ ধরে চলছে। সংখ্যা যোগতন্ত্র, দেহতত্ত্ব এগুলো হচ্ছে বাংলার আদি মঙ্গোলদের দান, আর নারী দেবতা, পশু-পাখি ও বৃক্ষদেবতা, জন্মান্ত প্রভৃতি হচ্ছে অস্ট্রিকদের দান। এগুলোর মধ্যে মন-মানষিকতা ও মননের যে বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত আছে, তার প্রভাব থেকে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ইসলাম, প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করে নানা সম্প্রদায়ের রূপ লাভ করেছে বটে, কিন্তু কখনো সে সংখ্যা, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব ছাড়তে পারেনি। ফলে বহিরাগত প্রতিটি মতবাদ এখানে এসে নতুন রূপ লাভ করেছে। নতুন চরিত্র নিয়েছে। বাঙ্গালী রূপ নিয়েছে।

5| Avh ms¯‹…Zi Abc‡ek : আর্যরা বিজয়ী হিসেবেই বিদেশ থেকে এসেছে। কাজেই তাদের সংখ্যা বেশি হবার কথা নয়। আমরা অনুমান করতে পারি আর্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের উচ্চবিত্তের ও আভিজাত্যের লোকগুলো আর্য সমাজে মিশে গিয়েছিল।[৫৫] তা না হলে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়েরা উচ্চবর্ণের আর্য শ্রেণিভুক্ত হলো কি করে ? আর্যদের বসবাসের সংগে সংগেই উত্তর ভারত 'আর্যাবর্তে' পরিণত হলো। আর্যেরা সম্ভবত বহুকাল ধরে প্রবল প্রতাপে শাসন চালিয়ে যায়। এমনি করে এক সময় যখন বিজেতা-বিজিতের স্মৃতি জনমন থেকে মুছে গেল অথচ বেশিরভাগ অনার্য সমাজে হীন বর্ণরূপে লাঞ্ছিত, অবজ্ঞা ও উৎপীড়িত হচ্ছিল, তখন জৈব নিয়মেই সেকালের প্রথা মতে ধর্ম বিপ্লবের আবরণে সমাজ বিপ্লব দেখা দিল। এ বিপ্লবের সার্থক নেতা বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ।

৫৫। সিরাজুল ইসলাম, cÖ¸ ³, পৃ . ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

জর্জ-গ্রিয়ার্সন গুজরাটি-মারাঠীর সঙ্গে ওড়িয়া-বাঙ্গলা অসমীয়ার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। মনে হচ্ছে এ সাদৃশ্য আলপীয় বর্গের আর্যভাষী নরগোষ্ঠির প্রভাব। বাঙ্গলার প্রাচীন ভাষাকে অসুর ভাষা বলার মূলও হয়তো অসুরপন্থি আলপীয়দেরই নির্দেশ করা হলো। এজন্যই বিভিন্ন গোত্রের অনার্যেরা আর্য সমাজে দস্যু, রাক্ষস, যক্ষ, নাগ, পক্ষী, কুকুর, দৈত্য, প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য আদিতে এগুলো ছিল টোটেম নামে কিন্তু আর্যেরা ব্যবহার করছে অবজ্ঞার্থে।

6| ag g‡Zi cPjb : বাঙ্গালীর ধর্মচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে লৌকিক ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, নাথ ধর্ম, ইসলাম প্রভৃতি। বাঙ্গালীর এ সকল ধর্ম চিন্তাও সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে।

7| †eŠ× I ˆRb¨ a‡gi Abc‡ek : আর্য-অনার্যের বিভেদ যখন ঘুঁচে গেল, তখন দেশ বা মানুষ বিশেষের কাছে বুদ্ধ-মহাবীরের বাণী পৌছিয়ে দেবার পক্ষে কোনো বাঁধা রইল না। এ সময়েই প্রথম জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মাগধের সীমা অতিক্রম করে রাঢ়ে, পুণ্ড্রে তথা আধুনিক বাংলাদেশে নবধর্ম প্রচারের জন্যে উপস্থিত হলেন। এদেশের আর্য ধর্মের সংগে আর্যভাষা আর সংস্কৃতিও তাদের বরণ করে নিতে হলো। এভাবে বাংলাদেশে অল্পকালের মধ্যে আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করেছিল বলে অনুমান করতে বাঁধা নেই। বাঙ্গালীর পাল রাজাগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাই তাদের সময়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম নামে টিকে ছিল। সেন রাজাগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন।[৫৬]

8| e¨emv-evwYR¨ : বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাঙ্গালীর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গমণ এবং সেখানকার বণিকের এদেশে আগমন ছিল আবশ্যিক। তাই ক্রিটবাসীর সংগে প্রাচীন বাঙ্গালীর সংস্কৃতির যোগও ছিল স্বাভাবিক।

ev½vjx ms¯‥wZi Amv¤cª`vwqK Dcv`vb

কোনো জাতির জীবনধারাই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা থেকেই অবগত হওয়া যায় একটি জাতির শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস।

এদেশে আর্য-আগমনের পূর্বে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি। আর্য-আগমনের পর এ বাঙ্গালী জাতি অনার্য নামে আখ্যায়িত হলো। আর্য-অনার্যের সংঘাত এবং পরবর্তীকালে মিলনের ফলে সৃষ্টি নতুন বাঙ্গালী জাতির। বৈদিক আর্যভাষার আধারে

৫৬। আমিনুর রহমান সুলতান, cm½: RvZxqZvev` I ms¯‥wZ, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা : ১৯৯৩, পৃ.৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আগত উন্নত আর্য সংস্কৃতির সাথে মিশে গেলো অনার্য সংস্কৃতি। গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হলো সমন্বয়াত্মক বাঙ্গালী সংস্কৃতি। সপ্তম শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিলো, ছিলো খণ্ডিত। অতএব, সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন জনপদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ছিলো অল্প হলেও। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে রাজা শশাঙ্কের সময় এবং পরবর্তীকালে পালযুগে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম একক রাষ্ট্রিক ঐক্য লাভ করে। বিভিন্ন জনপদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পায় এবং সুযোগ বাড়ে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই এদেশে প্রবর্তিত হয় মুসলিম শাসন। মুসলমান শাসকরা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাকে যথাক্রমে তাদের বাসভূমি এবং মৌখিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান করে বাংলা সাহিত্যের। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক হয়ে গেলো উভয় ধর্মগোষ্ঠি। ইংরেজ আগমনের পর আধুনিক যুগে বাঙ্গালী সংস্কৃতির পরিচিত হলো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে। এভাবে প্রথমে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমীকরণে সৃষ্ট বাঙ্গালী সংস্কৃতি মুসলমান আমলে আরব-ইরান থেকে আগত ইসলাম-প্রভাবিত সংস্কৃতি এবং ইংরেজ আমলে ইউরোপীয় মানবিকতাবাদী গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে তা পরিপুষ্টি লাভ করে বিকশিত হয়। সংস্কৃতির প্রধান উপাদান হলো আর্থিক জীবন, ভাষা, সাহিত্য, ভৌগলিক অবস্থান, ধর্ম বা জীবনাদর্শ ইত্যাদি। এগুলো প্রত্যেকটি ভিত্তিতে সংস্কৃতিকে তত্ত্বগতভাবে বিশেষ বিশেষ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু সবগুলো বিভাগ সমান গুরুত্বের অধিকারী নয়। সুতরাং বাঙ্গালী সংস্কৃতির সাধারণ গণ্ডির মধ্যে ধর্ম বা জীবনাদর্শ, ভৌগলিক অবস্থান, ভাষা, আর্থিক জীবন ইত্যাদি দ্বারা তফাৎ সৃষ্টি হলেও সবগুলোর প্রেক্ষিত সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। ধর্মীয় কারণে একজন হিন্দু এবং মুসলমান বা বৌদ্ধের সংস্কৃতির মধ্যে কিছুটা প্রভেদ রয়েছে। ঠিক তেমনি ভৌগোলিক অবস্থান এবং আর্থিক জীবনে পার্থক্যের কারণে দুজন বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য দুর্লক্ষ্য নয়। তবে আর্থিক জীবনের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে সংস্কৃতির ভেদাভেদ অন্যান্য কারণে সৃষ্ট ভেদাভেদের তুলনায় অনেক গুরুত্বের দাবিদার। [৫৭]

৫৭। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম , ev½vjxi mvabv I evsjv‡'‡ki gy³‡hv×v, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯২,পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ ও বিশ শতকে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে সৃষ্টি হয় ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার। মধ্যবিত্ত মুসলমানরা বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি ভেবে তা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আবার ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিও তারা বিরূপ মনোভাবাপন্ন। ফলে বাঙ্গালী সংস্কৃতির তিনটি ধারা-দেশজ ধারা, ইসলাম ধর্ম ও সামন্ততান্ত্রিক আরব-ইরান প্রভাবিত ধারা এবং পাশ্চাত্য ধারার মধ্যে দুটি ধারা–দেশজ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে প্রায় অস্বীকার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি, মুসলমান সংস্কৃতি গঠনে সচেষ্ট হয়।

পাকিস্তানী স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই আটচল্লিশ সালেই বাঙ্গালী তার আপন ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গড়ে তোলে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। অতঃপর বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, এরই প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ই ঘোষণা করে সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি গঠনের আরোপিত প্রচেষ্টার ব্যর্থতাকে।

সংস্কৃতিমাত্রই অবিভাজ্য। একথা বাঙ্গালী সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ধর্ম সংস্কৃতির একটি উপাদান মাত্র। কাজেই যারা ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির প্রবক্তা, তারা আসলে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে আচ্ছন্ন হয়ে স্বীয় পারিপার্শ্বিকতাকেই অস্বীকার করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। বাঙ্গালী সংস্কৃতির উপাদানগুলোর মধ্যে ধর্ম নয়, বাঙ্গালীর আর্থিক জীবন এবং ভাষাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক জীবনের ভিত্তিতে বাঙ্গালী উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত-সর্বহারা শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকলেও তাদের সাংস্কৃতিক জীবন প্রায় একই গণ্ডিভুক্ত। কিন্তু গ্রামবাংলার কৃষক শ্রমিক সর্বহারার সাথে তাদের সংস্কৃতির এতো ব্যবধান যে, এ দু'শ্রেণির মানুষের জীবনকে একটি সাধারণ সংস্কৃতির গণ্ডিভুক্ত করা রীতিমতো দুঃসাধ্য হতো যদি ভাষার ঐক্য না থাকতো।[৫৮] ভাষাই সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রধানতম নিয়ামক। তাই দেখা যায়, বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে ভাষার উপরেই আঘাত এসেছে তার জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করার ঘৃন্য ষড়যন্ত্র হিসেবে এবং সে আঘাতের বিরুদ্ধে যে সাংস্কৃতিক অবরোধ গড়ে উঠেছিলো বাংলাদেশে, তা ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতেই। জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার ঐক্য। বাঙ্গালী জাতি শোষিত হয়েছে বহুকাল বিদেশী, বিজাতি, বিভাষী

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা। এসকল বিদেশী-বিজাতি-বিভাষীদের আচার-আচরণ এবং খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতির সাথে যে সংস্কৃতি এসেছিলো বাংলাদেশে, বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিরাট আধারে সম্পৃক্ত হয়েছে মাত্র, বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে পারেনি। তাই বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রধান উপাদান বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। স্বার্থ-সর্বস্ব মানুষ দ্বারা সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা সকল সময়ই ব্যর্থতায় পর্যবষিত হয়েছে বাংলাদেশে।[৫৮]

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান। তারা ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনতার দেশ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। অদুর ভবিষ্যতে তা হবেও না, কারণ ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রভাবের কারণেই এদেশের জনগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী এর সুখ্যাতিও রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে ইসলামের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৫৮। আমিনুর রহমান সুলতান, C\/¸ ³, পৃ.৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq Aa¨vq

c_g cwi‡"Q'

Bmjv‡gi ms¯'wZ I Gi wewfbœ w'K

বাংলার এক কৃতি সন্তান বিবেকানন্দ তার রাজযোগের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন: (ভারতে) মুসলিম শাসনের নিকট আমরা ঋণী। মুসলিম শাসন এসেছিল এক মহান আশীর্বাদরূপে। কোন কোন গোষ্ঠির উপভোগকৃত সুযোগ-সুবিধার ধ্বংসকারীরূপে। (ভারতের) দরিদ্র এবং দলিতদের মুক্তিবার্তা নিয়েই মুসলমানদের ভারত বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণেই ভারতের এক পঞ্চমাংশ জনসমষ্টি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তরবারীর ভূমিকা এক্ষেত্রে ছিল গৌণ।[১]

পবিত্র আল কুরআনে বিবৃত হয়েছে,"ধর্মে বাধ্যবাধকতা বা জোরের কোন স্থান নেই"।[২]

সুরা আল-কাহ্‌ফে বর্ণিত হয়েছে, "সত্য এসেছে তোমার প্রভুর নিকট থেকে। যার ইচ্ছা হবে বিশ্বাস করবে এবং ইচ্ছা হবে অবিশ্বাস করবে"।[৩]

ইসলাম এক সার্বজনীন ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে পাঠানো হয়েছিল শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, সমগ্র মানব জাতির জন্যে। ইসলামের মূলমন্ত্র হলো সাম্য, সহিষ্ণুতা এবং সৌভ্রাতৃত্ব। পরমতসহিষ্ণুতা এর অলংকার। আকাশছোঁয়া উদারতা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আবহ। সাম্যের চিরন্তন বাণী হলো ইসলামের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। সৌভ্রাত্বের অন্তরঙ্গ আবেদন এর প্রাণস্বরূপ। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার ইসলামের সৌন্দর্য।[৪]

১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার যে কলোনীগুলো বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের মূল স্লোগানের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, ইসলামী ব্যবস্থার যে রূপরেখা ৬২২ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল মদীনা রাষ্ট্রে এবং যে সব নীতির ভিত্তিতে মদীনা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। সে সব নীতির অনুকরণ শোনা যায় প্রায় হাজার বছর পরে আমেরিকায় এবং ফ্রান্সে।[৫] সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের স্লোগান অথবা স্বাধীনতা, সাম্য এবং সুখের অন্বেষণ এসবই গৃহীত হয়েছে ইসলামী জীবন দর্শন থেকে। ইসলামই উন্নত জীবনের সওগাত

১। এমাজ উদ্দিন আহমেদ (নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত), mšÍvm cwZ‡iv‡a Bmjvg, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৫, পৃ.২৭

২। আল কুরআন, ২ : ২৫৬

৩। আল কুরআন, ১৮ : ২৯

৪। ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, Bmjv‡g gvbewaKvi, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৯ ,পৃ.৩৩

৫। এমাজ উদ্দিন আহমেদ, cv¸³, পৃ.২৮

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বৃহত্তর মানবতার বিস্তীর্ণ মোহণায়। এক্ষেত্রে সংকীর্ণতার কোন অন্ধকার ইসলামী জীবনবোধকে কালিমালিপ্ত করেনি। সাম্প্রদায়িকতার অরুচিকর মানষিকতা এখানে সর্বেব পরিত্যাজ্য। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জোর প্রয়োগের মধ্যযুগীয় বর্বরতা এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। অন্ধকারাচ্ছন্ন মানষিকতার কোন স্থান নেই ইসলামে।[৬]

ইসলামী জীবনাদর্শ এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তুল্য। এ আলোয় আলোকিত হতে যারা চেয়েছেন, নীতির উজ্জ্বল্য সব অন্ধকার ঘুচিয়ে যারা সুষমাভরা জীবনের গতিপথ অনুসন্ধান করেছেন, সংকীর্ণতাকে জয় করে যারা বিশ্বময় ভ্রাতৃত্বের পরিবেশে জীবনের অর্থ খুঁজেছেন তারাই স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে, ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন। এ প্রাপ্তিতে অহঙ্কার অথবা আত্মম্ভরিতার কোন ক্লেদ তাদের মনকে কলুষিত করেনি। শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় তাদের মননশীলতা ধূলি ধূসরিত হয়নি। বরং আকাশের মতো আরো উদার হয়েছেন তারা। হয়েছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রসূত অভিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়ে সমুদ্রের মতো গভীর এবং প্রশান্ত।[৭]

দেশ বিদেশের জ্ঞানী গুণীজন তাই ইসলামী জীবন দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যুগে যুগে। এ উপমহাদেশের বামপন্থীদের গুরু কমরেড এম.এন.রায় ১৯৩১ সালে প্রকাশিত তার 'The Historical Role of Islam' গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ইসলামের মহান ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের সময়ের অল্প সংখ্যক মুসলমানই সজ্ঞাত"।[৮] ঐ গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি আরো লিখেন : আবেগহীন ও বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের ফলে যখন ইতিহাস থেকে কিংবদন্তি আর ভয়ঙ্কর সব কল্পকথা মুছে যায় তখন এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইসলামের অভ্যুত্থান মানবজাতির জন্যে অভিশাপ নয় বরং এক আশীর্বাদ। ভারতের এক শ্রেণির সংকীর্ণমনা, সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট, ধর্মান্ধ হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের ইসলামের সমালোচনার জবাবে তিনি এ বক্তব্য রাখেন।

ভারতের শ্রেষ্টতম ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী ১৯৪০ সালের The Harijan পত্রিকায় লিখেন : ইসলামকে আমি মহান নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ একটি ধর্ম হিসেবে নিশ্চিতভাবে জ্ঞান করি। তাই আমি পবিত্র কুরআনকে মনে করি মহান আদর্শের ভাণ্ডাররূপে এবং মুহাম্মদ (সা.) কে শ্রদ্ধা করি একজন পয়গাম্বররূপে। তারও পূর্বে, ১৯২৪ সালের ১০ জুলাই প্রকাশিত Young India- তে তিনি

৬। এমাজ উদ্দিন আহমেদ, c৷¸ ³, পৃ. ৩১
৭। c৷¸ ³, পৃ.৩০
৮। c৷¸ ³, পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছিলেন : ইসলামের বিস্তার তরবারীর জোরে ঘটেনি, ঘটেছে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু সংখ্যক ওলি-আউলিয়া-ফকিরদের আন্তরিক গভীর ভালোবাসার জোরে।

মহাত্মা গান্ধীর এ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় ১৯৯০ সালে নরম্যান এ্যান্ডারসনের লিখিত গ্রন্থ- 'Islam in the Modern World: A Christian Perspective'- এর প্রতি লাইনে।

তিনি লিখেছেন: মুসলিম আমলের প্রথম শতকে ইসলামের অভাবনীয় বিস্তৃতির মূলে মুসলমানদের সুঠাম দৈহিক গঠন এবং আরব সৈন্যবাহিনীর পরাক্রম, বিশেষ করে খালিদ ইবন ওয়ালিদ ও অন্যান্য সামরিক প্রতিভার নেতৃত্ব কিছুটা দায়ী ছিল বটে, কিন্তু এ বিস্তৃতির মূল কারণ ছিল শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের মনে উন্নত জীবন দর্শনের আবেদন এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ।

গ্রন্থের ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনসে এবং পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় মুসলমানদের প্রভাব ব্যাপকভিত্তিক হয়ে ওঠে প্রধানত বাণিজ্য এবং শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশের ফলে"।[৯]

বর্তমান বিশ্বের ইন্দোনেশিয়াতে রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যক মুসলমান। ইন্দোনেশিয়া কোন সময় কিন্তু মুসলিমদের আগ্রাসনের শিকার হয়নি। অন্যদিকে, পাক-ভারত বাংলা উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ব্যাপ্তি ছিল প্রায় এক হাজার বছর-৭১২ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ উপমহাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ভাস্কর্য-নির্মাণশৈলী, এমনকি খাদ্যাভাস, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত হয় মুসলিম শাসকদের দ্বারা। তারপরেও এ উপমহাদেশের ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসমষ্টির এক চতুর্থাংশের বেশি হয়নি। অন্য কথায়, ইসলামের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে তরবারীর জোরের কোন প্রভাব কোন সময়ে ছিল না। তারপরেও স্বার্থান্বেষী মহল থেকে শত সহস্রবার প্রচারিত হয়েছে, তরবারীই ছিল ইসলামের অকল্পনীয় বিস্তারের প্রধান উপাদান।

এ মিথ্যা অভিযোগ সম্পর্কে O' Learly and De Lacy কর্তৃক ১৯২৩ সালে লিখিত গ্রন্থ 'Islam at the Crossroads' এর ৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : ইতিহাসে এটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ধর্মান্ধ মুসলমানরা বিশ্বের সর্বত্র ঝড়ের বেগে ছুটে গেছেন, ভূখণ্ড দখল করেছেন এবং দখলিকৃত ভূখণ্ডে তরবারীর জোরে ইসলাম গ্রহণে জনসমষ্টিকে বাধ্য করেছেন। ঐতিহাসিকদের বারে বারে উচ্চারিত এ কিংবদন্তি সর্বাপেক্ষা অবিশ্বাস্য অসত্য।

৯। কে আলী, gmwjg ms¯⁻wZi BwZnvm, আলী পাবলিকেশনস্, ঢাকা : ১৯৭৯, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

তারপরেও বিশ্বের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা দেয়া অব্যাহত রয়েছে এবং প্রচার করা হচ্ছে যে, ইসলামের জবরদস্তিমূলক প্রবণতা আধুনিক সভ্যতার জন্যে মারাত্মক। ১৯৯৬ সালেও নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় লিখিত হয় : "লাল ভীতি (কমুনিষ্টদের উপদ্রব) দূর হয়েছে বটে, কিন্তু ইসলাম এখনো রয়েছে"।[১০] ইসলামের অবদান সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। আট থেকে বার শতক সময়কালে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল একদিকে যেমন শিকড় সন্ধাবী, অন্যদিকে তেমনি ব্যাপকভিত্তিক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ, কর্ডোভা, সিরাজের শিক্ষায়তনে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন অসংখ্যা তীক্ষ্মধা, মেধাবী শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ইতিহাসবেত্তা এবং আইন বিশারদ। ঐ সময়ে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্জিত উৎকর্ষ সম্পর্কে মন্তব্য করে পবিত্র কুরআনের অনুবাদক রডওয়েল (Rodwell) The Koran- এ ১৯০৯ সালে লিখেছিলেন, "আরবের সাদাসিদে মেষপালক ও যাযাবর বেদুঈনরা মনে হলো যেন এক অবিশ্বাস্য যাদুর স্পর্শে সংহত হয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। শুধু তাই নয়, তারা নতুন নতুন নগরীর পত্তন করে। অসংখ্য পাঠাগার গড়ে তোলে। বাগদাদ, কর্ডোভা এবং দিল্লীর মতো ক্ষমতা কেন্দ্রিক নগরী এমনভাবে সুসজ্জিত হয় যার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ইউরোপ"।[১১]

ইউরোপ কেন মুসলিম বিশ্বকে তার প্রতিপক্ষ বা শত্রু জ্ঞান করে সে সম্পর্কে গত এক দশকে অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং এদের অধিকাংশেই লিপিবদ্ধ হয়েছে ইসলামের অন্তর্নিহিত সামর্থ্য, উন্নত জীবনাদর্শ এবং বিশ্বজয়ী নৈতিকতার তাৎপর্য।

১৯৯৪ সালের আগস্ট ৬-১২ সংখ্যায় 'The Economist' পত্রিকায় গবেষণাধর্মী 'A survey of Islam and the west' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সাথে সাথে এও উল্লিখিত হয়েছে যে, আট শতকে সৃষ্ট ইসলাম সম্বন্ধে ভীতি বার এবং তের শতক পর্যন্ত, এমন কি এখন পর্যন্ত তার রেশ অব্যাহত রয়েছে।[১২]

এ প্রসঙ্গে P. Hoodbhoy এর লিখিত 'Islam and Science' গ্রন্থে ইউরোপের ইসলাম ভীতির ব্যাখ্যা মিলে। তিনি লিখেছেন : আমাদের প্রধান সমস্যা হলো এ যে, মধ্যযুগের যুদ্ধবাজ প্রচারণার গভীর সংস্কারের উত্তরাধিকার আমরা এখনো বহণ করে চলেছি। অষ্টম শতকের প্রথম থেকেই খ্রিস্টান

১০। Syedur Rahman, *An introduction to Islamic Culture and philosophy, Mullick brothers,* Dhaka : 1963, P. 24

১১। msw¶ß Bmjvgx wek‡Kvl, (২য় খ.) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ. ২২৮

১২। আবুল হাশিম, Bmjv‡gi gg K_v, (অনু : মুসলিম চৌধুরী), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮১, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপ ইসলামকে চিহ্নিত করা শুরু করেছে তার প্রধান শত্রু হিসেবে, কেননা সামরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই ইউরোপ সন্ত্রস্তবোধ করেছে। ইসলাম সম্পর্কে এ ভীতি বার ও তের শতকের শেষ পর্যন্ত ইউরোপের ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। বিশ শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। সত্যি বটে, খ্রিস্টান ইউরোপ মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের যুদ্ধক্ষেত্রে যে চপেটাঘাত হজম করেছিল মধ্যযুগে, তার স্মৃতিটুকু এখনো স্মরণে রেখেছে। তা না হলে শান্তিপূর্ণ জীবনের ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে কার বলার কি আছে?

ইসলাম হলো সাম্য, মৈত্রী এবং সৌভ্রাতৃত্বের ললিত বাণীর আকর। ইসলাম হলো উন্নত জীবনবোধের পতাকাবাহী জীবন ঘনিষ্ঠ নৈতিকতার গভীর খনি। ইসলাম হলো আধুনিকতায় সমুজ্জ্বল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আকাশছোঁয়া ঔৎসুক্য ও গভীর অনুশীলনের প্রতীক।[১৩]

সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি হল সমাজ থেকে অর্জিত আচার-ব্যবহার। সমাজে একত্রে বসবাসের ফলে মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। তাদের এক অপরের নির্ভরশীলতায় গড়ে উঠে একটি সমাজ ব্যবস্থা। উৎপাদন যন্ত্র ও কৌশল, বণ্টন বিধি, ভোগবিলাস এবং জীবনযাত্রার প্রক্রিয়াই সংস্কৃতি। নৃ-বিজ্ঞানী টেইলার এর মতে, "সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত আচার-ব্যবহার, জ্ঞান,বিশ্বাস,কলা নীতি, আহৃণ প্রথা ইত্যাদির জটিল সমাবেশকেই সংস্কৃতি বলা হয়"।[১৪]

আল্লামা আবুল হাশিমের ভাষায়, "Culture is the development of the faculties of man both external and internal and is its manifestation in his behaviour and in his immediate material environment."[১৫] ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে ইসলামী অনুশাসনের প্রভাবে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হয়।[১৬] ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন, যাতে মানুষের বৃত্তিসমূহের পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে যে সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা-ই হল ইসলামী সংস্কৃতি।

উল্লেখিত বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর (তার কর্মকাণ্ডের কারণে কখনও বা) নিম্নস্তরে স্থাপন করেছি"।[১৭]

১৩। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, Bmjvg cm½ , রেনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা : ১৯৬৩, পৃ . ৩
১৪। E.B. Taylor, *Primitive Culture*, vol .1, London,: 1981, P . 7
১৫। Abul Hashim, *The Creed of Islam,* Islamic foundation of Bangladesh, Dhaka : 1980, P. 133
১৬। . সানাউল্লাহ নুরী, Bmjvgx ms¯‹wZ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮২, পৃ . ১০২
১৭। আল কুরআন, ৯৫:৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরি মানুষের সম্ভাবনাও অপরিসীম। তাদের জীবন বিধানের পরিসরও বিরাট। তাই সমগ্র জীবন নিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়। ইসলামী সংস্কৃতির মূলভিত্তি আল্ল্াহর একত্ববাদ। আল্লাহ স্রষ্টা, মানুষ তার সৃষ্টি। তাই এ সংস্কৃতিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক ছাড়াও মানুষের সমাজ জীবন, খাদ্য আহরণ ও অর্জনের পন্থা, যৌন জীবন, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্ক এবং এক মানবোচিত পরিকল্পনা রয়েছে।[১৮]

ইসলামী জীবন সর্বদেশ, কাল ও দর্শন এবং তমুদ্দন থেকে বিনয়ের সাথে যা কিছু সুন্দর, চিরন্তন, কল্যাণকর তাকে সাদরে বরণ করে নিতে উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। তবে যে সব ভাল জিনিস গ্রহণ করা হয় তাকে ইসলামের ভাবধারায় সমৃদ্ধ ও তৌহিদবাদ দ্বারা সঞ্জীবিত করে তোলার নির্দেশনা রয়েছে। তাই তা বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও দেশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন জাতি, দেশ ও ভাষা হলো সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু এ সংস্কৃতির মূলনীতি ইসলামী জীবন দর্শন ও মানবতার উপর নির্ভর করে। জাতি, দেশ, বর্ণ ও ভাষা এ সংস্কৃতির মূলভিত্তি নয়। ইসলামী জীবন দর্শনের মূল্যবোধগুলোই ইসলামী সংস্কৃতির মূলভিত্তি, যার উপর নির্ভর করে তার বিরাট সৌধ ও শাখা-প্রশাখা।[১৯] পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন”।[২০]

এখানে দ্বীন অর্থ হল আল্লাহপাকের ফিতরাত, যার ছাঁচে মানুষের প্রকৃতি গঠন করা হয়েছে। যে সকল অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন নিয়ন্ত্রণ করে সে সমষ্টির নাম দ্বীন বা জীবন দর্শন। ইসলামের দৃষ্টিতে তাই দ্বীনের বিরোধিতা অর্থ নিজ প্রকৃতির বিরোধিতা। এরূপ বিরোধিতা করে নয়, বরং এর সাথে সুসংগতি রক্ষা করে নিজের ইহকাল ও পরকাল সাফল্যময় করে তোলা যায়।

সুতরাং ইসলামে সংস্কৃতি যেমন ব্যাপক, তেমন আদর্শ ভিত্তিক। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে প্রথম হল তাওহীদবাদ, মানব জীবনে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, মানুষের সামাজিক জীবনে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সার্বজনীন নীতির প্রবর্তক। সার্বজনীন বিচার প্রতিষ্ঠা তাওহীদবাদের লক্ষ্য। এছাড়া প্রত্যয় বা চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আইন-কানুন নীতি, আচার-

---

১৮। ড. হাসান জামান , Avgv‡'i ms¯‹…wZ I mwnZ¨, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৩, পৃ . ৯৬
১৯। হাসান জামান, cÖv¸³, পৃ . ৭
২০। আল কুরআন, ৩:১৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার যা ইসলামে অস্তিত্ববাচক হিসেবে নিজেই গড়ে তোলে। প্রত্যয় বা চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন, নীতি, আচার-ব্যবহার যেগুলো তাওহীদবাদ ও সার্বজনীন নীতির বিরোধী নয় তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়। ইসলামের মূল্যবোধ এ সংস্কৃতির প্রাণ।[২১] ইসলাম তাই মানব প্রকৃতির মূল তত্ত্বগুলোর ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থার বিধান দেয়। সুতরাং ইসলামের প্রভাব ও প্রতিফলন মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রতিভাত হয়।

e¨w³MZ Rxe‡b

ব্যক্তি ইসলামী সমাজের প্রথম ও প্রধান উপাদান। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই পরিবার ও সমাজ । ব্যক্তি ভাল হলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ভালো। আর ব্যক্তি খারাপ হলে সবই খারাপ। আর ইসলামের বুনিয়াদি আমলগুলো মূলত ব্যক্তিকে প্রকৃত মানুষ ও আদর্শবান করে থাকে। প্রায় সবক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন কিছু শুরু হয় ব্যক্তি থেকে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তা সম্প্রসারিত হয় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও প্রথমত তা ব্যক্তি পর্যায়ে বর্তায়। প্রবাদ আছে, যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকেও চিনতে পেরেছে। তাই পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইসলামের বুনিয়াদি আমলগুলো ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়নের অধিক তাগিদ এসেছে। এমনিভাবে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ব্যক্তি জীবনে প্রতিপালনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সাফল্য বা কামিয়াবি হাসিল সম্ভব।

আল্লাহপাক ঐ মুমিনদের সফলকাম বা কামিয়াব হবার ঘোষণা দিয়েছেন যারা ব্যক্তি জীবনে ইসলামের বুনিয়াদি আমলগুলো বাস্তবায়ন করেছেন। মানুষ কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে এবং তার গন্তব্যস্থল কোথায়, মানব মনে স্বাভাবিকভাবে এ সব প্রশ্ন দেখা দেয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, "হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী হতে সৃজন করেছি এবং তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা এক অপরকে চিনতে পার ও যত্ন করতে পার"।[২২] আয়াতটিতে আল্লাহর একত্ববাদ ও অদ্বিতীয়ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তাঁর উপর আর কেউ নেই। কোন শক্তি নেই। তিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। সকল সৃষ্টিই সমভাবে তাঁর দয়া ও করুণা প্রাপ্ত। বিশ্বে যে কোন দেশের, যে কোন ধর্মের, যে কোন বর্ণের

২১। ড. হাসান জামান, C⁄¸ ³, পৃ.১৩

২২। আল কুরআন, ৪৯:১৩

Dhaka University Institutional Repository

মানুষই শ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরি বলেই আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি (তার কর্মকাণ্ডের দরুন কখনও বা) নিম্নতম স্তরে স্থাপন করেছি শুধু তাদের ছাড়া যারা বিশ্বাস করে এবং ন্যায় কর্মাচরণ করে। তাদের জন্য অব্যর্থ পুরষ্কার"।[২৩]

সুতরাং মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরি অর্থই হল মানুষ সৃষ্টির সেরা এবং তার সম্ভবনাও অপরিসীম। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীন প্রতিভূ হিসেবে এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে বাস করার সুযোগ সমেত মানুষকে কর্তব্য পালন করতে পাঠানো হয়েছে। বিশ্বাস রাখ এবং কাজ কর, আল্লাহর গুণাবলীর সাথে একাত্ম হয়ে কাজ কর এ হল প্রত্যাদেশ।

এ প্রত্যাদেশ অনুযায়ী যখন অপরিসীম সম্ভাবনার মানুষ আল্লাহ পথকে সম্মান করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসে, ঈমান রাখে এবং আল্লাহর গুণাবলীর সাথে কাজ করে তখনই সে নিজেকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে এবং জড় পরিবেশের পটভূমিতে সগৌরবে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। এ সম্পর্কে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু ও ধর্মপরায়ন ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট বেশী সম্মানিত"।[২৪] কিন্তু এ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মানুষ যখন তার জড় সম্পদ ভোগ লিপ্সার দাসে পরিণত হয় তখন সে নিজকে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত করে। এর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম জীবনের বাস্তব দিকের প্রতি উপেক্ষা করে এবং দুনিয়ার সম্পদরাজিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। মানুষ দুনিয়ার সম্পদরাজিকে স্বীয় প্রয়োজনে ভোগ করবে। কিন্তু নিজেকে ভোগ সম্পদের ভোগ্য বস্ত্ততে পরিণত করবে না। কেননা, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব বলে আল্লাহপাক ঘোষণা দিয়েছেন। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার সাধনাই হল ইসলামী আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মূলতন্ত্র।[২৫] সুতরাং মানুষের যে সকল বৃত্তি ও তৎসংশ্লিষ্ঠ মুল্যবোধ ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশের সহায়ক সেগুলোর পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে তাদের বহিঃপ্রকাশ ইসলামী জীবনে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি।

মানুষ জন্মগতভাবেই একটি নৈতিক সত্তা। মহানবী (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক মানব সন্তানই নিজ ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে"।[২৬] পৃথিবী থেকে পাপ-পঙ্কিলতা দূরীকরণ এবং মানুষের স্বাভাবিক শুভ্রতায় বিশ্বাস-এ দু'টির সমবায়ে রচিত ইসলামের নৈতিক ভিত্তি। জন্মগতভাবে নৈতিকতার কারণে

২৩। আল কুরআন, ৯৫:৪-৬
২৪। আল কুরআন, ৪৯:১৩
২৫| Abul Hashim, Op. cit., P. 135
২৬। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmwen, কলিকাতা : ১৩৫০ হিজরি, পৃ . ২১

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ শান্তি প্রিয়। মানুষকে নিজের প্রতি, সকল সৃষ্টির প্রতি এবং আল্লাহর প্রতি তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়াই ইসলামী নীতিবিদ্যার লক্ষ্য। এ জন্যেই ইসলামের নির্দেশিত সকল আচার-অনুষ্ঠানে মানবাত্মার বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মানুষের প্রকৃতিতে মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব এ দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মুনষ্যত্বের দিকটি মানুষকে নিয়ে যায় উপরের দিকে অর্থাৎ উৎকর্ষের চরম শিখরে। অন্যদিকে পশুত্বের দিকটি তাকে চালিত করে নীচের দিকে অর্থাৎ অধঃপতনের দিকে । জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, মনের পশুত্ব ও রিপুকে মনুষ্যত্ব শক্তি দ্বারা জয় করা। এদিক থেকেই মানুষকে অভিহিত করা হয় নৈতিক দায়িত্ব সম্বলিত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা বলে। সকল রকমের ভ্রান্তি ও ত্রুটি থাকা সত্তেও মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই তাকে বিকশিত করতে হয় তার সুপ্ত শক্তিসমূহকে।[২৭] মানুষের শক্তিসমূহকে বিকশিত করার সাথে নৈতিকতার প্রশ্নটি জড়িত। এ বিষয়ে কখনও কখনও সে পশুত্ব শক্তি দ্বারা চালিত হতে পারে, যা মানুষ তথা সৃষ্টির ক্ষতিসাধন করে।

পশুশক্তিতে পরিচালিত হওয়া মানে নৈতিকতা বিরোধী হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতি বা নৈতিকতা বিরোধী কাজ তা-ই, যা অপর কারও ক্ষতি সাধন করে। নৈতিকতা বিরোধী কাজেই মানুষের প্রকৃতিতে পশুত্বের বৈশিষ্ট্য।

উল্লেখ্য, কর্ম বলতে কেবল হস্তদাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কর্ম বোঝায় না, চিন্তা ও অনুভূতিও এর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আবুল হাশিম বলেন,"যে কর্ম মানব সত্তায় ও তার পারিপার্শ্বিক বস্ত্ত জগতে বিরাজমান সক্রিয় প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষতিকর ফল প্রসব করে তা জুলুম ও নৈতিকতা বিরোধী। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক জ্ঞান কতগুলো অবাস্তব ও স্বেচ্ছা উদ্ভাসিত ভাল মন্দের বিচার বুদ্ধি নয়, বরং যে কোন কর্ম স্বভাবত ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিময় অগ্রগতিকে ব্যহত করে, তাই নৈতিকতার বিরোধী। ক্ষতি দৈহিক ও মানষিক প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের হতে পারে। কোন কোন ক্ষতির প্রভাব সুদূরপ্রসারীও হতে পারে, আবার সীমিতও হতে পারে"।[২৮] সৃষ্টির যে কোন ক্ষতিকারক কর্মই মহান আল্লাহর দেয়া বিধানানুযায়ী জুলুম। শুধু তাই নয় বরং যে ব্যক্তি জুলুম করে কিংবা জুলুমের সহায়তা করে বা শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন প্রতিবাদ করে না সেও জুলুমের জন্য সমভাবে দায়ী। যে সব ভোগ লিপ্সা মানব মনকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে যেমন : মাদকাসক্তি, জুয়া, অশ্লীল ও কুরুচীপূর্ণ নৃত্য, গীত, ভাস্কর্য এবং যৌন আবেদন সম্বলিত রূপ প্রদর্শনী ইসলামী

২৭। ড. আমিনূল ইসলাম , gmwjg ‘kb I ms¯wZ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৪, পৃ . ৫২

২৮। Abul Hashim, Op. cit., P. 136

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির দৃষ্টিতে নৈতিকতা বিরোধী।[২৯] কেননা, তা মানব মনের ক্ষতিসাধন করে। অবশ্য মানব মনে রস সঞ্চালনকারী জীবনমুখী রুচি সম্পন্ন সংগীত ইসলামী সংস্কৃতি বিরোধী নয়। কেননা, এর মাধ্যমে মানুষের মানবতাবোধ তথা জীবন ও জীবনের পরিসমাপ্তির কথা থাকে। সুতরাং ইসলাম আপোষহীনভাবে যেমন নৈতিকতা বিরোধী যে কোন ক্ষতিকারক কর্ম ও জুলুমের বিরোধিতা করে, সে প্রকারের মন গঠনের অনুশীলনী এবং ব্যবহারিক জীবনে তার বহিঃপ্রকাশই হল নৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামের এ নৈতিক পরিকল্পনাই আজকের পৃথিবীর কাঙ্খিত শান্তি দান করতে পারে, যে পরিকল্পনা ও নীতির অনুসরণ করে ইসলাম পাপাচারী মরু বেদুঈনদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করেছিল এবং তাদেরকে বিশ্বসভ্যতার ধারক ও বাহকে পরিণত করেছিল। ইসলামের নৈতিক ধারণা প্রকৃতির নিয়মের এক অপরিবর্তনীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩০] ইসলামের নৈতিক শিক্ষার কার্যকারিতার বিষয় উল্লেখ করে রেভারেন্ড টেইলর বলেন, "মদ্যপানে, জুয়াখেলা ও ব্যভিচার যে তিনটি অভিশাপ খ্রিষ্ট জগতকে ধ্বংসের পথে চালিত করছে, তা একমাত্র ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই বিদূরিত করতে পারে"।[৩১]

মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আর আল্লাহ বিশ্বাসীদের বন্ধু। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন। মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আল্লাহর যে সমস্ত গুণ আত্মস্থ করা প্রয়োজন তার প্রথমটির হল সে বৈশিষ্ট্য, যা জীবনের জন্য সক্রিয়। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃজনে এবং দিন রাত্রির পরিবর্তনে এবং সমুদ্র চালিত জাহাজে যাতে মানুষ লাভবান হয়ে থাকে এবং আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে তদ্দারা ভূমিকে যে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন তাতে তদুপরি বিবিধ জন্তু সঞ্চারিত করেছেন তাতেও বায়ুমণ্ডলে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে"।[৩২] কেবল ঐ সব বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে তার গবেষণা করা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন তার যথার্থ ব্যবহার। এ পথেই অর্জিত হয় শক্তি এবং শক্তিকে নাগালে আনার একমাত্র উপায় হল জ্ঞান।

২৯। Abul Hashim Op.cit.,P. 138
৩০। ড. রশীদুল আলম, gmwjg 'k‡bi fwgKv, সাহিত্য কুটির, ঢাকা : ১৯৮৪, পৃ . ৩৮
৩১। ড. রশীদুল আলম, cv¸ ³, পৃ . ৩৮
৩২ । আল কুরআন, ২:১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা.) বলেছেন, " জ্ঞান এমন বন্ধু যা জ্ঞানীকে নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ নয় এমন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সহায়তা করে; জ্ঞান জান্নাতের পথ আলোকিত করে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্ঞান আমাদের বন্ধু, নির্জন আমাদের সমাজ, পরিত্যক্ত অবস্থায় এ আমাদের সাথী এ আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করে, এ বিপদে আমাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে, বন্ধুমহলে এ আমাদের অলংকার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের বর্ম। জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহর বান্দা পবিত্রতার শীর্ষে ও মহৎ মর্যাদায় উন্নীত হয়, ইহজগতে নৃ-পতিদের সঙ্গ লাভ করে এবং পরজগতে পূর্ণাঙ্গ সুখপ্রাপ্ত হয়"।[৩৩] প্রশ্ন হল জ্ঞান কখন থেকে শুরু করতে হবে? ইকবালের ভাষায়, "মূর্ত বস্তু থেকেই জ্ঞানকে যাত্রা শুরু করতে হবে। যেমন ধরা যাক, অগ্নি। এটাকে স্পর্শ করলে দগ্ধ হতে হয়। এ জ্ঞান আছে বলেই কেউ অগ্নি স্পর্শ করে না। অগ্নি স্পর্শ হতে বিরত রাখার জন্য পুলিশ, প্রহরী, হিতোপদেশ সমাজ শাসনের প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই যথেষ্ট। তারপর মাদক দ্রব্য সেবন মন ও মস্তিষ্কের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু তা সেবনে কি ক্ষতি হল সঙ্গে তা উপলব্ধি করার জ্ঞান অর্জন না করা হলে পরিণামে মানুষ কুঅভ্যাসের দাস হয়। এমনি ধাপে ধাপে মানুষ জ্ঞানের উচ্চ পর্যায়ে যাবে। ইকবালের ভাষায়, মূর্তবস্তুর বুদ্ধিগত উপলব্ধি এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভের ফলেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে মূর্তবস্তুকে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়"।[৩৪] মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "হে জীন ও মানব জাতি! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তবে কর, কিন্তু কেবল ক্ষমতার দ্বারাই তা পারবে"।[৩৫]

অতএব দেখা যাচ্ছে, ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন বিজ্ঞানমুখী। পবিত্র কুরআন আল্লাহর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করার জন্য, গবেষণা করার জন্য বহুভাবে মানব জাতিকে আদেশ-নির্দেশ প্রদান করেছে। সুতরাং জ্ঞানানুশীলন ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির ভিত্তি।

যে সকল বৃত্তি মানুষকে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানপিপাসু করে সেগুলো পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে তার ফলিত রুপ ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি।[৩৬] এ জ্ঞান দু'প্রকার-বুদ্ধিলব্দ এবং বোধিলব্ধ। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার অনুসরণে বোধলব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনও ইসলামী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে শিক্ষা বুদ্ধি বোধির উৎকর্ষ সাধন করে সে বিশুদ্ধ শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগ ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি। ইসলামের জ্ঞান চর্চার স্থান সর্বোচ্চ এবং জ্ঞান চর্চাকে

৩৩| সৈয়দ আমির আলী (অনু : দরবেশ আলী খান) w' w¯úwiU Ae Bmjvg, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৩, পৃ . ৩০১

৩৪| Dr. Allama Iqbal, ***The Reconstruction of Religious thought in Islam***, Asrhaf press, Pakistan: 1960 P. 131

৩৫ । আল কুরআন, ৫৫ : ৩৩

৩৬। শাহেদ আলী, (সম্পা) Bmjvgx ms¯wZi i‡c‡iLv, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলদেশ, ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ . ১৩

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কর্ম বা দায়িত্ব মনে করা হয়, কৃষ্টি চর্চাকে সুউচ্চে মর্যাদা দেয়া হয়। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই তার প্রমাণ। জ্ঞানের সাধনায়, সৃষ্টিতত্ত্বের গবেষণায় ইসলামের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম জাতি এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, পৃথিবীকে চমক লাগিয়ে সারা বিশ্বের জ্ঞানপিপাসুদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে ইসলামী সভ্যতার প্রেরণা বিদ্যমান। এ ধারণা পাশ্চাত্য জগতও অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছে। ব্রিফল্টের ভাষায় বলতে হয়, "বিজ্ঞান হচ্ছে আধুনিক বিশ্বে সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কিন্তু এর ফল পরিপক্ক হয়েছিল বিলম্বে। মূল সংস্কৃতির অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে যাবার অনেক দিন পর তার গর্ভজাত এ বিজ্ঞান সন্তানটি পূর্ণ শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কেবল বিজ্ঞানই ইউরোপের প্রাণ সঞ্চার করেনি। ইসলামী সভ্যতার অন্যান্য এবং বহুমুখী প্রভাব আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের প্রথম উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল"।[৩৭] আল্লামা ইকবাল বলেন, "The fruits of modern European Humanism in the shape of modern science and philosophy are in many way only a further development of muslim culture."[৩৮]

সুতরাং ইসলাম শুধু কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মুক্তবুদ্ধির সাহায্যে সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনে উৎসাহিত করে। চিন্তা, বিবেক, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ, যার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশ পায়।

mvgwRK Rxe‡b

ইসলাম উদার মানবতা শিখায়। সামাজিক জীবন সম্পর্কে ইসলাম দিয়েছে এক বৈপ্লবিক ধারণা। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী সকল মানুষই সমাজভূক্ত এক আদমের সন্তান। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির ভাষা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন হলেও সকল মানুষ একই মানব গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,"হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে পরিণত করেছি যেন এক অন্যকে চিনতে পার। আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাশীল ব্যক্তি সে-ই, যে ব্যক্তি অধিক আল্লাহভীরু"।[৩৯]

---

৩৭. Brifault, ***Making of Humanity***, London, : P. 202
৩৮. Abdul Vahid (ed.) ***Thoughts and Refrection of Iqbal***, Asrhaf press, Pakistan : 1964, P. 203
৩৯. আল কুরআন, ৪৯:১৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সমাজের মূলভিত্তি সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু এ সাম্য যোগ্যতার নয়, ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার বিকাশের দ্বারা সমাজ জীবনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার ও সুযোগের সাম্য। রক্তাভিজাত্র ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পদের গৌরব অথবা বিশেষ কোন পেশা ইসলামী সমাজ জীবনে মানবিক মর্যাদার মাপকাঠি নয়। চারিত্রিক সততা ও কর্তব্যপরায়ণতাই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। এখানে উঁচু-নীচুর কোন ভেদাভেদ নেই। মানুষও মানবিকতার প্রতি ইসলামের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামে সামাজিক সংস্কৃতির প্রথম সোপান।

ইসলামী সমাজের সাংগঠনিক ভিত্তি পরিবার। পারিবারিক সততা, শান্তি না থাকলে এবং পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা না থাকলে সমাজ জীবনে সুখ,শান্তি ও সমৃদ্ধি আসতে পারে না। সমাজের সত্যিকারের উন্নতি নিহিত রয়েছে বদান্যতা, ভালোবাসা এবং পরস্পরকে বোঝার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের তথা নিয়ত পরিবর্তনশীল ও সদা বিলীয়মান বস্তু সামগ্রীর উপর মানুষের বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর অংকনের যে ক্ষমতা তার উন্নতির মাঝেই।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব অর্থ এখানে সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতি। সততা, যোগ্যতা ও কর্তব্য পরায়ণতার অনুপাতে মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের ব্যক্তিত্ব ঠিক সেরূপ মনোরম থাকবে যেমন আল্লাহ তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন, পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,"মানবতার জন্য গড়ে তোলা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। তোমরা সদাচরণের নির্দেশ দাও এবং অন্যায়কে নিষিদ্ধ কর এবং তোমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস আন" ।[৪০]

ইসলাম সৎ ও ন্যায়কে যেমন সযত্নে আলিঙ্গন করে, তেমনি অন্যায়কে ঘৃনা করতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু অন্যায়কারীকে ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতির সাথে অন্যায় পথ হতে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আপনি আপনার প্রভুর পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে (লোকদেরকে) আহবান করুন" ।[৪১]

ইসলামের মনোভঙ্গি আপোষমূলক, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার উপরে জোর দেয়া হয়েছে, যাতে করে কোন কৃত দুষ্কর্মের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় এবং উন্নততর সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। "এবং ভাল ও মন্দ কাজ সদৃশ নয়। একটি ভাল কাজ দিয়ে একটি মন্দ কাজের উত্তর দাও। তখন দেখবে, যার সঙ্গে তোমার শত্রুতা ছিল, তাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে হবে" ।[৪২] কিন্তু ইসলাম দুর্বল ক্রোধকে কখনও শুদ্ধির ছাড়পত্র প্রদান করে না। তাকে যতই সুভাষণে বিশেষিত করা হোক। নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে

৪০। আল কুরআন, ৩:১১০
৪১। আল কুরআন, ১৬:১২৫
৪২। আল কুরআন, ৪১:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় গাল এগিয়ে দিয়ে নতুন অপমান বা অন্যায়কে অভ্যর্থনা করার নীতিকে ইসলাম কখনও গুণ বলে অভিহিত করে না। কেননা, এতে করে মানবিক মর্যাদার অবমাননা করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্যায়কারীর কাছে দুর্বলের ক্ষমার কোন মূল্য নেই। সে মুসলমানকে ক্ষমা করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে, যে যথার্থ পৌরুষকে অক্ষুন্ন রেখে ক্ষমা করার শক্তি ধারণ করে। কেননা এ সব ক্ষেত্রে ক্ষমাশীলতা আল্লাহর কাছে অধিকতর মনোরম বলে গৃহীত এবং সুফল ফলাতেও তাঁর ক্ষমতা নিশ্চিত।

সুতরাং বিশ্ব মানবের এ সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে এর বাস্ত বায়নই সামাজিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি। আগেই বলা হয়েছে, ইসলামী সমাজের সাংগঠনিক ভিত্তি পরিবার। পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলাম আপসহীন। পারিবারিক সততা ও শান্তি সমূলে ধ্বংস করে যৌন ব্যভিচার। ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন ব্যভিচার নরহত্যা অপেক্ষা জঘণ্যতম অপরাধ ও অমার্জনীয় এবং ইসলামী সামাজিক সংস্কৃতির ঘোরতর পরিপন্থি। নরঘাতক একজন মানুষকে হত্যা করে কিন্তু ব্যভিচারী একটি পরিবার তথা সমাজকে হত্যা করে। তাই দৃঢ়তার সাথে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, "ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ এদের প্রত্যেককে একশতটি করে দোররা মার এবং তাদের প্রতি দয়াশীলতা আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তোমাদেরকে যেন বাঁধাগ্রস্ত করতে না পারে"।[৪৩]

মোটকথা, দৈহিক ও মানষিকভাবে মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে, আর সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয় তার নৈতিক জীবন। এজন্যেই তার পক্ষে কাম্য সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে তৎপর হওয়া। মানব জাতির মুক্তি, পরিবেশের উন্নতি বিধান এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ সুগম করার লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখাই ইসলামে সামাজিক সুনীতির প্রধান লক্ষ্য।

ivR‰bwZK Rxe‡b

ইসলামী রাজনীতি গোড়ার কথা হচ্ছে আল্লাহর প্রভুত্ব। যার নাম 'হুকুমতে ইলাহিয়া' বা ইসলামী রাষ্ট্র। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "চূড়ান্ত হুকুম দেয়ার, সার্বভৌমত্বের অধিকার কারোর নেই, আছে কেবল আল্লাহর জন্য। তিনি পরম সত্য কথা বলেন, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী"।[৪৪] ইসলামের দৃষ্টিতে কোন দেশের অধিবাসীই দেশের প্রকৃত মালিক নয়, বরং আল্লাহই হচ্ছেন সমগ্র

৪৩। আল কুরআন, ২৪:২

৪৪.। আল কুরআন, ৬:৫৭

Dhaka University Institutional Repository

দেশ ও রাজ্যের মালিক। তিনি দেশ ও এর অধিবাসী তথা সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী নিজ ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য আল্লাহর বিধান অনুসারেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত আদেশ-নিষেধই ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। অন্যান্য নবীর মত হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। আল্লাহ প্রেরিত নির্দেশাবলীর আলোকেই তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের নমুণা দিয়ে গেছেন। কোন আইনসভা, কোন শাসন কর্তৃপক্ষ বা কোন বিচার সভা এ নমুণার পরিপন্থি কোন নির্দেশ দিতে পারে না। কারণ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। দ্বীন তাই পরিবর্তনহীন নিত্য।[৪৫]

ইসলাম মানবতার মঙ্গলের জন্য এমনি চরিত্রেরই বিকাশ ঘটাতে চায় এবং এ চরিত্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থরূপে বহণ করা সম্ভব। একজন ব্যক্তি অথবা একটি পরিবার যারা সমাজের সদস্য অথবা একজন রাষ্ট্র পরিচালক অথবা একজন নেতা, যিনি শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধার অধিকারী, এদের সকলের করণীয় হল নিজস্ব দায়িত্বের অন্তর্নিহিত সে কর্তব্যসমূহ পালন করা। ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করবেন জনগণের কল্যাণে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নর-নারী নিজের ব্যক্তিগত, ব্যবহারিক জীবনে ও সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রকে তার মহান কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও সততার সাথে সাহায্য করবেন। কারণ শুধু রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতি নন, প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর রবুবিয়াতের খলীফা।

এখানে কেউ কারও দাস-প্রভু নয়, সকলে ভাই-ভাই, আল্লাহর দাস এবং একমাত্র তারই অধীন। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোন বৈষম্য বিরাজ করে না। তবে এ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের কিছু গুণ থাকা চাই। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য বান্দারাই ইসলামী হুকুমতের অধিকারী হয়ে থাকেন"।[৪৬] নিম্নোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিই ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি-

১। অকলংক আদর্শ, ইসলামী চরিত্র।

২। জরুরী ইসলামী জ্ঞান ও ইসলামী আদর্শ সচেতনতা।

৩। শারীরিক ও মানষিক সুস্থ্যতা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা।

৪। আদর্শ রাষ্ট্র চালনার মত বুদ্ধিজ্ঞান, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা।

৪৫| David de Santillana, ***Law and Society,*** *The legacy of Islam,* London : 1931, P . 286
৪৬। আল কুরআন, ২১:১০৫

Dhaka University Institutional Repository

৫। ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা ও শত্রুকে প্রতিরোধ করার উপযোগী সাহস।[৪৭]

ইসলামী রাষ্ট্রে দু'শ্রেণির নাগরিক থাকে মুসলমান ও জিম্মি। মুসলমান নাগরিকগণ আল্লাহর বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে। প্রত্যেক নাগরিকের জীবন, ধন, মান, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যক্তিগত মতামত ও বিশ্বাস করার, মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার রয়েছে। এ মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি নাগরিকের প্রতি কতগুলো দায়িত্ব আরোপিত হয়। যেমন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার, শাসন কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তরিক সহযোগিতা, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য জান-মাল কুরবান। এজন্য আল্লাহপাক ঘোষণা করেন,"আল্লাহর অনুগত হও, তাঁর রসূল (সা.)-কে অনুসরণ করে চল এবং তোমাদের মধ্য হতে (নির্বাচিত) আমীরের অনুগত হয়ে থাক"।[৪৮]

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকের মত অমুসলিম নাগরিক বা জিম্মিরাও জীবন, ধন, সম্মান, বিশ্বাস, সংস্কৃতির অধিকার লাভ করে থাকে।[৪৯] জিম্মিদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন পালনের অধিকার ও ধর্ম প্রচারের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের অধিকার নেই।[৫০] কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়া তারা রাষ্ট্রে যে কোন পদে নিযুক্ত হতে পারেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিম, অমুসলিম নাগরিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও সাধারণ নাগরিকের দায়িত্ব এক আল্লাহর রবুবিয়াতের প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীনের নির্দেশানুযায়ী নিজেদের রাষ্ট্র ও সমষ্টি জীবন পরিচালনা করা। দায়িত্বার্পিত নাগরিকগণ স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা ভুল করলে অপরের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাকে সাহায্য করা বা সংশোধন করা। এজন্য এ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের কার্যক্রম জনসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি নাগরিক তার সমালোচনা করে তা সংশোধনের অধিকার রাখে। এ আদর্শের অনিবার্য ফল আইনের শাসন।[৫১]

৪৭। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx ivRbxwZi fwgKv, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ . ৫৮

৪৮। আল কুরআন, ৪:৫৯

৪৯। মুহাম্মদ আবদুর রহীম , cÖv¸³, পৃ . ৬০

৫০। Abul Ala Maududi, *(Tr. Khurshid Ahmed), Islamic Law and Constitution*, Islamic cultural center, Dhaka : 1969, P.145

৫১। শাহেদ আলী, cÖv¸³, পৃ . ১৮

ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বিচারালয়ে উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই সমান। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলে সাধারণ অপরাধীর মত আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য এবং সাধারণ আসামীর মতই তার বিচার হবে।[৫২]

শান্তির আকাঙ্খা ও ধৈর্যশীলতা মুসলমানদের জাতীয় জীবনে এক উজ্জ্বল দিক। ইসলাম বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, "কাফির যদি সন্ধি করার জন্য নতি স্বীকার করে তবে তুমি তা গ্রহণ কর এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনেন এবং সব জানেন"।[৫৩] সন্ধি ভঙ্গ করলে তার বিধান প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "সন্ধিতে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির বিশ্বাসঘাতকতা করার আশংকা আছে মনে করলে তার সন্ধি ফেরত দাও। ফলে উভয় দলই সমান হবে। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের মাত্রই ভালোবাসেন না"।[৫৪]

স্বাধীনতা অন্ন-বস্ত্রের ন্যায় মানুষের মৌলিক অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রে কোন আমলা, এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানেরও বাকস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।[৫৫] বাকস্বাধীনতা না থাকলে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এভাবে যে সমস্ত মূল্যবোধ ইসলামী রাষ্ট্রীয় আদর্শের সহায়ক সেগুলোর অনুশীলন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে তাদের প্রয়োগ রাজনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।[৫৬] মানবতার ঐক্য বিধানের জন্য মহানবী (সা.) তার উম্মতের কাছে যে দ্বীনকে সমস্ত পৃথিবীর ব্যপ্তিতে ছড়িয়ে দিলেন তা কোন নতুন ধর্মমত নয়। এটা সে একই ধর্ম, যা প্রকৃতির গভীরে প্রোথিত যা সকল জাতির নবীদের কাছেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং চিরন্তন তার কর্মপ্রবাহ।

ইসলাম মানব জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম, মানুষের সামগ্রিক চেতনার পরিপূর্ণ পরিচয়। আমীর আলী বলেন, "ইসলাম শুধু একটা মতবাদ নয়, এটা বর্তমান কালে জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সৎকর্ম, সৎচিন্তা ও সত্য কথনের ধর্ম। এটা ঐশী প্রেম, সার্বজনীন বদান্যতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত"।[৫৭]

৫২। মুহাম্মদ আবদুর রহীম , cÖv¸³, পৃ . ৬১
৫৩। আল কুরআন, ৮ : ৬১
৫৪। আল কুরআন, ৮ : ৫৮
৫৫| শামছুল আলম, Bmjvgx ivó, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮১, পৃ .৭৮
৫৬। শাহেদ আলী, cÖv¸ß, পৃ . ১৯
৫৭। Sayed Amir Ali, Op. cit., P.178

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা। মানুষের জ্ঞান, বিশেষত বস্তুনির্ভর জ্ঞান আপেক্ষিক হওয়া সত্ত্বেও সীমিত জ্ঞানকে অবলম্বন করে বিভিন্ন মানুষ নিজেদের জন্য জীবন বিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রয়াস পেয়েছে মানব জীবনের মূল সুর আবিষ্কারের। এ সব করতে গিয়ে তার মানব জীবনের এক এক দিকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে অন্য দিকগুলোর প্রতি করেছে অমার্জনীয় অবহেলা।

ফলে তা সমাজে ডেকে এনেছে সংকট, সংঘাত আর অভিশাপ। ইসলাম জীবনের কোন বৃত্তিকেই তুচ্ছ মনে করে না, আবার কোনটিকেই জীবনের একমাত্র নিয়ন্তাও মনে করে না। তাই ইসলাম সমষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতির সকল বৃত্তিরই সুসামঞ্জস্য ও কল্যাণমুখী পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবনে ও বাস্তব পরিবেশে তার প্রকাশ চায়। আর এটাই ইসলামী সংস্কৃতি।[৫৮] এটাই মানব সত্তার পূর্ণ বিকাশ তথা মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার পরম পরিণতি লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা।

পাশ্চাত্য মণীষীদের অনেকেই ইসলামের এ অপরিসীম প্রভাব ও প্রাণ শক্তিতে উৎসাহিত হয়েছে এবং ভবিষ্যত মানবতার মুক্তির আলোকবর্তিকা খোঁজে পেয়েছেন ইসলামেই। ঐতিহাসিক টয়েনবীর ভাষায়, "দু'টি সুস্পষ্ট সংকট দেখা দিয়েছে। একটি মনস্তাত্ত্বিক অপরটি বস্তুগত। কসমোপলিটান প্রলিতারিয়েতের (তথা পাশ্চাত্য মানবতা) যুগে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাবশালী উপাদান হচ্ছে গোষ্ঠি সচেতনতা ও অ্যালকোহল। এ দুটি কুৎসিত বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইসলামী চেতনা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে, যা ভেবে দেখার বিষয়। পাশ্চাত্য সমাজে যদি তা গৃহীত হয়। তবে উন্নত নৈতিক সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। মুসলমানদের মধ্যে গোষ্ঠি চেতনার বিলোপ ইসলামের উল্লেখযোগ্য নৈতিক সাফল্য। সমকালীন দুনিয়ায় যা ঘটেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ইসলামের এ নীতি প্রচার করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এটা সহজেই বোধগম্য যে, ইসলামী চেতনা সৃষ্টির কাজ হবে বিশ্বে শান্তি ও সহণশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

অ্যালকোহলের কুপ্রভাব এ অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠির মধ্যে ব্যাপকতর রূপ লাভ করেছিল, পাশ্চাত্য সমাজ তাকে আরও উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বস্তুত পক্ষে এমনকি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেও কোন একটা সম্প্রদায়কে সামাজিক অনাচার থেকে মুক্ত করা যায় না, যতক্ষণ না তাদের মুক্তির আকাংখা থাকে, সে আকাংখাকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত তৎপরতা রূপায়িত করার ইচ্ছা সৃষ্টি না হয় এবং সে জনগোষ্ঠির অন্তর থেকেই তা জাগ্রত না হয়। আজ পাশ্চাত্য 'অ্যাংলো স্যাকসন' প্রশাসকরা তাদের অধীনস্ত নেটিভদের স্বাভাবিক বর্ণ পার্থক্যের কারণে নিজেদেরকে আত্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নেটিভদের ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি

৫৮। আবুল হাশিম, Bmjvgx ms¯'wZi i|c‡iLv, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৬৭, পৃ .৬১

Dhaka University Institutional Repository

কমই আশা করা যায়। এক্ষেত্রেই ইসলাম যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সম্প্রতি দ্রুত গড়ে উঠা এসব গ্রীষ্মাঞ্চলীয় উন্মুক্ত সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এক ধরণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। যা একই সাথে দিয়েছে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শূণ্যতা। তাই ভবিষ্যতের পাতায় আমরা মন্তব্য রাখছি, তাহলো পাশ্চাত্য সমাজের কসমোপলিটান প্রলিতারিয়েতদের সরিয়ে দিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় এর জাল বিস্তৃত হবে এবং সমগ্র মানবতা ইসলাম কবুল করবে। এরপর আমরা অনুমান করেতে পরি সুদূর ভবিষ্যতে সমাজে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে ইসলাম কতিপয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে"।[৫৯]

এইচ. এ. আর গীব বলেন, "পাশ্চাত্য দুনিয়ার চরম বিরোধী মতবাদগুলোর মধ্যে ইসলাম এখনও ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। একদিকে যেমন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের অরাজকতার বিরোধিতা করে তেমনিভাবে রাশিয়ানদের দমণমূলক সাম্যবাদেরও বিরোধিতা করে। অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে ইসলাম ততটুকু গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়নি যেমন চলছে আজকের দিনের ইউরোপ ও রাশিয়ায়। ইসলামে প্রত্যেক নাগরিক তার সম্পদের এক দশমাংশ সমাজের জন্য দান করার ব্যবস্থা থাকায় সাম্যবাদী মতবাদসমূহের যোগ্যতা এতে রয়েছে। ইসলাম অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়, ব্যাংকিং পুজি, রাষ্ট্রীয় ঋণ, বিশেষ প্রয়োজনে পরোক্ষ কর আরোপ ইত্যাদির বিরোধিতা করে। কিন্তু পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের অধিকার এবং ব্যবসার মাধ্যমে পুজি সংগঠনের অধিকার স্বীকৃতি দেয়। ফলে ইসলাম বুর্জোয়া পুঁজিবাদ ও বলশেভিক সাম্যবাদ এ মতবাদ দুটির মধ্যবর্তী অবস্থান দখল করে আছে।

অপরদিকে নিরবচ্ছিন্ন মানবতার সেবা করার প্রচেষ্টা ইসলামে রয়েছে। ইউরোপের চাইতে অধিকতর বাস্তবভিত্তিক ও ঘনিষ্টভাবে ইসলাম প্রাচ্যের পাশে এসে দাঁড়ায়। ইসলামের রয়েছে আন্তঃবর্ণ সহযোগিতা ও সহ অবস্থানের চমৎকার ঐতিহ্য। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সমমর্যাদা ও সুযোগ প্রদানের এত উদ্যোগ কোন সমাজ নেয়নি। এবং এতবেশী সফলতা আর কোন সমাজ অর্জন করতে পারে নি। বিভিন্ন বর্ণ এবং ঐতিহ্যের মধ্য মীমাংসার অযোগ্য সমস্যাসমূহের পূর্ণ মীমাংসা করার ক্ষমতা ইসলামের রয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাতের মত দুই বৃহৎ সমাজের মধ্যে বিরোধিতার পরিবর্তে যদি সহযোগিতা কায়েম করতে হয় তবে ইসলামের মধ্যস্থতা হবে অপরিহার্য শর্ত। প্রাচ্যের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপ যেসব সমস্যার মুকাবিলা করছে তার সমাধান বহুলাংশে ইসলামের হাতে রয়েছে। কিন্তু ইউরোপ যদি ইসলামের সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেয় তবে

---

৫৯. Arnold Toyenbee, ***Civilization on Trial***, London : 1859, P . 205

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ের পরিনতি হবে মারাত্মক।[৬০] জর্জ বার্ণার্ড শ বলেন, "আশ্চর্য প্রাণশক্তির জন্য মুহাম্মদের ধর্মকে আমি সশ্রদ্ধ মনোভাব নিয়ে বিবেচনা করেছি। আমার মনে হয়েছে যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা মানবিক অস্তিত্বের পরিবর্তনশীল সকল স্তরকে সমন্বিত করতে সক্ষম যার ফলে তা সকল যুগের কাছে আবেদনশীল। আমি তাঁকে, সে আশ্চর্য মানবকে অনুধাবণ করেছি এবং আমার ধারণায় খ্রিস্ট বিরোধী হওয়া দূরে থাক, তাকে মানবতার ত্রাণকর্তা বলে চিহ্নিত করা উচিত। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর মত একজন ব্যক্তি যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়ক হয়ে আসতেন তাহলে এমন এক পদ্ধতিতে সকল সমস্যার সমাধান রচনায় তিনি সফল হতেন, যাতে করে বিশ্বে বহু আকাংখিত সুখ ও শান্তি নেমে আসত। মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে আমি ভবিষ্যদ্বানী করছি যে, আগামী দিনের ইউরোপের কাছে তা সরাসরি গৃহীত হবে, যেমন আজকের ইউরোপের কাছে তা ইতিমধ্যেই গ্রহণীয় হতে শুরু করেছে"।[৬১]

A_‰bwZK Rxe‡b

সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রতি এবং বিভিন্ন সমাজ সদস্যের মধ্যে সুখী সম্পর্ক রচনার প্রতি ইসলাম আদ্যোপান্ত সজাগ। ইসলাম মানুষের জন্য শুধু এক উন্নত ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থাই উপস্থাপন করেনি, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গঠন করার জন্য এক নির্ভুল ও উজ্জ্বল অর্থ ব্যবস্থাও পেশ করেছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ তার 'রব'। যিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা ও বিবর্তক তিনিই রব।

আল্লাহ মানুষকে তাঁর 'রব' গুণের খলীফা করে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "তিনিই সে-ই, যিনি তোমাকে তাঁর প্রতিনিধি (খলীফা) হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে তিনি শ্রেণি মর্যাদায় আর সকলের উপর উন্নীত করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা-ই দিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন"।[৬২]

এখানে 'খলীফা' কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির মর্ম উপলব্ধি করা যায়। খলীফা অর্থ প্রতিভূ। আল্লাহ যে নিয়মে জীবের সৃষ্টি, পালন ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রন করেন সে নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে তার সৃষ্ট অপরাপর জীবকে পালন করার দায়িত্ব অর্পণ করে মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' করেছেন। জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা শোষণ বা শাসনের নয়, পালনের। এটাই খিলাফতের তাৎপর্য। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,"মহান আল্লাহ যার কাছে আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ, মর্ত্যে যা কিছু আছে কোন কিছুই গোপন নয়"।[৬৩]

৬০। H.A.Gibb, ***Whither Islam***, London : 1932 , P.379

৬১। George Barnard Shaw, `The Genuine Islam', *The New encyclopedia Britanica*, 15th edition, printed in USA Vol.1, Singapore : 1963

৬২। আল কুরআন, ৬ : ১৬৫

৬৩। আল কুরআন, ৩ : ৫

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সবকিছুর উপর নিরঙ্কুশ অধিকার আল্লাহর। এ সবের মালিক মানুষ বা ব্যক্তি সমষ্টিও নয়, রাষ্ট্রও নয়। এগুলোর ভোগের অধিকার রয়েছে কেবল মানুষের। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষ জড় সম্পদ অধিকার করবে মালিকরূপে নয়, আল্লাহর 'রব' গুণের প্রতিভূরূপে। এ সম্পদের ব্যবহার করতে হবে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী। ভোগের স্বত্বাধিকার তাদের অর্জন করতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "সে আল্লাহ যিনি যমীনকে তোমাদের (জীবিকা উপার্জনের জন্য) অধীন, অনুকূল ও বিনয়ী, নম্র, মসৃণ করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর ক্ষেত্রসমূহে শ্রম সাধনা করে (জীবিকা উপার্জন কর) এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক ভোগ কর"।[৬৪]

কোন সঙ্গত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক নিম্নমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মের সংস্থান এ মৌল জীবিকাপোকরণসমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মেটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,"এবং আল্লাহর সেবা কর। কোন কিছুকে তাঁর শরীক বলে গণ্য করো না। দয়াশীলতা দেখাও পিতামাতার প্রতি, তোমার নিকটাত্মীয়ের প্রতি, অনাথদের প্রতি, অভাবীর প্রতি, তোমার প্রতিবেশীর প্রতি, যে তোমার জ্ঞাতী অথবা যে তোমার জ্ঞাতী নয় তার প্রতি, তোমার সহযাত্রীর প্রতি, মুসাফিরের প্রতি এবং তাদের প্রতি তোমার দক্ষিণ হাত যাদের ধারণ করে আছে"।[৬৫]

এ দায়িত্ব পালনের নাম হল 'হক্কুল ইবাদ'। পবিত্র কুরআনে 'সালাত' শব্দটির সাথে 'যাকাত' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যার মর্মার্থ হল 'হক্কুল ইবাদ' আদায় না করলে নামায হয় না। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ ব্যাপারে কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, "যে ব্যক্তি ইয়াতিমের দুশমন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দানে বিমুখ এবং প্রতিবেশীর কল্যাণের প্রতি উদাসীন সে দ্বীনকে অস্বীকার করে, তার সালাত অশুদ্ধ ও প্রদর্শনী সর্বস্ব এবং এ প্রকার মুসল্লিগণ অভিশপ্ত।[৬৬]

সুতরাং বলা যায় যে সমস্ত মূল্যবোধ ও গুণ অর্থের উপার্জন ও ব্যবহার সর্ম্পকে এ মানষিকতার উৎকর্ষ সাধন করে তাদের পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে সেগুলোর ফলিত রূপ অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।[৬৭]

৬৪। আল কুরআন, ৬৭:১৫
৬৫। আল কুরআন, ৪:৩৬
৬৬। আ্ল কুরআন, ১০৭:১-৪
৬৭। শাহেদ আলী, CvߠÕ, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡"Q'

Bmjv‡g gvbevwaKvi

RwZms‡Ni gvbevwaKvi †NvlYv

১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ যে মানবাধিকার ঘোষণা করে তাতে বলা হয়, মানুষ হিসেবেই মানুষের কতগুলো অধিকার রয়েছে। সে অধিকারসমূহের মর্যাদা রক্ষা করা সকলেরই কর্তব্য। সে অধিকারসমূহ হলো : স্বাধীনতার অধিকার, সাম্য ও সমতার অধিকার এবং মালিকানার অধিকার। দুনিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলের বহু মণীষীই এ ঘোষণাকে বিংশ শতাব্দীর বিরাট চ্যালেঞ্জ অভিধায় অভিহিত করেছেন। এর পঁচিশ বছরের বেশি কাল পরে ১৯৭৮ সনে জাতিসংঘের অধীনে UNESCOO নামের একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। তার পক্ষ থেকে মানবাধিকার পর্যায়ে নিম্নোক্ত চারটি সুপারিশ গৃহীত হয়:

১. বিভিন্ন দেশের সংবিধানে জরুরী ও অস্বাভাবিক অবস্থায় সরকারকে যে বিশেষ ও ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়, তা পরিবর্তন করতে হবে।

২. সকল মানের শিক্ষা সূচীতে মানবাধিকার সম্পর্কিত শিক্ষা শামিল করতে হবে।

৩. মানবাধিকারের ইতিহাস ও দর্শন পদ্ধতি শামিল করতে হবে এবং তাতে ত্রুটি প্রবেশের কারণসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

৪. সব দেশের কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে সাম্য ও সমতার ঘোষণা দিতে হবে। অধিকার, মান-মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা কার্যকর করতে হবে।[৬৮]

৫. কিন্তু এ সত্ত্বেও আজও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ও শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিভেদ ও বৈষম্য প্রচণ্ড হয়ে রয়েছে। মানুষ মানুষের উপর নির্মম নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্ভবত এ পর্যায়ের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য চেষ্টা 'নিউ টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ডেনমার্কের ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। পরে এ রকমেরই একই লক্ষ্যে আরও একটি প্রতিষ্ঠান বোষ্টনের ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে।

বোষ্টনে গঠিত এ সংস্থার প্রধান ডা. নেলসন বলেছেন, বহু সংখ্যক সরকার প্রতিপক্ষকে জব্দ ও দমণ করার জন্য নিপীড়নকে প্রধান উপায় রূপে গ্রহণ করার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমাদের এ সংস্থাটি গঠিত

৬৮। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvg I gvbevwaKvi, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৮, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। কেননা এ নিপীড়নের কাজটি মহামারী আকারে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। নিপীড়নের মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক প্রতিক্রিয়া অধ্যায়ন এ সংস্থাটির একটি লক্ষ্য বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ডা. নেলসন বলেন, এ ক্ষেত্রে এমন কিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, অধ্যয়নের মাধ্যমে তার মাত্রা নির্ধারণ ডাক্তারদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে তারা অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে আশা করা যায়, এ ব্যাপারটিকে চূড়ান্তরূপ দেয়া সম্ভব হবে।

তবে বিশ শতকের শেষ ভাগে সমগ্র বিশ্ব অন্তত নীতিগতভাবে এ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্য এবং ন্যায়পরতা ও সুবিচার মানবাধিকার হিসেবে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যদিও তার বাস্তবায়ন সুদূর পরাহত ব্যাপার হয়েই আছে এবং থাকবে। এ কথা স্পষ্ট ভাষায়ই বলা যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, সুবিচার ও ন্যায়পরতা বিশ্বে মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু তা মানব পরিকল্পিত নীতিমালার ভিত্তিতে ও নিতান্ত বৈষয়িক-বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনই সম্ভবপর হবে না। তা কেবল ইসলামের মৌল আকীদা বিশ্বাস ও ইসলামী আদর্শবাদের ভিত্তিতেই সম্ভব।

দুনিয়ার মানব পরিকল্পিত ধারণা ও রচিত নীতিমালা শুধু মানুষের সাথে মানুষের শান্তির কথাই বলে। মানবীয় মেধাও এর অধিক ব্যাপক ও সূক্ষ্ম কিছু চিন্তাই করতে পারে না।

RwZms‡Ni †NvlYvi Am¤úYZv

কিন্তু জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। কেননা সে অধিকারসমূহ শুধু সরকার ও রাষ্ট্রসমূহের মুকাবিলায় চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে এক একটি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ শুধু এতটুকু দাবীই করতে পারে যে, তার দেশে তাকে বাঁচার ও স্বাধীনতার অধিকার দেবে। তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, আইনের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা জাতীয়তা, প্রজন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ধন-সম্পদের পরিমাণ বা সামাজিক মৌলিকতা ও রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদির দিক দিয়ে পার্থক্যহীন আচরণ পাওয়ার অধিকার দিতে হবে। কিন্তু এ ঘোষণায় মানুষ হিসেবে তারই ভাই অপর মানুষের উপর তার অধিকার রয়েছে, সে বিষয়ে কোন কথাই সে বিশ্ব ঘোষণায় উল্লেখিত হয়নি। শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়েছে যে, নাগরিকগণ পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের ভাবধারাপূর্ণ আচরণ করবে। অথচ আসল ব্যাপার হল, মানুষের একজনের উপর অপর জনের যে অধিকার, রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের উপর নাগরিকের অধিকারের তুলনায় তা অনেক বেশী গভীর ও ব্যাপক। কিন্তু জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্বমানবাধিকার ঘোষণায় তার কোন উল্লেখ নেই।

বস্তুত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটিই মানব জীবনের সার নির্যাস। এ কারণে কুরআন ও সুন্নাহ এর মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের কথা একই সাথে ব্যাপকভাবে ও শক্তি সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে যেমন পিতার অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে সন্তানের অধিকার ও কর্তব্যের কথাও। যেমন স্বামীর অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে তেমনি স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্যের কথা। ভাই ও নিকটাত্মীয়ের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথাও একই সাথে পাশাপাশি বলা হয়েছে। প্রতিবেশী ও সঙ্গীর অধিকার ও কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। গরীব-মিসকীনের অধিকার ও কর্তব্যের কথাও। শাসকের অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলার সাথে শাসিতের অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলে দেয়া হয়েছে। এক কথায় অধিকার ও কর্তব্যের যত দিক ও বিভাগ আছে, তার কোন একটিও কুরআন ও সুন্নাহে বাদ পড়ে থাকেনি। সে ব্যাপারে নতুন কোন দিকই এমন থেকে যায় নি, যে বিষয়ে কারোর কিছু বলার সুযোগ বা অবকাশ থেকে যেতে পারে। তা এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে বলে দেয়া হয়েছে, যা কোন মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কোন বিবর্তন, বিকাশ বা নবোদঘাটনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবকাশ বা প্রয়োজন রয়েছে শুধু অনুধাবণ-উপলদ্ধির, শুধু বিশ্বাস ও গ্রহণ অবলম্বনের এবং শুধু অনুসরণ ও বাস্তবায়নের। জাতিসংঘের বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার অসম্পূর্ণতার দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, তাতে কেবল অধিকারের কথা বলা হয়েছে, কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বলা হয়নি। আর অধিকারের ব্যাপারটিকেও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে স্বাধীনতা, শান্তি, নিরাপত্তা, সাম্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ধর্মপালনমাত্র এ কটির মধ্যে। মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব কোথায়? আমানতদারী রক্ষা করা, আমানতের জিনিস তার প্রকৃত মালিকের নিকট প্রতিশ্রুত সময়ে যথাযথভাবে প্রত্যার্পণ করা কি কর্তব্য নয়? মানুষের উপর তারই মত অপর মানুষের কি কোন হক বা অধিকার নেই? অধিকার কি একতরফা? অপর লোকের সে অধিকার যথারীতি আদায় করা কি কর্তব্য নয়? সে কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বলা না হলে মানবাধিকার কি একতরফা হয়ে যায় না? [৬৯]

মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ করা কি মানুষের কর্তব্যভুক্ত নয়?

কর্মে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা, বাতিল পন্থায় লোকদের ধন-মাল হরণ না করা, যুলম থেকে বিরত থাকা, ধোঁকা না দেয়া, কাউকে না ঠকানো, কারোর সহিত বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ না করা, মুনাফিকী না করা,

৬৯। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, C/, ³, পৃ. ২২-২৩

মিথ্যা না বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া, উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়া, নম্রতা সহৃদয়তা দয়ার্দ্রতা গ্রহণ, কারুর প্রতি অকারণ খারাপ ধারণা পোষণ না করা, কারুর দোষ খুঁজে না বেড়ানো, পরের দোষ না গাওয়া, চোগলখুরী না করা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো থেকে বিরত থাকাও তো মানুষের কর্তব্য।

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা, সহজাত ক্ষমতার সৃজনশীল বিকাশ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় কতিপয় অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার। এগুলো এমন অধিকার যেগুলো ব্যতীত মানুষ সত্যিকার মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে না। অধিকারগুলো মানুষের মূল্য ও মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং মানুষরূপে জন্ম লাভ করার কারণে তার জন্মগত অধিকার।[৭০] তাই সৃষ্টিকর্তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সমভাবে এ অধিকারগুলো প্রদান করেছেন। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বলেই সম্ভবত এসব অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার বলা হয়। অধিকারগুলোকে প্রাকৃতিক আইনের আওতায় প্রাপ্য মানুষের অধিকার হিসেবে অভিহিত করে বলা হয় যে, "Rights thought to belong to the individual under natural law as a consequence of his being human."[৭১] প্রকৃতপক্ষে মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সহজাত, সার্বজনীন ও অহস্তান্তরযোগ্য কিছু অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার।[৭২]

gvbewaKv‡ii msÁv

UNO এর Universal Declaration of Human Rights, 1995 এর Preamble- এ মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Recognition of the inherent dignity of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom justice and peace on the world."[৭৩]

অন্যভাবে বলা যায়, "Human rights are mostly inherent and natural rights. The execution, Preservation or enjoyment of these rights are not aboigenetic.

৭০। সৈয়দ শওকতুজ্জামান, gvbewaKvi, mvgwRK b¨vqwePvi I mgvRKj¨vY, সোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ২০০৫, পৃ. ৬৮
৭১। U.N.O-এর ***Universal Declaration of Human Right***, 1945- এর preamble
৭২। U.N.O-এর ***Universal Declaration of Human Right***, 1945- এর preamble.
৭৩। Moses Moscowity, ***Human rights and world order***, Occana publications, inc, New York, Appendix-1, P.199

Dhaka University Institutional Repository

Without the effective environmental and structural foundation the enjoyment of human rights is simply impossible."[৭৪]

R.J. Vincent বলেন, "Human rights are the rights that everyone equally has by virtue of their very humanity and also by virtue of their being grounded in our appeal to our human nature."[৭৫]

অর্থাৎ মানবাধিকার বলতে সে সব অধিকারকে নির্দেশ করে যেগুলো শুধু মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের সমানভাবে রয়েছে এবং মানব প্রকৃতির জন্য মানুষ এ সব অধিকারের প্রত্যাশা করতে পারে।

অন্যদিকে Gealirth Alan বলেন, "Human rights are aspecies of moral rights in which all persons are equal simply because they are humans. Such rights can be arguable or justification though a universal set of valid moral principle."[৭৬]

The New Encyclopedia Britanica তে মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Rights thought to belong to the individual under natural law as a consequence of his being human. The charted of U.N. affairs a faith in fundamental human rights in the dignity and worth of the human person in the equal right of men and women and of nation large and small."[৭৭]

মুহাম্মদ জমির বলেন, "Human rights have gradually evolved over the years and are based on mankind's increasing demand for a life in which the inherent dignity and worth of each human being will receive respect and protection."[৭৮]

এ প্রসঙ্গে মোস্তফা জামান ভূট্টো বলেন, "মানবাধিকার হচ্ছে সে অধিকার যা মানুষকে সুস্থ্য, সুন্দর ও শান্তিময় জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেয়। মানুষকে বিশিষ্টতা প্রদানে সহায়তা করে। বলা যায় কারও

৭৪। Begum Rokeya, 'Human rights-An overview in Historical Perspective' *The Journal of Social Development*, Vol.2, No-1, Dec. India, 1997, P. 185

৭৫। As quated Dr. D. P. Khanna, ***IPS: Reforming Human Rights***, P. 16

৭৬। Gretirth Alan, ***Human rights: Essays on Justifications Application***, Chichago University Press.U.S.A : 1982, P.1

৭৭। **William Benton , 'A world religion', *The New Encyclopedia Britanica,* 15th edition,** Vol.V, U.S.A: 1986, P. 200

৭৮। Muhammad Zamir, ***Human rights: Issues and International Law,*** UPL Dhaka : 1990, P.1

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার হরণ করা হলে সে আর সুস্থ্য মানুষ থাকে না। গুটিকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া চিন্তাশক্তি উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কথা বলার যোগ্যতা মানুষের সহজাত, কোন রাষ্ট্র, সরকার বা সার্বভৌম শক্তি তাকে এসব প্রদান করে না। মানুষের জীবনটাও কোন রাজনৈতিক না সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। তাই রাষ্ট্র, সরকার কিংবা অন্য কোন শক্তি মানুষের এ সব অধিকার যদি কেড়ে নেয় তাহলে প্রকারান্তরে ঐ মানুষের মানবাধিকারই কেড়ে নেয়া হয়। হরণ করা হয় সহজাত মানবিক বৈশিষ্ট্য" ।[৭৯]

ইসলামে মানবাধিকার প্রসঙ্গটি গভীরতর ও ব্যাপকতার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যাত হবার দাবী রাখে।[৮০]

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের বাণী ছিল আল্লাহর একত্ববাদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সে সঙ্গে সততা, ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরহঙ্কার মুল্যবোধের আলোকে মানবজীবনকে সর্বাঙ্গীন করা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সৃষ্টি করে আইনের মাধ্যমে মানব সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠা।[৮১] মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মদীনা প্রজাতন্ত্রে ৬২২ সালে প্রণীত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদ' এ সকলের জন্য অনেকগুলো অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ইসলামী আইনে সংযোজিত মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারের নীতিসমূহই বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে পরিণত হয়েছে।[৮২]

বর্তমান পাশ্চাত্য ধারার মানবাধিকারের সাথে ইসলাম ধর্মে বর্ণিত মানবাধিকার পরিধি ও তাৎপর্যগত দিক দিয়ে পার্থক্যপূর্ণ হলেও বর্তমানে মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত বিভিন্ন অধিকারসমূহ অধিকতর অর্থবহভাবে ইসলামে ঘোষিত হয়েছে। [৮৩]

তদুপরি এসব প্রচলিত ধরণের মানবাধিকার ছাড়াও মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্ব ও বিকাশ তথা কল্যাণের স্বার্থে ইসলামে সুক্ষতরভাবে আরও অসংখ্য অধিকার ও কর্তব্য উল্লেখিত আছে । এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্মে ব্যক্ত উল্লেখযোগ্য মানবাধিকারগুলো হলো :

৭৯। মোস্তফা জামান ভুট্টো, ÔgvbevwaKvi wb‡q fvebvÕ, *Amity-a-Voice of Humanity*, Vol.1, May-2002, P.1

৮০. F.K.M. Munim, ***'Rights of the Citizen under Constitution and law'***, Bangladesh Institute of Law and International Affairs Dhaka : 1975, P . 2

৮১. আবুল কাসেম, ÔgvbevwaKvi msi¶Y I ev¯Íevq‡b gvbevwaKvi Kgxi fwgKvÕ, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, ঢাকা : ১৯৯০, পৃ.২০

৮২. M. Ershadul Bari, ***Human Rights in Islam with special reference to women rights***, paper presented at the international Seminar on Human Rights in Islam, Sonargaon Panpacific Hotel, 5th Oct, Dhaka : 1994 , P.5

৮৩. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, cv¸ ³, পৃ .৬৮

Dhaka University Institutional Repository

Rxe‡bi AwaKvi I wbivcËv

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবনের অধিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক একটি অধিকার। কেবল এ অধিকারটি প্রাপ্তির পরই মানুষ অন্যান্য অধিকার ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। মানুষের জীবনের অধিকারের নিশ্চয়তা নিরাপত্তার জন্য ইসলামে বেশ কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে । যেমন -

gvbl nZ¨v wbwl×

কুরআন ও সুন্নাহতে মানুষ হত্যাকে এক জঘণ্য পাপ ও আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং হত্যাকারীকে 'হুদূদ'[৮৪] পর্যায়ের শাস্তি 'কিসাস' বা মৃত্যুদণ্ডে (অবস্থাভেদে অন্য দণ্ডে) দণ্ডিত করা হয়েছে।[৮৫] যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ। হত্যার ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস ফরয (বাধ্যতামূলক) করা হয়েছে"।[৮৬] "তোমরা এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা কর না, যাকে আইনগত সিদ্ধান্ত ব্যতীত হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন"।[৮৭] কুরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আমি বনী ইসরাইলের প্রতি (এ বিধান) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি, যে ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে যে হত্যার অপরাধে অপরাধী নয়, কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে কোন ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রাখে"।[৮৮] কুরআনের এ আয়াতে 'একজন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করার মাধ্যমে সকল মানুষকে হত্যা করা হয়'- এ উক্তি করে হত্যাকর্মের জঘণ্যতাকে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা জীবন ও বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, জীবন বেঁচে থাকবে এবং এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিকাশ ও উন্নয়ন দ্বারা এ বিশ্বশান্তি, সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভরে উঠবে। সুতরাং ব্যক্তির জীবনকে ধ্বংস করার মাধ্যমে মূলত সমগ্র মানবজাতির জন্য সম্ভাব্য কল্যাণ ও সৃষ্টিকর্তার মহান উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও নর হত্যাকে জঘণ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, "সবচেয়ে জঘণ্য অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানানো এবং

---

৮৪. হুদূদ শাস্তি হচ্ছে যা কুরআনে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। এর বিপরীতে রয়েছে তাযির এর শাস্তি যা ইসলামী আদালত অবস্থাভেদে নির্ধারণ করে থাকে।

৮৫। দণ্ডার্হ নরহত্যার শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, গাজী শামছুর রহমান," কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফৌজদারি আইনের সংশোধন", BmjvwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ . ৩০৫

৮৬. আল কুরআন, ২:১৭৮

৮৭. আল কুরআন, ১৭:৩৩

৮৮. আল কুরআন, ৫:৩২

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে হত্যা করা”।[৮৯] তিনি আরও বলেছেন, “যে বক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ মানুষকে (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) হত্যা করে, সে এমনকি বেহেশতের সুগন্ধিও পাবে না”।[৯০]

সুতরাং সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত জীবনের এ প্রাকৃতিক মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘণ কোন পরিস্থিতিতেই অনুমোদনযোগ্য নয়, কেবল দু'টি কারণ ব্যতীত-এক. কেউ কোন নির্ভরযোগ্য আদালতে দণ্ডার্হ নরহত্যা অনুষ্ঠিত করেছে বলে প্রমাণিত হলে এবং দুই, কোন ব্যক্তি কোন নির্ভরযোগ্য আদালতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে দণ্ডার্হ হলে। এ দু'টি পরিস্থিতি ব্যতীত অন্য যেকোন পরিস্থিতিতে মানুষের বেঁচে থাকার সার্বজনীন অধিকার ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে। এ অধিকার লঙ্ঘণকারী শরীয়া আইনে দণ্ডার্হ অপরাধ সংঘটনকারী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পেশাগত, মর্যাদাগত, রাজকীয় বা কূটনৈতিক বিশেষ মর্যাদা নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য বিচার-বিবেচনার একই মুল্যবোধ ও মান অনুসৃত হয়েছে।

AvZ¥nZ¨v wbwl×

আত্মহত্যা প্রাণ সংহারের এক অমানবিক ও কাপুরুষোচিত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় আত্মহত্যাকারীরা নিজেরাই নিজেদেরকে জীবনের মুল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে থাকে। আল কুরআনে এ প্রবণতাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলা হয়েছে, “তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাপ্রবণ”।[৯১] সুতরাং আত্মহত্যা না করে বরং নিজের অসহণীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের প্রত্যাশী হতে কুরআনে মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগানো হয়েছে। শরীয়া আইনের দৃষ্টিতে আত্মহত্যাকারী সৃষ্টিকর্তার সকল পার্থিব অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়। এ কাজে সহায়তাকারীও তা'যিরের দণ্ডে দণ্ডার্হ হয়ে থাকে”।[৯২]

beRvZK nZ¨v wbwl×

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব থেকে আরব সমাজে নবজাতক বিশেষত মেয়ে শিশুদেরকে জন্ম লাভের পরপরই দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা বা জীবন্ত প্রোথিত করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। ইসলাম শিশু হত্যার

---

৮৯. ইমাম মুসলিম, mnxn gmwjg, বাবু বায়ানিল কাবায়িরি ওয়া আকবারুহা, হাদীস নং- ২৭১
৯০. ইমাম নাসাঈ, mbvb Avb bvmvC, বাবু তা'জীমু কতলিন মু'আহিদ, হাদীস নং- ৪৭৫০
৯১. কুরআন, ৪:২৯
৯২. গাজী শামছুর রহমান, 'কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফৌজদারী আইনের সংশোধন', BmjvwgK dvD‡Ükb cwÎKv, জুলাই-সেপ্টেম্বর,ঢাকা : ১৯৯২, পৃ . ৩০

Dhaka University Institutional Repository

এ জঘণ্য প্রবণতাকে দণ্ডার্হ অপরাধ ঘোষণা করে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শিশুদের জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে।[৯৩] কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,“দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা এক জঘণ্য অপরাধ” ।[৯৪]

অন্যত্র তিনি ঘোষণা করেছেন, “যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে প্রশ্ন করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?”[৯৫]

এ আয়াতে নিরপরাধ নবজাতকের জীবনের অধিকার লঙ্ঘণের বিষয়টিকে প্রশ্নাকারে মানুষের চেতনার কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছে যাতে করে তারা (মানুষেরা) তাদের (শিশুকন্যাদের) জীবনের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে তৎপর হয়।

নবজাতক বিশেষত মেয়ে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যদি কোন পরিবারের একের পর এক মেয়ে শিশু জন্মলাভ করে এবং তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করেন, তাহলে সে শিশুরা তাদের পিতা-মাতাকে দোযখের অগ্নি থেকে রক্ষা করবে” ।[৯৬] রাসূলের এ ঘোষণায় মেয়ে শিশুদের জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশংসনীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

MfcvZ wbwl×

জীবনের অধিকারকে হরণ করা হয় বলে ইসলাম গর্ভপাতকে অনুমোদন দেয় না বরং এতে ফৌজদারি আইনের আওতায় দণ্ডার্হ অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। ‘ইসকাত-ই-হামল’[৯৭] ও ইসকাত-ই-জানীন’[৯৮] এ উভয় পদ্ধতিতে গর্ভপাত সংগঠন ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ (তা’যির-এর দণ্ডে দণ্ডার্হ অপরাধ হিসেবে গণ্য) হয়েছে।

---

৯৩. গাজী শামছুর রহমান, cÖ¸³, পৃ . ৩১

৯৪. আল কুরআন, ১৭:৩১

৯৫. আল কুরআন, ৮১:৮-৯

৯৬. ইমাম আলী আল রিদা, gmbv‘, বৈরুত : ১৯৬৬, পৃ. ৮৮

৯৭. ‘ইসকাত-ই-হামল’ হচ্ছে এমন নারীর গর্ভপাত ঘটানো যার গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গসমূহ গঠিত হয়নি। অণুরূপ গর্ভপাত সৎ বিশ্বাসে উক্ত নারীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্য বা তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করবার জন্য না করা হলে তা দণ্ডার্হ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় ঐরূপ নারীর সম্মতি নিয়ে তা ঘটানো হলে অপরাধ সংগঠনকারী যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ দর্শ বছর পর্যন্ত হতে পারে- দণ্ডনীয় হবে। আর তা গুযদি ঐরূপ নারীর স্মৃতি ব্যতীত ঘটানো হয় তা হলে সংঘটনকারী যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে-যার মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে দণ্ডনীয় হবে (গাজী শামছুর রহমান, cÖ¸³, পৃ . ৩০৩)।

৯৮. ‘ইসকাত-ই-জানীন’ হচ্ছে এমন নারীর গর্ভপাত ঘটানো যার গর্ভস্থ কিছু অঙ্গ বা অবয়ব গঠিত হয়েছে। অনুরূপ গর্ভপাত সদ্বিশ্বাসে উক্ত নারীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে না ঘটানো হলে তা দণ্ডার্হ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় যদি (ক) গর্ভস্থ শিশু মৃত ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে ইসকাত-ই-জানীন সংঘটনকারী দিয়াত এর কুড়ি ভাগের এক ভাগ দণ্ডে (খ) যদি শিশু জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় এবং অপরাধীর কোন কাজের ফলে মারা যায়, তাহলে পূর্ণ দিয়াতের দণ্ডে এবং ৯গ) তা’যির স্বরূপ যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডার্হ হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ নারীর গর্ভে যদি একাধিক শিশু থাকে তাহলে অপরাধী ঐরূপ প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথক ‘দিয়ত’ বকা তাযির- অবস্থাভেদে যা প্রযোজ্য হয়, দণ্ডে দণ্ডার্হ হবে। (গাজী শামছুর রহমান, cÖ¸³, পৃ . ৩০৪)।

Dhaka University Institutional Repository

‘vmZ †_‡K ¯vaxbZvi AwaKvi

মানবেতিহাসের শুরুতে মানুষ ছিল স্বাধীন। পরবর্তীকালে দাস প্রথার অভিশাপ স্বাধীনতার এ মূল্যবান অধিকার থেকে মানব সমাজের একটি শ্রেণিকে বঞ্চিত করে। কখন কিভাবে দাস প্রথার উদ্ভব হয়েছিল তা বলা কঠিন। সম্ভবত যুদ্ধের পর বন্দীদেরকে বাঁচিয়ে রেখে দাস-দাসীতে পরিণত করার রেওয়াজ থেকে উদ্ভব হয় এ অমানবিক প্রথাটি। ‘Old Testament’-এর আব্রাহামের (কুরআনে বর্ণিত নবী ইব্রাহীম) কাছে সারাহ্ কর্তৃক হাজেরাকে দাসী হিসেবে অর্পণ এবং জোসেফ (কুরআনে বর্ণিত নবী ইউসুফ) মিশরের খোলা বাজারে দাস হিসেবে বিক্রিয় করার ঘটনা থেকে দাস প্রথার অতি প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও পারসিয়ান সভ্যতায় দাসদের অবস্থা ছিল মানবেতর। তাদের নাগরিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না তাদেরকে হত্যা, নির্যাতন ও শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে দাসপতিরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। শ্বেতাঙ্গকে অপমানিত করার অপরাধে একজন দাস বা দাসীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা বা যে কোন ধরণের মানষিক ও শারীরিক শাস্তি প্রদানের অধিকার স্বীকৃত হয়।

শুধু দাস-দাসীরাই নয়, বরং যে সকল স্বাধীন পুরুষ দাসীদের সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হতো তারাও সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো।[৯৯] Abdullah Kannoun এ সম্পর্কে বলেছেন, “Any American marrying a slave woman was not allowed to hold any public office in south America, lest he should be sympathetic to the Negroes. That is to say, such person lost some of his civil rights as if he had committed a crime.”[১০০]

এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দাস-দাসী ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল স্বাধীন মানুষেরা নিগৃহীত হতে থাকে যে পর্যন্ত না ১৮৯০ সালে দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ করে ব্রাসেলস্ কনফারেন্সে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১০১] দাসপ্রথার অমানবিকতা ও এ সম্পর্কিত মানুষের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য প্রাচীনকালে দার্শনিকগণ অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আঠারো শতকের অধিকাংশ দার্শনিক দাস প্রথাকে সমর্থন করেছেন। দাসপ্রথা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতামত উল্লেখ করে Abdullah Kannoun বলেছেন, “In his opinion, mankind consisted of two categories-the free and the

---

৯৯. Quoted in Abdullah Kannoun, . *The Islamic Review Journal,* `Islam is the First anti-Slavery Religious System of the World.’ Working, Survey, England : 1966 , P. 37

১০০. Ibid, P.37

১০১. Ibid, P.37

Dhaka University Institutional Repository

slaves and to him some people were slaves by their very nature.”[১০২] গ্রীক, রোমান পারসিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাসমূহে, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও সনাতন হিন্দু ধর্মে এমনকি আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকায়ও প্রথম দিকে দাসপ্রথা স্বীকৃত প্রথার মর্যাদা পায়। এ থেকে অনুদিত হয় যে, এ প্রথাটির নৈতিকতা সম্পর্কে জনসচেতনা সৃষ্টির প্রাথমিক কৃতিত্ব ইসলামেরই প্রাপ্য। কেননা, ইউরোপ, ও আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দাসপ্রথার বিরোধিতা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। পক্ষান্তরে, ইসলাম এর অভ্যুদয়কাল অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতেই এ প্রথার বিরোধিতা ও এর বিলুপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। এ কারণে ইসলামকে ‘The First Anti Slavery Religious System of the World’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[১০৩]

মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার এক সার্বজনীন আবেদন নিয়ে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে যাতে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, সমগ্র মানবজাতি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে উদ্ভূত। সুতরাং জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান ও স্বাধীন। মানুষ প্রভূ বা দাস নয়। প্রাচীনকাল থেকে দাসপ্রথা যেভাবে গড়ে উঠেছে সেগুলো ছিলঃ (ক) শক্রদের দখল করে সেখানকার সাধারণ মানুষ ও সৈন্যদেরকে আটক করার মাধ্যমে ব্যাপক দাসত্ব সৃষ্টি করা, (খ) স্বাধীন মানুষদের অপহরণ ও আটকের মাধ্যমে দাস বানানো, (গ) ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার কারণে স্বাধীনতাহরণ, (ঘ) দারিদ্র্যের কারণে সন্তান-সন্ততিকে বিক্রয় করার মাধ্যমে দাসত্বে নিয়োজিত করা ইত্যাদি।

ইসলামে এ পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে সাময়িক প্রয়োজনহেতু শুধু যুদ্ধবন্দীদের দাস-দাসীরূপে গ্রহণ করার অনুমোদন (কিছুতেই বাধ্যতামূলক নয়) দিলেও অন্য সকল পদ্ধতিকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়ে নতুনভাবে দাস-দাসী তৈরি হবার উৎস পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়। সুতরাং কৌশলগত কারণে ও নিরাপত্তার স্বার্থে ইসলাম সাময়িকভাবে যুদ্ধবন্দিগণকে দাস-দাসীরূপে গ্রহণের বিষয়টিকে অনুমোদন করে। তবে, তাও এ শর্ত সাপেক্ষে ছিল যে, (এক) অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক মুক্তকরণ (দুই) মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তকরণ (তিন) বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তকরণ। যখন এ তিনটি ব্যবস্থার কোনটির মাধ্যমে বন্দিমুক্তি সম্ভব হবে না কেবল তখনই যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “তোমরা যখন তাদেরকে

১০২. Ibid, P. 36

১০৩.আবদুর রাজ্জাক, C৶¸ ³, পৃ. ১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

(শত্রুপক্ষকে) পরাভূত করবে তখন তাদের বন্ধী করবে। অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শণপূর্বক কিংবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেবে”।[১০৪]

ইসলামে গৃহীত কয়েকটি অভূতপূর্ব ব্যবস্থা সকল ধরণের দাস-দাসীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছিল। ইসলামে গোটা দাস-ব্যবস্থার বিলুপ্তির জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বিত হয় সেগুলো হলো :

K) ZvKwZe (¯vaxbZvi wjwLZ ‘wjj ev Pw³cÎ)

‘তাকতিব’ ইসলামের এমন একটি দলিল যার মাধ্যমে দাস-দাসীদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের আবেদন জানানো হয়।[১০৫]

L) Zv‘wei (‘vmcwZi gZ¨i ci ¯vaxbZv jv‡fi AwaKvi m¤úwKZ Pw³)

এ ব্যবস্থায় কোন দাসপতি যদি তার কোন দাস বা দাসীকে বলতো, ‘আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বাধীনতা লাভ করবে’, তাহলে উক্ত চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যেতো। এমতাবস্থায় উক্ত দাস বা দাসীকে বিক্রি করা, উপঠৌকন হিসেবে প্রদান করা বা পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ হত এবং দাসপতির মৃত্যুর পর উক্ত দাস বা দাসী স্বাধীনতা লাভ করত।[১০৬]

M) BmwZjv‘ (cfi mšÍvb Rb¥‘vb‡nZ ¯vaxbZv jv‡fi AwaKvi m¤úwKZ AvBbMZ e¨e¯v)

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন দাসী তার প্রভুর সন্তানের জন্মদান করলে সে স্বাধীনতার অধিকার লাভ করতো। এমতাবস্থায় তার প্রভুর পক্ষে তাকে বিক্রি করা বা পরিত্যাগ করার অধিকার থাকতো না। রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “দাসীকে তার প্রভুর পক্ষের সন্তান স্বাধীন করে দেয়”।[১০৭]

N) ‘vmxi cmeKZ mšÍv‡bi ¯vaxbZvi e¨e¯v

এ ব্যবস্থায় প্রভু কর্তৃক গর্ভবতী হয়ে কোন দাসী কোন সন্তান প্রসব করলে সে সন্তান স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লাভ করতো। এ সম্পর্কে আইনগত ভিত্তি ছিল এ যে, যেহেতু সন্তানটি প্রভুর শুক্রজাত সেহেতু প্রভুর স্বাধীনতা তাকে স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করেছে।[১০৮]

---

১০৪. আাল কুরআন, ৪৭:৪
১০৫. বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী, Avj-wn‘vqv,(২য় খ.), ‘vmgw³ ev ¯vaxbZv অধ্যায়, কালাম কোম্পানী, তীর্থদাস রোড, পকিস্তান : ১৯৯৮, পৃ. ৪৬৯
১০৬. বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী , cÖv¸³, পৃ . ৪৭২
১০৭. cÖv¸³, পৃ .৪৭৩
১০৮. cÖv¸³, পৃ. ৪৫৬

O) AvBbMZ Ab¨vb¨ e¨e¯ v

ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ইত্যাদি কর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দাস-দাসীকে স্বাধীনতা দানের আইনগত ব্যবস্থা প্রণীত হয়। অবশ্য এর পাশাপাশি ষাটজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে আহার করানো, ষাটটি রোজা রাখার ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। এর একটি কারণ এ যে, যখন পৃথিবী থেকে দাস প্রথা বিলুপ্ত হবার ফলে দাসমুক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তকরণ সম্ভব হবে না তখন মানুষ বিকল্প হিসেবে এ সকল ব্যবস্থা অবলম্বণ করবে। উল্লেখ যে, এভাবে ইসলাম কর্তৃক সপ্তম শতাব্দীতে দাসপ্রথা উচ্ছেদের পরোক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

P) hvKvZ e¨e¯ v

পবিত্র কুরআনে দাস-দাসীদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার আইনগত ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের যাকাতের অর্থে যে বিপুল পরিমাণ দাস-দাসীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সম্ভব ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ব্যক্তি দাসত্বের অবলুপ্তি সম্ভব হলেও ভূখণ্ডগত দাসত্বের অবলুপ্তি আজও সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে যে সকল দেশ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মরণপণ সংগ্রামে রত তাদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

Q) ¯ZtùZ gw3

হযরত মুহম্মদ (সা.) কর্তৃক দাস-দাসীকে স্বাধীনতা দান একটি অত্যন্ত পুণ্যের কাজ এবং সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের উপায় হিসেবে ঘোষিত হয়। হাদীসে একে এক মহান প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, দাসপতির প্রতিটি অঙ্গ মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে নরকের অগ্নি থেকে মুক্তি লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে মুসলমান একজন বিশ্বাসী দাস-দাসীকে মুক্ত করবে আল্লাহ মুক্ত দাস-দাসীর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে দাসপতির প্রতিটি অঙ্গকে নরকের অগ্নি থেকে রক্ষা করবেন"।[১০৯] উপযুক্ত ঘোষণার ফলস্বরূপ বহু দাসপতি দাস-দাসীদেরকে স্বাধীনতা দান করতে উদ্বুদ্ধ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাতষট্টি, হযরত আবু বকর অসংখ্য, হযরত আব্বাস সত্তর, হযরত ওসমান বিশ, হাকীম ইবনু হিযাম একশত, ইবন ওমর

---

১০৯. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, mnxn eLvix,(২য় খ.), পাকিস্তান : ১৯৬১, পৃ. ৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

এক হাজার, আবদুর রহমান ইবনু আউফ ত্রিশ হাজার দাস-দাসীকে স্বাধীনতা দান করেন"।[১১০] এভাবে ইসলাম দাসমুক্তি ও দাসপ্রথার বিলুপ্তির জন্য সম্ভাব্য সকল পদ্ধতি খুলে দিয়েছিল যার মাধ্যমে খলিফাদের আমলে আরবের সকল দাস-দাসী স্বাধীনতা লাভ করে এবং আরবের দাস প্রথার সমাধান এভাবে চল্লিশ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল।

wewa ewnf Z AvUK I wbhvZb-wbcxob †_‡K gw³ jv‡fi AwaKvi

সরকার বা সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কিংবা সংস্থা কর্তৃক এমন কোন কার্য সম্পাদিত হওয়া যার দ্বারা নাগরিকগণের উপর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গুরুতর মানষিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ও শাস্তি আরোপ করা যায়, ইসলামে তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে : "আর যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণকে শাস্তি প্রদান করে তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহণ করে"।[১১১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি যার কথা ও হাত (কাজের নিপীড়ন) থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকেন"।[১১২] অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "মনে রেখো! যদি কোন মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার উপর সাধ্যাতীত বোঝা (জিযয়া বা প্রতিরক্ষা কর) চাপিয়ে দেয় অথবা তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব"।[১১৩]

ইসলামী শরীয়া আইন অনুসারে নির্যাতন, দমণ, প্রতারণা অথবা গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের কাজ আইনগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অসমর্থনযোগ্য। কোন ব্যক্তিকে আদালতে সাক্ষ্য দেয়া বা তথ্য সরবরাহের জন্য বল প্রয়োগ বা নির্যাতন করা, আদালতের পরওয়ানা ব্যতীত পুলিশি

---

১১০. মুহাম্মদ আবুল হাসান, Zvbhxgj AvkZvZ, ৩য় সংস্করণ, দেওবন্দ, (২য় খ.) স্বাধীনতা অধ্যায়, পৃ. ২১৮
১১১. আল কুরআন, ৩৩ : ৫৮
১১২. ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ, wgkKvZ Avj-gvmvexn, (১ম খ.), এম বশীর হাসান এন্ড সন্স, কলিকাতা : ঈমান অধ্যায়, পৃ . ১২
১১৩. আবু দাউদ সুলায়মান, mbv‡b Ave 'vD', দারুল ফিকর, বৈরুত:তা.বি, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাহ ওয়াল বাই, হাদীস নং- ৩০৫২

Dhaka University Institutional Repository

তল্লাশি, মিথ্যা অধিকারহরণ ও তাদের শারীরিক ও মানষিক নির্যাতনের কারণ ঘটায় ইসলামে তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

ইসলামী আইন অনুসারে কোন ব্যক্তিকে অন্যের অপরাধের জন্য দায়ী করা বা দণ্ড দেয়া যায় না। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে "প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। যে ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটিত করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে, কেউ অন্যের বোঝা বহণ করেনা"।[১১৪] ইসলামী আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে তার অনুপস্থিতিতে বা তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে বিচার করা বা আটক করাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

gvbnwwbKi AvPiY †_‡K gw³ jv‡fi AwaKvi

সমাজের কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কোন সংস্থার মানহানিকর হস্তক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড থেকে রেহাই পাওয়ার অধিকার রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মূল্যবান নাগরিক অধিকার। ব্যক্তির মান-সম্মান, পদ-মর্যাদা, চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রভৃতির হ্রাস বা হানি করার মাধ্যমে তার জীবনের আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক বিকাশধারাকে বাঁধাগ্রস্ত করা হয়। তাই মানহানিকর আচরণের যত পন্থা হতে পারে, যেমন-অপপ্রচার, গুজব, নিন্দা, উপহাস, তিরস্কার, ভৎর্সনা, গালাগাল, বিকৃত নামকরণ, মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বা বক্রোক্তি করবে না, একে অপরকে আক্রমণাত্মক উপনামে আহ্বান করবে না বা কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে নিন্দা করবেনা, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করাকে পছন্দ করবে? তোমরা তো তাকে অপছন্দই করে থাক"।[১১৫]

নারী জাতির সম্ভ্রমের প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "যারা পবিত্রমনা নারীগণের সম্ভ্রমে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তারা ইহকালে ও পরলোকে ধিকৃত হবে এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি অবধারিত"।[১১৬]

এভাবে ইসলামে মানহানিকর বিভিন্ন আচরণকে নিষিদ্ধ করে মানুষের সম্ভ্রম ও মর্যাদার মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

---

১১৪. আল কুরআন, ২৭ : ২১
১১৫. আল কুরআন, ৪৯:১২
১১৬. আল কুরআন, ২৪:২৩

Dhaka University Institutional Repository

AvBbMZ mgZv j‡fi AwaKvi

ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে একটি কার্যকর আইনগত ব্যবস্থার অধীন প্রতিটি মুকদ্দমার আইনগত প্রতিকার লাভের সার্বজনীন অধিকার প্রদান করে। ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকগণের মুকাদ্দমা ইসলামী শরীয়া আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। অমুসলিম নাগরিকগণ শরীয়া আইনের অধীনে তাদের মুকাদ্দমার নিষ্পত্তি চাইলে শরীয়া আইন অনুযায়ী তাও সম্পন্ন হবে। অন্যথায় প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর স্বীয় আইন অনুযায়ী তাদের মুকদ্দমা পরিচালনার নীতি ইসলামে অনুসৃত হয় যা ইসলামের সার্বজনীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। অমুসলিম নাগরিকগণের মুকাদ্দমা তাদের নিজস্ব আইন অনুসারে পরিচালনা করার প্রেরণামূলক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় কুরআনের নিম্নলিখিত কয়েকটি আয়াতে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে- "আর তাদের (ইয়াহুদীদের) কাছে 'তাওরাত' রয়েছে যাতে আল্লাহর আইন আছে"।[১১৭] "আমি তাওরাত অবতারিত করেছি, এতে পথ-নির্দেশিকা ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ নবী, দরবেশ ও জ্ঞানীগণ এর মাধ্যমে ইয়াহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন"।[১১৮]
৬২২ সালে প্রণীত মদীনার আন্তর্জাতিক সনদে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক ইয়াহুদীদেরকে তাদের ধর্ম, আইন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদিসহ ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম জাতিসত্তার অধিকার প্রদান করা হয়।[১১৯] পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও অন্যান্য মুসলিম শাসক কর্তৃক খ্রিস্ট, জরাথুষ্ট্র, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য অমুসলিম জনগোষ্ঠির প্রতিও উপর্যুক্ত মূলনীতি অনুসৃত হয়। আইনে সমতার অধিকার প্রদানের নীতি হচ্ছে ইসলামী সংবিধানের একটি ভিত্তিপ্রস্তর এবং যে সকল মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইসলামী সভ্যতার বৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ একটি মুল্যবোধ। আইনে সমতার মূলনীতি থেকে আইনের শাসন ও মানবিক স্বাধীনতার নীতি উৎসারিত হয়েছে।

b¨vqwePvi j‡fi AwaKvi

ইসলামে ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাগত মর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার লাভ করে থাকে। ন্যায়বিচারের ধারণার ওপর ইসলামে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআনে ঘোষণা

১১৭. আল কুরআন, ৫ : ৪৩
১১৮. আল কুরআন, ৫:৪৪
১১৯. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, †gvm‡jg e½i mvgvwRK BwZnvm, গ্রন্থকার প্রকাশিত, ঢাকা : ১৯৬৫, পৃ. ৫৭০

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে, "তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহর জন্য ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দাও, তাতে যদি তোমাদের নিজেদের পিতা-মাতা কিংবা আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি হয় তবুও"।[১২০] অন্যত্র " তোমরা যখন কথা বলবে তখন ন্যায় কথা বলবে। যদি কোন আত্মীয় হয় তবুও আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে অর্থাৎ আল্লাহর আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করবে"।[১২১]

রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ব্যক্তিগত বা দলগত প্রভাব কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আবেগ যেমন আনুকুল্য, দয়া, ঘৃনা, ক্ষোভ ইত্যাদির কারণে বিচারকের জন্য সুবিধামত আইনের ব্যাখ্যা দান ও রায় প্রদানের নূন্যতম সুযোগ ইসলামে নেই। কুরআনে বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "তোমরা বিচার করতে গিয়ে আবেগের বশবর্তী হবে না। তোমরা যদি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন"।[১২২] "তোমরা যখন জনসাধারণের মধ্যে মুকাদ্দমা পরিচালনা করবে, তখন পূর্ণমাত্রায় ন্যায় পরায়ণতাসহ রায় দান করবে"।[১২৩]

Aciva cgwYZ bv nIqv chšÍ wb‡`©vl we‡ewPZ nIqvi AwaKvi

কোন ব্যক্তির অপরাধ আদালতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সমাজে নির্দোষ বিবেচিত হওয়ার এবং তদানুযায়ী আচরণ লাভ করার অধিকার ইসলাম প্রদান করে থাকে। কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ ছাড়া তাকে দোষী সাব্যস্ত করা বা তার প্রতি অপরাধ আরোপ করা বা তাকে বাহ্যিকভাবে সৎকর্মপরায়ণ মনে হলেও নিতান্ত সন্দেহবশত তার সম্পর্কে কুধারণা পোষণ এবং তদানুযায়ী আচরণ করা ইসলামী আইনে হারাম ও দণ্ডার্হ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমরা বেশি সন্দেহ ও কুধারণা থেকে বেঁচে থাক কেননা কোন কোন সন্দেহ ও কুধারণা পাপ"।[১২৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কেননা ধারণা মিথ্যার নামান্তর"।[১২৫]

---

১২০. আল কুরআন, ৪:১৩৫
১২১. আল কুরআন, ৬ : ১৫২
১২২. আল কুরআন, ৪ : ১৩৫
১২৩. আল কুরআন, ৪ : ৫৮
১২৪. আল কুরআন, ৪৯ : ১২
১২৫. মুফতি মুহাম্মদ শাফী, gv\`Awidj †KviAvb (মহিউদ্দীন খান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত) কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা : ১৪২৩ হিজরি, পৃ. ১২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ভাল ধারণা পোষণ ইসলামের একটি নীতি। ইসলামী আইনে যা মুস্তাহাব বা পুণ্যার্হ কর্মরূপে বিবেচিত। কোন ব্যক্তির অপরাধ সমাজে ব্যাপকভাবে চর্চিত হতে থাকলেও যতক্ষণ না তা আদালতে প্রমাণিত হয় তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করার নীতিও কুরআনে উপস্থাপিত অন্যতম একটি নীতি। হিজরি সপ্তম বর্ষে 'গাযওয়া-ই-মুরাইসী' থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কিত ব্যভিচারের অলীক অপবাদ চর্চায় অনেক মুসলমানও অজ্ঞতাবশত অংশগ্রহণ করে। হযরত আয়েশার (রা.) বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধটি প্রমাণিত ছিল না। তা সত্ত্বেও তাতে অংশগ্রহণের কারণে কুরআনে মুসলমানদেরকে তিরস্কৃত করা হয় এবং বলা হয়, "তোমরা যখন এ সম্পর্কে শুনেছিলে তখন বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করেনি এবং বলেনি যে, এটা নির্জলা অপবাদ। যদি ইহকাল ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ না হত তবে তোমরা যা চর্চা করেছিলে তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করত। তোমরা একে তুচ্ছ ধারণা করেছিলে অথচ তা আল্লাহর কাছে গুরুতর বিষয় ছিল। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও পুনরায় কখনও এ ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না"।[১২৬] সুতরাং ইসলামে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বিবেচিত হবার অধিকারের স্থায়ী আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

e¨w³MZ †MvcbxqZv i¶vi AwaKvi

নাগরিকগণের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বাসস্থান বা সংবাদ আদান-প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদিতে রাষ্ট্রে কিংবা রাষ্ট্রীয় কোন সংস্থা, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির অবৈধ, অযাচিত ও নিবর্তনমূলক হস্তক্ষেপ তাদের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে বিধায় এ থেকে রেহাই পাওয়ার অধিকার অন্যতম মুল্যবান মানবিক অধিকার। ইসলামে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য এ অধিকারের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মানুষের এ অধিকারের হস্তক্ষেপ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ঘোষণা হয়েছে, "তোমরা গোয়েন্দা তৎপরতায় প্রবৃত্ত হবে না"।[১২৭] "তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে অনুমতি না নিয়ে বা গৃহবাসীকে অভিবাদন না করে প্রবেশ করবে না। কেননা, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও কল্যাণপ্রদ পন্থা"।[১২৮] "গৃহের

১২৬. আল কুরআন, ২৪ : ১৭

১২৭. আল কুরআন, ৪৯ : ১২

১২৮. আল কুরআন, ২৪ : ২৭

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যন্তরে পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করা পুণ্যের কাজ নয়। বাসগৃহের সদর দরজার পথ দিয়ে প্রবেশ কর”।[১২৯]

কারও ব্যক্তিগত গুপ্ত বিষয় অবগত হবার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, ভিডিও ক্যাসেট টেপরেকর্ডার বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়ে বা সেন্সর করা, টেলিফোনে আড়িপাতা বা টেলিফোনের কতাবার্তা গোপনে রেকর্ড করা, অর্থ-সংক্রান্তগুপ্ত তথ্যাদি জ্ঞাত হবার চেষ্টা করা। এ জাতীয় কর্মকাণ্ড নাগরিকগণের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে, তাই ইসলামে এসব চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ সকল কাজে জড়িত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, “যারা মৌখিকভাবে ঈমান এনেছে বলে দাবি করে প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি। তারা জেনে রাখ যে, তোমরা মানুষের গুপ্ত তথ্যাদি অবগত হবার উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা চালাবে না। কেননা, যে ব্যক্তি মানুষের গুপ্ত তথ্যাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় স্বয়ং আল্লাহ তার গুপ্ত তথ্যাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোন তাকে চূড়ান্তভাবে অপমানিত করেন”।[১৩০]

বিনা অনুমতিতে কারও বাসগৃহে প্রবেশ করে তার ব্যক্তিগত বিষয় জানার প্রচেষ্টা চালানো ইসলামে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম হিসেবে বিবেচিত। আবাসস্থলে মানুষ ক্লান্তি শেষে বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং অবসাদ দূর করে। অযাচিতভাবে বাসস্থানে প্রবেশ মানুষের শান্তি ও স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করে। গৃহের অভ্যন্তরে নারী-পুরুষ অসতর্কাবস্থায় থাকে বিধায় অনুমতি না নিয়ে প্রবেশের কারণে গৃহবাসীর বিরক্তি উৎপাদন ও অশ্লীলতার ব্যপ্তি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ইসলামে বাসগৃহে প্রবেশ সম্পর্কিত উপযুক্ত নীতিমালা কেবল অপরের গৃহে প্রবেশে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং ব্যক্তির নিজস্ব এমন গৃহের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য যেখানে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা বা মুহরিমা (বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ) নারীগণের বসবাসের ব্যবস্থা থাকে।

¯vaxbfv‡e PjvPj I emev‡mi AwaKvi

ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার প্রদান করে। অনুরূপভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বাইরে গমণ ও পররাষ্ট্রে বসবাসের অধিকারও ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে দেয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এক বিশ্বরাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণায় বিশ্বাসী। একারণে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং সমভাবে বহির্বিশ্বের যে কোন

১২৯. আল কুরআন, ২ : ১৮৯

১৩০. মুহাম্মদ শাফী, C√¸ ³, পৃ. ১২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

স্থানে মানুষের স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের ব্যাপারে ইসলাম কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে না। ইসলামী রাষ্ট্র দর্শন অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর রাজ্যস্বরূপ যা তিনি সকল মানুষের চলাচল ও বসবাসের জন্য অবারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং মানুষ তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার বলে বিশ্বের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা লাভ করে।[১৩১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “সমগ্র দেশ আল্লাহর আর মানুষ আল্লাহর বান্দা, তুমি যেখানে মঙ্গলজনক মনে কর বসবাস কর”।[১৩২]

ivR‰bwZK Avkq I bvMwiKZ jv‡fi AwaKvi

ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে না এ শর্ত সাপেক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার দেয়। এ পর্যায়ে রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে পররাষ্ট্র থেকে স্বেচ্ছায় আগত, নির্বাসিত বা বিতাড়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয। রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা প্রজাতন্ত্রে মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজির জনগণকে আশ্রয় ও নাগরিকত্ব প্রদানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। সে সময় মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি আশ্রয় প্রার্থীকে মদিনা প্রজাতন্ত্রে আশ্রয় প্রদানের নির্দেশ দিয়ে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “অংশীবাদীদের কেউ যদি তোমার কাছে (মদীনায়) আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও যাতে করে সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করে। এরপর তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে দাও”।[১৩৩]

মুসলিম আশ্রয় প্রার্থীগণের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও জনসাধারণের মনোভাব বর্ণনা করে কুরআনের অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে,“তারা (ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ) তাদের ভালোবেসে যারা দেশ ত্যাগ করে তাদের কাছে আসে। আর তাদেরকে (দেশত্যাগীদেরকে) যা কিছু দেয়া হয় সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ লোভ বা ঈর্ষার সৃষ্টি হয় না। তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে (আশ্রয় প্রার্থীগণকে) প্রাধান্য দেয়”।[১৩৪] আশ্রয় প্রার্থীদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণার্থে রাষ্ট্রীয়

---

১৩১. মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, Bmjvg ivó mgvR, বাংলা একাডেমী, ঢাকা :১৯৮৪, পৃ . ৩০৮
১৩২. আল হাদীস, উদ্ধৃত: মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, cv¸³, ৩০৭
১৩৩. আল কুরআন, ৯: ৬
১৩৪. আল কুরআন, ৫৯: ৯

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দপূর্বক তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে মদিনা প্রজাতন্ত্রে। কুরআনে এরূপ সম্পদ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, "এ ধনসম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ এবং আল্লাহ ও রাসূলকে সহযোগিতার কারণে ধনসম্পদ ও বাস্তুভিটা থেকে বহিস্কৃত হয়েছে" ।[১৩৫]

কুরআনের এ আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় লাভের পর আশ্রয়প্রার্থীগণকে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

RvZxqZvi AwaKvi

ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে কোন জাতির (কুরআনের পরিভাষায় কাওম ও উম্মাহ) অন্তর্ভূক্ত হবার এবং তার দ্বারা পরিচিতি লাভের অধিকার প্রদান করে। তবে অধুনা জাতীয়তা বলতে যা বোঝায়, ইসলামে জাতীয়তার ধারণা তা থেকে পৃথক। আধুনিক জাতীয়তার ধারণা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে মানবজাতির ভূখণ্ডগত বিভক্তির ফলমাত্র। এরূপ জাতীয়তা কোন বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে চরম স্বাদেশিকতা এবং অন্য অঞ্চলের মানুষের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রত্যয় সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের এ প্রত্যয় সর্বব্যাপী ঘৃনা ও অবজ্ঞার জন্ম দেয়।

কুরআনে আধুনিক জাতীয়তাবাদ-উপজাত উপর্যুক্ত মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। এ জন্য নয় যে, তোমরা একে (বিভক্তিকে) অন্যদের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করবে। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় সে ব্যক্তি যে সর্বাধিক ধর্মপ্রাণ"।[১৩৬] কুরআনের এ আয়াতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ভেদে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করে ব্যক্তি মানুষের ন্যায়পরায়ণতা ও মহৎ অর্জনকে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইসলাম অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার চেয়ে বরং আদর্শগত জাতীয়তার ধারণাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। ইসলামের এ জাতীয়তার ধারণা অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির প্রতি বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং ভালোবাসার নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

---

১৩৫. আল কুরআন, ৫৯: ৯
১৩৬. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

weevn I cwievi MV‡bi AwaKvi

ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে বিবাহ করার অধিকার প্রদান করে। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালন এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে গড়ে তোলার জন্য পরিবার গঠনের অধিকারও দেয়। সুতরাং সুস্থ্য ও স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অধিকার, একের প্রতি অন্যের কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ ইসলামে সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

ইসলামে বিবাহ সমভাবে একটি অধিকার ও ধর্মীয় দায়িত্ব। মানব বংশ বৃদ্ধির ধারাক্রম অব্যাহত রাখা এবং মনোগত প্রশান্তিও স্থিতিশীলতার জন্য ইসলাম যেমন বিবাহকে অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করে তেমনি 'চিরকুমার ব্রত' গ্রহণকেও নিরুৎসাহিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "বিবাহ আমার পন্থা, যে আমার পন্থার প্রতি অনাসক্ত হয় সে আমার আদর্শভূক্ত নয়"।[১৩৭] "কৌমার্য ব্রতকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছেন, "ইসলামে সন্ন্যাসব্রত বা বৈরাগ্য প্রথার অনুমোদন নেই"।[১৩৮]

ইসলামে বিবাহ কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণের পন্থা নয় বরং পাস্পরিক ভালোবাসা, সমঝোতা, সমবেদনা ও নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।[১৩৯] আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি এ যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে (এ ঐশী ব্যবস্থাপনায়) চিন্তাশীল মানুষে জন্য নিদর্শন রয়েছে"।[১৪০] ইসলামে বিবাহ এমন এটি সামাজিক চুক্তি যাতে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মত বা অসম্মত হবার সমান অধিকার স্বীকৃত। বৈবাহিক যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবার সমান অধিকার স্বীকৃত। বৈবাহিক যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবার পর কোন পক্ষ যদি এ দাবি উত্থাপন করে যে, বিবাহে তার সম্মতি ছিল না, সে অবস্থায় ইসলামী আইনে সে বিবাহের বৈধতা থাকে না। তালাকের (বিবাহ বিচ্ছেদের) ব্যাপারেও ইসলাম নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করেছে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আর যদি তোমরা তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হবার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজনকে নিষ্পত্তির জন্য সালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা সমস্যা সমাধানের মনোভাব গ্রহণ করে আল্লাহ তাদেরকে সহায়তা দেবেন"।[১৪১]

১৩৭.ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ. wgkKvZj gvmvexn, এম বশির হাসান এন্ড সন্স, কলিকাতা : কিতাবুন নিকাহ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৩৮. cv¸³, wKZveb wbKvn, অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৩৯. সানাউল্লাহ নুরী, cv¸³, পৃ .১০২
১৪০. আল কুরআন, ৩০ : ২১
১৪১. আল কুরআন, ৪ :৩৫

Dhaka University Institutional Repository

m¤úwËi gvwjKvbvi AwaKvi

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির অপ্রকৃত মালিকানা স্বীকৃত। তবে তা এতটাই নিয়ন্ত্রিত যে, ব্যক্তি এখানে সম্পদ উপার্জনের লাগামহীন স্বাধীনতা লাভ করে না। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানা এ শর্ত সাপেক্ষে স্বীকৃত হয়েছে যে, সকল সম্পদে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের অংশ ও অধিকার থাকবে এবং পুঁজিপতি শ্রমিক নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের কল্যাণ সমভাবে অর্জিত হবে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে"।[১৪২]

ইসলামে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্পর্ক শোষণ বা সংঘর্ষ-নির্ভর নয় বরং পারস্পরিক কল্যাণমূলক ও ভ্রাতৃত্বসূলভ। এখানে একজন পুঁজিপতি যতক্ষণ না নিজের কল্যাণের অনুরূপ কল্যাণ শ্রমিকের জন্য কামনা করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হিসেবে গণ্য হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার অন্য ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে"।[১৪৩]

ইসলামে সকল সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে এর অর্জন, ভোগ ও বণ্টনের অধিকার লাভ করে। এখানে যেমন কাউকে আল্লাহর দান (সম্পদ অর্জনের অধিকার) থেকে বঞ্চিত করা যায় না তেমনি কারও অধিকার থেকে সম্পদকে দখলচ্যুত করাও যায় না।

প্রতারণা, চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ হস্তগতকরণ, বাজারে একচেটিয়া অধিকার লাভ, সংকট সৃষ্টি কিংবা কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধির জন্য পণ্যদ্রব্য মজুদকরণ, সুদ বা লোকসানের চুক্তি ব্যতীত লভ্যাংশ গ্রহণ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহর"।[১৪৪] "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য (পণ্যদ্রব্য) মজুদ করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে কঠোর শাস্তির সংবাদ পৌছে দাও"।[১৪৫]

কুরআনের এ সকল আয়াতসহ আরও অসংখ্য আয়াতে এভাবে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম প্রদত্ত এ অপ্রকৃত ব্যক্তির মালিকানায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকারের নেই। ইসলাম প্রতিটি নাগরিককে উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে সম্পদ লাভ কিংবা স্থানান্তরিত করার

---

১৪২. আল কুরআন, ৫১:১৯
১৪৩. ইমাম নাসাঈ, mbv‡b Avb bvmvC, বাবু আলামাতিল ইমান, হাদীস নং- ৫০১৭
১৪৪. আল কুরআন, ৩:১৮৯
১৪৫. আল কুরআন, ৯ : ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার প্রদান করেছে। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "(উত্তরাধিকারের সম্পদ বণ্টন হবে) ইস্টিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে প্রদত্ত দান এবং ঋণ পরিশোধের পর"।[১৪৬]

agxq ¯vaxbZv I wbivcËvi AwaKvi

ইসলাম মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্ব স্ব ধর্ম পালন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের নিমিত্ত উপাসনালয় নির্মাণ এবং ধর্মীয় আদর্শ প্রচারার্থে মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনা করার স্বাধীনতা প্রদান করে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) বায়তুল মাক্‌দাস অধিকারের পর সেখানকার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীগণকে এসব অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঘোষণায় বলেছিলেন, "ইসলামী সরকার তাদেরকে জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও নিরাপত্তা দিচ্ছে। তাদের গীর্জায় কেউ বসবাস করতে পারবে না, তাদের ক্রস ভাঙ্গতে পারবে না বা তাদেরকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করতে পারবে না"।[১৪৭]

কুরআনের দাবি অনুসারে ইসলামী মুল্যবোধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন মূল্যবোধ নেই। সুতরাং এ শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধকে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে প্রকাশ ও উপস্থাপনের এ বিশ্বজনীন ও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর একক, যৌথ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হিসেবে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক অর্পিত হয়েছিল। কুরআনে এ দায়িত্ব পালনের একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সুকৌশলপূর্ণ পন্থা অবলম্বন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "(হে মুহাম্মদ!) আপনার পালনকর্তার প্রতি তাদেরকে আহ্বান করুন কৌশল ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে, তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়"।[১৪৮]

কোন ব্যক্তির কোন মতবাদে দীক্ষিত হবার বা কোন মতবাদ বর্জনের ব্যাপারে ইসলাম ব্যক্তির আগ্রহ ও ইচ্ছাকে গুরত্ব প্রদান করে। কিছুতেই প্রলোভন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ, নির্যাতন, শক্তি প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মান্তরিত বা ধর্মচ্যুত করার নীতিকে সমর্থন করে না। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আপনি বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা অবিশ্বাসী থেকে যাক"।[১৪৯]

কুরআনের এ সকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে প্রতিটি ব্যক্তির যে কোন ধর্মে বিশ্বাসী হবার বা ধর্মহীন নাস্তিক থেকে যাবার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। এ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার

---

১৪৬. আল কুরআন, ৪ : ১১
১৪৭. সাইয়্যেদ কুতুব, wekkwšÍ I Bmjvg, গোলাম সোবহান সিদ্দিক অনূদিত, শতদল প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৮৫, পৃ . ২১৮
১৪৮. আল কুরআন, ১৬ : ১২৫
১৪৯. আল কুরআন, ১৮ : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে কুরআনে অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে, “ধর্ম সম্পর্কে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিবিধানের ব্যবস্থার অবকাশ নেই। নিঃসন্দেহে সত্যপথ বিপথ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে”।[১৫০]

একবার জনৈক সাহাবী স্নেহের বশীভূত হয়ে তার পুত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করার প্রেক্ষাপটে কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতটি অবতারিত হয়। ইসলাম সম্পর্কে এ অভিযোগ রয়েছে যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রচারিত হয়েছে। বস্তুত ইসলামের যে জিহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তা কাউকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য নয়, বরং আত্মরক্ষার পাশাপাশি অন্যায়-অবিচার ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) একজন বৃদ্ধ খ্রিস্টান মহিলাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। হযরত উপর (রা.) তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য না করে এবং উপর্যুক্ত আয়াতটি পাঠ করে ধর্মের জন্য শক্তি প্রয়োগ না করার নীতিকে সমর্থন করেন।

ইসলামে যেমন ব্যক্তিকে ধর্মে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হবার স্বাধীনতা দেয় অনুরূপভাবে ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। কারও ধর্মানুভূতিকে আহত করে এমন কোন কাজ, বক্তৃতা, বিবৃতি, সাহিত্য বা নেতিবাচক সমালোচনা যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কুরআনে অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে ঘোষণা করা হয়েছে, “এ সকল মানুষ আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যে সকল উপাস্যকে আহ্বান করে, তোমরা তাদের গালাগাল দিও না”।[১৫১]

evK ¯vaxbZvi AwaKvi

রাষ্ট্র, সমাজ ও মানব সভ্যতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে ইসলাম মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক মানবাধিকার ও ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে। তবে মতামত প্রকাশের এ স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ ও অবাধ নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। কুরআনে সমাজ ও সভ্যতার জন্য চিন্তা করার এবং এর অগ্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখার অধিকারের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে ঘোষিত হয়েছে, “তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত মনোনীত করা হয়েছে যাতে তোমরা কল্যাণমূলক কাজে নির্দেশ দাও এবং গর্হিত কাজ নিষেধ কর”।[১৫২]

---

১৫০. আল কুরআন, ২ : ২৫৬
১৫১. আল কুরআন, ৭: ১০৮
১৫২. আল কুরআন, ৩ : ১১০

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত মদিনা প্রজাতন্ত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক মদিনার জনসাধারণকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ভিন্নমত পোষণ করার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার সাহাবীদেরকে এমন নির্ভিক মানষিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলেছিলেন যে, তারা নির্দ্বিধায় তাদের মতামত প্রকাশ করতেন।

তিনি তাঁর সাহাবীগণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার আদেশ দিতেন। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে অভিনন্দিত করে তিনি বলেছেন, "সবচেয়ে সম্মানীয় জিহাদ হচ্ছে এমন ব্যক্তির জিহাদ যে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত মতামত প্রকাশ করে"।[১৫৩]

সমাজের সামগ্রিক পরিবেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাক-স্বাধীনতার চর্চা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ কোন অন্যায় হতে দেখলে তা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। প্রথমত হস্ত দ্বারা অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। তাতে সমর্থ না হলে মুখের ভাষা দ্বারা অর্থাৎ স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে। তাতেও সমর্থ না হলে তৃতীয় পর্যায়ে অন্তরে ঘৃনা করা উচিত। তবে শেষোক্ত পদ্ধতিটি দূর্বল ঈমানের পরিচয় বহণ করে"।[১৫৪] উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহর (সা.) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মদিনা প্রজাতন্ত্রে বাক-স্বাধীনতার এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। খলিফাগণের শাসনামলেও জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাতেন। তারা প্রায়শই বলতেন, "তোমাদের (জনসাধারণ) কল্যাণ নেই, যদি তোমরা আমাদের সমালোচনা না কর এবং আমাদের কল্যাণ নেই, যদি আমরা তা না শুনি"।[১৫৫] সুতরাং খিলাফতের শাসনামলেও যে বাক-স্বাধীনতার একটি সুন্দর পরিবেশ বিরাজমান ছিল এ ঘোষণা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

¯^vaxbfv‡e kwš—¡cY© mgv‡ek I ‘jex¨ nIqvi AwaKvi

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের কোন উম্মাহ্ বা সমাজভূক্ত হওয়া প্রাকৃতিক সত্য ও ঐশ্বরিক পরিকল্পনার ফলমাত্র। যেহেতু কোন মানুষই সমাজ থেকে বিমুখ বা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না সেহেতু কোন দল বা উম্মাহর সঙ্গে যুক্ত বা বিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রতিটি ব্যক্তি প্রকৃতি প্রদত্ত

---

১৫৩. ইমাম নাসাঈ, mbv‡b Avb bvmvC, বাবু ফাদলুন মান তাকাল্লামা বিল হাক্কি ইনদা ইমামিন জায়ির, হাদীস নং ৫৪২০৯
১৫৪. ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ, cv¸³, বাব-ই-আল-আমর বিন মা'রুফ, পৃ . ৪৩৬
১৫৫. শামছুল আলম, Bmjvgx ivó, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮১, পৃ.৭৮

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার অনুযায়ী স্বাধীন। এ স্বাধীনতা অনুসারে মানুষ একে অন্যের সংগে সংযোগ স্থাপন, পরস্পরের মিলন, কোন দল বা সংস্থার অধীনে দলবদ্ধ হওয়া, সভা-সমাবেশ করা নিজেদের মধ্যে শক্তভাবে আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময় করা, নিজেদের কল্যাণে কর্মসূচী প্রণয়ন করা ইত্যাদি কার্যক্রমের অধিকার লাভ করে।

ইসলামে বাক-স্বাধীনতার অধিকার ইতিবাচক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা চর্চাসহ সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে একযোগে অংশগ্রহণের জন্য এ স্বাধীনতা স্বীকৃত। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক অথবা আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থি কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য বা কোন ষড়যন্ত্রমূলক অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে এ স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "সৎকর্ম ও ন্যায়পরায়ণতায় একে অন্যকে সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘণের ব্যাপারে পরস্পরের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা"।[১৫৬] কুরআনে অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে এমন একটি উম্মাহ্ বা দল থাকা প্রয়োজন যারা সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বারণ করবে"।[১৫৭]

কুরআনে আরও ঘোষণা করা হয়েছে, "যখন তোমরা গুপ্ত মন্ত্রণা সভা প্রতিষ্ঠিত কর, অপরাধ, শত্রুতা বা রাসূলের (সা.) অবাধ্যতার জন্য, বরং ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তা কর। আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে"।[১৫৮]

miKv‡ii AskMn‡Yi AwaKvi

ইসলাম দেশের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিজ নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ইসলামে এটি একটি অধিকারই নয়, ধর্মীয় দায়িত্বও বটে। ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন অনুসারে মানুষ এ বিশ্বে আল্লাহর প্রতিনিধি। এ প্রতিনিধিত্বের অধিকার কোন ব্যক্তি পরিবার কিংবা নির্দিষ্ট শ্রেণির জনসাধারণের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল মানুষের জন্য সার্বজনীনভাবে অবারিত।

সরকারে অংশগ্রহণের অধিকারের পর্যায়ে পড়ে কোন ব্যক্তির সরাসরি কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারের অংশগ্রহণ, সরকারের প্রতি আনুগত্য বা বিরোধিতা প্রদর্শন, সরকারকে পরামর্শ দান, ব্যর্থতায় সরকারকে সতর্ক, সমালোচনা বা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতাচ্যুত করা এবং পূর্বতন

১৫৬. আল কুরআন, ৫ : ২
১৫৭. আল কুরআন, ৩ : ১০৪
১৫৮. আল কুরআন, ৫৮ : ৯

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের স্থলে একটি নতুন সরকার নির্বাচিত করা ও তাকে কার্যে নিযুক্ত করা ইত্যাদি অধিকার। ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে এসব অধিকার প্রদান করেছে।[১৫৯]

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) তার নির্বাচন ও অভিষেক অনুষ্ঠানে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি সরকারের সমালোচনা, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বা সরকার থেকে আনুগত্য প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি যদি সরকারকে যথাযথভাবে পরিচালনা করি তাহলে আপনাদের উচিত আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আর যদি ত্রুটিপূর্ণভাবে পরিচালনা করি তাহলে আপনাদের উচিত আমাকে সংশোধন করে দেয়া। আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আনুগত্য দেখানো যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও তার রাসূলের অনুগত থাকি। যখন আমি তাদের অবাধ্য হই আপনারা আর আমাকে আনুগত্য দেখাবেন না"।[১৬০] ইসলাম সরকারের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সকল নাগরিকের সার্বজনীন অংশগ্রহণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে শূরা বা পরামর্শভিত্তিক শাসন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাখে। এতে রাষ্ট্রের প্রতিটি নগিরিকের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরামর্শ দেয়ার অধিকারকে উন্মুক্ত করা হয়েছে। কুরআনে এ পদ্ধতির অপরিহার্যতা সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, "তাদের (সরকারের) সামষ্টিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হবে তাদের (সরকার ও নাগরিকগণের) পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে"।[১৬১] সপ্তম শতাব্দীতে মদিনা প্রজাতন্ত্রে এ পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছিল। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আপনি তাদের (নাগরিকগণের) সঙ্গে যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রণয়নে পরামর্শ করুন। অতঃপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এর (সফলতার জন্য) আল্লাহর ওপর ভরষা করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ভরষাকারিগণকে ভালোবাসেন"।[১৬২]

সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যারা একজন খলীফা বা রাজনৈতিক কর্মকর্তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে মৃত্যু বরণ করে তারা অমুসলিমের মত মৃত্যুবরণ করে"।[১৬৩] রাসূলের (সা.)-এর ঘোষণায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য

---

১৫৯. শামসুল আলম, "মৌলিক মানবিক অধিকার", Bmjvgx wekwe'¨vjq cwÎKv. 1g msL¨v, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, XvKv : 1980, পৃ .৭৬

১৬০. Ibn Ishaq, (edited by M.M.D. Abdul Hamid) ***Sirat-al-Nbiyy (SAAS)***, Vol.IV , M. Sunayh, Cairo : 1983/1963 , P. 1075

১৬১. আল কুরআন, ৪২ : ৩৮

১৬২. আল কুরআন, ৩ ; ১৫৯

১৬৩. আল হাদীস, উদ্ধৃত : Ismail Ali Faruqi, *Islam and Human Rights, Islamic Quarterly*, The Islamic Cultural Centre, London : 1983, Vol .27, P. 26

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারই শুধু ঘোষিত হয়নি, বরং একে একটি অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

miKwi K‡g c‡e‡ki mg-AwaKvi

ভাষা, বর্ণ বা জাতিগত ও সামাজিক উৎপত্তি নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিজ নিজ দেশের সরকারি কর্মে প্রবেশের সমান অধিকার ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে সমতার নীতি উৎসাহিত হয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা.) বিদায় হজ্জের অভিভাষণ থেকে, যাতে তিনি বলেছেন, "তোমরা সকলে ভাই ভাই এবং সমান। তোমাদের কেউ অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পার না। একজন আরব একজন অনারবের উপর এবং একজন অনারব একজন আরবের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না। অনুরূপভাবে একজন শ্বেতাঙ্গ একজন কৃষ্ণাঙ্গের উপর এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না, কেবল ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে প্রাধান্য প্রাপ্তি ব্যতীত"।[১৬৪] এ হাদীস দ্বারা সকল ক্ষেত্রে ইসলামের সমতার নীতি অবলম্বিত হবার ঘোষণার পাশাপাশি এ নীতিও ঘোষিত হয়েছে যে, ইসলামের সমতা চরম মানের সমতা নয়, বরং ব্যক্তিগত যোগ্যতা, ক্ষমতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি সাপেক্ষ একটি নীতি। গোটা জাতির উন্নয়নের স্বার্থে ইসলাম ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও বিকাশের জন্যও প্রতিটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ইসলামে যেহেতু সরকারি দায়িত্বকে একটি পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য করা হয় সেহেতু এ দায়িত্ব এমন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করার নীতি অনুসৃত হয় যে তা সর্বোচ্চ দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমানসমূহকে তাদের যোগ্য প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন"।[১৬৫] সুতরাং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের পরিচালনার জন্য অশিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে অসচেতন জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চাইতে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের দ্বারা মনোনীত দক্ষ ও জ্ঞানী প্রতিনিধিগণই উত্তম হবেন।

ইসলাম যোগ্য ও ক্ষমতা সম্পন্ন লোকদের উপর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করার পাশাপাশি এ দায়িত্বের জন্য জবাবদিহিতার নীতিও অনুসরণ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং তার রক্ষণাবেক্ষণে ন্যস্ত সকল কিছুর জন্য তাকে জবাবদিহি

১৬৪. শামসুল আলম, cÖ¸ ³, c . 105
১৬৫. আল কুরআন, ৪ : ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে”।[১৬৬] রাসূলের এ ঘোষণা অনুসারে প্রতিটি সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী তার উপর অর্পিত আমানতের (দায়িত্ব) জন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের কাছে দায়ী থাকেন।

A_‰bwZK, mvgvwRK I mvs¯wZK AwaKvi Z_v mvgvwRK wbivcËvi AwaKvi

ইসলামের বিধান অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদি বিশেষ কারণে কোন ব্যক্তির মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদা যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবেনা। চাকুরি এবং অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুবিধা থাকবে। প্রতিটি ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন পেশা বা চাকুরিতে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। তার উপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে ভোগ করার অধিকার থাকবে। কোন ব্যক্তি যদি প্রচেষ্টা করেও তার মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করতে অসামর্থ হয়, তাহলে ঐব্যক্তিকে সামাজিকভাবে সাহায্য প্রদানের বিধান রয়েছে। অধিকন্তু বেকার, অসামর্থ্য এবং অভিভাবকহীন পরিবারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ সাহায্য দেয়ার বিধান ইসলামী আইনে রাখা হয়েছে। এভাবে ইসলাম সামাজিকভাবে মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। হাদীসে আছে, সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় অথচ প্রতিবেশী অনাহারে থাকে। তদুপরি রয়েছে, অথনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খলিফা ওমর (রা.) ও খলিফা দ্বিতীয় ওমর এর আমলে দেখা যায়।[১৬৭]

KvR, b¨vh¨ gRwimn kwg‡Ki mKj cKvi b¨vqm½Z AwaKvi

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেই শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন অনেক দিন পর্যন্ত তিনি শ্রম বিভাগের মাধ্যমে অংশীদার হিসেবে হযরত খাদিজা (রা.) এর ব্যবসায়ে খেঁটেছেন। খুলাফা-এ-রাশেদার অন্যতম দুই খলিফা হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আলীও (রা.) তেমন রূপে জীবন যাপন করেছেন। ইসলাম শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে। তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামের প্রচারক নিজে বিত্তবান মানুষ ছিলেন না, ফলে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিকূল পরিস্থিতি তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারতেন। ফলে ইসলামে শ্রমিকদের অধিকার,

---

১৬৬.আল হাদীস, উদ্ধৃতঃ Ismile Ali. Faruqi, op.cit., P. 26
১৬৭. ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক, ‘‘ইসলামে মানবাধিকার,” ˆ`wbK BbwKjve, ২৫ সেপ্টেম্বর, ঢাকা : ২০০৩, পৃ . ৯

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায্য মজুরি ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। শ্রমিকের সমস্যা নিরসন এবং তাদের অধিকার পূরণে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, "মহান আল্লাহ বলেন, তিন ধরণের ব্যক্তি আছে কিয়ামতের দিন আমি যাদের দুশমন হব। আর আমি যার দুশমন হব তাকে আমি লজ্জিত ও পর্যুদস্ত করে ছাড়ব। উক্ত তিনজনের মধ্যে একজন সে যে কোন মজুরকে খাটিয়ে নিজের পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয় কিন্তু মজুরি দেয় না"।[১৬৮] শ্রমিকদের অধিকার আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট তাগিদ রয়েছে। শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাবার আগেই মজুরি প্রদানের তাগিদ রয়েছে ইসলামে।

hw³m½Z wekvg I Aemi we‡bv'‡bi AwaKvi

শুধু কর্ম দিয়েই যে মানুষের জীবন ঠাঁসা, সে মানুষ জীবনের কাছে বন্ধী। সে বিশ্ব কারাগারে কয়েদি। মানুষের দাবি আছে, যেমনি কর্মের, তেমনি অবসরের। জীবনের বিকাশের জন্য চাই অবসর। একটানা কাজ দেহকে অবসন্ন করে, মনকে ভরে দেয় অবসাদে। ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরকে পুনরায় কর্মক্ষম করে তুলতে প্রয়োজন যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস। আবার প্রতিদিনের কর্মক্লান্তি ও এক ঘেয়েমি দূর করার জন্য প্রয়োজন অবসর বিনোদনের। তাই যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম ও অবসর বিনোদন শ্রমিকের অন্যতম দাবী। এ দাবিকে মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৬৯]

wk¶v jv‡fi AwaKvi

শিক্ষার অধিকার সকল মানুষের জন্য মৌলিক। মানুষকে মানুষ হতে হলে শিক্ষা তার জন্য অপরিহার্য। আজকের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যখন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে নানাভাবে তখন শিক্ষাহীনতা একটি দুর্ভাগ্যজনক অভিশাপ। মানবাধিকারে সার্বজনীন ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে করতে হবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা তারাই পাবে যাদের এদিকে প্রবণতা আছে। আর উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকার তাদেরই থাকবে যারা মেধাবী। ইসলাম শিক্ষালাভের জন্য সুদূর চীন দেশে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে এবং বলা হয়েছে, "বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র"।[১৭০]

---

১৬৮. ইমাম বুখারী, mnxn eLvix, বাবু ইসমু মানবা'আ, হুররান, হাদীস নং- ২০৭৫
১৬৯. গাজী শামছুর রহমান, cÖv¸³, পৃ. ৪৮৭
১৭০. Sayed Amir Ali, op.cit., P. 361

Dhaka University Institutional Repository

MYZwšK ghv'v

ইসলামে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের সমালোচনা করা যায় এবং বিরোধীদলের উপস্থিতিতে স্বীকৃত রয়েছে। জনগণ রাজনৈতিক সভা ও সমাবেশের আয়োজন করতে পারে। প্রতিটি নাগরিকের চিন্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "ধর্মের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই" ।[১৭১]

ইসলামে বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তবে অতিরিক্ত বক্তব্য সমর্থিত নয়। এভাবে ইসলাম যুক্তিসঙ্গত বাঁধা নিষেধ সাপেক্ষে বক্তব্য প্রকাশের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে।

agxq msL¨vjN‡'i AwaKvi

সংখ্যালঘু অমুসলিমরা তাদের সমস্ত সামাজিক অধিকার ভোগ করে থাকে। ইসলামী আইনে অমুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার বিধান করা হয়েছে। একইভাবে তাদের শিক্ষার ও রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার ধর্ম আমার কাছে" ।[১৭২]

ইসলাম শুধু মুসলিম এবং অমুসলিমদের জন্য কিছু মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ঐ সমস্ত অধিকারসমূহ যদি কেউ লঙ্ঘণ করে তাহলে তা বলবৎকরণের বিধান রয়েছে। এ অধিকারসমূহ বলবৎকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, একটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে আদালতের মাধ্যমে এবং অপরটি হচ্ছে পরকালে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে। যদি কোন ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘিত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার অধিকার বলবৎকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, ইসলামে যে সমস্ত মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, সেগুলো সার্বজনীন, শাশ্বত ও চিরন্তন। মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য যে দু'টি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো প্রকৃতগতভাবে বৈচিত্র্যময় এবং যা আধুনিক

---

১৭১. আল কুরআন, ২ : ২৫৬
১৭২. আল কুরআন, ১০৯ : ৬

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে পরিলক্ষিত হয় না।[১৭৩] সুতরাং বলা যায় যে, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের উন্নয়নে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য।

Bmjvgx ivó e¨e¯—vq msL¨vjN

ইসলাম মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য এসেছে। আল্লাহ পাকের সকল সৃষ্ট জীব তার একান্ত আপনজন। ইসলাম বলিষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছে :'সকল সৃষ্ট জীবই আল্লাহ্‌র বৃহত্তর পরিবার।' তাই অন্যায়ভাবে একটি সামান্য পিঁপড়ার উপর যুলুমকেও ইসলাম বরদাশ্‌ত করেনি। ইসলাম সকল প্রকার যুলুমকে অত্যন্ত ঘৃনার দৃষ্টিতে দেখেছে। শক্তিমানের যুলুমকে শক্তিহীনের উপর, সংখ্যাগুরুর যুলুমকে সংখ্যালঘুর উপর কোনক্রমেই ইসলাম সহ্য করেনি। ইসলাম সকল স্তরে ন্যায়কে কায়েম করতে চায়। যালিম যদি মুসলমান হয়, আর মযলুম কাফিরও হয়, তবু ইসলাম সব সময়ই মযলুমকেই সমর্থন দিয়েছে। জাগতিক ন্যায়ের দৃষ্টিতে এর কাছে সকলেই সমান।

অবশ্য যে সব অমুসলিম সহ-অবস্থানে বিশ্বাস করে না, অধিকন্তু জবরদস্তিমূলক চরমতম অন্যায়কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, ফিত্‌না-ফাসাদের সৃষ্টি করে ন্যায়ের অবসান ঘটাতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম চরম পন্থা অবলম্বন করেছে। তবে যারা সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কল্যাণের আওতায় বসবাস করতে চায়, তাদের সঙ্গে ইসলাম নেহায়েত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার ও নযীর বিহীন উদারতা প্রদর্শন করেছে। তাদের জান-মাল, ইজ্জত আবরু সব কিছুরই বলিষ্ঠ নিরাপত্তা দান করেছে। আর এরাই ইসলামী রাষ্ট্রে পরিভাষায় 'সংখ্যালঘু'।

ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের যে সমস্ত মানবিক অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার রয়েছে, পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ অধিকার দেয়া সম্ভবপর হতে পারে না।

ইসলাম সংখ্যালঘুদের জান-মাল ও ইয্‌যত-আবরুকে আল্লাহ ও রাসূলের পরম আমানত বলেই মনে করে এবং প্রতিটি সংখ্যাগুরুর মন-মগজে কার্যকরীভাবে এ মানষিকতা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। আল্লাহ ও রাসূলের যিম্মাতেই তারা সংখ্যালঘুদেরকে গ্রহণ করে। তারা জানে, এ যিম্মা অন্যায়ভাবে যারা ভঙ্গ করবে, তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের সামনে কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে পবে। ওয়াদা খিলাফীকে তারা জঘণ্যতম প্রবঞ্চনা বলেই বিশ্বাস করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

---

১৭৩. Rev. Bosworth Smith, *Mohammad and Mohammadanism,* London : 1875 , .p.67

Dhaka University Institutional Repository

"মুনাফিক তথা যালিম প্রবঞ্চক তারা, যারা ওয়াদা খিলাফ করে এবং আমানতের খিয়ানত করে"। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের উপর কখনোই অবিচার হতে পারে না। ইসলামের চৌদ্দ শ'বছরের ইতিহাসে দেখা গেছে সংখ্যালঘুরা হয়ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, শত্রুকে পক্ষকে সাহায্য করেছে, কিন্তু তবুও সংখ্যাগুরু মুসলমানরা তাদের প্রতি কখনো অবিচার করেনি।

হযরত উমর (রা.), উমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.) গাজী সালাহউদ্দীন প্রমুখের ইতিহাস আরো এর জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহণ করে।[১৭৪]

মূল বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা পূর্বে এখানে আমাদের কয়েকটি বিষয় বুঝে নিতে হবে। এগুলো এ ব্যাপারে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য ও আবেদন সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করার কাজে সহায়ক হবে।

ক. সংখ্যালঘুদেরকে ইসলাম যে সমস্ত অধিকার দিয়েছে, এগুলোকে বর্তমানের কূটনৈতিক চালের উপর ধারণা করা ঠিক হবে না। কেননা শুধু বাক্যের অলংকার বাড়ানোর জন্য শাসনতন্ত্রে অনেক কথাই লেখা থাকে, বাস্তবে যেগুলোর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ইসলামে দেয়া সমস্ত অধিকার (বিবরণ পরে পেশ করা হচ্ছে) আল্লাহ্ ও রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্যেরই মর্যাদা রাখে। তাই শরীয়তের অন্যান্য আহকাম ও ফরায়েযের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন যেমনভাবে রাষ্ট্রের পরম এক দায়িত্ব, তেমনি সংখ্যালঘুদের সম্পর্কীয় অধিকারগুলোকেও সর্বতোভাবে সংরক্ষিত রাখা ইসলামী রাষ্ট্রে জন্য অবশ্য করণীয় দায়িত্ব। যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া বিনা কারণে কেউ যদি এগুলোর অবমাননা করে, তবে তাকে যে শুধু দুনিয়াতেই জবাবদিহি করতে হবে, তা-ই নয়; অধিকন্তু আল্লাহ্ পাকের সামনেও তাকে অভিযুক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে।

খ. এ সমস্ত অধিকার শুধু মুসলমান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের তরফ হতেই দেয়া হয় না বরং আল্লাহ ও রাসূলের জামানতের উপর দেয়া থাকে। তাই জেনে শুনে কারণ ছাড়া সেগুলোর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা আল্লাহ ও রাসূলের জামানতের খিয়ানত এরই নামান্তর হবে।

গ. এ সমস্ত অধিকার ন্যূনপক্ষের অধিকার। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ হতে যেহেতু এসব দেয়া হয়েছে, তাই এর চেয়ে নীচে যাওয়ার অধিকার কোন ইসলামী রাষ্ট্রের নেই। সমকালীন পরিবেশ অনুযায়ী ইসলামী মূলনীতির উপর লক্ষ্য রেখে এর চেয়ে ঊর্ধ্বেও যাওয়া যাবে, কিন্তু এতে কোন কমতি করা যাবে না।

১৭৪। মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, "দৃষ্টিভঙ্গি" BmjwgK dvD‡Dkb cwÎKv, ২য় সংখ্যা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৮, পৃ . ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রেক্ষিতে সংখ্যালঘুরা দু'শ্রেণির। এক. যারা সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়েছেন এদেরকে ইসলামী পরিভাষায় আহলে সুন্নাহ্ বলা হয়ে থাকে। এদের সঙ্গে সন্ধিপত্রের শর্তানুসারে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

দুই. যারা যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; এদেরকে আহলে উসওয়াহ্ বলা হয়।[১৭৫]

সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কীয় ইসলামী ধারাগুলো পর্যায় ক্রমে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

Rvb I gv‡ji wbivcËv

ইসলামের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বসবাসকারি আনুগত্যশীল প্রতিটি সংখ্যালঘুর জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামী সরকারের ও প্রতিটি মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। প্রত্যেকেই এর যিম্মাদার। ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলমানের জান-মাল যেমন ভাবে নিরাপদ, ঠিক তেমনিভাবে একজন সংখ্যালঘুরও জান-মাল নিরাপদ থাকবে।

'আইনের দৃষ্টিতে একজন সংখ্যালঘুর জান ও মাল এবং একজন মুসলমানের জান ও মালের মধ্যে কোন তারতম্য নেই। ইমাম রা'বী, আবূ হানিফা প্রমুখ ইমাম বলেন, 'একজন সংখ্যালঘুর হত্যাকারী মুসলমান হলেও তাকে হত্যা করা হবে।' একবার হযরত আলীর কাছে কোন এক সংখ্যালঘু হত্যাকারী মুসলমানকে ধরে আনা হয়। অনুসন্ধানের পর অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি এ মুসলমানকে হত্যার আদেশ দিয়ে দেন। পরে নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বলে, 'আমি ভাইয়ের রক্তের দাবী মাফ করে দিলাম।' হযরত আলী বলেন, 'হয়ত তোমাকে কেউ ভয় দেখিয়েছে কিংবা ধমকিয়েছে, তাই এ কথা বলছো।' সে বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন', ব্যাপার আসলে তা নয়। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, "যা ইচ্ছা করার ইখতিয়ার তোমার আছে। নইলে যাদের যিম্মা আমরা নিয়েছি, তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই এবং তাদের দিয়্যত (রক্তপণ) আমাদের দিয়্যতের মতই"।[১৭৬]

১৭৫। মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দিন, Bmjv‡g gvbewaKvi, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯২, পৃ. ৫৯
১৭৬। মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দিন, cÖv¸³, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

BhhZ-Avei“i wndvhZ

সব সময়ই দেখা গেছে, সংখ্যাগুরুরা সংখ্যাধিক্যের মদমত্ততায় সংখ্যালঘুদের ইয্যত আবরুর উপরই হামলা করেছে বেশি। পক্ষান্তরে ইসলাম এর হিফাযতের দিকে অত্যন্ত লক্ষ্য রেখেছে। ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের ব্যাপারে তো করেছেই, এমনকি যুদ্ধরত শত্রুদেরও মা-বোনও ধর্মীয় নেতাদের ইয্যত-আবরুর হিফাযতের নিশ্চয়তা ইসলাম দিয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সংখ্যালঘুদের ইয্যত আবরু একজন মুসলমানের ইয্যত-আবরুর মতই গণ্য। তাদের ব্যাপারে অনর্থক কোন অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করাও ইসলাম পছন্দের নযরে দেখিনি। হযরত উমর (রা.) এর আমলে মিসরের গভর্ণর উমারই বিন সা'দ এর যবান থেকে এক দিন কোন এক সংখ্যালঘুর সম্পর্কে বের হয়ে গিয়েছিল, 'আখযাকাল্লাহ'! আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন' এ বাক্যে। তিনি তখন অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে পদত্যাগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এ পদের গর্বেই আমার দ্বারা এমন হয়ে গেছে। তাই এটা ইনসাফের পরিপন্থি যে, আমি এ পদে আসীন থাকি'।[১৭৭]

agxq mvs¯‹…wZK wbivcËv

ইসলামী রাষ্ট্র চরম আদর্শবাদী রাষ্ট্র। তাই সংখ্যালঘুদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে নযীর বিহীন উদারতা ও সহণশীলতা প্রদর্শন করেছে। সংখ্যালঘুদেরকে পূর্ণ আযাদীর সঙ্গে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করার নিশ্চয়তা দিয়েছে। নজরানবাসীদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিলেন, এতে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। তাদের কোন পাদ্রীকে তার পদ থেকে সরানো যাবে না। তাদের ধর্মীয় সন্নাসীদেরকে উত্ত্যক্ত এবং গীর্জার চাবি রক্ষককে তার কাজ হতে পদচ্যুত করা হবে না। ঠিক এমনিভাবে হযরত উমরের আমলে যুরজান ও আজারবাইজান ইত্যাদির চুক্তিতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের জান-মাল ও ধর্ম সংস্কৃতির পূর্ব নিরাপত্তা দেয়া গেল। আর এর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধণ করা হবে না।

যে সমস্ত শহর মুসলমানগণ আবাদ করেছেন, যেমনঃ কুফা, বসরা অথবা যে সব শহরকে ইসলামী সংস্কৃতির জন্য সরকার সংরক্ষিত রেখেছেন এগুলো ছাড়া যে কোন শহরে তাদের যে কোন ধমীয় আচার-অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদি প্রকাশ্যভাবে করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ইমাম আবূ উবাইদ যুদ্ধের

১৭৭। এ.এম.এম মাহবুবুর রহমান, "প্রবন্ধ : Avn‡j wKZve©, ইসলামী বিশ্বকোষ, (৩য় খ.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে অধিকৃত শহরগুলোর দীর্ঘ তালিকা দিয়ে লিখেন, 'এ সমস্ত এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকৃত হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে আযাদীর সঙ্গে বসবাস করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

নিজেদের ধর্মের গুণকীর্তন করা, অমুসলিমদের কাছে এর প্রচার করা এবং সন্তান-সন্ততিদেরকে নিজেদের ধর্ম শিক্ষা দেয়ার স্বাধীনতাও ইসলাম তাদেরকে দিয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির সংরক্ষণ নষ্ট হয়ে গেলে পুনঃ নির্মাণ করার অধিকার তাদের রয়েছে। এমন কি বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি নিরুদ্বেগে চালানোর নিমিত্ত ইসলামী রাষ্ট্রের তরফ হতে ঐগুলোর নামে জায়গীরও দেয়া হত। ড. হামিদুল্লাহ ওলন্দাজীয় জনৈক প্রাচ্যবিদের উদ্বৃতি দিয়ে লিখেন, 'পক্ষান্তরে আরবীয়রা যারা আবূ বকরের হিদায়েত অনুযায়ী চলতেন, তারা বিজিতদের মন আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা চালান। এর কয়েক বছর পরে এক পাদ্রী এ সম্পর্কে লিখেছিলেন, আরবীয়গণ, যাদেরকে আল্লাহ পাক সাম্রাজ্যের অধিকারী করেছেন এবং আজ আমাদের মালিকও তারা হয়ে গিয়েছেন, এতদ্সত্ত্বেও তারা খ্রিস্টানদের ধমীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। অধিকন্তু তারা আমাদের ধর্মের হিফাযত করে থাকেন। আমাদের পাদ্রী ও ধর্মীয় নেতাদের তারা সম্মান করেন এবং আমাদের গীর্জা ইত্যাদির জন্য জায়গীরও দিয়ে থাকেন। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি একজন মুসলমান কী অনুভূতি রাখেন'।[১৭৮]

A_‰bwZK Avhv'x

অর্থনৈতিক আযাদী না পেলে মানুষ গোলামে পরিণত হয়ে যায়। এ না হলে বাঁচার কোন অর্থ হয় না। তাই ইসলাম প্রতিটি সংখ্যালঘুকেই বৈধ অর্থনৈতিক আযাদী এবং মালিকানার অধিকার দান করেছে আয় এবং ব্যয়ের স্বাধীনতা তাদেরকে দিয়েছে। এমন কি যেসব স্থল একজন মুসলমানের জন্য হারাম অনেক ক্ষেত্রে সে সমস্ত পথে তাদেরকে উপার্জনের অধিকার দিয়েছে, যেমন মদ ও শূকরের ব্যবসায় এবং এর পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন সংখ্যালঘুর পূর্ণ অধিকার রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমাদের জন্য সির্কা যেমন, তাদের জন্য মদ তেমন। আমাদের জন্য বকরী যেমন, তাদের জন্য শূকর তেমন। অর্থাৎ সির্কা ও বকরী খাওয়া, এগুলোর কেনা-বেচা করা যেমন একজন মুসলমানের জন্য বৈধ, ঠিক তেমনি মদ ও শূকর ইত্যাদি কেনা বেচা করাও একজন সংখ্যালঘুর জন্য বৈধ।

১৭৮। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, Avj KziAv‡b ivóª I miKvi, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৮৮, পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

ivR‰bwZK AwaKvi

রাষ্ট্রের সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আপন মতামত ব্যক্ত করা বা এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকেরই অন্যতম মৌলিক অধিকার। এ সম্পর্কে ইসলাম সংখ্যালঘুদেরকে নিম্নোক্ত অধিকার দিয়েছে:

ক. সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের গঠনমূলক মতামত একজন মুসলমানের মতামতের মতই গণ্য। খিলাফত-ই-রাশেদার আমলে এসব ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করার অধিকার তাদের ছিল। এমন কি প্রশাসকদেরকে তাদের মতামত নেয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। হযরত উমর (রা.) এর সময়ে বিনিয়ামিন নামে মিসরে বিবতীয়দের একজন বড় নেতা ছিলেন। হযরত উমর (রা.) যখন জানতে পারলেন যে, স্বীয় সম্প্রদায়ে তাঁর প্রভাব রয়েছে, তখন তিনি মিসরের গভর্ণর হযরত আমর বিন আসকে সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নেয়ার জন্য লিখে পাঠিয়েছিলেন।

খ. তাদের নিজস্ব ব্যাপারে ইসলামী সরকার তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবে। হযরত উমর (রা.) সংখ্যালঘুদের সম্পর্কীয় বিষয়ে তাদের পরামর্শ এবং মতামত না নিয়ে কিছুই করতেন না। ইরাকের বন্দোবস্তের সময়ে সেখানকার নেতাদেরকে মদীনায় আমন্ত্রণ করে এনে কর ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। মিসরের সংখ্যালঘুদের নেতা মুকাউকাসের মতামত নিয়ে তিনি সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠন করেছিলেন।

গ. তাদের ধর্মীয় বিষয়াদিতে শুধু তাদের মতামতই গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে তারা যে ব্যাখ্যা দেবেন, তা-ই মানা হবে; অন্য কারো মতামত গ্রহণ করা যাবে না। কারণ ইসলাম তাদেরকে ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ আযাদী দিয়েছে। তবে কুরআন-হাদীস সম্পর্কিত কোন বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মতামতের কোন মুল্য হতে পারে না।[১৭৯]

cwZi¶v wefvM I msLï¨vjN

ইসলামী রাষ্ট্র মূলত কোন সংখ্যালঘুকে তার সম্পত্তি ছাড়া ফৌজী কাজে নিয়োগ করতে বাধ্য করতে পারে না। প্রতিটি সংখ্যালঘুর জান-মাল, ইয্যত-আবরুর দায়িত্ব ইসলামী সরকার নেয়। কিন্তু তাদেরকে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে হয় না। তাই এর বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের নিকট

১৭৯। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, cÖ¸³, পৃ. ৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

হতে প্রতিরক্ষা কর নেয়। আর এ কারণেই এটা শুধু যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির উপরই অর্পিত হয়ে থাকে। শিশু, বৃদ্ধ, মেয়ে, অন্ধ, সন্নাসী প্রমুখের উপর এ কর ধার্য করা হয় না। এমনকি মুসলমান সরকার যদি তাদের জান-মাল হিফাযতে কোন কারণে অপারগ হয়ে পড়ে, তবে তাদের কাছ থেকে আদায়কৃত ঐ কর সরকারের পক্ষ হতে ফেরত দিতে হয়। প্রখ্যাত সিপাহ্‌সালার হযরত আবূ উবায়দা গভর্ণর থাকাকালে একবার সিরিয়ায় রোমীয় হামলায় মুসলমানরা কিছুটা পিছু হটে আসে। তখন আবূ উবায়দা সে এলাকা হতে আদায়কৃত প্রতিরক্ষা কর এ বলে তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিয়েছিলেন, ‘এ ট্যাক্স হিফাযতের বিনিময়ে ছিল। কিন্তু আমরা এখন তোমাদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারছি না, তাই এটা রাখার অধিকারও আমাদের নেই’।

ইসলামী পরিভাষায় এ প্রতিরক্ষা করকেই ‘জিযয়া’ বলা হয়ে থাকে। আবার ঐ কর আদায়ের ব্যাপারেও অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। গরীব, যাদের জিযয়া আদায় করার শক্তি নেই তাদেরকেও এ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) খিলাফত আমলে জিযয়া আদায় হয়ে এলে গোপনে অনুসন্ধান করতেন যে, তাদের উপর কোনরূপ চাপ প্রয়োগ করে তা আদায় করা হয়েছে কি না। তবে যে সব সংখ্যালঘু নিজের সম্মতিতে সামরিক কাজে অংশ নেয়, তাদের জিযিয়া দিতে হয় না। আজারবাইজান চুক্তিতে স্পষ্ট করে লিখে দেয়া হয়েছিল, যে সমস্ত সংখ্যালঘু মুসলিম সামরিক বাহিনীতে অংশ নেবে, তাদের ঐ বছরের জিযয়া মাফ করে দেয়া হবে।

ইমাম শাফি’ঈ লিখেন, ‘ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম বাসিন্দাগণ যদি নিজেদের সম্মতিতে ফৌজী কাজে যোগ দেয়, তবে সরকারের জন্য তাদের খিদমত গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নেই আর এর প্রতিদানে তাদেরকে আতিয়্যা অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ কিছু মাল দেয়া হবে’।[১৮০]

miKwi PvKwi

ইসলাম সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ন্যায় উপযুক্ততা হিসেবে নেয়া বড় প্রত্যেক সরকারি চাকুরির সুযোগও সংখ্যালঘুদেরকে দিয়েছে। এ ব্যাপারে উপযুক্ততা, রাষ্ট্রীয় আনুগত্য, আমানতদারী ও দক্ষতা একমাত্র বিচার্য বিষয় বলে গণ্য হবে। হযরত উমর (রা.) যখন কায়রো থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করান, এর ইঞ্জিনিয়ার সংখ্যালঘুদের একজনকেই নিয়োগ করেছিলেন।

১৮০। ইসলাম গনী, Ô জিযয়া’, Bmjvgx wek‡Kvl (১১ খ.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ . ৫৭৮

পূর্বেই বলা হয়েছে, সামরিক বিভাগেও চাকরি করার সুযোগ তাদের রয়েছে। হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ তার সময়ে অস্ত্রগারের প্রধান পদে একজন হিন্দুকে নিয়োগ করেন।

তবে যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় নীতি কুরআন সুন্নাহর আলোকে নির্ণীত হয়, আর এ বিষয়ে অমুসলিমগণ কোন সাহায্য করতে পারে না, তাই যে সমস্ত পদ নীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, সে সমস্ত মৌলিক পদগুলো স্বাভাবিকভাবে কেবল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে উপযুক্ত ঈমানদারদের জন্যই সংরক্ষিত।

AvBb c‡qv‡Mi †¶‡Î gvb-ghv©'v

ইসলাম আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু বলে তাদের কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বরদাশত করে না। এ ব্যাপারে সংখ্যালঘুদেরকেও সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে। হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতের সময় জনৈক সংখ্যালঘু ইয়াহুদী তার বর্ম চুরি করে নিয়ে যায়। পরে আদালতে খলীফা হয়েও তিনি একজন সাধারণ নাগরিকের মতই হাযের হন। এ বিষয়ে তার ছেলে হযরত হাসান (রা.) ও কয়েকজন গোলাম তার সাক্ষী ছিলেন। হযরত আলী (রা.) ও তা মেনে নেন। ইসলামের এ ন্যায়পরায়ণতা দেখে ইয়াহুদী অভিভূত হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে।[১৮১]

msL¨vjN‡'i cvi‡mvbvj j"

নিজেদের উপর নিজস্ব আইন প্রয়োগ করার স্বাধীনতা ইসলাম এদেরকে দিয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামী সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। এমনকি এ ব্যাপারে বিচারের জন্য ইসলামী আদালতে আসতে তারা বাধ্য নয়।

পঞ্চম খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.) একবার ইমাম হাসান (রা.) কে বললেন, পার্সীরা নিজের মেয়ে এবং বিমাতাকে বিয়ে করে থাকে। কিন্তু এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী খলীফাগণ কোনরূপ ব্যবস্থা করেননি। এর কারণ কি? হযরত হাসান (রা) জবাবে বললেন, আপনাকে তাদের পদাংক অনুসরণ করেই চলতে হবে। নিজের তরফ হতে কোন নতুন বিধান জারী করতে আপনি পারেন না।

১৮১। A.K. Brohi , ***Quotation in united nations and human rights***, Karachi University, Pakistan : 1968, P. 313

Dhaka University Institutional Repository

msL¨vjN‡`i Dc‡`óv †evW

সমকালীন ইসলামী সরকার এ সকল ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের থেকে তাদের ভোট অনুযায়ী নির্বাচন করে একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করতে পারেন যা সংখ্যালঘুদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আর তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি পালনে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কিনা, ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং প্রয়োজনবোধে তাদের পারসোন্যাল ল'র আওতায় আইন বানানোর সুপারিশ করবে। হযরত উমর (রা.) এর নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত আমর বিন আস কিতবী সরদার বিনিয়ামিনকে তাদের নিজস্ব ব্যাপারে যিম্মাদার নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন।[১৮২]

mvgvwRK wbivcËv

প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। ইসলামের দৃষ্টিতে এতীম, বিধবা, বৃদ্ধ, অন্ধ, অসুস্থ্য, বেকার প্রভৃতিদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য। সরকার বায়তুল মাল হতে এর বন্দোবস্ত করবেন। এ ব্যাপারে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মধ্যে কোন তারতম্য করা হয়নি। বরং একজন মুসলমান নাগরিকের মতই একজন সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা বিধান করবে সরকার।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ তার গভর্ণর আদি ইবনে আরতাতকে নির্দেশ পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার এলাকার সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নাও। যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে, উপার্জনে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তাদেরও জন্য বায়তুল মাল হতে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী মাসোহারা জারী করে দাও। আমি জানতে পারছি, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) একবার এক ইয়াহুদীকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখলেন অতঃপর বায়তুল মাল হতে তিনি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) এর আমলে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ হিরাবাসীর সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন, তাতে আরো পরিস্কার করে বলেছেন, আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, যিম্মীদের মধ্য হতে (ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম বাসিন্দা) কেউ যদি বার্ধক্য জনিত কারণে বেকার হয়ে যায় অথবা আসমানী মুসীবতে আক্রান্ত হয় কিংবা তাদের কোন ধনী ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে পড়ে, তবে এমন সকলকেই জিযয়া মাফ করে দেয়া হবে। অধিকন্তু বায়তুল মাল (সরকারি কোষাগার) তার এবং তার পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে, যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্র বসবাস করবে।

১৮২। মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, Cv¸³, পৃ. ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এ যে মানব জীবনের জন্য তা শুধু নীতিমালাই পেশ করে নি, বরং বাস্তবভাবে সকলের সমস্যার সমাধান দিয়েছে। আর ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামের এ ন্যায়বিচার কার্যক্রমের দরুন সব সময়ই দেখা গেছে, সংখ্যালঘুরা তাদের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে সম্মান জানিয়েছে, মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতাকে আশ্রয়স্থল হিসেবে ভেবেছে। ইরাক, ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি বিজয় আজো এরই জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহণ করে। আমরা সকলেই জানি যে, সিন্ধু বিজয়ের সময় স্বধর্মী হিন্দুরাজা দাহিরের পরিবর্তে সে দেশের অধিবাসীরা মুসলমানদেরকেই স্বাগত জানায়।

এমন কি তারা মনে-প্রাণে মুসলমানদের বিজয়কেই দেখতে চাইত। হযরত আবূ ওবায়দা (রা.) যখন সিরিয়াবাসীকে তাদের জান-মালের হিফাযতের জামানতে দেয়া জিযয়া ফেরত দিয়েছিলেন, তখন তারা অত্যন্ত অভিভূত হয়ে প্রবল আবেগের সঙ্গে বলেছিল, ‘আল্লাহ্ তোমাদেরকে জয়ী করে আবার ফিরিয়ে আনুন। আল্লাহর কসম, রোমীয়রা যদি তোমাদের অবস্থায় পড়ত, তবে আমাদের স্বধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তারা কিছুই ফেরৎ দিত না। অধিকন্তু আমাদের সব কিছুই লুট করে নিয়ে যেত।’[১৮৩] এগুলো ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম বাসিন্দাদের সম্পর্কে ইসলামী বিধানের কতিপয় উজ্জ্বল ধারণা ও উদাহরণ।

১৮৩। ফরীদুদ্দিন, মাসউদ, “ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু,” Bmjvgx wekwe`¨vjq cwÎKv, ২৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা : ১৯৮৩, পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡”Q‘

Bmjvgx mgv‡Ri gj¨‡eva

gj¨‡ev‡ai msÁv I cwiwPwZ

‘মূল্যবোধ’একটি ব্যাপক ও বহুল ব্যবহৃত আপেক্ষিক প্রত্যয়। এটা দর্শন সম্পর্কিত একটি ধারণা।[১৮৪] মূল্যবোধ বলতে মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদণ্ডকে বুঝায়, যার মাধ্যমে কোন ঘটনা বা অবস্থার ভাল মন্দ বিচার করা হয়। মূল্যবোধ একটি অলিখিত সামাজিক বিধান। কোন সমাজেই মূল্যবোধ লিপিবদ্ধ থাকে না। সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ ও অনুমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যবোধ গড়ে উঠে। ফলে সমাজ ভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই মুল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে ইতিবাচক বা নেতিবাচক রূপ ধারণ করে। এজন্য এ. আর. উইলিয়াম বলেছেন, “মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে ইতিবাচক বা নেতিবাচক রূপ ধারণ করে। মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড, যার আদর্শে মানুষের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের কর্মকাণ্ডের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়”।[১৮৫] সমাজ জীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ইত্যাদি পর্যায়ে মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মূল্যবোধ ব্যক্তিগত বিশ্বাসবোধ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও নীতিবোধকে নির্দেশ করে। যেগুলো পরোক্ষভাবে ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। দলীয় লক্ষ্য, আদর্শ ও নীতিবোধের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা বিচারবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি দলীয় মূল্যবোধের পরিচয় বহণ করে। সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ এবং সমাজ অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে। আর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশগত মূল্যবোধ হলো প্রতিষ্ঠান বা নিদিষ্ট পেশার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ ভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি, যেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।[১৮৬]

সামাজিক জীবনের একটি অপহির্যা বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যেই নিহিত থাকে সমাজের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কিত ধারণা। মূল্যবোধের মধ্যে ব্যক্তিনিষ্ঠতা বস্তুনিষ্ঠতা বর্তমান থাকে। তাই সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

১৮৪। সম্পা দাস, mgvRKg, cZ¨q, BwZnvm I ‘kb, বুক চয়েস, ঢাকা : ২০০৫, পৃ . ১৩৭
১৮৫। মোঃ আতিকুর রহমান, mgvRKj¨vY, কোরআন মহল, ঢাকা :১৯৯৯, পৃ .৫৮
১৮৬। সম্পাদাস, cÖv¸³, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি, সামাজিক লক্ষ্য অর্জন, সামাজিক সংহতি সৃষ্টি, সামাজিক প্রয়োজনপূরণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার অন্যতম উপায়।

সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই কোন সমাজের সামাজিক প্রতিক্রিয়া (Social Process) পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতিনীতির উচ্চতম মানদণ্ড (higher order norms) হিসেবে সমাজের ভাল-মন্দ, প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত ও ন্যায়-অন্যায়ের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং যে সমস্ত সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস, সাধারণ মানদণ্ড, ভাল-মন্দ নির্ধারণ ও প্রত্যাশিত কল্যাণ প্রবণতা সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে, ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজে বাঁধা দেয় সে সমস্ত অমূর্ত (abstract) সামাজিক উপাদানের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।[১৮৭]

জীবন ও জগতের স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে মানব জীবনের পরমার্থ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ, মানব জীবনের লক্ষ্য, কর্তব্য, পরিণতি প্রভৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানের অনুরাগই দর্শন। আর এক্ষেত্রে ধর্মই অগ্রণী ও প্রধান ভূমিকা পালন করে।[১৮৮] সমাজ জীবনে বিধি-বিধান পালন, অনুশাসন, জীবন ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াদির পথ নির্দেশ দেয়াই ধর্মের একটি সামাজিক কর্তব্য। জীবনকে সুন্দর করার জন্য নীতি নৈতিকতার ভিত্তিতে মানবীয় সুকুমার বৃত্তির পরিচর্যা করা প্রয়োজন। ধর্মীয় জীবন দর্শন বিশেষত ইসলামী ধর্ম ব্যবস্থা এ লক্ষ্য অর্জনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। ইসলাম অর্থ আনুগত্য। আনুগত্য অর্থ মেনে নেয়া, গ্রহণ করা এবং সে মত জীবন-যাপন করা। ইসলাম চায়, আমাদের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমে শান্তি আনয়ন। ইসলাম নতুন কোন ধর্ম ব্যবস্থা নয়। মানুষ পৃথিবীতে প্রথম যেদিন আগমন করেছেন সেদিন থেকেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তি লাভের জীবন-বিধান আল্লাহ মানুষকে মেনে চলতে বলেছেন। ইসলাম আল্লাহর প্রেরিত একমাত্র ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা। এর অর্থ ইসলাম এমন এক চিরন্তন এবং মৌলিক বিধান যা মানুষকে জীবনের চলার পথে প্রতিনিয়ত দিক নির্দেশ দিয়ে থাকে।[১৮৯] তাই সামগ্রিক জীবনদর্শন এবং পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। মানব জীবনের সামগ্রিক দিকই ইসলামের পরিধিভুক্ত। এজন্যই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আজ তোমাদের ধর্মব্যবস্থা সর্বাঙ্গ

১৮৭। cv¸ ³, পৃ. ১৩৮

১৮৮। G.R. Leslic and other, *Introdctory Sociology*, 3rd ,ed. New York :1994, P.460

১৮৯। মুহাম্মদ ফজলে ইলাহী , mnR fvlvq Bmjv‡gi gj K_v, আঞ্জুমান হিদায়তুল উম্মত, ঢাকা ;১৯৯৩, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দর ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলাম তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম” ।[১৯০]

তাই ধর্ম শব্দের প্রচলিত অর্থে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে না। ব্যক্তি এবং স্রষ্টার মাঝে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক সীমিত সম্পর্ক স্থাপনই সাধারণত ধর্মের সংজ্ঞার আওতায় আসে। কিন্তু ইসলাম এ সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়। ইসলাম একদিকে যেমন স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে, অপরদিকে তেমনি মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষের সাথে সৃষ্ট জগতের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্কও সংজ্ঞায়িত করে। সমগ্র জীবনকেই বেষ্টন করে আছে ইসলাম। জীবনের এমন কোন দিক নেই, যা ইসলামের বর্ণিত হয়নি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পার্থিব এবং অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই।[১৯১]

Bmjvgx mgv‡Ri gj¨‡eva

ইসলাম তার মূল্যবোধসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে এমন এক অবস্থায় পৌঁছে দিতে চায়, যেখানে থাকবে শুধু সুখ, শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ইসলাম মানবকল্যাণে বিশ্বাসী বিধায় অন্যান্য ধর্মের তুলনায় মানব সেবাকে এতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল কাজের মধ্যে সমাজ সেবা শ্রেষ্ঠতর কাজ বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে দানশীলতাকে ইসলাম ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়নি, বরং বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলাম এভাবে সমাজ ও সমাজ জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে যা সমাজের বুক থেকে অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়-বিচার ও শোধনের ফল্গুধারা প্রবাহিত করে।

gvb‡li ghv©v

ইসলামের মতে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই ইসলামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা স্বীকার করা হয়েছে। “আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই” ।[১৯২] এটাই হল মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় সনদ। এ সনদের মাধ্যমে ইসলাম মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে একটা প্রত্যক্ষ সর্ম্পক প্রতিষ্ঠা করে। একমাত্র স্রষ্টা ব্যতীত কেউ মানুষের উপরে নয়। ইসলামের

১৯০। আল কুরআন, ৫:৩
১৯১। Sayed Amir Ali*, Op.cit.*, P.178
১৯২। আল কুরআন, ২: ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিতে আল্লাহ সার্বভৌম। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মানুষের সাহায্য চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে : "আমরা অবশ্যই সম্মানিত করেছি আদম বংশকে এবং তাদের চলতে দিয়েছি স্থল ও জল পথে। আর তাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছি সব পবিত্র দ্রব্যাদি এবং আমার সৃষ্টির অনেক কিছুর উপর তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি"।[১৯৩] সত্যিকার অর্থে মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে, অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি। কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার"।[১৯৪]

কুরআন আরেকটি ঘোষণা দিয়েছে যে, নারী, পুরুষ, সাদা-কালো নির্বিশেষে মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে, "তোমাদের রব ফেরেস্তাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা (প্রতিনিধি) প্রেরণ করছি"।[১৯৫] খলিফা সম্পর্কিত ধারণাই মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। পৃথিবীতে মানুষকে তার প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার রুবুবিয়াতের কাজ (লালন ও পালন নীতি) মানুষ তারই প্রতিনিধি হিসেবে করে যাবে। যেহেতু মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব, তাই আল্লাহ তাঁর ফেরেস্তাদেরকে আদেশ করলেন আদমকে কুর্ণিশের মাধ্যমে মানুষের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে। স্রষ্টা স্বয়ং মানব জীবনের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে মানুষকে সর্বোতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে ও তাদের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছে যাতে পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে তারা তাদের উদ্দেশ্য সফলকল্পে সমগ্র সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার করতে পারে। মানুষকে কেন্দ্র করেই এ বিশ্বলোকের সৃষ্টি। তাই এ বিশ্বলোককে মানুষের কর্মক্ষেত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য। মানুষ তার উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে এর ব্যবহার করবে। এসবই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। তাই আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে : "একমাত্র তিনিই পৃথিবীর সকল বস্তু তোমাদের (মানব জাতির) জন্য সৃজন করেছেন"।[১৯৬]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে,- "আল্লাহ তিনিই; যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী। আর আকাশের দিক থেকে পানি বর্ষণ করিয়েছেন। তার ফলে বের করেছেন-ফল-ফসলসমূহ তোমাদের

১৯৩। আল কুরআন, ১৭ : ৭০
১৯৪। আল কুরআন, ৯৫: ৪-৬
১৯৫। আল কুরআন, ২: ৩০
১৯৬। আল কুরআন, ২: ২৯

Dhaka University Institutional Repository

রিযিকরূপে। তিনি নৌকা-জাহাজ তোমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন, যেন তা নদী সমুদ্রে চলতে পারে তাঁর বিধানমত। তিনি খাল-ঝর্ণাসমূহকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আবর্তনশীল চন্দ্র ও সূর্যকে। তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত্র ও দিনকে এবং এভাবে তোমরা যা চাও, যা প্রয়োজন মনে কর সবই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। যদি আল্লাহর দেয়া এসব কল্যাণকর দ্রব্য-উপকরণ গণনা করতে চেষ্টা কর, তাহলে তা কখনই পারবে না"।[১৯৭]

"তুমি কি দেখতে পাওনা যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলীর ও যমিনের সবকিছু তোমার অধীন করে দিয়েছেন। তিনি ব্যাপকভাবে দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় ভাবেই তার উদারতাকে তোমাদের নিকট প্রবাহিত করেছেন"।[১৯৮]

সুতরাং ইসলামের পরিকল্পনায় মানুষই হল সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র। তার জন্য সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং তারই জন্য এত আয়োজন। এভাবেই ইসলাম সৃষ্টিলোকে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং ধর্ম, বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদ না করে সমগ্র জাতিকে সম্মানের আসনে বসায়। এ সম্মান ও মর্যাদা সব মানুষের জন্মগত অধিকার। আকীদা-বিশ্বাস পোষণ, জ্ঞানার্জন ও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ইসলাম সবাইকে সমান অধিকার দেয়।

AvZ¥bqšY AwaKvi

ইসলামের অন্যতম একটি স্বীকৃত মূল্যবোধ হলে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের নিজস্ব পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। ইসলামী বিধান মতে, প্রত্যেক মানুষ স্বীয় চেষ্টায় ভাল-মন্দ করে থাকে। এজন্য ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "যারা সৎ কাজ করে তারা তা নিজের জন্যই করে থাকে এবং যারা অসৎ কাজ করে তারা তা নিজেদের জন্যই করে থাকে"।[১৯৯]

"যে সৎ পথে চলে, সে নিজের মঙ্গলের জন্যই তা করে এবং যে বিপথে গমণ করে সে বিপথে গমণের দায়িত্ব নিজেই বহণ করে"।[২০০]

১৯৭। আল কুরআন, ১৪: ৩২-৩৪
১৯৮। আল কুরআন, ৩১: ২০
১৯৯। আল কুরআন, ৪১: ৪৬
২০০। আল কুরআন, ১০:১০৮

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বুঝা যায় যে, ইসলামে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলাম একটা মধ্যপন্থার নীতি অবলম্বন করে। ইসলাম আল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে যেমন একবাক্যে স্বীকার করে, তেমনই মানুষের মুক্ত-চিন্তা ও দায়িত্বকেও অস্বীকার করে না। আল্লাহ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু মানুষেরও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তা বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমায়িত। সে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেই তাকে ভাল-মন্দ বিচার করে চলতে হয়। মানুষের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। মানুষের জন্মকাল হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত চলে ভিতর বাইরের সংগ্রাম। একদিকে প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্ব অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার সাথে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

এদিক থেকেও মানুষ একটা নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। মানুষের গোটা পরিবেশ এক বিরোধ-সংহতির ইতিহাস, এক বিরোধ সমন্বয়ের প্রয়াস। কাজেই মানুষ যা চায় সব সময় তা পায় না, এ চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়। মানুষ তাই এক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্বাধীন, এক সীমিত ক্ষমতার মধ্যে নিজের চরিত্র ও ভাগ্যের সংগঠক।[২০১]

mK‡ji Rb¨ mgvb m‡hvM

ইসলাম সাম্যে বিশ্বাসী বলেই সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদান করে থাকে। এতে মানুষ মানুষে ভেদাভেদ স্বীকার করে না। ইসলামের অনুশাসন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার উপর সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতানুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারে। সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূলমন্ত্র। সাদা মানুষ কালো মানুষের উর্ধ্বে নয়, আর কালো মানুষও সাদা মানুষের উর্ধ্বে নয়। আইনের চোখে সবাই সমান।[২০২]

ইসলামী সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু পরিবেশের মাঝে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সুব্যবস্থা করেছে। এতে জাতিভেদের কোন বালাই নেই। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং ভূমিকে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। তিনি চারদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর অনুসন্ধান করে"।[২০৩] এ আয়াত সম্পদ ভোগে কোন বিশেষ শ্রেণির বিশেষ অধিকারকে স্বীকার করা হয়নি।

২০১। ড. রশীদুল আলম, gmwjg 'k‡Yi fwgKv, সাহিত্য কুটির, ঢাকা : ১৯৮৬, পৃ . ২৮৮
২০২। মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, Bmjvg ivó mgvR, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৪, পৃ . ৩০৮
২০৩। আল কুরআন, ৪১:১০

Dhaka University Institutional Repository

কোন প্রাণীর মধ্যে বৈষম্যও করা হয়নি। ইসলামী আইন অনুসারে কোন মুসলমান কোন অমুসলমানকে হত্যা করলে তাকে সে শাস্তি দেয়া হবে যে শাস্তি একজন মুসলমানকে দেয়া হয়নি। এমনকি, ইমাম এবং সম্রাট পর্যন্ত কেউই কোন অমুসলিমকে তার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে পারতেন না। মহানবী (সা.) বলেছেন, "তাদের (জিম্মি) শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হবে। ধর্ম পরিবর্তনে তাদেরকে বাধ্য করা হবে না। তাদের ধন-প্রাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই নিরাপদ থাকবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাদের অধিকারে থাকবে। তাদের পাদ্রী, পূজারী, বিশপ ও পুরোহিত কাউকেও বরখাস্ত করা হবে না এবং তাদের ক্রুশ ও দেব-দেবীর মূর্তি বিনষ্ট করা হবে না। মুসলমান চাষীদের অবশ্য দেয় 'ওশর' জিম্মিদের নিকট হতে নেয়া হবে না। তাদের অঞ্চলেও সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হবে না। তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা হবে"।[২০৪]

বায়তুল মাল সম্পর্কে হযরত ওমরের (রা.)- এর ঘোষণা : "আল্লাহর নামে শপথ! এ রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর কেউ অপর কারো অপেক্ষা অধিক অধিকার লাভের দাবি করতে পারে না। আমি নিজেও কারো অপেক্ষা অধিক অধিকারের দাবীদার নই"।[২০৫]

mvgvwRK ‘wqZ

ইসলাম মানুষের কর্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন সামাজিক দায়িত্বকেই নির্দেশ করে। আসমান ও যমিনে যা কিছু বিদ্যমান, তার সব কিছুর মালিক আল্লাহ, তা সে ব্যক্তিই হোক, আর ব্যক্তির সমষ্টি রাষ্ট্রই হোক। মালিকানা স্বত্বের অর্থ ইচ্ছামত বস্তুর ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহারের অধিকার। ইসলাম মানুষের এ ধরণের অধিকার স্বীকার করে না। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ জড় সম্পদ ভোগ করবে মালিক রূপে নয়, আল্লাহর 'রব' (লালন ও পালন নীতি) গুণের প্রতিভূরূপে (খলিফা)। অপরের কল্যাণে অন্তরায় ও উদাসীন না হয়ে সম্পদ ভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু এ ব্যবহারিক স্বত্বাধিকার তাদেরকে অর্জন করতে হয় আল্লাহ প্রদত্ত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। কোন সঙ্গত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক জীবন মানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মের সংস্থান এ মৌল জীবিকার উপকরণসমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনেরই নাম 'হককুল ইবাদ' আদায় করা। এ

২০৪। আল হাদীস উদ্ধৃত: ড. রশীদুল আলম, cÖ¸³, পৃ.২৮৮

২০৫। আল হাদীস উদ্ধৃত: ফজলুল করীম, Av‘k gvbe, ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৯৪৭, পৃ . ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ নেই; কিন্তু পূণ্য আছে কেবল আল্লাহ, পরকাল, ফেরেস্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহার্য্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে, যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী"।[২০৬] "যারা এতিমদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্নদানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশীর উপকারের প্রতি উদাসীন সে সকল উপসনাকারী অভিশপ্ত"।[২০৭]

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যে উত্তম দ্রব্য উপার্জন কর তা হতে অপরের জন্য ব্যয় কর এবং আমরা জমি হতে যা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেছি তা হতে ব্যয় কর"।[২০৮]

আমাদের বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়, সব লোকেরই নিজ নিজ পরিবারের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য থাকে এবং তাদের সবাইকে নিয়ে আমরা সামাজিক কর্তব্য পালন করি। এখানে ব্যক্তি হিসেবে একজন মানুষের দায়িত্ব সুস্পষ্ট। এক আল্লাহর সর্বময় উপস্থিতি বিশ্বজগতে আমাদের যার যার প্রকৃত কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। যাকাত ব্যবস্থা গরীব ও অভাবীদের মধ্যে সম্পদের পুনর্বণ্টন করে, ফলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজে একজন ইয়াতীম ছিলেন। সুতরাং তিনি তার ছোটবেলা থেকে জানতেন, জনসাধারণ কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের দান সমাজে কতটুকু প্রয়োজনীয় ছিল। এর প্রয়োজনীয়তা সব সময়ই থাকবে। পিতা-মাতার কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কর্তব্যসমূহ দায়িত্বপূর্ণভাবে পালন করা উচিত। নৈতিক আচরণ সংক্রান্ত বিধানসমূহও অনুরূপভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যক্তি জীবন এবং সমষ্টি জীবনে সদাচরণ প্রদর্শন তদানুরূপ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া উচিত। যাই হোক মানুষের জন্য কোন কাজকে তার সাধ্যাতীতরূপে চাপিয়ে দেয়া হয়নি : "আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তা তারই, সে মন্দ যা উপার্জন করে তাও তার"।[২০৯]

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকেও নৈতিকতাপূর্ণ করার দিকে নজর দেয়া দরকার। রাষ্ট্র ও সংবিধানে অবশ্যই সবার জন্য ন্যায়ের বিধান থাকতে হবে। প্রাচীন সামুদ জাতিকে সর্তক করে দেয়া হয়েছিল

২০৬। আল কুরআন, ২:১৭৭
২০৭। আল কুরআন, ১০৭:২-৪
২০৮। আল কুরআন, ২:২৬৭
২০৯। আল কুরআন, ২: ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

যে, এমনকি একটি তৃষ্ণার্ত উটেরও পানি পান করার অধিকার আছে। সমষ্টির দায়িত্ব সম্পর্কে এ আয়াত দু'টিতে বলা হয়েছে : "আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না। যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে"।[২১০]

ইসলামের যৌথ প্রতিরক্ষা নীতি আক্রমণকারীদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছে : ইসলাম 'অন্য গাল বাড়িয়ে' অবাস্তব নীতির কথা বলে না বরং আত্মরক্ষায় মেজাজ নিয়ে সহানুভূতিশীলভাবে মীমাংসার প্রচেষ্টা নেয়। নিম্নের কয়েকটি আয়াত থেকে আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি :

"যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিম। তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা কার? ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না, মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই যারা ধৈর্যশীল। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই, যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর স্মরণ নিবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।[২১১]

ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়িত্বপূর্ণ তৎপরতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইতিবাচক আচরণকে নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক তৎরপতার উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে যে, 'কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু এরই প্রতিফল দেয়া হবে, আর তারা অত্যাচারিতও হবে না।[২১২]

সুতরাং আমাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যেন আমরা প্রথমত আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, নারী-শিশু বিশেষ করে ইয়াতীম, দরিদ্র ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং মুসাফির, যাদের খোঁজ-খবর নেয়া ও সমবেদনা জানানো প্রয়োজন তাদের সকলের সাথে গঠনমূলক আচরণ প্রদর্শন করি। এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন ও বন্দীকে আহার দান করে। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমরা আহার দান করি, আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতা নয়"।[২১৩]

এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রায় সবগুলোই রসূল (সা.)-এর জীবন বাস্তব উদাহরণ থেকে বিস্তারিতভাবে সংকলিত হয়েছে যাকে আরবিতে বলা হয় সুন্নাহ। এজন্য গড়ে উঠেছে হাদীস বিজ্ঞান বা ঐতিহ্য বিজ্ঞান এবং

২১০। আল কুরআন, ১৩ : ১১
২১১। আল কুরআন, ৪১: ৩৩
২১২। আল কুরআন, ৬ : ১৬০
২১৩। আল কুরআন, ৭৬: ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম মণীষীগণ অতীতের ঘটনা ও বিবরণের সত্যতা যাচাই করার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

হাদীস সংকলনে এর কঠোর প্রয়োগ ঐতিহাসিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে এক গৌরবময় অধ্যায়। এসব কিছুর মধ্যে রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিত্বের প্রভাব গভীর নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে, যা গড়ে তুলেছে আমাদের হাদীস যা ইসলামী ঐতিহ্যের ভিত্তি।

আমাদের রয়েছে এক গৌরবময় ঐতিহ্য। যে ঐতিহ্যের বন্ধনে বিস্তৃত হয়েছে আফ্রিকা থেকে মরক্কো, দক্ষিণ এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এবং গড়ে তুলেছে সাংস্কৃতিক ঐক্য। পাশ্চাত্যের আক্রমণের মুকাবিলায় ইসলামী বিশ্ব আবার জেগে উঠেছে নিজেদেরকে বর্তমান বিশ্বে মধ্যপন্থি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

m¤ú‡`i mØ¨envi I mlg eÈb

ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যেই আবর্তিত হয়েছে। যাকাত আদায়ের পরও ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তারা জিজ্ঞাসা করে যে, তারা কী খরচ করবে; বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (ধন-সম্পদ, সমাজ ও জাতির জন্য) আল্লাহর পথে ব্যয় কর"।[২১৪] "পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"।[২১৫] এখানে 'তোমাদের' শব্দটি কোন ব্যক্তি, সমষ্টি বা গোত্রকে সম্বোধন করে বলা হয়নি বরং সমগ্র মানবতাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সম্পদ ভোগে ইসলাম সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে এবং কারো বিশেষ অধিকারকে শুধু যে অস্বীকার করেছে তা নয়, কোন অঞ্চলের সম্পদ যে শুধু সে অঞ্চলের ইসলাম এ স্বীকৃতিও দেয়নি।

ইসলামী মতে, সম্পদ শুধু দু'টি কাজে ব্যবহৃত হবে। এর একটি জীবনের সুন্দরতম বস্তু লাভের জন্য খরচ করা এবং অপরটি শিল্প কিংবা ব্যবসায় ব্যয় করা। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসার পূর্বেই আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে (সমাজের কল্যাণের জন্য) ব্যয় কর"। [২১৬]

২১৪। আল কুরআন, ২:২১৯

২১৫। আল কুরআন, ২:২৯

২১৬। আল কুরআন, ৬৩: ১০

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বা অনটনের অজুহাতে কারও সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার অধিকার নেই। প্রত্যেককেই সমাজের জন্য কম-বেশি ব্যয় করতেই হবে।

আল কুরআনে মওজুদদারদের কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কেও হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে : "তারা অভিশপ্ত যারা ধন সম্পদ মওজুদ করে আর গুণে গুণে রাখে, ভাবে তাদের ধন তাদের নিরাপত্তা দিবে। নিশ্চয় নয়। এ সম্পদ তাদের এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাবে যা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলবে"। [২১৭] সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে- "ধন সম্পদের অপচয় করো না, যারা এভাবে ধন-সম্পদের অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই"।[২১৮]

ইসলাম মানুষকে সম্পদ ভোগ করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সম্পদের প্রতি আসক্ত হতে নিষেধ করেছে। এভাবেই ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

mvgwMK Rxebv‡eva

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলে মানব জীবনের সামগ্রিক জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণে বিশ্বাসী। ইসলাম সমাজের অখণ্ড সত্তায় বিশ্বাসী এবং মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল, সমষ্টি ও সমাজকে পৃথকভাবে বিচার না করে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করা হয়। ইসলাম দুনিয়ায় প্রচলিত অর্থে কোন ধর্ম নয় এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। ব্যক্তিগত, সামাজিক, পার্থিব, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন, সংস্কৃতি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের পথ-নির্দেশ রয়েছে।[২১৯]

ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠন করা। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে," রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হিদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সে সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি। যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং লোহা ও অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিরাট শক্তি এবং লোকদের জন্যে বিস্ময়কর কল্যাণ নিহিত রয়েছে এটা এ

২১৭। আল কুরআন, ১০৪:১-৩
২১৮। আল কুরআন, ১৭:২৬-২৭
২১৯। মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, cÖv¸³, পৃ. ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেন আল্লাহতা আ'লা জানতে পারেন যে, কে তাকে না দেখে তাঁর ও তাঁর রসূলগণের সাহায্য সহযোগিতা করে"।[২২০]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রক্ষক বা রাখাল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধানকে জিজ্ঞেস করা হবে তার রাষ্ট্রের জনগণ সম্পর্কে। প্রত্যেক মানুষকে তার পরিবার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, প্রত্যেক নারী তার স্বামীর সংসারের রাখাল স্বরূপ, তাকে তার পরিবারের সকল সদস্য সম্পর্কে হিসেব দিতে হবে এবং প্রত্যেক কর্মচারী তার মালিকের রাখাল, তাকে তার মালিকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে"।[২২১] সুতরাং ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে এরূপ একটি ভাষা সমীক্ষায়ও দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম একটি সর্বদিক পরিব্যপ্ত জীবন-ব্যবস্থা এবং মানব জীবনের এমন কোন দিক পরিত্যাগ করেননি যা শয়তানের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে।

åvZZ‡eva

ইসলামী সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মানব জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা। ইসলামের বিঘোষিত নীতিতে সকল মানুষই সমান এবং জন্ম বা মর্যাদার কারণে মানুষে-মানুষে কোন প্রভেদ নেই। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের নীতিতে জাতি, গোষ্ঠি, বর্ণ বা সামাজিক পেশা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নর-নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম আন্তর্জাতিক মিলন প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। ধর্ম, জাতি এবং দেশ বিভিন্ন হলেও মানুষই যে মূলত এক পরিবারভুক্ত, সকলের উৎস যে এক, সকল মানুষের অন্তরে যে একটা নিগূঢ় আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে এবং তারা যে পরস্পর ভাই এ কথা ইসলামই হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছে। আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : "সমস্ত মানবমণ্ডলী এক জাতি। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে; যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন"।[২২২]

২২০। আল কুরআন, ৫৭:২৫
২২১। ইমাম আবু দাউদ, mbv‡b Ave 'vD', বাবু মা ইয়ালজিমুল ইমামু মিন হাক্কির রায়িয়্যাতি, হাদীস নং- ২৯৩০
২২২। আল কুরআন, ৪৯:১৩

Dhaka University Institutional Repository

তাই ইসলামের প্রতিটি বিধানই মানুষকে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করা ছাড়াও জীবনে সৎপথে থেকে তার আত্মচেতনাকে জাগ্রত করতে সহায়তা করে। বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা সদুত্তরের মাধ্যমে মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন-যাপনে অনুপ্রাণিত করে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার স্বত্ব, সম্পদের বণ্টন, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক, ন্যায়পরায়ণতা, সামরিক সংগঠন, যুদ্ধ ও শান্তি, দরিদ্রের কল্যাণ বিধান, এতিম ও বিধবার মঙ্গল সাধন প্রভৃতি বিষয়ের সঠিক পথ নির্দেশ রয়েছে ইসলামে।

ইসলাম ফিতরাত বা স্বাভাবিকতার ধর্ম। যা স্বাভাবিক, যা প্রকৃতিসম্মত, যা জীবনের উপযোগী, যা জীবনের রক্ষা ও পোষণে প্রয়োজনীয় তা-ই ফিতরাত বা স্বাভাবিক। 'নিজে বাঁচ অপরকে বাঁচতে দাও' এটাই প্রকৃত ব্যবস্থা। তাই মানবতার জন্য ইসলাম প্রত্যেক নাগরিককে যে সমস্ত অধিকার দিয়েছে তা এক বিস্ময়কর উপযোজন। এর নির্দেশ রয়েছে : "মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও আহতদের উপর কখনই অবিচার করবে না; সর্বাবস্থায় নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

ইসলামে মুসলমান অমুসলমান প্রত্যেক নাগরিকই বিভিন্ন ধরণের মৌলিক অধিকার ভোগ করে। জীব, সম্পত্তি ও মর্যাদার নিরাপত্তার বিধান, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং মতামত প্রকাশ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় মৌলিক অধিকারের আওতাভুক্ত। ইসলাম মানব মর্যাদা, তার স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সার্বজনীন আদর্শকে বিশ্বের বুকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করেছে। ইসলাম মানব অধিকারকে নিজস্ব পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং সাফল্যের সাথে এ অধিকার বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। মানব মর্যাদার প্রবক্তা ও সহায়ক হিসেবে ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই মানব জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি এবং হত্যার পরিবর্তে হত্যাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। যদি কেউ একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে ইসলামের দৃষ্টিতে ধরে নেয়া হয় যে, সে সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা এবং একজন মানুষের জীবন রক্ষাকারীকে সমগ্র মানব জাতির জীবন রক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২২৩] আল্লাহ নরহত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা যায় না। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারীদের কিসাসের দাবি করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ইসলাম দাসপ্রথা অবলুপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে। দাসব্যবসাকে নবী (সা.) পাপ এবং অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। দাসদেরকে শুধু মুক্ত করার জন্যই নয়, মর্যাদা সহকারে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে নেতৃত্ব করার অধিকারও দেন নবী (সা.) নিজে। যায়েদকে

২২৩। আল কুরআন, ৫: ৩২ (ভাবার্থ)

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত করে তাঁকে নিজের পরিবারভুক্ত করে নেন এবং নবীজী তাঁর চাচাত বোন যয়নাবের সাথে বিয়ে দেন। মহানবী (সা.) তাকে সৈন্যবাহিনীর জেনারেলের দায়িত্ব দেন। মুক্তি লাভের পর হাবসী গোলাম বেলাল (রা.)- কে মুয়াজ্জিনের উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়।

mvg¨ I MYZš

ইসলামে মৌল সামাজিক মূল্যবোধসমূহের অন্যতম হল সাম্য ও গণতন্ত্র। ইসলামের অপরাপর মূল্যবোধসমূহ এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সাম্যের মূল উৎস হল মানবপ্রেম। একমাত্র ইসলামই মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও সবরকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে ভালোবাসা, উদারতা, সহযোগিতা ও সাম্যের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণিগত বা জাতিগত আভিজাত্যের স্থান নেই। ইসলামের বিচারে মানুষের মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়, বরং তা তার চারিত্রিক গুণাবলী ও সমাজের উপকারার্থে অবদানের উপর নির্ভরশীল।[২২৪] ইসলামী মৌলতত্ত্বের খোঁজ নিতে গেলে দেখা যায় ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, সকল মানুষ একজন মানুষ থেকেই সৃজিত হয়েছে। ঘোষণা হয়েছে,"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকেই সৃষ্টি করেছেন, তার থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং দু'জন থেকে বহু সংখ্যক নারী ও পুরুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন"।[২২৫]

সুতরাং সমগ্র মানব জাতির উৎস একটাই। সে অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, গোত্র ও দেশে বিভক্ত হয়েছে। সুতরাং জাতি ও গোত্রের এ প্রকার ভেদের উদ্দেশ্য শুধু এটাই হওয়া উচিত যে, এটি তার পারস্পরিক পরিচিতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে হবে। এজন্যই আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে- "হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন মাত্র নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচয়ের আদান-প্রদান করতে পার"।[২২৬]

এরপর জীবনকে কতক লোক সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং কতকগুলো পেছনে পড়ে থাকে। কেউ ধনী হয়, কেউ পরমুখাপেক্ষী হয়। কেউ শাসক হয়, কেউ শাসিত হয়, কতক জাতির বর্ণ সাদা হয়, কত জাতির চামড়া কালো হয়। এটা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তাই বলে এ ধরণের এ উঁচু-নীচু ও ছোট-বড় হওয়া মানবতার উপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের কারণ হয়ে উঠবে এটা হতে দেয়া যায় না এবং ইসলাম তা হতেও দেয়না। ইসলামে গরীবদের উপর ধনীর, প্রজার উপর শাসকের কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আদম সন্তান ও মানুষ হিসেবে সবাই

২২৪। ফজলুল করীম, cª, ³, পৃ. ৫৫
২২৫। আল KiAvb, ৪ : ১
২২৬। আল কুরআন, ৪৯: ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সমান। শ্রেষ্ঠত্ব যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা কেবল সততার ভিত্তিতে। "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত যে সবচেয়ে মুত্তাকী"।[২২৭]

আইনের চোখে সবাই একই রকম। সবার উপর আইনের কর্তৃত্ব সমভাবে কার্যকর। তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে শুধু ন্যায়ের ভিত্তিতে "যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও ন্যায় কাজ করবে সে তা দেখবে, আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও অন্যায় কাজ করবে সে তাও দেখবে"।[২২৮] সমাজ কাঠামোতে সকলের অবস্থান সমান। যে শক্তিশালী সে দুর্বলকে সাহায্য করে। এভাবে গোটা সমাজ প্রতিটি ব্যক্তির সেবকে পরিণত হয়। মহানবী (সা.) বলেছেন-"পারস্পরিক স্নেহ মমতায় মুসলমানদের উদাহরণ একটা একক দেহের মত। দেহের একটা অঙ্গ যখন রুগ্ন হয়, সবকটা অঙ্গ তার সাথে জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত হয়"।[২২৯]

এভাবে ইসলাম ক্রমাগত ঘোষণা করে আসছে যে, মানব একটা একক সত্তা এবং এর সদস্যগণ সব একই মাতা-পিতার সন্তান ও ভাই বোন। আল কুরআন যে বার বার 'হে মানব জাতি' এবং 'হে আদম সন্তানরা' বলে সম্বোধন করে থাকে, সেটা এ জন্যই করে থাকে যেন মানুষের মনে মানবীয় ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি ও বদ্ধমূল হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে মুসলমানদের 'হে মুমিনগণ' এবং 'হে ঈমানদারগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তাদের ভেতরে বংশীয় বা শ্রেণিগত বৈষম্য সৃষ্টির অবকাশ না থাকে। ইসলাম মানবতার মঙ্গলের জন্য এমন চরিত্রেরই বিকাশ ঘটাতে চায় এবং এরূপ চরিত্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থরূপে বহণ করা সম্ভব।[২৩০]

একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার, যারা সমাজের সদস্য অথবা রাষ্ট্রের পরিচালক অথবা একজন নেতা, যিনি শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, এদের সকলেরই করণীয় হল নিজস্ব দায়িত্বে অন্তর্নিহিত সে কর্তব্যসমূহ পালন করা। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন "তিনিই সে সুমহান সত্তা যিনি তোমাদের কে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে তিনি অপর কারো উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন যাতে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন"।[২৩১] "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেছি । অতএব

২২৭। আল কুরআন, ৪৯:১৩
২২৮। আল কুরআন, ৯৯:৭-৮
২২৯। ইমাম বায়হাকী, Avj AvievDbv Avm mMiv, বাবু মাসালুল ম'মিনিনা ফীতারুহুমিহিম, হাদীস নং- ৯১
২৩০। মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, cv, ³, পৃ. ৩১০
২৩১। আল কুরআন, ৬ : ১৬৫

মানুষে মানুষে যথার্থ বিচার করো এবং বাসনার শিকার হয়ো না যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে” ।[২৩২]

এখানে যে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মানবগোষ্ঠির উদ্দেশ্যেই ইসলামের আবির্ভাব, যে মানবগোষ্ঠি প্রকারান্তরে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং যাদের ইসলামের নবী মনোরম ব্যক্তিত্বের গুণে বিভূষিত করেছিলেন। এ ধর্ম তাদের জন্য যারা পরবর্তীকালে আল কুরআন অনুমোদিত দায়িত্বসমূহ বহণ করতে এগিয়ে আসবে। ঘোষণা করা হয়েছে যে,“মানবতার জন্য গড়ে তোলা সকল সমাজের মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ সমাজ। তোমরা সদাচরণের নির্দেশ দাও এবং অন্যায়কে নিষিদ্ধ কর এবং তোমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ” ।[২৩৩] “আমরা তোমাদের একটি মধ্যস্থতাকারী সমাজ হিসেবে নিয়োগ করেছি, তোমরা সে সমাজের নকশা যা মানবতার জন্য একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ” ।[২৩৪]

যারা ইসলামের গণতন্ত্র গঠন করেছিলেন এমনি ছিল তাদের চরিত্র। হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত আবু বকর, হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) প্রমুখ জগৎ বরেণ্য মহাপুরুষগণ সকলেই সামান্য কুলি ও মজদুরের সঙ্গে উঠা বসা ও পানাহার করেছেন। তাঁরা সামান্য দীন মুজুরের কাজ করেছেন, ঝাড়ু দিয়েছেন, অপরের মল-মূত্র পর্যন্ত পরিস্কার করেছেন। রাজার আসনে বসেও সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। ক্রীতদাস বেলালের অধীনে খুলাফা-এ-রাশেদীনের বরেণ্য জননেতাগণ মানুষের সেবা করেছেন। সেখানে কোন রাজপ্রাসাদ, রাজার বৈভব ও ঐশ্বর্য অথবা বিলাসের কোন সামগ্রী ছিলনা। বিপুল ধন-সম্পদের মাঝেও তাদের গৃহে অন্ন থাকতনা। বিশাল ভূ-খণ্ডের অধিপতি সত্ত্বেও হযরত উমরের (রা.) পরিধানে ছিল অসংখ্য তালি বিশিষ্ট কাপড় সামান্য, খেজুর ও পানি ছিল তাঁর খাদ্য।

এ প্রতাপশালী শাসক জেরুজালেম প্রবেশ করেছিলেন উষ্ট্রের রশি ধরে আর উষ্ট্রচালক পৃষ্ঠে বসেছিল; মনিব-দাসের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিলনা। ভ্রাতৃত্বের এ মনোরম দৃশ্য, সাম্য ও গণতন্ত্রের এ অন্যবদ্য ছবি ইতিহাস কোনদিন দেখেনি।

পবিত্র কুরআনের উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা- “নিশ্চয়ই মানব জাতি এক অখণ্ড সমাজ” ।[২৩৫]

২৩২। আল কুরআন, ৩৮ : ২৬
২৩৩। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZ j gvmvwen, কিতাবুল আদাব দ্রষ্টব্য
২৩৪। মুস্তফা আসসিবায়ি, “ইসলামী সভ্যতায় মানবপ্রেম,” gvmK cw_ex, ঢাকা: ১৯৯৯, পৃ. ২৪
২৩৫। আল কুরআন, ২: ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

mvgvwRK b¨vqwePvi

সমাজের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে ন্যায়বিচার অপরিহার্য। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বণ্টন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। অপরদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। এটি সাম্য ও নিরাপত্তার নিয়ামক। এর মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়বোধ পালিত হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল-দূর্বল, ধনী-গরীব এবং শাসক শাসিতের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ইসলাম যে সুবিচারনীতি উপস্থাপন করেছে তা সকল মানুষে প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। আইন প্রয়োগে মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদাভেদ করার নীতি ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয় তা বংশের দিক দিয়েই হোক আর বর্ণ, ভাষা ও সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতেই হোক। এমনকি আকীদা, বিশ্বাস, আত্মীয়তা, নৈকট্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদির কারণেও আইন প্রয়োগে কোনরূপ পার্থক্য করা চলবে না। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,"তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচারকার্য করবে, তখন অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে"।[২৩৬] "হে ঈমানদারগণ! ন্যায়বিচারে তোমরা অটল থাকবে, আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারীরূপে, যদিও সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের প্রতিকূলে যায় অথবা পিতা-মাতা এবং এটি আত্মীয়দের (প্রতিকূলে যায়)। সে ধনী অথবা গরীব হোক, আল্লাহই উভয়ের জন্য উত্তম অভিভাবক"।[২৩৭]

মহানবী (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের বাণীতে বলেন-"অনারবের উপর একজন আরবের কোন কর্তৃত্বই নেই, যেমনি নেই একজন আরবের উপর আরেকজন আরবের। মাটির তৈরি আদমের পরবর্তী বংশধর হল মানুষ"।[২৩৮] তিনি আরও ঘোষণা করেন যে," বিশেষ সুযোগের প্রতিটি দাবি তা রক্তের হোক আর সম্পত্তির হোক সেদিন থেকে তাঁর পদতলে"।[২৩৯] রাসূল (সা.) কখনো নিজেকে আইনের উর্দ্ধে বিবেচনা করেননি।

কুরআন এটা পরিস্কার করে দিয়েছে যে, তিনি সামাজিক আচরণেও কখনোই কোন বৈশিষ্ট্যের দাবি করেননি। তিনি ছিলেন সামাজিক ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতিক। মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী একজন মহিলা চুরি করলে মহানবী (সা.) তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কুরাইশদের জন্য ব্যাপারটা বড়ই বিব্রতকর হয়ে দেখা দিল। মহিলাটি সম্মানিত কুরাইশ বংশের ছিল বলে ওসামা বিন যায়েদ

২৩৬। আল কুরআন, ৪: ৫৮
২৩৭। আল কুরআন, ৪:১৩৫
২৩৮। ইমাম আহমাদ, gmbv‡' Avngv', বাবু হাদীসু রাজুলিন মিন আসহাবিন্ নাবিয়্যি(সা.), হাদীস নং- ২৩৫৩৬
২৩৯। আল হাদীস, উদ্ধৃত: সৈয়দ বদরুদ্দোজা, cv¸³, পৃ.৫৫

Dhaka University Institutional Repository

তাকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন,“তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল এ যে, তাদের দৃষ্টিতে যারা অভিজাত ছিল, তাদের কেউ অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল শ্রেণিভুক্ত কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর শপথ! চুরির অপরাধে ধৃত এ ফাতিমা যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও হত, তবে আমি তার হাতও না কেটে ছাড়তাম না” ।[২৪০]

Bmjvg I mgvRe× Rxeb

নিতান্ত সাধারণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করলেও একথাই প্রমাণ হয় যে, ইসলামী চিন্তা ও কর্মব্যবস্থা সমাজবদ্ধ জীবনের কর্তৃত্বশূন্য নয়। বরং সেখানে তার গুরুত্ব ও দাবীসমূহের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃত দেয়া হয়েছে। আর এ পর্যালোচনা যদি আরো ব্যাপক হয়, তাহলে এ বিষয়টি সম্পর্কে আর কোন সন্দেহই থাকে না। তখন দেখা যাবে যে, এ ব্যবস্থায় সমাজবদ্ধ জীবন এমন অস্বাভাবিক গুরুত্ব অর্জন করেছে, যার সম্ভবত কোন নযীর পাওয়া যাবে না। সম্ভাব্য সকল দিক দিয়েই এ গুরুত্বের ব্যাখ্যা ও নির্দেশ দান করা হয়েছে। সামাজিক কার্য পদ্ধতি কার্যকরী করার যতটুকু সুযোগ থাকতে পারে তার সবটুকুতেই ইসলাম একে কার্যকরী করার নির্দেশ দিয়েছে।

কোন ধর্ম যখন তার অনুসারীদের সম্বোধন করে তখন তার মনোজগতে মানুষের আসল মর্যাদা সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা থাকে এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখেই সে তার শিক্ষা বিস্তারের সূচনা করে। যে সব বিষয়ে মানুষের আসল মর্যাদা ও তার প্রাকৃতিক অবস্থানের নির্দেশের প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে সমাজনীতি অন্যতম। এ জন্য ইসলাম তার শরীয়তের উপর সমাজ জীবনের গভীর ছাপ রেখেছে। তার বিধান ও নির্দেশাবলীর একটা বিপুল বিরাট অংশ মানুষের সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। আর এগুলোর আনুগত্যকেও সে অন্যগুলোর ন্যায় অপরিহার্য গণ্য করেছে।

তাই ইসলাম কেবল ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত নয়, বরং সামাজিক, তমাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, নাগরিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক তথা মানব জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই যে সম্পর্কে তার কোন বিধান নেই।

বস্তুত ইসলামে এ সামাজিকতার ধারণা এতই স্পষ্ট যে, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও বিভাগে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহণ করে।

২৪০। ইমাম বায়হাকী, gwidvZm mbvb Iqvj AvQvi, বাবুল হুদুদ, হাদীস নং- ৫২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকে বিরাট ও মৌলিক গুরুত্ব দান করেছে। তার প্রাথমিক ও আসল বাণী ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই। ব্যক্তি যেমন একা জন্ম গ্রহণ করেছে, তেমনি আল্লাহর বিধানও ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করে নিজের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করাও তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। ভবিষ্যতে আল্লাহর সামনে নিজের কার্যাবলীর জবাবদিহি করার জন্য তাকে একাই হাজির হতে হবে। কিন্তু এ সঙ্গে ইসলাম একথাও বলে যে, যে পথ মানুষকে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছায় তা সমাজকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়নি বরং একটি সংগঠিত সমাজ জীবনের মধ্যখান থেকে বের হয়ে অগ্রসর হয়েছে। তাই এ পথের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে: “হে মু’মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর পৃথক হয়ে থেকো না”।[২৪১]
কাজেই বুঝা গেল যে, সঠিক সমাজ জীবনেই দ্বীন ও ঈমানের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব এবং মুসলমানের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ এরই মধ্যে সংরক্ষিত। সমাজ জীবনের এ অবস্থা কত মূল্যবান এবং ইসলাম ও মুসলমানের জন্য সমাজ জীবন কত অপরিহার্য। বস্তত ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সামাজিক শৃঙ্খলা ও জাতীয় ঐক্য বিধানের জন্য যেসব নির্দেশ দিয়েছে, এগুলো তারই সংক্ষিপ্ত সার। কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে মুসলিম ও অমুসলিম সকলকে একটি বিশেষ সামাজিক বন্দ্ধনে আবদ্ধ থাকা, বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকা, কতখানি জরুরী ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং ইসলামের এসকল নির্দেশনার সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সকল পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

২৪১। আল কুরআন, ৩ :১০৩

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ Aa¨vq

c_g cwi‡”Q‘

mgvR ms¯’vi, cbMVb I mv¤ú‘wqK m¤úxwZi ev¯Íevq‡b Bmjvgx Av‘‡ki wekRbxbZv

Bmjv‡gi ‘wó‡Z mvgwRK eÜb

মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব। বিচ্ছিন্ন মানব জীবনের কল্পনা করাও অসম্ভব। সমাজ ছাড়া মানুষ কখনও চলতে পারে না। বস্তুত সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা মানুষের স্বভাবগত ও প্রকৃতগত ব্যাপার। পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে জান্নাতে একা থাকতে দেয়া হয়নি, বরং মা হাওয়া (আ.) কেও সৃষ্টি করে তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করতে দেয়া হয়েছিল। হযরত আদম (আ.)- এর জোড় সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন : "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক"।[১]

মানব ইতিহাসের শুরুতেই সমাজের মূলভিত্তি পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, যখন তমাদ্দুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি, তখনো মানুষ পরিবারবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে বাস করত। পরবর্তী পর্যায়ে এ পারিবারিক এককসমূহ গোত্রে এবং গোত্রসমূহ সমাজে পরিণত হয়। মানব জাতির আরবি প্রতিশব্দ 'ইনসান' আর এর মূলধাতু 'উনস' মানে মনের আকর্ষণ, ঝোঁক-প্রবণতা, ভালোবাসা, মেলামেশা। অর্থাৎ মানব স্বভাব হল অন্য মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা তথা সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। এর দুটো কারণ দেখা যায় : এক, স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ। দুই. জীবন ধারণের জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন। স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, এর অর্থ মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্বজাতির প্রতি বিশেষ অনুরাগের অধিকারী। স্বজাতির সঙ্গসুখে সে আত্মিক ও মানষিক শান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে স্বজাতির সাথে পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন হলে তার মনে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। আর নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘকালীন নির্জনতা তাকে আতংকগ্রস্ত করে তোলে।

১। আল কুরআন, ২:৩৫

Dhaka University Institutional Repository

জীবনধারণের জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন, এর অর্থ মানুষের একক ব্যক্তিগত শক্তি একেবারেই সীমাবদ্ধ। অথচ সে তুলনায় তার পার্থিব প্রয়োজন বিপুল ও ব্যাপক। সুতরাং তার প্রয়োজন পূরণের জন্য তার ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। সেজন্য তাকে সহযোগিতা নিতে হয় অন্য মানুষের। সে অন্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না এক মুহূর্তের জন্যও।[২]

নিজের, নিজ পরিবার-পরিজনের,আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা ও কল্যাণ সাধন প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। ইসলামে 'হুকূকুল ইবাদ' তথা অপরের প্রতি কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বস্ততার সাথে 'হুককুল ইবাদ' আদায় করা ইসলামী সমাজ জীবন যাপনের অপরিহার্য শর্ত বিশেষ। শুধু নিজের বা নিজ পরিবারের আরাম আয়েশ করার অধিকার কোন মুসলিমকে দেয়া হয়নি বরং তার আনন্দ-বেদনা, সুখানুভূতি ও সম্পদে রয়েছে তার প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-দুঃখী মানুষের অংশ ও অধিকার। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন"।[৩]

এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মানুষকে মূলত সামাজিক জীব হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমাজবদ্ধতা মানব প্রকৃতির এমন একটি চাহিদা যা থেকে শুধু এ পার্থিব জীবনেই নয় বরং আখিরাতের জীবনেও সে পৃথক থাকতে পারে না। জান্নাতেও মানুষ কেবল তখনই মানষিক স্বস্তি ও পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করবে, যখন সে স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য লাভ করবে।

মানব জীবনের বহুমুখী কার্যক্রম সম্পাদনে প্রয়োজন সমাজের সাথে বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক ও বহুবিধ সম্পৃক্ততা। যার যার প্রয়োজন পূরণ ছাড়াও তাদের মাঝে বিরাজ করে এক প্রকার মধুর সম্পর্ক। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা তাই স্বাভাবিক, আবার ধর্মেরও দাবী। অধিকন্তু, আখিরাতের কামিয়াবীর জন্যেও আবশ্যক দুনিয়ার জীবনে সুন্দর-সুষ্ঠু সামাজিক বন্ধনের।

কুরআন মজীদের বিধানসমূহ মানব কল্যাণের জন্য এবং মানব সমাজকে লক্ষ্য করেই নাযিল হয়েছে। এমনকি কুরআনের যেসব আয়াতে ব্যক্তি গঠন ও ব্যক্তি সংশোধন বিষয়াদির উল্লেখ রয়েছে সেগুলোও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি বরং সমাজের সাথে তা সম্পৃক্ত।

সালাত, যাকাত ও হজ্জ সহ যাবতীয় মৌলিক ইবাদত যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সমাজ-জীবনই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। সালাত ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম। ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। ইসলামের

2| ^'b›'b Rxe‡b Bmjvg, (সম্পাদনা পরিষদ), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০০, পৃ . ৪২৯
৩। আল কুরআন, ৩০:২১

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ রোকন এ সালাত। জামাতের সাথে আদায় করাই শরীয়তের বিধান। ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইবাদত যাকাত, যা সমাজের ধনীদের থেকে সংগ্রহ করে গরীব, অসহায়দের মাঝে বণ্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের আরেকটি স্তম্ভ হজ্জ আদায় করা এবং হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা, যা একা কোন ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয় ব্যাপার।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার পরস্পরকে ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের খবর দেব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে সক্ষম হবে? (তা হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে।[৪]

এ হাদীসে দেখা যায় বেহেশ্‌তী হওয়ার জন্য ঈমানদার হওয়া শর্ত, আবার ঈমানদার হওয়ার জন্য সামাজিক সৌহার্দ্য থাকা অপরিহার্য। আল্লামা ইবন খালদূন (র.) বলেন, একসাথে মিলেমিশে থাকা মানুষের জন্য অপরিহার্য। এ সত্যটিকেই পণ্ডিত ব্যক্তি ও জ্ঞানীগণ এভাবে বিবৃত করে থাকেন যে, 'জন্মগতভাবে মানুষ সামাজিক জীব'। দার্শনিক এরিস্টটল বলেছিলেন, 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক জীব। যে লোক সমাজ-সভ্য নয়, সে হয়ত দেবতা নয়ত পশু।' কথাটি সর্বজন স্বীকৃত।

ইসলামে সামাজিক বন্ধনের গুরুত্বের প্রতি দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বস্তুত ইসলাম যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, সেহেতু এতে মানুষের যথার্থ কল্যাণের সার্বিক বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে। সমাজত্যাগী জীবন মূলত ইসলামী জীবন নয়। আল কুরআন পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে : "আর বৈরাগ্যবাদ তো তাদেরই আবিষ্কৃত, আমি তো তাদের এ বিধান দেইনি"।[৫]

ইসলাম নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকে বিশেষ মৌলিক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক ও মূলবাণী ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই। ব্যক্তি একাই দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছে। আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবনযাপন করা ব্যক্তিরই দায়িত্ব। আর দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ তাকেই দিতে হবে। কিন্তু ইসলাম এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, মানুষ যে পথে চললে জীবনের সফলতা লাভ করতে পারে, তা সমাজকে পাশ কাটিয়ে নয়; বরং একটি সুসংগঠিত, সুষ্ঠু সমাজ জীবন-যাপনের মাধ্যমেই তাকে

৪। ইমাম মুসলিম, Avm mwnxn, দারু ইহইয়া আত্ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত: ১৩৭৮ হি: পৃ. ৪২৮
৫। আল কুরআন, ৫৭:২৭

Dhaka University Institutional Repository

সাফল্যের চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছতে হবে। আল কুরআনের নির্দেশ হলো, "তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" ।[৬]

ইসলাম একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। ইরশাদ হয়েছে, "এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থি জাতি হিসেবে গড়েছি, যাতে করে তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষ্যদানকারী হতে পার" ।[৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : "তোমরা উত্তম জাতি, মানুষের জন্য তোমাদের আবির্ভাব তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে আর বিরত রাখবে মন্দ কাজ থেকে" ।[৮]

পৃথিবীর মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা, মানুষের মঙ্গলের জন্যে ভাল কাজের প্রতিষ্ঠা ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা, সত্যের সাক্ষ্য দেয়া আর দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মানব জাতির সত্যিকার কল্যাণ সাধন করাই ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্য। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সুষ্ঠু পরিবেশ কায়েম হয় না। তাছাড়া সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা ও বিরত রাখাও ইসলামী সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সমাজে মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়ামূলক কাজে পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হওয়া ও পরস্পরের সাহায্য-সহানুভূতি থাকা সে সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

mnve¯vb I m¤úxwZ

সমাজে বসবাসকারী মানুষের সাথে সহাবস্থান করে পরস্পর সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকলের সাথে সমঝোতা ও সুসম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন : "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয়া দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমি মহা পুরস্কার দিব" ।[৯]

এ আয়াতে তিনটি কাজকে উত্তম বলে অভিহিত করা হয়েছে- ১. দান খয়রাত, ২. সৎ কাজ, ৩.পারস্পরিক শান্তি স্থাপন। শেষোক্তটি আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকলে সমাজে শান্তিতে বসবাস করা যায় না। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের বিষয়টি

৬। আল কুরআন, ৩:১০৩
৭। আল কুরআন, ২:১৪৩
৮। আল কুরআন, ৩:১১০
৯। আল কুরআন, ৪:১১৪

Dhaka University Institutional Repository

'আমর বিল মারূফ'- এর অন্তর্ভুক্ত হলেও গুরুত্ব বুঝাবার জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য যারা চেষ্টা তদবীর করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে বিরাট পুরষ্কার। এ প্রসেঙ্গ রাসূলে করীম (সা.) বলেন, "তোমরা মুসলিমগণকে পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর ও নিদ্রাহীনতাসহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে"।[১০]

এরূপ সম্পর্ক মুসলিম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার যে কোন স্থানের ও যে কোন বর্ণের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও একাত্ববোধ বিরাজমান থাকা বাঞ্ছনীয়। মুসলমান যদি বিচ্ছিন্ন থাকে তবে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং শত্রু তাদের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। মোটকথা পারস্পরিক দৃঢ় সম্পর্ক ও একাত্ববোধের মধ্যে মুসলমানদের মুক্তি নিহিত রয়েছে।

mvgwRK mnve¯'vb

মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যকে একে অন্যের সাথে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অভাব পূরণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্য থেকে কোন বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন"।[১১]

এ হাদীসে মুসলিম সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসেঙ্গ বলা হয়েছে, এক মুসলমানের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক হবে এক ভাইয়ের সাথে অন্য ভাইয়ের সম্পর্কের মত। একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের প্রয়োজন পূরণ করবে। বিপদে আপদে সাহায্য করবে এবং কেউ কারো প্রতি

১০। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ (সম্পাদনা: মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতিব আত তিরমিযী), wgkKvZj gvmwen, আল মাকতাব আল ইসলামী, বাব আল আদব, বৈরুত : ১৯৭৯, পৃ . ৪২২

১১। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, mnxûj eLvix, (২য় খ.), বায়তুল আফকার আদ দৌলিয়া, সৌদি আরব : ১৯৯৮, পৃ.৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

যুলুম নির্যাতন করবে না। এভাবে মুসলমানকে অন্য মুসলমানের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করে সহাবস্থান করার জন্য নবী করীম (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন।

Agmwjg‡'i mv‡_ mnve¯'vb

ইসলামী রাষ্ট্রে যে সব অমুসলিম বাস করে তাদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। মুসলমানদের মত তারাও নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "মনে রেখ যে ব্যক্তি কোন মুয়াহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানি করে অথবা তার কোন সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে পক্ষ অবলম্বন করবো"।[১২]

আল্লাহর নবী অমুসলিম নাগকিরদের উপর অত্যাচার করা এবং মালসম্পদ কেড়ে নেয়াকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, "অমুসলিমদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না, তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে"।[১৩]

এমনকি কোন অমুসলিম রাষ্ট্র সেখানকার মুসলিম নাগরিকদের উপর যতই অবিচার, অত্যাচার করুন না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তার কোন অমুসলিম নাগরিকের প্রতি প্রতিশোধ নিতে পারবে না। সারকথা, বর্তমান মুসলিম সমাজে যে বিবাদ-বিসংবাদ ও কলহ-দ্বন্দ্ব চলছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রতিটি মুসলমানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে সামাজিক সম্প্রীতি অর্জন করতে হবে এবং পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করতে হবে। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে সবাইকে বসবাস করতে হবে।

BqvZxg, 't¯' I gvhjg gvb‡li cwZ KZe¨

ইসলামী জীবন বিধানে মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,"মুমিনগণ একে অন্যের ভাই"।[১৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। তিনি আরও

১২। ইমাম আবু ইউসুফ, wKZvej LvivR, দvi"æj gvAwid, মিশর : ১৯৭৭, পৃ. ৮২

১৩। ইবন হিশাম, (অনু: সম্পাদনা পরিষদ), mxivZbex, (১মখ.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৪, পৃ. ৫৬১

১৪। আল কুরআন, ৪৯:১০

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। আল্লাহর কাছে প্রিয় সৃষ্টি হলো সে, যে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে"।[১৫] ইসলাম সকল মানুষের সাথে সদাচারের শিক্ষা দেয়। বিশেষ করে সমাজের ইয়াতীম, দুঃস্থ্য, অসহায় ও মাযলুম মানুষকে সহায়তা দানের প্রতি ইসলাম অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সমাজের সকল মানুষকে ইয়াতীম, দুঃস্থ্য ও মাযলূম মানুষের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্নভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইয়াতীমের হক আদায় না করা ও মিসকীনদের খাবার না দেয়ার প্রতি ভৎর্সনা করে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, "তুমি কি এমন লোককে দেখেছো, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর সে মিসকীনদের খাবার দানে মানুষকে উৎসাহিত করে না"।[১৬] আল কুরআন ইয়াতীমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, "কখনও এরূপ নয় বরং তোমরা ইয়াতীমের সম্মান কর না, আর মিসকীনদের খাদ্য দানে উৎসাহিত করোনা"।[১৭] ইয়াতীমদের সম্মান না করার অর্থ তাদের প্রাপ্য আদায় না করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহণ না করা। যারা দুনিয়ার জীবনে ইয়াতীম, মিসকীন ও বন্দিদের উপকার করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আখিরাতে জান্নাত ও জান্নাতের বহু নিয়ামত দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি সহায়তা দান জান্নাতী মানুষের স্বভাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য দান করে"।[১৮]

ইসলাম অসহায় ও দুঃস্থ্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। প্রত্যেক মানুষকে ইসলাম পরস্পরকে ভালোবাসতে শিক্ষা দেয় । অন্তত কেউ যেন অন্যকে কোনভাবে কষ্ট না দেয় এবং কারো প্রতি যুলুম-অত্যাচার না করে, সে মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলে। আল কুরআন আজকের মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে বলেছে, "তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি! তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য"।[১৯]

মুসলমানগণ আবির্ভূত হয়েছে সকল মানুষের সঠিক ও প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য। এ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক দায়িত্ব। আর প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিগত পর্যায়েও মানুষের কল্যাণ সাধনে

১৫। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী , C/, ³, পৃ.৪৬৩

১৬। আল কুরআন, ১০৭: ১-৩

১৭। আল কুরআন, ৮৯: ১৭-১৮

১৮। আল কুরআন, ৭৬: ৮

১৯। আল কুরআন, ৩: ১১০

Dhaka University Institutional Repository

আত্মনিয়োগ করবে। কমপক্ষে অন্তত কেউ যেন কষ্ট না পায় অথবা কারো প্রতি যেন যুলুম না হয়, তার প্রতি সচেতন থাকা মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য।

মাযলূমকে সাহায্য করা এবং যালিমকে বাঁধা দেয়া ঈমানী দায়িত্ব। কোন মুসলিম যদি এর বিপরীত করে অর্থাৎ মাযলূমকে যালিমের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা না করে, অথবা যালিমকে বাঁধা না দেয় তবে সে ব্যক্তি ইসলামের অবারিত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। হযরত আউস ইবন শুরাহবীল (রা.) থেকে এক হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যালিমের সাথে থেকে তাকে শক্তি যোগায় অথচ তার জানা আছে যে, লোকটি যালিম, তবে সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে"।[২০] নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন : তুমি তোমার মুমিন ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে যালিম হোক অথবা হোক মাযলূম। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম যালিমকে সাহায্য করার তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, নবী করীম (সা.) বলেন, "যালিমকে যুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা"।[২১] বস্তুত ইসলাম মানব সমাজে যুলুম-অত্যাচার বন্ধের কার্যকর বিধান দিয়েছে। এর অনুকরণ আমাদের সকলের জন্য কর্তব্য।

সমাজের প্রবীণদের কাছে নবীণদের জানার ও শিক্ষা নেয়ার অনেক কিছু থাকে। প্রবীণদের কাছ থেকে তারা ঈমান-আমলসহ জাতীয় পরিচিতি, জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে। পক্ষান্তরে, প্রবীণরা নবীণদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই ছোটদের উচিত বড়দের সম্মান করা ও তাদের কথা মেনে চলা। জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের সার্বিক উন্নতির জন্য ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অপরিহার্য।[২২]

রাব্বুল আলামীন সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা শিক্ষাদানে ও চরিত্র গঠনে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের প্রতিদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ছোটরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বড়দের থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হাসিল করে থাকে। একটি সমাজ সুন্দর-সুখী হয়ে গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন ঐ সমাজের ছোটদের প্রতি বড়দের মায়া-মমতা ও স্নেহ-ভালোবাসা রাখা এবং ছোটদেরও

২০। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvwen, cÖv¸³, পৃ. ৪৩৬
21। cÖv¸³, পৃ. ৪২২
২২। ‰`bw›`b Rxe‡b Bmjvg, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৭, পৃ. ৪৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বড়দের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান করা। নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না আর আমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।[২৩]

কোমলমতি বালক-বালিকারা অনুকরণ প্রিয়। বড়দের তারা যে কাজ করতে দেখে নিজেরাও তা করতে অভ্যস্ত হয়, কাজেই ছোটদের উন্নত চরিত্র ও সুষ্ঠু মানষিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা এবং তাদের সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করার ব্যাপারে বড়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পক্ষান্তরে, বড়দের আদেশ-উপদেশ মেনে নিয়ে জীবন পরিচালনা করা ও তাদের যথাযথ সম্মান দেখানো ছোটদের কর্তব্য। বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করা উচিত। পক্ষান্তরে বড়দের দায়িত্ব হল ছোটদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া এবং আন্তরিকতা সহকারে তাদের চরিত্র গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।

ইসলামপূর্ব মানব গোষ্ঠির মধ্যে কোন সুসংবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। গোষ্ঠি বা গোত্রীয় শাসন এবং শক্তির শাসন ছিল চালু। জীবন ও সম্পদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। মারামারি, কাটা-কাটি, খুন-জখম, সন্ত্রাস, লুণ্ঠন-ছিনতাই, সুদ-ঘুষ ও অনাচার ছিল মানুষের নিত্য সঙ্গী। মানব জীবন ছিল ধ্বংসের মুখোমুখী। এমনি এক পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.) কুরআন, সুন্নাহ ও তার বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মপন্থার মাধ্যমে মানবতাকে একটি সোনার সমাজ উপহার দেন। জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো :

Bmjvgx mgvR e¨e¯vq Rxe‡bi wbivcËv

†gŠwjK AwaKv‡ii wbðqZv

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের প্রতি মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ইসলাম মানুষকে তার মন ও মতের স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, ইজ্জত ও সম্মানের নিরাপত্তা, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান ও বেঁচে থাকার অধিকার দান করেছে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে "তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমি তাদের রিযক যেমন দেব, তেমনি তোমাদেরও"।[২৪]

২৩। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvwen, cv¸ ৩, পৃ. ৪২৩
২৪। আল কুরআন, ১৭: ৩১

Dhaka University Institutional Repository

Rxe‡bi wbivcËv

মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম অধিকার বাঁচার অধিকার, জীবন-যাপনের অধিকার। ইসলামী সমাজে যে কোন ব্যক্তি তার জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে ‘কিসাস’ স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা অথবা ‘দিয়াত’ রক্তপণ নেয়ার বিধান রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে: “হত্যা করো না কোন ব্যক্তিকে আইনের বিধান ব্যতীত যার হত্যা করাকে আল্লাহ হারাম করেছেন”।[২৫]

“কি অপরাধে তোমাদেরকে হত্যা করা হলো? একথা যখন জিজ্ঞেস করা হবে”।[২৬]

“এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জীবন ও সম্পদ ইজ্জত-আবরু সম্পূর্ণ হারাম”।[২৭]

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলমানকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো চিরদিনের জন্য জাহান্নাম”।[২৮]

“হে জ্ঞানীগণ! তোমাদের জন্য কিসাসের বিধানের মধ্যে জীবন লাভ রয়েছে। আশাকরি তোমরা এ বিধানের বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকবে এবং মুক্তির পথ খুঁজে পাবে”।[২৯] মহানবী বিদ্বায় হজ্জের ভাষণে বলেন, “নিশ্বয়ই তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য এমনই পবিত্র যেমন তোমাদের আজকের এ দিনটি পবিত্র”।[৩০] এ থেকে বুঝা যায় যে, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে না। এভাবে ইসলাম মানুষের জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেছে।

kwšÍcYf‚‡e Rxeb hvc‡bi wbivcËv

সমাজে মানুষকে বসবাস করতে হয়। পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছাড়া সমাজে বাস করা যায় না। যেমন মহান আল্লাহ সৎ কাজে সহযোগিতা ও অসৎকাজে অসহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন: “সৎ, কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করে যাও। আর অসৎ ও গুনাহের কাজে কেউ কারো সাহায্য সহযোগিতা করোনা”।[৩১] এ কারণে মানুষ যাতে সমাজে শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারে, সে জন্য কেউ যেন কাউকে উৎপীড়ন না করে, কষ্ট না দেয় সে ব্যাপারেই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন,“যার উৎপীড়ন হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন,তোমার প্রতিবেশীর

২৫। আল কুরআন, ১৭:৩৩
২৬। আল কুরআন, ৮১: ৯
২৭। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, eLvix kixd, কিতাবুল আদাব দ্রষ্টব্য ।
২৮। আল কুরআন, ৪:৯৩
২৯। আল কুরআন, ২: ১৭৯
৩০। ইবন সা’দ, ZvevKvZj Keiv, দারুল ইয়াহইয়া, বৈরুত, লেবানন:১৯৯৬, হাদীস নং-১৮৬৫
৩১। আল কুরআন, ৫:২

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সদভাবে বসবাস করলে তুমি প্রকৃত মুসলিম হবে। যার অনিষ্টকারিতা থেকে পাড়া-প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে মু'মিন নয়। আল্লাহর নিকট সে সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম"।[৩২]

wbivcËvgjK evm¯'vb

সমাজে মানুষ নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে নিজ গৃহে বসবাস করতে চায়। কোন উৎপীড়ন ও অশান্তি যেন ঘিরে না বসে এজন্য ইসলাম এক প্রতিবেশীর প্রতি অপর প্রতিবেশীর দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিনা অনুমতিতে কারো বাড়িতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পর্দা প্রথা মেনে চলার আদেশ করেছে। কোন বাড়িতে আলো-বাতাস প্রতিরোধমূলক কোন কাজ করতে নিষেধ করেছে।

mvgwRK mwePvi cwZôv

আইনের শাসন ও সুবিচার না থাকলে সে সমাজের মানুষের জীবনে নেমে আসে অশান্তির অমানিশা এবং মানুষের জীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন।

সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার পূর্বশর্ত হচ্ছে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এ ন্যায় বিচারের সুব্যবস্থা রয়েছে। এখানে আইনের চোখে আপন-পর, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, বিদ্বান-মূর্খ, সবল-দুর্বল এবং স্বজাতি-বিজাতি সকলেই সমান। ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করেছে, তোমরা যখন লোকদের বিচার করবে তখন ন্যায়বিচার করবে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ পাকের আরো নির্দেশ হচ্ছে : "আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় বিচার ও সদাচারণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন"।[৩৩] বস্তুত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকলে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে না।

gvb-m¤§v‡bi wbivcËv

সমাজে মানুষ তার আত্ম-সম্মান, ইজ্জত-আবরু ইত্যাদি নিয়ে গৌরবের সাথে বসবাস করতে চায়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে আত্ম-সম্মান নিয়ে গৌরবের সাথে জীবন-যাপনের নিরাপত্তা বিধান করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন :

১. তোমরা একে অন্যের দুর্নাম করোনা,

৩২। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ, wgkKvZj gvmvwen, cv¸ ³, পৃ. ৪২৬
৩৩। আল কুরআন, ৪:৫৮

Dhaka University Institutional Repository

২. মন্দ উপাধিতে কাউকে অভিহিত করো না,

৩. তোমরা পরস্পর গীবত করোনা।

৪. এবং তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না।[৩৪]

এ ভাবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মান-সম্মানের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।

gZ I a‡gi ¯^vaxbZv

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে তার মতামত ও ধর্মীয় জীবনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে যার ধর্ম পালন করবে। ধর্মের ব্যাপারে মানুষের উপর কোন জোর-জবরদস্তি নেই।[৩৫] কিন্তু স্বেচ্ছায় ধর্মগ্রহণ করার পর তার কোন বিধান লংঘণ করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয় না। মহান আল্লাহ ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বলেন, "আমি মানুষকে জীবন পথ দেখিয়েছি, হয় সে শোকরকারী হয়ে জীবনযাপন করবে, না হয় অন্যায়কারী হিসেবে"।[৩৬] মানুষকে আল্লাহ সৎ ও অসৎ উভয় পথের অনুভূতি দিয়ে রেখেছেন। এখন সে স্বাধীনভাবে যেটা গ্রহণ করবে তা করার ইখতিয়ার তার রয়েছে।

AwaKvi c'v‡b mvg¨

ইসলামের চোখে সমাজের সকল মানুষই সমান। মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ইসলাম সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করে থাকে। তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন লোক তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না, কেউ কোনভাবে নিগ্রহের শিকার হয় না। মহান আল্লাহ এমর্মে ঘোষণা করেন:

"আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে সে সবের মালিকের নিকট পৌঁছে দাও"।[৩৭]

AcivagjK KvhKjvc 'gY

ইসলাম মানব সমাজকে সর্বপ্রকার অধঃপতন, অবক্ষয়, পাপ ও অপবিত্রতার পংকিলতা হতে সম্পূর্ণ নিষ্কলূষ ও পবিত্র করতে চায়। সেজন্য মদ্য পান হারাম করা হয়েছে। চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, জুয়া, মিথ্যাচার, হত্যা নির্যাতনকে অপরাধ ও কঠিন পাপ বলে ঘোষণা করেছে। তেমনিভাবে অনাচার,

---

৩৪। আল কুরআন, ৪৯: ১১-১৩
৩৫ । আল কুরআন, ২ : ৫৬
৩৬। আল কুরআন, ৭৬:৩
৩৭। আল কুরআন, ৪:৫৮

Dhaka University Institutional Repository

উচ্ছৃঙ্খলতা, পর্দাহীনতা, নাচ-গান, বিচিত্রানুষ্ঠান, মেলা প্রভৃতি অশ্লীলতা ইসলামী সমাজে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এ সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

‰bwZK wk¶v

মানুষ যাতে তাদের নৈতিকমান উন্নত ও উৎকর্ষ সাধন করতে পারে, সেজন্য সব ধরণের ব্যবস্থা ইসলামী সমাজে রয়েছে। আর এর মাধ্যমেই সমজে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কেননা, একজন উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ দ্বারা কখনো অপরের অনিষ্ট হতে পারে না। তাই ইসলাম মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ জীবন গড়ে তুলতে চায়।

m¤ú‡`i wbivcËvq Bmjvgx mgvR e¨e¯'v

জীবনের সাথে সম্পদের সম্পর্ক সুনিবিড়। সম্পদ ব্যতীত জীবনের নিরাপত্তা অকল্পনীয়। এ কারণেই ইসলামী জীবন দর্শন সম্পদকে বৃথা বা মূল্যহীন কিংবা 'অর্থই অনর্থের মূল' মনে করে না, বরং সম্পদকে মহান আল্লাহর নি'আমত ও জীবনধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে গণ্য করে। জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে মহানবী (সা.) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, "মনে রেখ! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইজ্জত-সম্মানকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন পবিত্র আজকের এ দিন, এ শহর এবং এ মাস"।[৩৮] সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে :

mK‡ji wih‡Ki 'wqZ

মহান আল্লাহ যেমন মহাবিশ্বের স্রষ্টা, তেমন এর পালনকর্তাও বটে। পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভেই তিনি নিজকে 'রাব্বুল আলামীন' বা বিশ্বজগতের পালকরূপে অভিহিত করেছেন। অপর জায়গায় বলেছেন, "যমীনে এমন কোন প্রানী নেই যার রিযকের দায়িত্ব আল্লাহর নয়"।[৩৯] এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তিনি মানুষের জীবনধারণের জন্য যা যা আবশ্যক তা যথাস্থানে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

৩৮। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, C\¸ ³, পৃ. ৪৩৮
৩৯। আল কুরআন, ১১ : ৬

m¤ú‡`i mIg eÈb

ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণ-অর্থনৈতিক সাম্য বাস্তবে সম্ভবপর নয় এবং সমাজব্যবস্থা পরিচালনের পক্ষে অনুকূলও নয়। তাই ইসলাম অর্থের ন্যায়সঙ্গত তথা সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। ইসলাম আবশ্যকের অতিরিক্ত আয় উপার্জনের অনুমতি দেয়। কিন্তু সাথে সাথে যারা জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে অক্ষম তাদের সে প্রয়োজন পূরণ করতে তাকে বাধ্য করেছে। ইসলামী ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে যাতে সমাজের সমগ্র সম্পদ পুঞ্জিভূত না হয় সে জন্য সম্পদ দুঃস্থ্য ও অসহায়দের মধ্যে বণ্টন করে দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

hvKvZ I DËivwaKvi AvBb

যাকাত ও উত্তরাধিকার আইন ইসলামী সমাজে ন্যায়পরায়ণতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার গ্যারাণ্টী। ইসলাম সমাজের বুক হতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে সম্পদ বণ্টনের সুব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম এক অভূতপূর্ব বণ্টন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটিয়েছে এবং মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করেছে।

Ab¨vb¨ `vb-mv`Kvn

ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কেবল যাকাতকেই বাধ্যতামূলক করেনি, অন্যান্য দান-সাদকাহ করার জন্য আবেগময় ভাষায় উদাত্ত আহবান জানিয়েছে।

†gŠwjK c‡qvRb †gUv‡bvi `wqZ miKv‡ii

ইসলামী ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সমাজ তথা রাষ্ট্র দায়ী। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য বা ফরয হিসেবে গণ্য।'শরহে শিরআতুল ইসলাম' গ্রন্থে সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "তিনি কোনো দরিদ্র্যকে দরিদ্র্য রাখবেন না, কোন ঋণীকে ঋণী থাকতে দেবেন না, কোনো দুর্বলের সাহায্য না করে থাকবেন না, আর জালিমকে দমণ না করে ছাড়বেন না এবং কোন নাঙ্গাকে কাড় না দিয়ে রাখবেন না" ।[৪০] যখন সরকার এ ব্যাপারে অসমর্থ হয়, তখন তাদের এসব

৪০। ইমাম গাযযালী, (অনু: মাওলানা ফজলুল করীম), GnBqvI DjgwÏb, (৪র্থ খ.) , ঢাকা : ১৯৬৩, পৃ . ১০১৮

Dhaka University Institutional Repository

কিছুর ব্যবস্থা করে দেয়া সমাজের ধনী ব্যক্তিদের ওপর ফরজ। এ কর্তব্য পালনে কেউ অবহেলা করলে সরকার তাদেরকে এ কর্তব্য পালনে বাধ্য করবে।

পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ "ইহসান করো পিতা-মাতার প্রতি, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট ও দূর পড়শী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের দাস-দাসীদের প্রতি"।[৪১] এখানে আল্লাহপাক অক্ষম ও অভাবীদের প্রতি ইহসান করাকে ফরয করেছেন।

Aw_K AbvPvi cwZ‡iva

ইসলামী ব্যবস্থায় যাবতীয় আর্থিক অনাচার তথা সূদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, অশ্লীলতা, বে-দ্বীনের সহায়ক বিষয়, হারাম বা নাপাক বস্তু, ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, ছিনতাই, জবর দখল প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থোপার্জন করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। ইসলামী ব্যবস্থায় কর্মচারীদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য উপহার গ্রহণ, মূল্যবৃদ্ধির জন্য মজুদদারী, কালোবাজারী, চোরাচালানী, অপচয়, অপব্যয়, বিলাসিতা ইত্যাদিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বস্তুত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিশ্ব মানবতার জন্য এক কল্যাণকর ও আশীর্বাদ স্বরূপ জীবন ব্যবস্থা। তাই এতে মানুষের জীবনের ও সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্র বা ইজমের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। অতএব, নিঃসন্দেহে বলতে হয় যে, ইসলাম মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা আধুনিক পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু ও ধ্বংসোম্মুখ যে কোন মতবাদ ও ইজমের তুলনায় এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা। আর ইসলামের এ সমাজ ব্যবস্থাই বর্তমান বিশ্বের অশান্ত সমাজকে শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে।

এজন্য নবী করীম (সা.) অধীনস্ত দাস-দাসীদের হক সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে যা বলেছেন তার মূল কথা হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই নিজেরা যা খাবে ও পরবে তাদেরকে তাই খেতে ও পরতে দিতে হবে। তারা পারবে না এমন কোন কঠিন কাজের আদেশ দেয়া যাবে না। তারা যদি কোন অপরাধ করে তবে তা ক্ষমা করা উচিত। তাদেরকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা, অধীনস্ত লোকজনও উপরস্ত লোকজনের ন্যায় আবেগ ও অনুভূতি সম্পন্ন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। আর সকলের আদি উৎসও এক। আল্লাহ পাক যাকে আজ অধীনস্ত করে দিয়েছেন তিনি ইচ্ছা করলে কালই

৪১। আল কুরআন, ৪:৩৬

Dhaka University Institutional Repository

তাকে উপরস্থ করে দিতে পারেন। তাই নবী করীম (সা.) বলেছেন,"দাস-দাসীদের সাথে খারাপ ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না" ।[৪২]

Bmjvgx mgv‡R AvZ¥xq-¯^Rb, cwZ‡ekx I Ab¨vb¨‡`i AwaKvi

পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সত্যিকার উদার সহানুভূতি ও যত্নশীল মনোভাব প্রদর্শনের লক্ষ্যে তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য দান ও সহযোগিতার করার জন্য ইসলাম মানুষকে আদেশ করেছে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, আরবি ভাষায় আত্মীয়তা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে এমন একটি ধাতু থেকে, যার অর্থ হল, দয়াশীলতা (রহমত ও রহমাহ)।[৪৩] আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন হল বেহেশতে পৌঁছার সহজ ও সরল পথ। যারা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, তাদের জন্য এ পথটা নিষিদ্ধ। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহৃদয় ব্যবহারকে মহানবী (সা.) একটি ঐশী আর্শীবাদ ও পরম অনুগ্রহ বলে বিবৃত করেছেন। আত্মীয়-স্বজনদের মঙ্গল সাধন করা একটি পবিত্র দায়িত্ব, এমনকি তারা একইভাবে সাড়া না দিলেও। এ কর্তব্যের আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং আল্লাহর জন্যই এটি পালন করতে হবে আত্মীয়-স্বজনের কোন তোয়াক্কা না করেই। এ সম্পর্কে কুরআনের প্রাসঙ্গিক কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করার মত। যেমন- "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই, কিন্তু পূণ্য আছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে, এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী" ।[৪৪] আত্মীয় স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না" ।[৪৫]

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তার শরীক করবেনা এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক,

---

৪২। ইমাম ইবনে মাযাহ, mbv‡b Beb gvhvn, কিতাবুল আদাব, বাবুল ইহসান ইলাল মামালিক, হাদীস নং-৩৬৯১

৪৩। মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, Bmjvg ivó mgvR, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৪, পৃ.৩০৮

৪৪। আল কুরআন, ২:১৭৭

৪৫। আল কুরআন, ১৭: ২৬

Dhaka University Institutional Repository

আত্মগরবীকে" ।[৪৬] "এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন" ।[৪৭]

নবী করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন," আমি রহমান এবং এ রহম আমার নাম থেকে বের করে তার নামকরণ করেছি। যে তার বন্ধন রাখে আমিও তার সাথে সংযুক্ত থাকি এবং যে তা ছিন্ন করে আমিও তা বিচ্ছিন্ন করি" ।[৪৮] আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, "এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এরূপ আত্মীয় রয়েছে আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। আমি তাদের সাথে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করি,তারা সর্বদা মূর্খতার পরিচয় দেয়। নবী (সা.) বলেন, তুমি যেমন বলেছো সত্যিই যদি তেমনি হয়ে থাকে, তবে তুমি যেন তাদেরকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছো। তুমি যতক্ষণ উল্লেখিত কর্মনীতির উপর কায়েম থাকবে, আল্লাহর সাহায্য সর্বদা তোমার সাথে থাকবে এবং তিনি তাদের ক্ষতি থেকে তোমাকে বাঁচাবেন" ।[৪৯] তিনি আরো বলেছেন, "ইহসানের পরিবর্তে ইহসানকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী নয় বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী ঐ ব্যক্তি, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে পুনরায় তাই স্থাপন করল" ।[৫০] নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী লোক থাকে সেখানে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় না" ।[৫১]

সুতরাং আত্মীয়-স্বজনকে কোন অবস্থাতেই কষ্ট দেয়া বৈধ নয়; বরং অত্যন্ত গুনাহের কাজ। তাদের শোক-দুঃখের অংশীদার হওয়াই সকলের নৈতিক ও মানবিক কর্তব্য। তাদের কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার সেবা করতে হবে। যদি কোন আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং দুর্ব্যবহার করে তথাপি তার সাথে ভালো ব্যবহার করাই ইসলামের নীতি। যদি সে অত্যাচার করে তাহলে প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমা করা ইসলামী আদর্শ। গরীব ও বিপদগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনকে আর্থিক সাহায্য করা ধনী আত্মীয়ের উপর ফরয। আত্মীয়দের সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ করা অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধ। যারা এ ধরণের গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, আল্লাহ তাদেরকে আদৌ

৪৬। আল কুরআন, ৪:৩৬
৪৭। আল কুরআন, ৪:১
৪৮। ইমাম মুহিউদ্দিন নববী, wiqv'm mv‡jnxb, (১ম খ.), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা : ২০০১, পৃ. ২১৭
৪৯। ইমাম নববী, wiqv'm mv‡jnxb, (১ম খ.), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা : ২০০১, পৃ . ২০৮
৫০। ইমাম নববী, cv¸³, পৃ . ২২১
৫১। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ, wgkKvZj gvmvwen, cv¸³, পৃ . ৪২০

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসেন না। তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত থাকে এবং পরকালেও জান্নাতের পরম শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে তা বজায় রাখা অবশ্য কর্তব্য। তবে ইসলাম যেমন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করতে এবং তাদের অধিকার আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি অন্যায়ভাবে তাদেরকে সহায়তা করতে এবং তাদের পক্ষপাতিত্ব করতেও নিষেধ করেছে। অতএব ইসলামের নির্দেশিত সীমা অতিক্রম না করে তাদের হক আদায় করতে হবে। প্রতিবেশীরা আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও অধিক কাজে আসে। আত্মীয়-স্বজন সবাই কাছে থাকেনা। প্রতিবেশীরাই বিপদে-আপদে দুঃখ-দুর্দশায় প্রথমে এগিয়ে আসে। বিপদের সময় প্রতিবেশীরা খোঁজ-খবর নেয় ও সেবা যত্ন করে থাকে। বিয়ে-শাদী এবং অনুরূপ সামাজিক কাজকর্মে প্রতিবেশীর ভূমিকা থাকে উল্লেখযোগ্য। তাই আল কুরআনে প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, "নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী এবং সঙ্গী সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে" ।[৫২]

প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকা, তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা প্রত্যেক মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ সকল প্রকারের ও সকল পর্যায়ের প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তাঁর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়" ।[৫৩] প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের উপকার করা, কষ্ট না দেয়া, দরিদ্র প্রতিবেশীকে দান করা এবং অভুক্ত প্রতিবেশীকে খাদ্য দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এজন্য মহানবী (সা.) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে তৃপ্তি সহকারে খাদ্য খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে অভুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। তিনি আরো বলেছেন, জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে তাগিদ দিচ্ছিলেন; আমার মনে হচ্ছিল, তিনি তাদেরকে আমার ওয়ারিস বানিয়ে দেবেন" ।[৫৪]

প্রতিবেশী যে কোন ধর্ম, বর্ণ কিংবা আদর্শের অনুসারীই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি ইসলাম প্রত্যেক মুমিনকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামেরই শিক্ষা। আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সকল প্রতিবেশীর সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ ঈমানদারগণের ঈমানের দাবি। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় এর সদস্যদের মধ্যে যারা বয়সে বড় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বয়সে

৫২। আল কুরআন, ৪:৩৬

৫৩ । ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvwen, cÖv¸³, পৃ . ৪২২

৫৪। cÖv¸³, পৃ . ৪২৪

Dhaka University Institutional Repository

যারা ছোট তাদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। পরিবারস্থ সদস্যরা বড় হোক আর ছোট হোক তাদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট অধিকার রয়েছে। তাই বড়দের প্রতি ছোটদের যেমন শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তেমনি ছোটদের প্রতি বড়দেরও স্নেহশীল হতে হবে। মানুষ যেহেতু স্বভাবতই দুর্বল; তাই সে সঙ্গদোষেই হোক কিংবা রিপুর তাড়নায়ই হোক সে যে কোন মূহুর্তেই তার দুর্বলতা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ফলে সে আর কাউকে মান্য করতে চায় না। এমনকি পিতা-মাতার সাথেও দুর্ব্যবহার করে থাকে। এমতাবস্থায় সে যদি আত্মসংযম বা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহর ইবাদত করে তাহলে তা হবে আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়।

অতএব কেউ যদি এহেন যৌবন অবস্থায় বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান দেখায় তাহলে মহান আল্লাহ ও তার বৃদ্ধাবস্থায় অন্য কারো দ্বারা তাকে সম্মান দেখাবেন। নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যদি কোন যুবক কোন বৃদ্ধ লোককে তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে মহান আল্লাহ তার বৃদ্ধাবস্থায় তার জন্য এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন, যে তাকে সম্মান করবে"।[৫৫] বড়দের ন্যায় ছোটদেরও যথেষ্ট অধিকার রয়েছে। ছোট ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাতিজি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা বয়সে ছোট তাদের প্রতি মায়া-মমতা, স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের আদর যত্ন করতে হবে। বড়দের অধিকার ও ছোটদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে জানেনা, সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়"।[৫৬]

সুতরাং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের কর্তব্য হল ছোটদের আদর স্নেহ করা, আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা, আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া। আর বয়োকনিষ্ঠদের কর্তব্য হচ্ছে, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের কথা মান্য করা, সালাম দেয়া এবং বসা থাকলে উঠে তাদের বসার ব্যবস্থা করা। যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব বিদ্যমান নবী করীম (সা.) বলেন, "আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা উঠিয়ে নেন তবে আমি বারণ করার সামর্থ্য রাখি"।[৫৭]

৫৫। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvwen, cÖv¸³, পৃ. ১৩৮৭
৫৬। cÖv¸³, পৃ. ৪২৩
৫৭। cÖv¸³, পৃ. ৪২১

Dhaka University Institutional Repository

Av‘k mgvR MV‡b H‡K¨i c‡qvRbxqZv

আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জাতীয় ঐক্যের উপর ইসলাম প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু (কুরআন) দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"।[৫৮] এ আয়াতে ঐক্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সাথে সাথে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ,"তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছে"।[৫৯]

এ আয়াতের আলোকে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিবাদ পরিহার করে ঐক্যবদ্ধভাবে ধৈর্যধারণ করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। আদর্শ সমাজ বলতে এমন সমাজকে বুঝায়, যেখানে নাগরিকবৃন্দ আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় ঈমান এবং আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সৎকাজে উদ্যোগী হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এরূপ সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাবী, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, অভাব অভিযোগ ও অপসংস্কৃতি থাকবেনা। মানুষ পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে। একে অন্যের বিপদে-আপদে সাহায্য, সহযোগিতা করবে এবং সুখে-দুঃখে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করবে, সব মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে। আদর্শ সমাজে উপরিউক্ত নেতিবাচক দিকগুলো সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো সর্বোচ্চ স্তরে পরিলক্ষিত হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে চুরি, ডাকাতি, খুন খারাবী সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছিল এবং মুসলমানদের মানবীয় গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। এরূপ সমাজ গড়তে হলে সমাজের সদস্যবৃন্দকে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রশিকে মজবুতভাবে ধরে রাখতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দেয়া দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।

৫৮। আল কুরআন, ৩:১০৩
৫৯। আল কুরআন, ৮:৪৬

Dhaka University Institutional Repository

H‡K¨i wfwË

ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত পোষণ করে থাকেন। সাধারণত বংশ, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদিকে ঐক্যের ভিত্তি মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছে-

ক. এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি আনুগত্য

খ. আল্লাহর রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ

গ. কুরআন ও সুন্নাহকে জীবন পথের একমাত্র দিশারী হিসেবে গ্রহণ।

মুসলমান যে ভাষায় কথা বলুক, বংশ বা বর্ণে যতই পার্থক্য থাকুক, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার একমাত্র ইলাহ। কোন অবস্থাতেই সে এ থেকে বিচ্যুত হয় না। এ বিশ্বাস বা ঈমানী বল মুসলমানের ঐক্যের প্রথম ভিত্তি। মুসলমানের ঐক্যের অন্যতম ভিত্তি হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের অনুকরণ। তিনি আল্লাহর বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, কলহরত একটা জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে এক আল্লাহর দাসে পরিণত করেছেন। সমগ্র মানব জাতির জন্য তিনিই একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ। অতএব আল্লাহর রাসূল (সা.) কে ঐক্যের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা সব মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

ঐক্যের আরেকটি ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যার বিশ্বাস রয়েছে তাকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে হবে। আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমেই আমরা তা পেয়েছি। মহানবী (সা.)-এর উপর যেভাবে কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবে বিদ্যমান। একতাবদ্ধ হওয়ার মূলনীতি হিসেবে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "মু'মিনগণ একে অন্যের ভাই"।[৬০] সুতরাং বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চল মানুষের মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করে না। পার্থক্যের একমাত্র মাপকাঠি হলো আদর্শ। যেহেতু সব মুসলমান এক আদর্শে বিশ্বাসী, এক আল্লাহর অনুগত, এক রাসূল (সা.)-এবং এক কুরআন অনুসারী, সেহেতু তারা পরস্পর ভাই ভাই এবং এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তাদের ঐক্যের ভিত্তি।

৬০। আল কুরআন, ৪৯:১০

Dhaka University Institutional Repository

HK¨e× nIqvi Dcvq

পারিবারিক হিংসা, বিদ্বেষ, কুৎসা রটনা ও শত্রুতামূলক আচরণ ইত্যাদি ঐক্য বিনষ্টকারী দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে কথায় ও ব্যবহারে সম্প্রীতিমূলক আচরণ করতে হবে, তাহলে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এরপর ঐক্য সৃষ্টির জন্য আরো কিছু কাজ করতে হবে। যেমনঃ সংঘবদ্ধ হওয়া- ইসলাম সংঘবদ্ধ যিন্দেগীর উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তিন ব্যক্তি যদি সফরে থাকে তারা যেন তাদের একজনকে আমীর-নেতা বানিয়ে নেয়"।[৬১]

ইসলাম দৈনিক পাঁচবার জামা'আতে নামায ও শুক্রবারে জুমু'আর নামায জামা'আতে আদায়ের বিধান দিয়েছে। হজ্জের মাধ্যমে বাৎসরিক বিশ্ব জামা'আতের ব্যবস্থা রেখেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় মুসলমানকে একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে হবে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা- এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে বিপদে-আপদে সাহায্য করবে। এ সাহায্য যে কোন ধরণের দ্বীনি ও দুনিয়াবী বৈধ প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে হতে পারে। রাসূলে করীম (সা.) বলেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দার সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে"।[৬২] পরস্পরকে সদুপদেশ দান করবে, প্রত্যেক মুসলমান নিজে নেক আমল করার সাথে সাথে অপর মুসলমান ভাইয়ের কাজ-কর্মের প্রতি নযর রাখবে এবং তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেখলে উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "এক মু'মিন অন্য মু'মিনের আয়না স্বরূপ এবং এক মু'মিন অন্য মু'মিনের ভাই। সে তার ভাইকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে পিছন থেকে তাকে হিফাজত করে"।[৬৩] এরূপ উপদেশ দানের মধ্যে কল্যাণ কামনা, সহানুভূতি ও ভালোবাসার মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। যাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে সে যেন মানষিকভাবে আহত না হয়। ইসলামে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপায়সমূহ হলো :

mvjvg Av`vb-cÖ`vb I `ÖAv Kiv

সালাম আদান-প্রদানের রীতি মানুষের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক উত্তম উপায়। এর মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের জন্য দু'আ করা এবং মনের মিল হয়। তবে সালামের মধ্যে অপর ভাইয়ের শান্তির জন্য দু'আ ও শুভাকাঙ্খার মনোভাব থাকতে হবে।

৬১। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvweন, (২য় খ.), cv¸³, পৃ. ৩৩৯
৬২। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvweন, (১ম খ.), cv¸³, পৃ. ৩২
৬৩। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvweন, (২য় খ.), cv¸³, পৃ. ৪২৪

Dhaka University Institutional Repository

Av‡cvm gxgvsmv

কোন কারণবশতঃ দু'জন বা দু'দল মুসলমানের মধ্যে কলহ বিবাদ দেখা দিলে তা মীমাংসা করে দেয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও"।[৬৪] এমনকি এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রমকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এভাবে কলহ-দ্বন্দ্ব মিটিয়ে সমাজে ঐক্য স্থাপন করার জন্য বারবার তাগীদ দেয়া হয়েছে।

†ZŠwdK PvIqv

সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট দু'আ চাইতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তার অনুগ্রহে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি করে দিতে পারেন।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ "তিনি তাদের অন্তরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়"।[৬৫]

নবী করীম (সা.) মানুষের নৈতিক গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে তদানীন্তন সমাজের চেহারা পাল্টে দিয়েছিলেন। দ্বন্দ্ব-কলহ ছিল যাদের নিত্য দিনের সঙ্গী, সামান্য কারণে যারা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো তাদের তিনি একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি আদর্শ সমাজ গড়েছিলেন। এ অসাধারণ কাজের জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল মানুষের মনের মধ্যে আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা.) প্রতি অবিচল আস্থা সৃষ্টি এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চরিত্র গঠন। অতএব একটি সুসংবদ্ধ আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

nw'qv Av'vb-c'vb

ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্যদের যে উপহার ও উপঢৌকন আদান-প্রদান করা হয় তাকে 'হাদিয়া' বলা হয়। নবী করীম (সা.) বলেন, 'একে অন্যকে হাদিয়া দিবে, হাদিয়া অন্তরের কলুষতা দূর করে। এক পড়শি অপর পড়শিকে হাদিয়া দিতে যেন অবহেলা না করে এবং কেউ যেন সামান্য মনে না করে যদিও তা এক টুকরা বকরীর ক্ষুরও হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে হাদিয়া দিতেন এবং সাহাবীগণও রাসূলুল্লাহ (সা.)- কে হাদিয়া দিতেন। কেউ হাদিয়া দিলে তার প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর

৬৪। আল কুরআন, ৪৯ : ১০
৬৫। আল কুরআন, ৮:৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হয়। হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যাকে দান করা হয়েছে তার সামর্থ্য থাকলে সে যেন এর প্রতিদান দেয়, আর যার সামর্থ্য নাই, সে যেন প্রশংসা করে। কেননা যে প্রশংসা করল সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, আর যে তা গোপন করে সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে"।[৬৬]

হাদিয়ার প্রতিদানে সমপরিমাণের জিনিস হতে হবে এমন কোন কথা নেই, বরং নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিদান দিতে চেষ্টা করা উচিত। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া আদান-প্রদান করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সহধর্মিনীগণকে হাদিয়া দিতেন। প্রকৃতপক্ষে হাদিয়া দাম্পত্য জীবনে আন্তরিকতা বৃদ্ধির এক মূল্যবান উপাদান। এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয় এবং মনের গ্লানি দূর হয়ে যায়।

কেউ হাদিয়া দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়, কেননা তাতে হাদিয়া দাতার মনে কষ্ট হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়। নবী করীম (সা.)-এর জীবন থেকে হাদিয়ার ব্যাপারে যে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় তা হলো-

ক. হাদিয়া নিজ সামর্থ্যানুযায়ী দেয়া উচিত। (এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো দাতার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা, প্রদত্ত বস্তুর মূল্য নয়)

খ. হাদিয়া যাই হোক না কেন তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

গ. হাদিয়ার পরিবর্তে হাদিয়া দেয়ার চেষ্টা করা উচিত।

ঘ. হাদিয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দনীয় বস্তুর মধ্যে খুশবু ছিল অন্যতম।

ঙ. হাদিয়া দেয়ার পর তা ফিরিয়ে নেয়া অশোভনীয়।[৬৭]

nw‘qv I Nl

হাদিয়া ও ঘুষ এক নয়, হাদিয়া ও ঘুষের মধ্যে পার্থক্য বিরাট। হাদিয়া দেয়ার নিয়তের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত ছাড়া পার্থিব কোন স্বার্থ হাসিল বা কোনরূপ সাহায্য পাওয়ার আশা থাকে না। অপরপক্ষে ঘুষ দেয়ার উদ্দেশ্য হয় কোন স্বার্থ হাসিল করা বা সাহায্য পাওয়া। সাধারণত কর্তব্যরত কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে কিছু দেয়া ঘুষের পর্যায়ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম (সা.) আয়দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে

৬৬। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvwen, (1g L.), cv¸ ³, পৃ. ২৬১
৬৭। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvwen, ((১ম খ.), cv¸ ³, পৃ. ২৬০

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত করেন। তার নাম ছিল ইবন লুতবিয়্যা। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে। একথা শুনে নবী (সা.) ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও প্রশংসা বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালনের জন্য আমি তোমাদের মধ্য থেকে কোন কোন লোককে নিয়োজিত করি। তাদের মধ্য থেকে কেউ এসে বলে, 'এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে। সে তার পিতা বা মাতার ঘরে বসে থাকেনি কেন, তখন দেখতে পেত, তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কিনা? সে সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, এক্ষেত্রে কেউ যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে সে তা তার ঘাড়ে বহণ করে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে।[৬৮] ঘুষকে হাদিয়া বা অন্য কোন নামে আখ্যায়িত করলেও তা ঘুষ বলেই গণ্য হবে। হাদিয়া আদান-প্রদানের মাধ্যমে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং পরস্পর হাদিয়া আদান-প্রদান একটি উত্তম রীতি। তবে এর মাধ্যমে দুনিয়ার কোন স্বার্থ লাভের আশা না করা। কেবল পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য হাদিয়া আদান-প্রদান বাঞ্ছনীয়।

mrKv‡Ri Av‡`k I AmrKv‡Ri wb‡la

মানবমণ্ডলীকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সমাজে এমন কিছু লোক থাকা উচিত যারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর"।[৬৯]

আল কুরআনের এ নির্দেশ দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের পথ দেখানো। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে শরিয়ত বিরোধী কাজ হতে দেখলে সে তা শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করবে। যদি সে এর শক্তি না রাখে তবে মুখ দ্বারা, আর যদি এর শক্তিও না রাখে তবে অন্তর দ্বারা ঘৃনা করবে। আর এটাই হল ঈমানের দুর্বলতম স্তর"।[৭০]

নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হয়েছে। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী ও রাসূল এ কাজ

৬৮। cv¸³, পৃ. ১৫৬

৬৯। আল কুরআন, ৩ : ১১০

৭০। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmwen, (১ম খ.), cv¸³, পৃ. ৪৩৬

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি পথভ্রষ্ট জাতিকে তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত জাতিতে পরিণত করেন। তাঁর পরে আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবে না। এ অবস্থায় কারা এ দায়িত্ব পালন করবেন। সে প্রসঙ্গে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : "আর তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা প্রয়োজন, যারা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। তারাই সফলকাম"।[৭১]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় মুসলিম জাতির অন্ততপক্ষে একদলকে সৎকাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন। যে কেউ এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে তাকে অমানুষিক নির্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। এ কাজ করতে গিয়ে বিশ্বনবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কে চরম কুরবানী দিতে হয়েছে। বিরোধীদের নির্যাতন ও অত্যাচারে তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে যারাই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন তাঁদেরকে অপরিসীম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সৎকাজের আদেশ নিজ পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে : "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি থেকে"।[৭২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথমে নিজ পরিবারের হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত যায়িদ ইবন হারীসা (রা.) কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সৎকাজের আদেশ দাতা নিজেও সৎকাজে নিয়োজিত থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন, "তোমরা মানুষকে সৎকাজে নির্দেশ দাও, আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও"।[৭৩]

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আহবানকারীকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে নিজেকেও সৎকর্মশীল হতে হবে। সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজের নিষেধকারীর পক্ষে বিপরীত কাজ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ভাল কাজের উপদেশ দান একটি মহৎ কাজ।[৭৪] যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন,"তোমরা সৎকাজের প্রতি

৭১ । আল কুরআন, ৩ : ১০৪
৭২। আল কুরআন, ৬৬ : ৬
৭৩। আল কুরআন, ২ : ৪৪
৭৪। মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, C৷¸ ³, পৃ.৩১০

Dhaka University Institutional Repository

আহবান জানাবে এবং মানুষকে অসৎকাজে নিষেধ করবে, তবেই হবে সফলকাম”।[৭৫] কোন পদ্ধতিতে ভাল কাজের উপদেশ দিতে হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ আল কুরআনে ইরশাদ করেন : “তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর উত্তমভাবে”।[৭৬]

এখানে আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করার জন্য তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা : হিকমত, সদুপদেশ ও সদ্ভাবে বিতর্ক করা। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে ফিরআউনের সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে বলেন : (হে মূসা ও হারুন) তোমরা দু'জন ফিরআউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘণ করেছে। তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে”।[৭৭]

এছাড়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহর বাণী প্রচারকদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, “তাঁরা আল্লাহর বাণী প্রচার করতো আর আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতো না”।[৭৮] অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে হবে নির্ভীক চিত্তে এবং দাওয়াত দাতার কথা হবে যুক্তিসঙ্গত ও উপদেশপূর্ণ। সাধারণভাবে এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। পরিবারের কর্তা পরিবারস্থ অন্যান্য সদস্যদের আমল সংশোধনের জন্য দায়ী থাকবেন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সমাজের অন্যান্য লোকদের সৎকাজের আদেশ দিবেন ও তাদেরকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। আলিম সমাজ বিশেষভাবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। সর্বোপরি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ভাল কাজ করতে ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিবে, এটাই ইসলামী বিধান।

Dcnvm, †`vlv‡ivc, g›` bv‡g WvKv I A‡nZK avi Yv Ki v †_‡K weiZ _vKv

কোন ব্যক্তিকে উপহাস বা তিরষ্কার করা কিংবা মন্দ নামে ডাকা ইসলামের দৃষ্ঠিতে গুরুতর অপরাধ। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের জন্য মুসলমানকে অবশ্যই এসব মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন: “হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং

৭৫। আল কুরআন, ৩ : ১০৪
৭৬। আল কুরআন, ১৬:১২৫
৭৭। আল কুরআন, ২০:৪৩-৪৪
৭৮। আল কুরআন, ৩৩:৩৯

Dhaka University Institutional Repository

কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরের মন্দনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দনামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা তাওবা না করে তারা যালিম”।[৭৯] এ আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে তিনটি কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যথা : (১) কোন মুসলমানকে বিদ্রুপ বা উপহাস করা (২) কাউকে দোষারোপ করা এবং (৩) কাউকে অবমাননা করা বা মন্দনামে ডাকা।

Dcnvm

কোন মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতাদের হাসির উদ্রেগ হয়, একে বলে উপহাস। এ কাজ কথায়, ভাবভঙ্গিতে বা আকার ঈঙ্গিতে হতে পারে। এরূপ কাজে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ও অন্যজনকে অপমান, লাঞ্ছনা ও হেয় প্রতিপন্ন করার মনোভাব বিদ্যমান থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি নিঃসন্দেহে ঘৃন্য অপরাধ। এরূপ কাজের দ্বারা অন্য ব্যক্তির মনে আঘাত দেয়া হয়। ফলে সমাজে বিপর্যয় ঘটে। এ জন্য আল কুরআনে কাজটিকে হারাম বলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতে পুরুষ ও নারীদের পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। উভয়ের প্রতি কুরআনের নির্দেশ হলো, এক পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে এবং এক নারী যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হচ্ছে সে উপহাসকারী বা উপহাসকারিনীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। এ আয়াতের সারমর্ম হলো, কোন ব্যক্তির দেহ, আকৃতিতে বা আচার-আচরণে কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে উপহাস বা বিদ্রুপ করা উচিত নয়। কেননা সে ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদি বিষয়ে উপহাসকারীর তুলনায় আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠতর হতে পারে।[৮০] কোন মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভাল বা মন্দ বলা যায় না। কারণ, যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম মন্দ তার কাজ ঘৃন্য ও অপছন্দনীয় হলেও তাকে হেয় মনে করা যায় না। কেননা তাওবার মাধ্যমে তার অপরাধ কাফফারা হয়ে যেতে পারে। কাজেই এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে উপহাস বা বিদ্রুপ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

৭৯। আল কুরআন, ৪৯: ১১-১২

৮০। মুফতী মুহাম্মদ শাফী, (মহিউদ্দীন খাঁন কর্তৃক বাংলায় অনুদিত), Zvdmx‡i gv‡Awidj KziAvb, কুরআন মুদ্রন প্রকল্প, মদীনা : ১৪২৩ হি., পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

g›‘bv‡g WvKv

কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে মন্দনামে ডাকা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। হযরত আবু যবায়র আনসারী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনায় আসেন, তখন আমাদের অনেকের একাধিক নাম ছিল। এর মধ্যে কোন কোন নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে লোকেরা ব্যবহার করত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তা জানা ছিল না। সে জন্য কখনও কখনও তিনি ঐ মন্দ নাম ধরে সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! ঐ ব্যক্তি এ নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে 'ওয়ালা তানাবাজু বিল আলকাব' আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৮১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন গুনাহ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তাওবা করেছে, তাকে সে গুনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করবেন। তবে যদি কোন লোকের এমন নাম প্রচলিত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এ নাম ব্যতীত কেউ তাকে চিনে না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় করার উদ্দেশ্য ব্যতীত সে নামে ডাকা যায়। যেমন কোন কোন মুহাদ্দিসের নামের সাথে (খোঁড়া, ট্যারা) ইত্যাদি যুক্ত করা আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবূ হুরায়রা (রা.) কে 'আবূ হুরায়রা' নামে অভিহিত করেছেন। এরূপ নামে স্নেহ ও ভালোবাসার ইশারা রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিজেরাও তা অপছন্দ করেননি।

মানুষকে তার ভাল নামে ডাকা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মু'মিনের হক অপর মু'মিনের উপর এ যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে আরব দেশে ডাক নামের প্রচলন ছিল তিনি কোন কোন সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে 'আতীক', হযরত ওমর (রা.) কে 'ফারুক' হযরত খরিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.) কে 'সাইফুল্লাহ' এবং হযরত হামযা (রা.) কে 'আসাদুল্লাহ' ইত্যাদি।[৮২]

A‡nZK aviYv Kiv

প্রমাণ ব্যতীত কোন মুসলমানের প্রতি কু-ধারণা বা অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে : "হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ (অহেতুক) অনুমান হতে দূরে

---

৮১ । মুফতী মুহাম্মদ শাফী, CÖv¸³, (৮ম খ.), পৃ .১২৫

৮২ । CÖv¸³, পৃ . ১২৬

থাক। কারণ (অহেতুক) অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ”।[৮৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: “তোমরা অহেতুক ধারণা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা অহেতুক ধারণা জঘণ্যতম মিথ্যা”।[৮৪]

MxeZ, Acev' I wQ'v‡šlY cwinvi

গীবত, অপবাদ ও ছিদ্রান্বেষণ করা কবীরা গুণাহ। সুতরাং মুসলমানকে অবশ্যই এগুলো পরিহার করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন : “আর তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু”।[৮৫]

MxeZ

‘গীবত’ আরবি শব্দ। বাংলায় একে ‘পরনিন্দা’ বলা যায়। কোন মানুষের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাকে বলা হয় গীবত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “গীবত কী, তা কি তোমরা জান? লোকেরা উত্তরে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, গীবত হলো তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, এটাও কি গীবত হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলেই সেটা হবে গীবত। আর তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে না থাকে, সে ক্ষেত্রে সেটা হতে ‘বুহতান’ বা অপবাদ”।[৮৬]

অবশ্য শুভাকাঙ্খীর দৃষ্টি নিয়ে কোন মুসলমানকে তার দোষত্রুটির কথা বললে স্বভাবতঃ একে সে খারাপ মনে করে না। কেননা এরূপ বলার উদ্দেশ্য থাকে সংশোধন। কিন্তু যদি কাউকে সমাজের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে তার অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি বর্ণনা করা হয়, তাহলে এটা হবে তার মনোকষ্টের কারণ। তাই কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা করা জায়িয নেই। এ থেকে এ কথা ধারণা করা ঠিক হবে না যে, উপস্থিতিতে কাউকে নিন্দা বা দোষারোপ করা জায়িয আছে। কেননা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে কাউকে কষ্টদায়ক কথা বলাকে দোষারোপ বলা

৮৩। আল কুরআন, ৪৯:১২
৮৪। মুফতী মুহাম্মদ শাফী, cv¸³, পৃ; ১২৮
৮৫। আল কুরআন, ৪৯:১২
৮৬। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmwen, cv¸³, পৃ. ৪১২

Dhaka University Institutional Repository

হয় এবং তা জায়িয নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :"দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে" ।[৮৭] গীবত কোন অবস্থায় জায়িয নেই। উপস্থিতিতে কাউকে দোষারোপ করার চেয়ে কারো অনুপস্থিতিতে তার গীবত করা অধিকতর দোষণীয়। কেননা অনুপস্থিতিতে কারো দোষের কথা বললে তার জবাব দেয়ার কেউ থাকে না। ফলে যে দোষ বা ত্রুটির কথা বলা হচ্ছে, তা সত্য না মিথ্যা বোঝার আর উপায় থাকে না। গীবত করার মত গীবত শোনাও পাপের কাজ। কোন ব্যক্তি যখন কারো গীবত করতে থাকে, তখন শ্রোতাদের উচিত গীবতকারীকে গীবত থেকে বিরত রাখা। এক্ষেত্রে গীবতের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তাহলে পরনিন্দা চর্চা সমাজ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়ে যাবে।

গীবত ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'গীবত বা পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ।' সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কিভাবে ব্যভিচার থেকে গুরুতর অপরাধ হতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "ব্যভিচার করার পর মানুষ আল্লাহর নিকট তাওবা করলে আল্লাহ তা কবূল করেন। কিন্তু গীবতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত সে ব্যক্তির (যার গীবত করা হয়েছে। ক্ষমা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাকে মাফ করবেন না" ।[৮৮] এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গীবত করা কোন অবস্থাতেই জায়িয নেই। অবশ্য কারো দ্বারা এরূপ গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি জীবিত থাকলে এবং তার নিকট থেকে মাফ করে নেয়া সম্ভব হলে ক্ষমা চেয়ে নিতে। কিন্তু যদি সে মারা গিয়ে থাকে কিংবা দূর এলাকায় চলে যাওয়ার কারণে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহর নিকট তার গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করতে হবে । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "নিঃসন্দেহে গীবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গীবত বা কুৎসা রটনা করছো তার জন্য এভাবে দু'আ করবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও" ।[৮৯] মৃত ব্যক্তির কুৎসা রটনা করাও পাপ। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমার মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করো না। কেননা, তারা তাদের কৃতকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে" ।[৯০]

৮৭। আল কুরআন, ১০৪:১
৮৮। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZzj gvmvwen, cÖ¸ ³, পৃ. ৪১৫
৮৯। cÖ¸ ³, পৃ. ৪১৫
৯০। আল্লামা জলীল আহসান নদভী, iv‡n Avgj, (২য় খ.), খন্দকার প্রকাশনী, ঢাকা:২০১২, পৃ.২০

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআনে ‘গীবত’ করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য বলা হয়েছে। গীবত কত বড় অপরাধ তা এর থেকে প্রতীয়মান হয়। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যখন আমার প্রতিপালক আমাকে মি’রাজে নিয়েছিলেন তখন আমি এমন এক শ্রেণির লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মত। যা দ্বারা তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরীল (আ.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, এরা সে ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেতো এবং তাদের ইযযত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো”।[৯১] এখানে মানুষের গোশত খাওয়ার অর্থ হলো অন্যের গীবত করা ও তাদের সুনাম ও খ্যাতি নষ্ট করার চেষ্টায় রত থাকা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গীবত জায়িয আছে: যেমন- (১) মাযলূম কর্তৃক যালিমের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করা (২) মুফতীর নিকট ফাতোয়া চাওয়ার সময় ঘটনার বিবরণ দিতে কারো দোষ-ত্রুটি বলার প্রয়োজন হলে তা বলা (৩) প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি যাতে গোটা সমাজকে মন্দ কাজে জড়িত করতে না পারে, সে জন্য তার পাপাচারেরও কথা প্রকাশ করা (৪) সাধারণ মানুষকে কোন অনিষ্টকর লোকের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তার সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া। এসব ক্ষেত্র ব্যতীত গীবত বা পরনিন্দা করা থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে বিরত থাকতে হবে।

Acev‘

‘অপবাদ’ গীবতের চেয়ে গুরুতর অপরাধ। কোন লোকের মধ্যে যে দোষ নেই, তার প্রতি সে দোষারোপ করাকে অপবাদ বলা হয়। আরবিতে একে ‘বুহতান’ বলা হয়। সতী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা ভয়ানক ধরণের অপরাধ। আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন, “যারা সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি”।[৯২] এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোন সতী নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ দানকারী দুনিয়া ও অখিরাতে অভিশপ্ত এবং তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এ দুনিয়ায় তার শাস্তি হল ৮০টি বেত্রাঘাত। আর তার সাক্ষ্য কোন সময় গ্রহণ করা হবে না। আখিরাতের জীবনেও তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ৭টি কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হলো সতী-সাধ্বী রমণীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ।[৯৩]

৯১। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvwen, cv¸ ³, পৃ. ১৭

৯২। আল কুরআন, ২৪:২৩

৯৩। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvwen, cv¸ ³, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

wQ‘v‡šlY

মানুষের দোষত্রুটি খুঁজে বের করাকে ‘ছিদ্রান্বেষণ’ বলা হয়। এটা কবীরা গুনাহ। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না, যার কোন দোষ নেই। কোন সমাজের মানুষ যদি পরস্পরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত হয় এবং তা প্রচার করতে থাকে, তবে সে সমাজে শান্তি থাকতে পারে না। আল কুরআনের নির্দেশ হলো: “তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না”।[৯৪] এ নির্দেশের তাৎপর্য হলো, পরস্পরের গোপনীয় দোষত্রুটি খুঁজে বের করা নিষিদ্ধ। মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা অতীব নিন্দনীয় কাজ। মোটকথা, কুরআন হাদীসের আলোকে প্রতীয়মাণ হয় যে, প্রকৃত মুসলমান গীবত, অপবাদ ও ছিদ্রান্বেষণের মত গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

mvgwRK Aciva ‘g‡Y Bmjvgx weavb

প্রতিটি মানুষ সমাজে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। সমাজের কোন মানুষ যেন অপরাধ করে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট না করে এটাই সকলের কাম্য। তবুও সমাজের কিছু মানুষ অন্যের অধিকার খর্ব করে অপরাধ করে বসে। ফলে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। সমাজে যাতে অপরাধ সংঘটিত না হয় সে লক্ষ্যে ইসলাম সমাজকে কলুষমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে চায়। সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল, যেসব পরস্থিতিতে অপরাধ সংঘটিত হবার সম্ভাবনা থাকে তা থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা। যেমন সম্পদের ইনসাফ সম্মত বণ্টন, যাতে অভাবের তাড়নায় কাউকে চুরি, ডাকাতি করতে না হয়। প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজ পরিশ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দেশে নারী-পুরুষের অবাধ মিলন ও যৌন প্রবৃত্তি উদ্দীপক সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার রোধ করে ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করা প্রয়োজন। খুন-খারাবি রোধে সামাজিক দ্বন্দ্ব কলহের অবসান ঘটাতে হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ধারা জারী রাখতে হবে। পরনিন্দা, পরচর্চা বন্ধ করার লক্ষ্যে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন করতে হবে।

অপরপক্ষে ইসলাম ব্যক্তির মন-মানষিকতায় আল্লাহর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও পরকালের জবাবদিহিতার প্রত্যয় সৃষ্টি করে। তাকে একথা পরিষ্কারভাবে অনুধাবণ করার সুযোগ দেয় যে, যত সংগোপনেই সে অপরাধ করুন না কেন আল্লাহ তা দেখেন। পরকালে আল্লাহর নিকট এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে

৯৪। আল কুরআন, ৪৯: ১২

Dhaka University Institutional Repository

হবে এবং পরকালের শাস্তি ইহকালের শাস্তি অপেক্ষা অনেক কঠিন ও স্থায়ী। এ বোধ সৃষ্টি করার মাধ্যমেই কেবল অপরাধের মাত্রা ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব। একাধারে সমাজ থেকে অপরাধ সংঘটনের সকল সম্ভাবনা দূরীভূত ও ব্যক্তি চরিত্রের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমেই অপরাধ দমন করা যেতে পারে। এতসব ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ করে বসে, তবে ইসলাম তাকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দেয়ার পক্ষপাতি।

ইসলামী দৃষ্টিতে মানুষের জীবন এক নৈতিক সংস্থা বিশেষ। সব প্রকারের কল্যাণময় মূল্যমানের ব্যাপকতা সাধন এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতির জঘণ্যতাকে নির্মূল করণের উপর তা সংস্থাপিত হয়। মানুষের জীবন একটা রাজনৈতিক সংস্থাও বটে। আর তার ভিত্তি হচ্ছে নিরংকুশ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা। তা একটি সামাজিক সংস্থাও। নির্মল পরিবার ব্যবস্থা ও পারস্পরিক নিরাপত্তা হচ্ছে তার বীজ, নিম্নতম ও একেবারে প্রাথমিক একক। জীবন একটা অর্থনৈতিক সংস্থাও। উৎপাদন কর্মতৎপরতা ও ইনসাফপূর্ণ বন্টন তার মৌল ভাবধারা। মুসলমান যদি বাস্তবিকই দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত ও অনুসারী হয়, নিজেদেরকে দ্বীনের বিধানাবলীর অধীন ও অনুগত বানাতে সচেষ্ট হয়, তাহলে মানুষের জীবন উক্ত রূপে সব দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

অপরাধ দমণে বা প্রতিরোধে পবিত্র ধর্মের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অতীত ধর্মের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। ইসলামে এ পর্যায়ে যে বিপুল জ্ঞানতত্ত্ব ও আইন সম্পদ রয়েছে, তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে, তা সব প্রকারের অপরাধ দমণের জন্য যথেষ্ট। তা অপরাধীকে বিরত রাখে অপরাধ করা থেকে। অথচ সে জন্য খুব মারাত্মক ধরণের কোন শাস্তির প্রয়োজন পড়ে না। ইসলামের পেশকৃত এসব উপায় ও পন্থাগুলো হচ্ছে মানুষের মন ও বিবেককে সুস্থ্য , কল্যাণময় ও পবিত্র ভাবধারা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা এবং অন্যায় অপরাধ ও পাপকর্মের প্রতি ব্যক্তির মন-মানষে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করে দেয়ার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।[৯৫]

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিধানসমূহ মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং তাতে চরম মাত্রার সূক্ষ্ম বিষয়ের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর ইসলামের পাঁচটি মৌল প্রয়োজন পূরণ, সংরক্ষণ ও নিশ্চয়তা বিধান হচ্ছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। পাঁচটি বিষয় হলো দ্বীন পালন, জীবন, বিবেক-বুদ্ধির সুস্থ্যতা, বংশ ও ধন

৯৫। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cÖZ‡iv‡a Bmjvg, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৭৯, পৃ . ১৩

Dhaka University Institutional Repository

মান রক্ষা কুরআন-সুন্নাহতে এ কথা বিধৃত। এ পাঁচ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অপরাধসমূহ গোটা সমাজ সংস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এ কারণে এ পাঁচটি পর্যায়ে অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির কথা স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন–

gvbl nZ¨v wbwl×

অপরাধের মধ্যে মানুষ হত্যার অপরাধ সবচেয়ে বড় মারাত্মক। মানুষ যখন এ অপরাধ করে তারই এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে, তখন সে গোটা মানবতার সাথেই শত্রুতা করে। সে মানুষ হত্যা করে আল্লাহর গঠিত মানব বংশ-প্রাসাদের ভিত্তিকে উৎপাটিত করে এবং আল্লাহর আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। তা ভয়াবহ নাফরমানী ও আল্লাহ দ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে। এ কারণে ইসলামে এ অপরাধের বীভৎসতা প্রকট করে তোলা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মানব মনে তীব্র ঘৃণা জাগাতে চেষ্টা করা হয়েছে আর সে সাথে ইসলামী সমাজে সে জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে ন্যায় বিচারভিত্তিক কঠিন শাস্তি। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ! হত্যার ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস্ ফরয (বাধ্যতামূলক) করা হয়েছে"।[৯৬] আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

"তোমরা এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করো না, যাকে আইনগত ব্যতীত হত্যা করা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন"।[৯৭] কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আমি বনী ইসরাঈলদের প্রতি (এ বিধান) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি, যে ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যে হত্যার অপরাধে অপরাধী নয় বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি, যে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করল। আর যে কোন ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে"।[৯৮] কুরআনের এ আয়াত একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করলে সকল মানুষকে হত্যা করা হয়। একথার মাধ্যমে হত্যাকর্মের জঘণ্যতাকে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে, একজন মানুষকে জীবিত রাখা সকল মানুষকেই জীবিত রাখার মত কর্ম হিসেবে উল্লেখ করে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটি নিরপরাধ মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ জীবন ও বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, জীবন বেঁচে থাকবে এবং এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা বিকাশ ও উন্নয়ন ধারায় এ বিশ্ব শান্তি, সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও

৯৬। আল কুরআন, ২ : ১৭৮
৯৭। আল কুরআন, ১৭ : ৩৩
৯৮। আল কুরআন, ৫ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতিতে ভরে ওঠবে। সুতরাং ব্যক্তির জীবনকে ধ্বংস করার মাধ্যমে মূলত সমগ্র মানব জাতির জন্য সম্ভাব্য কল্যাণ ও সৃষ্টিকর্তার মহান উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা হয়।[৯৯]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "সবচেয়ে জঘণ্য অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানানো এবং মানুষ হত্যা করা"।[১০০] তিনি আরো বলেছেন, "হে মানব জাতি! নিশ্চয় তোমাদের জীবন, সম্পদ এবং সম্ভ্রম তোমাদের প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত (অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে) পবিত্র"।[১০১]

আল কুরআনে আত্মহত্যার প্রবণতাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে, "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাপ্রবণ"।[১০২] বরং নিজের অসহণীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হতে কুরআনে মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগানো হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যাকারী স্রষ্টার সকল পার্থিব ও অপার্থিব দান থেকে বঞ্চিত হয়। এ কাজে সহায়তাকারীও তাযীরের দণ্ডে দণ্ডার্হ হয়ে থাকে।[১০৩]

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকে আরবের নবজাতক মেয়ে শিশুকে জন্মলাভের পরপরই দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা বা জীবন্ত প্রোথিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলাম শিশু হত্যার এ জঘণ্য প্রবণতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন, "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা এক জঘণ্য অপরাধ"।[১০৪]

Pwi Kiv

ধনসম্পদ মানব জীবনের চালিকা শক্তি। মানব জীবনে অর্থ ও সম্পদ থাকা অপরিহার্য। ইসলাম এ ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যয় ভোগের জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করেছে। হালাল পথে উপার্জিত ধন-সম্পদকে হালাল ঘোষণা করেছে আর হারাম পথে অন্যায় ও যুলুমের মাধ্যমে আহরিত ধন-সম্পদকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে এবং পরকালে কঠিন ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবার ভয়

৯৯। মুহাম্মদ শফিক আহমেদ প্রমুখ," ইসলামে মানবাধিকার: নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ", অক্টোবর ৯৩-জুন সংখ্যা, XvKv wekwe`¨vjq cwÎKv, XvKv : পৃ. ১৫৭

১০০। ইমাম নাসাই, mbv‡b bvmvC, কিতাবু তাহরিমিদ্ দাম, বাবু যিকরিল কাবাইর, হাদীস নং-৪০১১

১০১। ইবন সাদ, ZvevKvZj Keiv, হাদীস নং-১৮৬৫

১০২। আল কুরআন, ৪:২৯

১০৩। গাজী শামসুর রহমান, "কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফৌজদারী আইনের সংশোধন, " BmjwgK dvD‡Ðkb cwÎKv, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ঢাকা : ১৯৯২, পৃ. ৩০৫

১০৪। আল কুরআন, ১৭:৩১

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়েছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের ধন-মাল পরস্পর বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টি সম্মতিক্রমে ব্যবসা হলে তা নিষিদ্ধ নয়" ।[১০৫]

ধন-সম্পদ চুরি করে করায়ত্ব করলে তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। "পুরুষ চোর, নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও তারা যা উপার্জন করেছে, এটা তারই শাস্তি ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত" ।[১০৬] আর আল্লাহ দুর্জয় সুবিজ্ঞানী।

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, মানুষ চুরি করে দারিদ্র্যের কারণে, ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা নেই বলে। ইসলাম এ ব্যাপারে পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। ফলে ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই তার জীবিকা পাবে, তার মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ হবে, কোন লোকই না খেয়ে থাকবে না, অভাব অনটনে থাকবে না। এ কারণে ইসলামী সমাজে কারোরই চুরি করার আবশ্যকতা থাকতে পারে না। এরূপ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও চুরির কাজে অগ্রসর হতে পারে কেবল সেসব লোক যারা ধন-সম্পদের লোভী, যারা অধিক সম্পদ করায়ত্ব করার অভিলাষী বা যারা অন্যায় অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা বা পাপপথে বেহিসেবে অর্থ ব্যয় করার সুযোগে লালায়িত। অতএব, তা সুস্থ্য সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। এ কারণে ইসলামে চুরি সমর্থনীয় নয়। ইসলামী সমাজে চুরির কোন সুযোগ থাকতে পারে না। চুরির পথ ও কারণ সর্বোতভাবে বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক।[১০৭]

gvbnwbKi AvPiY wbwl×

সমাজের কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কোন সংস্থায় মানহানিকর হস্তক্ষেপ বা ব্যক্তির মান সম্মানের উপর মিথ্যা যৌন কলংকের কালিমা লেপনও অপরাধ। ব্যক্তির মান-সম্মান, পদ মর্যাদা, চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রভৃতির হ্রাস বা হানি করার মাধ্যমে তার জীবনের আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক বিকাশধারাকে বাঁধাগ্রস্ত করা হয়। তাই মানহানিকর আচরণের পন্থা হতে পারে, যেমন অপপ্রচার, গুজব, নিন্দা, উপহাস, তিরস্কার, গালাগাল, বিকৃত নামকরণ, মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "পুরুষরা অন্য পুরুষদের উপহাস

১০৫। আল কুরআন, ৪:২৯

১০৬। আল কুরআন, ৫:৩৮

১০৭। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, C\, ³, পৃ. ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

করবে না, হতে পারে তারা তাদের (বিদ্রুপকারী) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। অনুরূপভাবে নারীরাও নারীদের ঠাট্টা করবে না, হতে পারে তারা তাদের (বিদ্রুপকারী) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তোমরা পরস্পরের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বা ব্যঙ্গক্তি (মানহানিকর উক্তি) করবে না, একে অপরকে আক্রমণাত্মক উপনামে আহবান করবে না বা কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে নিন্দা করবে না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত, ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো"।[১০৮]

কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে মানহানিকর বিভিন্ন আচরণকে নিষিদ্ধ করে মানুষের সম্ভ্রম ও মর্যাদার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। নারী জাতির সম্ভ্রমের প্রতি অপবাদ আরোপ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি জঘণ্য কর্ম হিসেবে বিবেচিত। কেননা, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে যিনার অভিযোগ তোলা অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এর পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া সমাজে খুব ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়। তাতে সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত জনগণের আস্থা থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে সমাজে যে ব্যাপক প্রচারণা চলতে থাকে, তাকে মিথ্যা প্রমাণ করা ও তার খারাপ প্রতিক্রিয়া রোধ করা বা তার কুপ্রভাব মুছে ফেলা তার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। তাকে সারাটা জীবন মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বহণ করতে হয়। এ অবস্থা সর্বাধিক মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি হন কোন মেয়েলোক।

এ কলঙ্ক শুধু তাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে না, তার পিতৃপুরুষ ও তার গর্ভজাতদের মুখকেও কালিমালিপ্ত করে। আর অবিবাহিতা হলে তো তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়ার আশা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আর যেসব লোক সুরক্ষিত চরিত্রবান মেয়েলোকের উপর যিনার অভিযোগ আনে পরে সে জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থাপিত করে না, তাদের আশিটি দোররা মার। তাদের সাক্ষ্য কখনই গ্রহণ করবে না। ওরা ফাসিক। তবে যারা এ অপরাধ থেকে অতঃপর তওবা করবে ও নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ্ (তাদের জন্য) নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।[১০৯] অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে, "যেসব লোক সুরক্ষিত সচ্চরিত্র, অসতর্ক ঈমানদার মহিলাদের উপর যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও পরকালে লানতপ্রাপ্ত এবং তাদের জন্য অতি বড় আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে"।[১১০]

১০৮। আল কুরআন, ৪৯:১১-১২

১০৯। আল কুরআন, ২৪:৪-৫

১১০। আল কুরআন, ২৪:২৩

Dhaka University Institutional Repository

wḧbv gviZ¦K Acivа

যিনা বা ব্যভিচার কুৎসিত ও বীভৎস অপরাধ। তা সমাজ সংস্থাকে কুরে কুরে খায়, পরিবারের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন ভিন্ন করে। সমাজে নৈতিক বিপর্যয়, পরিবারে ভাঙ্গন এবং চরম লাম্পট্য সৃষ্টি করে। বিয়ে বা পারিবারিক বন্ধনের দিকে নারী পুরুষের মধ্যে তীব্র অনীহার সঞ্চার করে। তাই ইসলাম এটাকে নিকৃষ্টতম পাপসমূহের অন্যতম বিবেচনা করে এবং সমাজ সভ্যতার জন্য ধ্বংসাত্মক বিবেচনা করে। ব্যভিচার দু'ভাগে সমাজে নষ্টনীড়ের জন্মদেয়। (১) স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে ঈর্ষাপরায়ণতা ,অবিশ্বাস বা অবজ্ঞা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দাম্পত্য হানাহানি বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো। (২) দাম্পত্য জীবন পদাঘাত করে নতুন কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে নিরুদ্দেশ হওয়া। এভাবে ব্যভিচার যখন পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তি নড়বড়ে করে দেয়, তখনই সে পরিবার হয়ে উঠে অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার উৎসভূমি। এসকল সামাজিক সমস্যার মধ্যে রয়েছে মানষিক ব্যধি, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা, নিষ্ঠুরতা, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি। এগুলো ব্যভিচারের পরোক্ষ ফল। প্রত্যক্ষ ফলের মধ্যে রয়েছে অনাকাঙ্খিত গর্ভসঞ্চার, গর্ভপাত, জারজ সন্তান, উত্তরাধিকার লুণ্ঠন, যৌন ব্যাধি ইত্যাদি।[১১১]

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন "(হে নবী) আপনি জগতবাসীকে জানিয়ে দিন, আমার প্রভু পালনকর্তা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার নির্লজ্জ, অশালীন, অবান্তর কার্যাবলী হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন"।[১১২] আল্লাহ পাক অন্যত্র ঘোষণা করেছেন,"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুত শাস্তি এবং আল্লাহ পাক জানেন তোমরা জান না"।[১১৩] মহানবী (স.) বলেছেন, "লজ্জা ঈমানের শাখা এবং লজ্জাহীনতা অবিশ্বাসের শাখা এবং অবিশ্বাসী দোজখে যাবে। নির্লজ্জতা মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। কারো লজ্জাশীলতা রহিত হয়ে গেলে প্রবৃত্তির বশে সে সব কিছুই করতে পারে। যাতে অশ্লীলতা আছে, ধ্বংস ছাড়া তার আর কোন পরিণাম নেই; যাতে লজ্জা আছে সৌন্দর্য ছাড়া তার আর কোন পরিণামই নেই"।[১১৪]

১১১। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cÖ¸³, পৃ . ১৫
১১২। আল কুরআন, ৭:৩৩
১১৩। আল কুরআন, ২৪:১৯
১১৪। আল হাদীস উদ্ধৃত : খন্দকার রোকুনুজ্জামান, ' অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা,' gvwmK cÖ_ex, ডিসেম্বর, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ . ৫২

Dhaka University Institutional Repository

অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকেই ব্যভিচারের উস্কানী আসে। তাই ইসলাম সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়ে পরিবেশকে ব্যভিচারের অনুকূল হতে দেয়নি। এরপর ইসলাম ব্যভিচারে লিপ্ত হবার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, “ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ”।[১১৫] আল্লাহ আরও ঘোষণা করেছেন, “আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থকারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না এবং ব্যভিচার করো না। যে এগুলো করবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়, তবে তারা ব্যতীত যারা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে”।[১১৬] এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেছেন, “শিরকের পর ব্যভিচার অপেক্ষা গর্হিত পাপ আর নেই। যতদিন আমার উম্মতের মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে না পড়বে, ততদিন তারা ভালই থাকবে। তাদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করলে আল্লাহ তাদের সকলের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন”।[১১৭] আল্লাহ ও তার রাসূলের এ সব সতর্কবাণী বিশ্বাসীদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। সর্বপ্রকার নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা থেকে তারা দূরে থাকে, ব্যভিচার হতে থাকে পবিত্র।

g‘¨cv‡bi Aciva

ইসলামে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য ও মদ পান সম্পূর্ণ হারাম। কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামের এ দুটি উৎসই এ বিষয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে একথা ঘোষণা করেছে এবং নবী করীম (সা.)-এর সময় হতে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। কেননা, মাদকদ্রব্য সেবন করার ফলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় আর মানুষ যখন বিবেক বুদ্ধিই হারিয়ে ফেলে, তখন তার ভাল-মন্দ জ্ঞান ও লোপ পায়। তখন সে বুঝতে পারে না কি তার জন্য কল্যাণকর, আর কি তার জন্য ক্ষতিকর! কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানই সে হারিয়ে ফেলে। ন্যায়-অন্যায়ের বোধ কর্পূরের মত উড়ে যায়। ফলে সে বড় বড় অপরাধ করে বসে। সাধারণত ঘনিষ্ট বন্ধুকেও হত্যা করতে এবং যিনা ব্যভিচার করতেও সে তখন দ্বিধা করে না। আপন-পরের পার্থক্যবোধও থাকে না বলে সে নিকটাত্মীয়ের উপরও আক্রমণ চালিয়ে বসতে পারে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, “হে বিশ্বাসীগণ! শয়তান তো এ মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সংকল্পবদ্ধ, তোমাদের আল্লাহর স্মরণ ও

১১৫। আল কুরআন, ১৭:৩২
১১৬। আল কুরআন, ২৫:৬৮-৬৯
১১৭। আল হাদীস উদ্ধৃত : খন্দকার রোকুনুজ্জামান, Cv¸ ³, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

সালাত থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট। তা হলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?"[১১৮] নবী করীম (সা.) বলেছেন, "সব নেশার জিনিসই হারাম। আর যার সামান্য পরিমাণও মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে, তার পূর্ণ অঞ্জলি পরিমাণও হারাম"।[১১৯]

ইসলাম মদ্যপানের ন্যায় মদ উৎপাদন, মদের ব্যবহার তথা মদকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হয় বা করার প্রয়োজন হয়, তার সব কিছুকেই সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন মদের উপর, মদপায়ীর উপর, মদ পরিবেশনকারীর উপর, তার ক্রয়কারীর উপর, তার বিক্রেতার উপর, তার উৎপাদনের উপর, তার উৎপাদন যে করায় তার উপর, তার বহণকারীর উপর এবং তা যার জন্য বহণ করে নেয়া হয়, তার উপর"।[১২০]

mgv‡R kvwšÍ k•Ljv f‡½i Aciva

সমাজের সাধারণ শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধের শাস্তি কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। ইসলামে সশস্ত্র আক্রমণকারীর জন্য চার পর্যায়ের শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা হচ্ছে হত্যা বা শুলবিদ্ধ, বা হাত ও পা বিপরীত পরম্পরায় কেটে ফেলা, বা দেশ থেকে চির নির্বাসন। এ পর্যায়ের মূল দলীল হচ্ছে এ আয়াত : "যে সব লোক আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং পৃথিবী ও জনসমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে চেষ্টা ও তৎপরতা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে তাদের হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে তা তাদের হাত পা বিপরীত পরম্পরায় কেটে ফেলা হবে বা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এ লাঞ্ছনা ও অপমান তো তাদের জন্য এ দুনিয়ায়। আর পরকালে তাদের জন্য তা থেকেও অনেক বড় শাস্তি রয়েছে"।[১২১] উপরন্তু, সরকার বা সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক এমন কোন কার্য সম্পাদিত হওয়া যার দ্বারা নাগরিকগণের উপর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গুরুতর মানষিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ও শাস্তি আরোপ করা যায়, ইসলামে তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আর যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণকে শাস্তি প্রদান করে তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহণ করে"।[১২২] নবী করীম (সা.) বলেছেন, "প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি যার কথা ও হাত (কাজের

১১৮। আল কুরআন, ৫ : ৯০-৯১
১১৯। আবূ দাউদ সুলায়মান, 'viæBnBqv AvZ Ziwmj Avivex, বৈরুত : তা .বি., পৃ . ২৯৫
১২০। আবূ দাউদ সুলায়মান, (দ্বিতীয় খ.), cv¸ ³, পৃ . ৩৯২
১২১। আল কুরআন, ৫:৩৩
১২২। আল কুরআন, ৩৩:৫৮

Dhaka University Institutional Repository

নিপীড়ন) থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে”।[১২৩] অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেছেন মনে রেখো, যদি কোন মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার উপর সাধ্যাতীত বোঝা (জিযয়া বা প্রতিরক্ষা কর) চাপিয়ে দেয় বা তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব”।[১২৪]

Bmjvgx weav‡b kw¯Íi †kwY wefvM

ইসলামী শরিয়তে শাস্তি তিন প্রকার। যথা:

(১) যে শাস্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু কার্যকর করার দায়িত্ব অপরাধীর নিজের্ উপর ন্যস্ত করেছেন। যেমন, বিভিন্ন ধরণের কাফফারা।

(২) ঐ সমস্ত শাস্তি যা আল্লাহর কিতাব বা রাসূল (সা.)-এর হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট এবং এগুলো কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের। এক্ষেত্রে বিচারক বা সরকারের নিজস্ব মতামতের কোন সুযোগ নেই। এ শাস্তি দু‘ধরণের : হদ্দ ও কিসাস (বিধিবদ্ধ শাস্তি)। এ অপরাধে একদিকে যেমন সৃষ্ট জীবের প্রতি অন্যায় করা হয়, অন্যদিকে তেমনি স্রষ্টার নাফরমানীও করা হয়। ফলে অপরাধী আল্লাহ্ ও তার বান্দা উভয়ের নিকট দোষী বলে বিবেচিত হয়। যে অপরাধে আল্লাহর হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, তার শাস্তিকে ‘হদ্দ’ আর যে অপরাধে বান্দার হককে শরিয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, তার শাস্তিকে ‘কিসাস’ বলে। হদ্দ ও কিসাসের মধ্যে আরো একটি পার্থক্য এ যে, হদ্দকে আল্লাহ্র হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও হদ্দ অব্যবহার্য হবে না যেমন, যার সম্পদ চুরি যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরকে নির্ধারিত শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু ‘কিসাস’-এর বিপরীত। কিসাসে বান্দার হক প্রবল হবার কারণে হত্যা প্রমাণ হবার পর হত্যাকারীর বিষয়টি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে বিচার বিভাগের মাধ্যমে কিসাস হিসেবে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে কিংবা দিয়াত- রক্তপাত গ্রহণ করতে পারে কিংবা ক্ষমা করে দিতে পারে।

১২৩। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmwen, (১ম খ.) বাবুল ইমান, কলিকাতা : ১৩৫০ হি.,পৃ . ১২

১২৪। ইমাম আবু দাউদ, mbv‡b Ave ‘vD‘, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাহ ওয়াল বাই, কুতুব খানা রশীদিয়া, দিল্লী : ১৪০৮ হি., হাদীস নং-৩০৫২

Dhaka University Institutional Repository

(৩) ইসলামী শরীয়ত সেসব অপরাধের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি বরং বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে। তাকে বলে তাযীর বা দণ্ডবিধি। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমণের জন্য যেমন ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করেন, ততটুকুই দিবেন। এক্ষেত্রে সরকার নিজস্ব আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং বিচারককে তা মেনে চলতে বাধ্য করতে পারেন। অবস্থানুযায়ী তাযীরকে লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। তাযীরের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু হদ্দের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শোনা উভয়ই নাজায়িয।

Aciva ‘g‡Y Bmjvgx weav‡bi ‰ewkó¨

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের শাস্তি বিধানকালে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে, অপরাধী ঠিক কি অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়ে অপরাধটা করেছিল। সব অপরাধকে একই মানদণ্ডে ওজন সঠিক নয়। ইসলাম বরং অপরাধ সংঘটিত হবার পূর্বেই নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করতে পক্ষপাতি এবং এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে আগ্রহী। এ লক্ষ্যেই ইসলাম সবার আগে লোকদের ইসলামের বিধান পালনে অভ্যস্ত করতে ইচ্ছুক। কেননা, জনগণের চরিত্র উত্তম হলে বা উত্তম বানানো সম্ভব হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অধিকতর অনুকুল পরিবেশ তৈরি হতে পারে। ব্যক্তিগণের অন্তরে কল্যাণের ভাবধারা দৃঢ়মন হয়ে বসতে পারে এবং মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব প্রকারে অন্যায় পাপ ও অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে।

সর্বোপরি মানুষের ভ্রান্তমন-মানষিকতা সংশোধণের জন্য দয়া ও ক্ষমাশীলতার যে গভীর, ব্যাপক ও তীব্র প্রভাব রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। এজন্যই মহান আল্লাহ অপরাধ ও আদর্শ বিচ্যুতির প্রতিরোধ এবং সংশোধনের পন্থা হিসেবে নম্রতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন যেন অপরাধী অপরাধ সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ না করে এবং সে কারণে অপরাধে লিপ্ত থাকাকালেই স্থায়ী নীতি হিসেবে গ্রহণ করে না বসে, অপরাধের মধ্যেই যেন তার অগ্রগতি সাধিত হতে না থাকে। স্বয়ং মহানবী (সা.) অপরাধী বা গুণাহগার ব্যক্তিকে তার অপরাধ ও গুণাহর কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করতে উৎসাহিত করেছেন। অন্যথায় তার মন-মানষিকতায় অপরাধ ও পাপের দিকে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে তা স্থায়ী ও দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইসলাম তিনটি পন্থায় অপরাধীর মনস্তাত্ত্বিক সংশোধন ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের নীতি গ্রহণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

(১) সুপ্রসিদ্ধ ও সংস্কৃত জনমত গঠন। এ কারণেই 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'ভাল'-কে মন্দের জন্য দায়ী করা হয়েছে, যদি সে বাঁকা পথের পথিককে উত্তম পন্থায় সোজা ও সরল করতে অসমর্থ থাকে। এভাবে সমাজের ব্যক্তিগণ যদি পারস্পরিক নসীহত, উপদেশ ও কল্যাণময় পরামর্শের ফলে সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে তা হলে তারা অন্যায় ও দুষ্কৃতি প্রতিরোধে সক্ষম হবে এবং কল্যাণ ও শুভ চরিত্রের প্রতিষ্ঠা কার্যকর হবে।

(২) লজ্জাশীলতা গ্রহণের আমন্ত্রণ এবং তাকে মন-মানষিকতায় দৃঢ়স্থির করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কেননা, লজ্জা-শরম কল্যাণের উৎস। অপরাধ প্রবণতার রোগে আক্রান্তমন-মানষিকতায় লজ্জাশীলতার পূণর্জাগরণ এক সফল চিকিৎসা। অপরাধ করার পথে তা প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অপরাধের লজ্জা থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। এ মনোবৃত্তি মনে জাগ্রত করে যে, আমি এমন কাজ কখনই করব না, যার দরুন শেষ পর্যন্ত আমাকে জনসমাজে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। লজ্জা না থাকা সমস্ত অন্যায় ও পাপের চাবিকাঠি। যার লজ্জা নেই সে করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই।

(৩) ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ প্রচারিত ও প্রকাশিত হওয়ায় এক সাথে দুটি অপরাধ সংঘটিত হয়। একটি হচ্ছে অপরাধ করা; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রচার করা।[১২৫] এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, "তুমি যদি কোন ভুল বা মন্দ কাজ লুকিয়ে ফেল, তখন তা যে করলো, কেবল তারই ক্ষতি হতে পারে। আর যদি তা প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে খুবই সম্ভব হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তার আযাবে সর্বসাধারণকে পরিবেষ্টিত করে ফেলবেন। যে লোক এসব অন্যায় ও জঘণ্যতম কার্যাবলীর কোন একটা কববে ও তা গোপন করে ফেলবে, সে আল্লাহর আবরন লাভ করবে। আর যে লোক তার লজ্জাজনক কাজ আমাদের নিকট উদঘাটিত করবে, আমরা তার উপর সুনির্দিষ্ট 'হদ্দ' অবশ্যই কার্যকর করবো"।[১২৬]

এ তিনটি মৌলিক ব্যবস্থা অন্যায়, পাপ ও অপরাধের বিরুদ্ধে একটা তীব্র ঘৃনার সৃষ্টি করার ও তার অনুকূলে জনমত গড়ে তোলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। মুসলিম মন-মানষিকতাকে ইসলামী শিক্ষা-প্রশিক্ষণে প্রস্তুত ও উন্নত করে তোলার জন্য তা খুবই কার্যকর। সমাজের লোকজনকে এমন সুদৃঢ় বন্ধনে একাত্ম করার এক নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, যার দ্বারা প্রত্যেকটি মানুষের মন-মানষিকতা থেকে অপরাধ

১২৫। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, c৺, ³, পৃ. ৪০

১২৬। ইমাম মালিক, মুয়াত্তা, wKZvej û'', বাবু মা জাআ ফি মান ইতারাফা আলা নাফসিহি বিয যিনা, দারুল ফিকর, বৈরুত : ১৯৯৫, হাদীস নং-১৫০৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রবণতা দূর করা যেতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে পবিত্র চিন্তা ও নির্মল ভাবধারা জাগ্রত করে গোটা সমাজ সমষ্টিকে মহাকল্যাণের দিকে পরিচালিত করা এভাবেই সম্ভব।

Aciva ‘g‡Y kw¯ÍB GKgvÎ A¯ bq

ব্যক্তি তথা সমাজকে অপরাধমুক্ত করার জন্য ইসলাম নিছক বৈষয়িক ও পরকালীন শাস্তির ব্যবস্থা করেনি। ইসলামী শরীআত ও তার শিক্ষা যে লোকই অনুধাবন করবে, সে উপরোক্ত কথার যথার্থ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হবার পর্বেই তাকে অংকুরেই বিনষ্ট করতে ইচ্ছুক। এ কারণে ইসলাম মুসলিম ব্যক্তির চতুর্দিকে এক সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে, যা তাকে পাপের দিকে আকর্ষণ ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করবে-

(১) ইসলাম ব্যক্তির সংশোধনী, ব্যক্তির মন পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ এবং তাকে সুন্দর ও নির্মলায়ন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামের উন্নত মহান চরিত্রে বিভূষিত করতে সচেষ্ট। তার হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অপরাধ ও বিপর্যয় বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে চায়। আর প্রকৃত ঈমান ও একনিষ্ঠ দৃঢ় প্রত্যয়ই হচ্ছে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ, নির্লজ্জতা ও হারাম কাজ অবলম্বনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ। কেননা, সে নিঃসন্দেহে জানে ও বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছুই করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। কারও অপরাধ লোকজনের নিকট অজানা থাকলেও আল্লাহর নিকট তো কিছুই গোপন থাকেনা এবং কেউ যদি অপরাধ করে দুনিয়ার শাস্তি থেকে নিস্তার পেয়েও যায়, তবুও পারলৌকিক শাস্তি থেকে সে কিছুতেই রেহাই পেতে পারে না।[১২৭]

(২) ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে লোকজনকে দূরে রাখার জন্য অত্যন্ত খারাপ ও ভয়াবহ পরিণতির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যে খারাপ পরিণতি মানুষের সম্মুখে ভয়াবহরূপে চিহ্নিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে সে পরিনতি স্বভাবতঃই মানব মনে এমন তীব্র ভীতি সঞ্চার করে যে, সে কিছুতেই সে খারাপ কাজের দিকে পা বাড়াতে সাহস পেতে পারে না। পবিত্র কুরআন বহু ধরণের আপরাধকে হারাম ঘোষণা করেছে। যেমন, মুরতাদ বা মুসলমানদের ইসলামের প্রতি ঈমান হারিয়ে ফেলা ও সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা, ইচ্ছা ও সংকল্প করে মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা, যিনা করা বা যিনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ও মুসলিম সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও জঘণ্য চরিত্রের

১২৭। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cÖv¸³, পৃ. ৪০

কাজকর্মের ব্যাপক বিস্তার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। এসব কাজ করলে সংশ্লিষ্ট লোকটি যে আর ঈমানদার থাকে না, তা স্পষ্ট ও অকাট্য ভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠেছে।

(৩) ইসলাম মানব সমাজকে সকল প্রকার ভাল ও পূণ্যময় কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, সত্যের উপদেশ, ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ এবং সকল পাপ, সীমালংঘণমূলক কাজ, অন্যায়, অত্যাচার ও বিপর্যয় প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, " নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত; শুধু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং পারস্পরিক সত্য কাজের ওসিয়ত করেছে এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্য্য ধারণের" ।[১২৮] "তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর সকল প্রকার কল্যাণময় ও তাকওয়াপূর্ণ কাজে এবং পাপ ও সীমালংঘণমূলক কাজে কোনরূপ সহযোগিতা করো না" ।[১২৯]

মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে লোকই কোন অন্যায় ও ঘৃন্য পাপ কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা নিজ হস্তে ও শক্তির বলে ক্রমশঃ পরিবর্তন করে দেয়। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন মুখে তার প্রতিবাদ করে এবং তাও করতে সমর্থ না হলে অন্তর দিয়ে তাকে খারাপ জানবে। আর এ শেষোক্ত অবস্থা দূর্বল ঈমানের লক্ষণ" ।[১৩০]

কুরআন ও হাদীসের এসব আদেশ ও বিধানের কারণে ইসলামী সমাজে অন্যায় বিরোধী চেষ্টা সাধনায় পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে। সবাই তার প্রতিরোধে উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলে অন্যায় অপরাধকারী কোথাও আশ্রয় পায় না। কেউ তাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য বা সহযোগিতা করে না। ফলে ইসলামী সমাজে অন্যায়, অত্যাচার বা পাপ বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেনা, দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে থাকে, প্রচ্ছন্ন ও নির্মূল হয়ে যায় এবং ন্যায়, কল্যাণময় ও ভাল কাজ ব্যাপকতা লাভ করে।

(৪) ইসলাম যখন কোন কাজকে নিষিদ্ধ করে, তখন সে কাজের সুযোগ দেয় বা অনিবার্য করে তোলে এমন সব পথও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয় এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যেমন, ব্যভিচার ইসলামে

১২৮। আল কুরআন, ১০৩:১-৩

১২৯। আল কুরআন, ৫:২

১৩০। আবূ দাউদ সুলায়মান, Avm mbvb, (২য় খ.), cÖ, ³, পৃ .৩৯২

হারাম ঘোষিত হয়েছে। আল কুরআনে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়, স্বভাব ও প্রকৃতিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠান বন্ধ করার স্থায়ী বিধান ঘোষিত হয়েছে।

এজন্য নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর থেকে দৃষ্টি বিরত ও নত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুহাররম সঙ্গী ছাড়া কোন মহিলার পক্ষে একদিন এক রাত্রির দূরত্বের পথে সফরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। সে সাথে মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছে পর পুরুষের সাথে কথোপকথনে মিষ্ট, বিনম্র ও লালিত্যময় সুর মিশ্রিত না করতে। ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছে। সে সাথে নিষিদ্ধ করেছে তার ব্যবসা, তা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করাও। তাতে মদের সাথে একটা নৈকট্য ও ঘনিষ্টতা গড়ে উঠে। তাই তার উৎপাদনকারী, ক্রয়-বিক্রয়কারী ও তার বহণকারী, আমদানীকারীর উপরও লানত বর্ষিত হয়েছে। কেননা, এসব কাজের মাধ্যমে মদপানের মত একটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হারাম কাজের সাথে সহযোগিতাই করা হয়।

(৫) আল্লাহ যখন কোন কাজ বা জিনিস হারাম করে দেন তখন তদস্থলে একটা হালাল কাজের পন্থা বৈধ করে দেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ হারাম কাজটি পরিহার করে হালাল কাজটি দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ করবে। যেমন ইসলামে যিনা হারাম করে দেয়া হয়েছে; কিন্তু বিয়ে বৈধ করে দেয়া হয়েছে। ইসলামে চুরি হারাম ঘোষিত হয়েছে। অভাব অনটন ও দারিদ্র চুরির কাজে প্রলুব্ধ করে। তাই ইসলামী সমাজে যাকাত ফরয করে দেয়া হয়েছে। সে সাথে ধনীদের ধন-সম্পদে গরীব মিসকীনদের ন্যায্য প্রাপ্যতা ও অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[১৩১]

মহান আল্লাহ যে সকল ইবাদাত ফরয করেছেন, মানুষের মন পবিত্রকরণ, আত্মা বিশুদ্ধকরণ এবং তাদের পাপ ও নাফরমানীর কাজের জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করায় তা ব্যাপক প্রভাবশালী। নামায মুমিনকে সকল প্রকার নির্লজ্জতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে। যদি তা গভীর মনোযোগ, ভয়-শংকা মিশ্রিত আনুগত্য ও সজাগ মনে রীতিমত আদায় করা হয়। আর নামাজ ত্যাগ করা হলে তার পরিণতি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। রোযা ও রোযাদারকে সকল প্রকার লালসা ও ঝগড়া-ফ্যাসাদ থেকে সুষ্ঠরূপে রক্ষা করে।

(৬) ইসলাম অবলম্বিত সংশোধন ও পবিত্রকরণ প্রক্রিয়ার পূর্ণ প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সত্ত্বেও মানুষ যদি সংশোধিত না হয়, কুরআনের মত উপদেশ নসীহতের অনুপম কিতাবের শিক্ষাও যদি এ পর্যায়ে সুফল দিতে ব্যর্থ হয়ে যায়, কারও আকীদা বিশ্বাস যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, মনে আল্লাহ্‌র ভয় না থাকে

১৩১। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, C৶, ³, পৃ. ৪২

এবং সে কারণে নির্লজ্জতা ও পাপের কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘণ করে অপরাধ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও, তাহলে তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। এরূপ অবস্থায় অপরাধির শাস্তি একান্তভাবেই অপরিহার্য।[১৩২]

Bmjvgx mgv‡R bvixi m¤§vb I ¯^vaxbZv

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক-আবরণ। ইসলাম কখনোই নারীকে পুরুষের সেবাদাসী হিসেবে মূল্যায়ন করে না। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নারীর প্রতি পুরুষের যেমন অধিকার আছে, তেমনি রয়েছে পুরুষের প্রতি নারীর অধিকার। বর্তমান সমাজে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার পুরুষরা যতটুকু ভোগ করছেন, নারীরা তাদের অধিকার অনেক ক্ষেত্রেই ততটুকু ভোগ করতে পারছেন না নিজেদের অজ্ঞতার কারণে। কিন্তু যেখানে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে, নারীরা সেখানেই তা সংরক্ষণের জন্য বুদ্ধিমত্তার সাথে চেষ্টা চালিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইসলামী আইন তাদের চেষ্টা-সাধনাকে সফল করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহায়তা করেছে।

fiY-‡cvlY cÖvßi AwaKvi

বিবাহিতা নারীর মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে এটা অন্যতম। ভরণ-পোষণ বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।[১৩৩] তবে ভরণ-পোষণের মান নির্ধারণ পিতা বা স্বামীর সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নীতি হল:

"স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী কম স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী"।[১৩৪] বিয়ের পূর্বে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করবেন মেয়ের পিতা। "যথাযথভাবে মেয়ের খাদ্য ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা পিতার জন্য অপরিহার্য"।[১৩৫] বিয়ের পর নারী তার এ অধিকার আদায় করবে স্বামীর কাছ থেকে। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) বলেছেন,"যথাযথভাবে তাদের পানাহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের উপর অপরিহার্য"।[১৩৬]

১৩২। cÖv¸³, পৃ. ১৪৩
১৩৩। সাইয়িদ সাবিক, wdKûm mybvn, (২য় খ.), আল ফতেহুলিল ইলমিল আরাবী, কায়রো : ১৯৯০, পৃ.২৭৮
১৩৪। আল কুরআন, ২:২৩৬
১৩৫। আল কুরআন, ২:২৩৩
১৩৬। ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, mnxn gmwjg, কিতাবুল হজ্জ, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী :১৪০৯ হি. বাবু হিজ্জাতিন নাবীইয়ি(সা.)।

Dhaka University Institutional Repository

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বে স্বামী যদি এ দায়িত্ব পালন না করে, আইন তাকে এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে। এমন কি স্বামী ভরণ-পোষণে ব্যর্থ হবাার ফলে স্ত্রী যদি বিয়ে বিচ্ছেদের দাবি করে, তাহলে ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত অনুযায়ী বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.) স্বামীকে এক, দুই, তিন মাস বা একটা উপর্যুক্ত সময় পর্যন্ত অবকাশ অনুমোদন করেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর ফতোয়া এ যে, অবিলম্বে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে নিতে হবে। খোরপোষ না দেয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিয়ে বিচ্ছেদের ব্যাপারে হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকেও বর্ণনা পাওয়া যায়। তাবিঈগণের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.)-এর ফতোয়াও এটাই। হযরত ‘উমর বিন আবদুল আযীয (র.) ও বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার পর এ ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করেছেন।

‡gvnivbv cvwßi AwaKvi

মোহরানা স্ত্রীদের পাওনা বা অধিকার। নিম্লোক্ত আয়াতসমূহ এর প্রমাণ: “তোমাদের স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানা দিয়ে দাও”।[১৩৭] “অনন্তর তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা ভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত হক দিয়ে দাও”।[১৩৮] “ন্যায়সংগতভাবে তাদেরকে মোহরানা দিয়ে দাও”।[১৩৯] বিয়ের সময় নারী পুরুষের মধ্যে মোহরানা সংক্রান্ত যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তা পূরণ করা পুরুষের জন্য অপরিহার্য। নারী যদি পুরুষকে এটা আদায় করার জন্য সময় প্রদান করে বা সন্তুষ্ট মনে মাফ করে দেয় বা দাবি প্রত্যাহার করে বা চুক্তির পর পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে এর পরিমাণে কম-বেশি করে, তাহলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন : “তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশের দাবি প্রত্যাহার করে, তবে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর”।[১৪০] “তোমাদের কোন গুনাহ হবে না যদি (মোহরানা) নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর কোন বিষয়ে সম্মত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়”।[১৪১]

১৩৭। আল কুরআন, ৪:৪
১৩৮। আল কুরআন, ৪:২৪
১৩৯। আল কুরআন, ৪:২৫
১৪০। আল কুরআন, ৪:৪
১৪১। আল কুরআন, ৪:২৪

Dhaka University Institutional Repository

wk¶vi AwaKvi

জন্মের পর শিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষ তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষিত নাগরিক ছাড়া একটি সভ্য ও উন্নত জাতি আশা করা যায় না। এ শিক্ষার সূচনা হয় মায়ের কোলে। অতএব এ মায়ের জাতি তথা নারী জাতিকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,"প্রত্যেক মুসলমানদের উপর জ্ঞান অর্জন ফরজ (পুরুষ হোক বা নারী)" ।[১৪২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তির অধীনে কোন দাসী থাকে, সে যদি তাকে উত্তমরূপে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয় এবং বিয়ে করে, তবে সে ব্যক্তি দু'টি প্রতিদান পাবে" ।[১৪৩] এ হাদীসে দাসীদেরকে উত্তমরূপে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শেখানোর জন্য মুসলিম মনিবদের যখন তাগিদ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে তাদের নিজ কন্যাদের ব্যাপারে এটা যে অধিকতর প্রয়োজ্য, তা বলাই বাহুল্য।

রাসূল (সা.)-এর অন্য এক হাদীস ইবনে জুরাইয হযরত আতা থেকে, তিনি হযরত যাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে এভাবে বর্ণনা করেন,"কোন এক ঈদুল ফিতরের দিনে রাসূল (সা.) সালাত আদায় শেষে খুতবা দিলেন। খুতবা শেষে তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। তখন তিনি হযরত বিলাল (রা.)- এর হাতের উপর ভর দিয়েছিলেন আর বিলাল (রা.) তার কাপড় মেলে ধরছিলেন যাতে মহিলারা দান করছিলেন" ।[১৪৪]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.) মনে করলেন, তাঁর কথা মেয়েরা শুনতে পায়নি। তাই তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন এবং সাদকা করতে বললেন। ইবনে জুরাইয হযরত আতা (রা.)- কে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি মনে করেন যে, মেয়েদেরকে উপদেশ দেয়া ইমামের কর্তব্য? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই এটা ইমামের কর্তব্য। কিন্তু তারা এটা করছে না কেন?"[১৪৫]

১৪২। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল খতীব তিরমিযী, mbv‡b wZiwghx, কিতাবুল ইলম, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী : ১৪০৯, পৃ.৭৬

১৪৩। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী, mnxû j eLvix , কিতাবুন নিকাহ্, বাব ইতিখাজুস সারারী ওয়ামান আতাকা জারিয়াতাহু ছুম্মা তাযাওয়াজা।

১৪৪। সহীহ বুখারী : কিতাবুল ইলম, বাবু ইয়াতুল ইয়ামিন নিসাওয়া তালিমুহুন্না।
সহী মুসলিম: কিতাবু সালাতিল ঈদাইন।

১৪৫ । সহীহ বুখারী: কিতাবুল ঈদাইন,বাবু মাওসিজাতিল ইমামিন নিসায়া ইয়াওমাল ইমাম মুসলিম , Avm mvnxn, দারু ইহইয়া আত তুরাসিল আরাবী , বৈরুত : ১৩৭৮ হি, wKZve mvjwZj C'vBb দ্রষ্টব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.) যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁর কথা মেয়েরা শুনতে পাননি, কারণ সমাবেশ ছিল বড়, উপরন্তু মহিলাদের সারি ছিল পুরুষদের সারির পেছনে, তখন তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে আলাদাভাবে উপদেশ দিলেন। এটা ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের বৈধ অধিকার।

wPwKrmvi AwaKvi

চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ অধিকার যেমন আছে পুরুষের, তেমনি আছে নারীরও। নবী করীম (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে বদরের যুদ্ধের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন শুধু তার রুগ্ন স্ত্রীর সেবা-শুশ্রুষার জন্য।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে হযরত উসমান (রা.)- এর অনুপস্থিতির কারণ হলো তার স্ত্রী মহানবীর কন্যা রোগাক্রান্ত ছিলেন। তাই রাসূল (সা.) তাকে বললেন, "বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অথবা শহীদ ব্যক্তির যে প্রতিদান তোমারও সে প্রতিদান"।[১৪৬]

Rxebm½x evQvB‡qi AwaKvi

দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন অধ্যায়ে উপনীত হয়। যদি সঙ্গী নির্বাচনে ভুল হয়ে যায় বা একের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, তা হলে গোটা জীবনটাই বিড়ম্বনাময় হয়ে যায়। সে সংসারে জ্বলে ওঠে অশান্তির দাবানল। আমাদের সমাজে পুরুষের স্ত্রী নির্বাচনে স্বাধীনতা তো পূর্ণরূপেই মেনে নেয়া হয়। একজন পুরুষ কাঙ্খিত মানের স্ত্রী লাভের জন্য হাজারো কনে দেখতে পারেন, কিন্তু নারীদেরকে আমাদের সমাজও এ জাতীয় অধিকার তেমন দেয় না। সে-ও যে রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, তারও রুচি আছে; আছে ভাল বা মন্দ লাগার অনুভূতি, এসব আমরা বেমালুম ভুলে যাই। বর পছন্দ করা যেন নারীর অধিকারেই আসে না; বরং এ সমাজে এ দায়িত্ব নিছক অভিভাবকরাই আনজাম দিয়ে থাকেন। এ জাতীয় একপেশেও অধিকার হরণকারী নীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, নারীর বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই তার অনুমতি নিতে হবে। ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ফিকহুস সুন্নাহ'-এ প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়িদ সাবিক উল্লেখ করেছেন: "বিয়ের পূর্বে নারীর সম্মতি গ্রহণের মাধ্যমে (বিয়ের কার্য) শুরু করা অভিভাবকের জন্য ওয়জিব। অভিভাবকদের পূর্বে তার সম্মতি জেনে নিবেন, যেহেতু বিয়ে হলো পুরুষ এবং নারীর মধ্যকার স্থায়ী

১৪৬। সহীহ বুখারী: কিতাবু ফাযায়িলি আসহাবিন নবীইয়ী (সা.), বাবু মানাকিবা উসমান ইবনে আফফান (রা.)।

Dhaka University Institutional Repository

ও যৌথ ব্যবস্থাপনা এবং নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে প্রেম-ভালোবাসা স্থায়িত্ব লাভ করে না। এ কারণে শরীয়ত মেয়েকে (কুমারী হোক বা সায়্যিবা) জোরপূর্বক বিয়ে দেয়া এবং যেখানে তার আগ্রহ নেই এমন স্থানে পাত্রস্থ করাকে নিষেধ করেছে এবং তার সম্মতির পূর্বে বিয়েকে অশুদ্ধ আখ্যায়িত করেছে"।[১৪৭]

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাহমুদ মাহদী ইস্তাম্বুলী লিখেছেন,"ইসলাম নারীকে তার স্বামী নির্বাচনের অধিকার প্রদান করেছে যেন বিয়ে ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়"।[১৪৮] নবী করীম (সা.) বলেন, "বিধবা নারীর নির্দেশ ও কুমারী মেয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে দেয়া যাবে না।"[১৪৯]

ইসলাম বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতির প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, মহানবী (সা.) নারীর অসম্মতিতে সম্পাদিত বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন। নিম্নোক্ত হাদীস প্রমাণ : কাসেম থেকে বর্ণিত, জা'ফর তনয়ের এক কন্যা আশংকা করলেন, তার অসম্মতি সত্বেও অভিভাবক তাকে বিয়ে দেবেন। তখন তিনি এ ব্যাপারে ফায়সালার জন্য জারিয়ার ছেলে আবদুর রহমান ও মুজাম্মা নামক দুই বয়োবৃদ্ধ আনসারীর খিদমতে লোক পাঠালেন। তারা বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। খানসা বিনতে খিদামের ব্যাপারে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। তার পিতা তাকে অসম্মতি সত্ত্বেও বিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) সে বিয়ে বাতিল করে দিয়েছিলেন।

মাহমুদী মাহদী ইস্তাম্বুলী এ সম্পর্কে বলেন, "বিয়ের পূর্বে যুবতীর অনুমতি অপরিহার্য হওয়া সম্পর্কিত রাসূল (সা.)- এর নির্দেশের ব্যাপারে পিতাগণ কতই না উদাসীন। অথচ এর ফলাফল খুবই খারাপ ও পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ ব্যাপারে অনেক উদাহরণ রয়েছে যা কারও কাছেই গোপন নয়"।[১৫০]

অন্য একটি মেয়েকে তার পিতা আপন ধনাঢ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কনে বরকে একেবারেই পছন্দ করেনি। মেয়েটি রাসূল (সা.)-এর খিদমতে এ বিষয়ে অভিযোগ তুললে তিনি বললেন, এ বিয়ে রক্ষা করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছাধীন। মেয়েটি বললো, বাবার দেয়া বিয়ে

১৪৭। সাইয়িদ সাবিক, wdKûm mbvn , (২য় খ.), 'viæj dvZwn wjj Bjwgj Avievx, কায়রো : ১৯৯০, পৃ . ২৪৩

১৪৮। মাহমুদ মাহদী ইস্তাম্বুলী, ZndvZj Diæm , মাকতাবাতুল ইসলামী, আম্মান, জর্দান : ১৪১০ হি. পৃ .৬৪

১৪৯। সহীহ বুখারী :কিতাবুন নিকাহ্, বাবু ইয়ানকিহুল আবু ওয়া গহিরাহুল বিকরা ওয়া সায়্যিবাহু ইল্লা বিরিদাহুমা।
সহীহ বুখারী : কিতাবুল হিলাল, বাবু ফিননিকাহ।

১৫০। মাহমুদ মাহদী ইস্তাম্বুলী, cv¸³, পৃ.৬৪

Dhaka University Institutional Repository

আমি খতম করবো না বটে; তবে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, মেয়েদের ইচ্ছা ও পছন্দের বিপরীত তাদের বিয়ে দেয়ার কোন অধিকার পিতাদের নেই।[১৫১]

ইসলাম কোন পুরুষকে নির্বাচন ও তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার অধিকার নারীর জন্য পুরোপুরিভাবে সংরক্ষিত রেখেছে ও স্বীকৃতি দিয়েছে।

we‡q we‡"Q‡'i AwaKvi

বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য মানুষকে পবিত্র জীবনযাপনে সহায়তা করা। পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনকে সুদৃঢ় করা ইত্যাদি। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে যদি বাঁধার সৃষ্টি হয়, স্বামী বা স্ত্রীর কারো দৈহিক অক্ষমতার কারণে বা বিশেষ কোন রোগের কারণে বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে, তাহলে ইসলাম এ জাতীয় পরিস্থিতিতে নারীকে 'খোলা'র (বিয়ে বিচ্ছেদের) অধিকার দিয়েছে, যেমনি দিয়েছে পুরুষকে তালাকের অধিকার। যে বিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি, প্রেম-ভালোবাসা ও আত্মিক তৃপ্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পরস্পরের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়, ইসলাম এ জাতীয় বিয়েকে জোরপূর্বক টিকিয়ে রেখে অশান্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করতে চায় না। বরং এ জাতীয় বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে মানুষকে এ আযাব থেকে মুক্ত করতে চায়।

১৫১। মাওলানা সাইয়িদ জালালউদ্দীন আনসার উমরী, (অনুঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক), Bmjvgx mgv‡R bvix, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৭৯ পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡”Q‘

wekgvbeZvi ghv‘v, Kj¨vY I m¤úxwZ cwZôvq Bmjv‡gi Av‘k

gvbeZv I mv¤ú‘wqKZv- Bmjv‡gi Av‘k

সকল সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ পৃথিবীতে তার খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর খিলাফত পরিচালনা তথা পার্থিব ও পারলৌকিক শান্তি ও সমৃদ্ধির দিক নির্দেশনা সম্বলিত পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বা ইসলামী দর্শনের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অবতীর্ন করেছেন তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মাধ্যমে। এর জ্ঞান দান করার কারণে তাঁর সকল সৃষ্টির উপর মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ জ্ঞান দ্বারা মানুষ ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা দেখতে পারে বুঝতে পারে। আর জ্ঞান দান করেছেন বলেই তাদের মধ্যে দু'টি বিপরীতধর্মী শক্তি, মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্যে যে, কে মনুষ্যত্বের পথে জীবন পরিচালনা করে, শান্তির পথে চলে, আর কে পশুত্বের পথে গিয়ে অশান্তি বা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।[১৫২] এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তিনি আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্যে জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যেন পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কারা সঠিক সুন্দর পথে জীবন যাপন করে"।[১৫৩] তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে সকল মানুষকেই ভালোবাসেন। পবিত্র কুরআনে তিনি ঘোষণা করেছেন, "হে মানবমণ্ডলী। তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একই ব্যাক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের বহু নর ও নারী বিস্তৃত করেছেন"।[১৫৪] ইসলামের মূল উৎস আল কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমেই ইসলামী দর্শনে বিশ্বমানবতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মূলোৎপাটন করা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার। আল্লাহতা'আলার সৃষ্ঠি জগতে মানব জাতি একটি জাতি। মানব জাতির মধ্যে বিরাজ করবে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা। সাম্প্রদায়িকতা নয় বরং সম্প্রীতি। ঘৃনা, নিন্দা, হিংসা, প্রতিহিংসা বা পশুত্ব নয় বরং মানবতা, মানব প্রেম তথা সৃষ্টি প্রেমের মাধ্যমেই লাভ করা যায় মানব জীবনের কাঙ্খিত লক্ষ্য

---

১৫২ । মাহমুদ মাহদী ইস্তাম্বুলী, C¨¸ ³, পৃ . ৬৪
১৫৩। আল কুরআন, ৬৭ : ২
১৫৪। আল কুরআন, ৪ : ১

Dhaka University Institutional Repository

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রেম। আর এটাই শিক্ষা দিয়েছেন মহানবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবুওয়াতের ২৩ বছর তথা পার্থিব জগতের ৬৩ বছরের জীবনে।

সৃষ্টি জগতের সকল মানুষ আল্লাহ্র পোষ্য বা পরিবারের সদস্যের ন্যায়, তাই সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় যে তার পোষ্য বা পরিবারের সদস্যর নিকট অধিক প্রিয়। সুতরাং মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। হ্যাঁ, যে মানুষ মানবতাবোধের অধিক মর্যাদা দিয়ে মানব তথা সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার নির্দেশ অধিক পালন করবে সে আল্লাহ্র নিকটি অধিক মর্যাদার অধিকারী হবে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক মন্দ কাজ পরিহার করে"।[১৫৫]

ইসলামী দর্শনানুযায়ী মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। ইসলামের পাঁচটি মূলস্তম্ভের অন্যতম সালাত বা নামাযেই সে মানবতাবোধ, একতা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্বের শিক্ষা দেয়া হয়। তাওহীদের মর্মবাণী-লাশারীক এক আল্লাহ তা'আলার সামনে নামাযে যেমন বাদশা, আমীর, গরীব, আশরাফ, আতরাফ ও ধনী দরিদ্র্যের ভেদাভেদ থাকে না, একই সাথে দাঁড়িয়ে নামাযে সাম্য মৈত্রীর যে অনুশীলন করা হয় তা মানব সমাজে বাস্তবায়িত করার অনুশীলনই বটে। আল্লামা ইকবাল এ চিত্রটিকে বেশ চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন যার মূল অর্থ হলো মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্যে নামাযে দাঁড়ালে বাদশা, নফর, ধনী গরীবের কোন পার্থক্য থাকে না, মহান স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষ হিসেবে সবাই সমান হয়ে যায়। এ সাম্য-মৈত্রী যদি সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা যেতো তাহলে অশান্ত বিশ্ব শান্তির নীড়ে পরিণত হতো।[১৫৬]

বস্তুত মানুষের জন্যেই মানুষকে বানানো হয়েছে। মানুষের সেবা বা মানবতার কল্যাণের জন্যেই মানুষের সৃষ্টি। এ মানবিক মূল্যবোধহীনতা এবং মানবিক অধিকার থেকে যে সমাজে মানুষ বঞ্চিত হয় সে সমাজেই দেখা দেয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা, অন্যায় ও অবিচার। বুদ্ধি জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অমানষিক আচরণে মানুষ কেন জীব–জন্তু পর্যন্ত লজ্জাবোধ করে। একটি মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে অথবা কোথাও কারো সাথে যদি এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাত ঘটে যার মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান কোন জাতিরই কোন চিহ্ন নেই, তাহলে তার কাছে ঐ ব্যক্তির পরিচয় কি হয়? মানুষ হয় কি?

১৫৫। আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

১৫৬। Dr. Raisuddin, *Sayings of the Holy prophet (s.) in our day to day life*, Dhaka University, *Dhaka* : 1977, P. 2

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে এ মানবতার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, স্থান, কাল ও ভাষা নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালোবাসতে জানে না বা মানুষকে ভালোবাসে না, তার সাথে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের ভালোবাসা কোন মতেই সম্ভবই নয়। আল্লাহ্‌র কাছে মানুষ একজাত, মানবজাত, তাই মানব জাতি বলা হয়।[১৫৭]

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভে একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক বৃদ্ধা মহিলাকে বড় বোঝা বহণ করে নিয়ে যেতে দেখে মহানবী (সা.) তার সাহায্যার্থে তার বোঝাটি নিজের কাঁধে নিয়ে পথ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলেন, "মা তুমি এতো বড় বোঝা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ? বৃদ্ধা জানালেন যে, তার এলাকায় মুহাম্মদ নামে এক ব্যাক্তি বেরিয়েছেন, তাই সে পিতৃ ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা এ এলাকা ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছেন। মহানবী (সা.) আর কিছু না বলে বৃদ্ধাকে তার গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় চাইলে বৃদ্ধা মহানবী (সা.)-এর মানবতা ও মহানুভবতায় বিমুগ্ধ হয়ে তার নাম ও পরিচয় জানতে চায় মহানবী (সা.) মিথ্যা বলতে জানতেন না এবং কখনও মিথ্যা বলেননি। তিনি বললেন,'আমার নাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ' অর্থাৎ আমার নাম আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। বৃদ্ধা মহানবী (সা.)-এর মমতা ও মানবতা প্রেমে মুগ্ধ হন এবং বুঝতে পারেন এমন চরিত্র সত্য নবী ছাড়া কারো হতে পারে না। তিনি মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাৎধন্য হয়ে মহা সত্য ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.)-এর আরো একটি ছোট্ট ঘটনা যা প্রায় সবার জানা যে, এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর পথে কাঁটা দিত, একদিন কাঁটা না দেখে এবং মহিলার অসুস্থতার কথা জানতে পেরে মহানবী (সা.) তার সেবা ও চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা নিজে করেন এবং মানুষ হিসেবে শত্রু-মিত্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবতাবোধ ও মানব প্রেমের এক শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় আদর্শ স্থাপন করলেন।

ইসলামী দর্শনই হলো মানবতার জন্যে, মানুষের জন্যে। ধর্ম তথা ইসলাম মানুষের কল্যাণের জন্যে দেয়া হয়েছে। মানুষকে ধর্ম বা ইসলামের জন্যে বানানো হয়নি। মানুষের জন্যেই ধর্ম বা ইসলাম। যে সব বিধান মানুষের কল্যাণ সাধন করে না তা অন্য কিছু হতে পারে ধর্ম বা ইসলাম নয়। মানুষের মধ্যে হিংস্রতা, শত্রুতা, ঘৃনা, নিন্দা ও পাশবিকতা বিরাজ করবে কেন? মানুষের মধ্যে তো থাকা উচিত ভ্রাতৃত্ব, বন্ধত্ব, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও মানবতার মনোভাব। এক কথায় মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে এটাই তো মানবতা, বা মনুষ্যত্বের পরিচয়।

১৫৭। ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন, mবদev' I cmাওK welq, A‡šlv cKvkbx, ঢাকা : ২০০৯, পৃ . ৫২

Dhaka University Institutional Repository

তাই ইসলামের মানবতার শিক্ষা হলো সংঘাত নয় সমঝোতা, সাম্প্রদায়িকতা নয় সহমর্মিতা, যুদ্ধ নয় শান্তি, পরনিন্দা নয় আত্মসমালোচনা, কুৎসা নয় আত্মশুদ্ধি,অহংকার নয় বিনম্রতা, শত্রুতা নয় বন্ধুত্ব, পরশ্রীকাতরতা নয় ভ্রাতৃত্ব, জবরদস্তি নয় ন্যায়পরায়ণতা, অমঙ্গল কামনা নয় সমবেদনা, ক্ষতি সাধন নয় কল্যাণ কামনা এবং হিংস্রতা ও পশুত্ব নয় সদাচরণ ও মানবতা।[১৫৮]

সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন সৃষ্ঠির মধ্যে মানুষ বা মানব জাতি শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে যা অন্য সৃষ্টির মধ্যে নেই। ফলে জ্ঞান ও বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ অপর সৃষ্টিগুলোকে নিজের প্রয়োজনে ও স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। যেমন মানুষ গরু, ছাগল ও মুরগীর গোশত খায় কিন্তু গরু, ছাগল বা মুরগী মানুষের গোশত খায় না, খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এখানে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বাণী পবিত্র কুরআনের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায়। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে , “তিনিই (মহান স্রষ্টা আল্লাহ্) তোমাদের (মানুষের) কল্যাণের জন্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন” ।[১৫৯] এতে বুঝা গেল, সৃষ্টি জগতের সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্যে মানুষের কল্যাণের জন্যে, মানুষের সুখ ও শান্তির জন্যে। আর মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে,“আমি জিন এবং মানব জাতিকে সৃষ্টির করেছি শুধু আমার ইবাদতের (দাসত্ব, সেবার বা আমাকে জানার) জন্যে” ।[১৬০] “তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে (মুমিনদেরকে) সাহায্য করেছেন এবং পবিত্র খাদ্য দান করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর” ।[১৬১] তাহলে বুঝা গেল, মহান স্রষ্টা মানুষের জন্যে অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ এবং শান্তির জন্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য হলো শান্তি তা সামাজিক শান্তি হোক কি মানষিক বা মনের শান্তি। অবশ্য শান্তি লাভ করতে হলে এবং শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে তার পূর্বশর্ত হলো সংযম। সংযমের মাধ্যমে সম্প্রীতি ও মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়। আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যে কখনও শক্তির প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু শক্তি দ্বারা কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না। হিটলার নাকি যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তার সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, তোমরা কি শান্তি চাও? উত্তরে সবাই বলল, হ্যাঁ আমরা শান্তি চাই। হিটলার বললো, তাহলে চলো যুদ্ধ করি। এ যুদ্ধ বা শক্তি দিয়ে হিটলার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বরং বাঁধিয়ে দিয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ যাতে বিনষ্ট হয়েছে অসংখ্য মানুষের জীবন এবং ধ্বংস

১৫৮। ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন, C৷¸ ³, পৃ. ৫৩
১৫৯। আল কুরআন, ২ : ২৯
১৬০। আল কুরআন, ৫১ : ৫৬
১৬১। আল কুরআন, ৮ : ২৬

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে অসংখ্য জনপদ। আর এ জন্যেই দেখা যায়, মানুষ সভ্যতার বিকাশ ও বিজ্ঞানের কল্যাণে পানিতে দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটতে বা চলতে শিখেছে, বাতাসে উড়তে শিখেছে এমনকি চাঁদের দেশেও গিয়ে পৌঁছেছে কিন্তু এ মানুষ তার নিজের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আজও অক্ষম ও অপারগ রয়ে গেছে। নমরুদ, কারুন, ফেরাউন, আবু জাহাল ও হিটলারের ন্যায় অহংকার ও দাপটের কারণে মানব সমাজে অশান্তি ও ধ্বংস নেমে এসেছে।[১৬২]

অপরদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) ও বিশ্ব মানব সমাজে শান্তির প্রতীকরূপে আবির্ভূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সংযম সম্প্রীতি ও মমত্ববোধের মাধ্যমে বিশ্ব মানব সমাজে সকল মানুষের জন্যে সামাজিক শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এটি বস্তুত পাশবিক ও মানবিক শক্তিরই দ্বন্দ্ব। পাশবিক শক্তি বিভিন্ন উপায়ে মানুষের মধ্যে কলহ-বিবাদ, অহংকারের মাধ্যমে অশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, আর অপরদিকে নবী রাসূলগণ পশুত্ব দূর করে প্রেম-ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত নবী, রাসূল ও আউলিয়ায়ে কিরামগণ শত অত্যাচার, নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করেও তাঁদের জাগতিক জীবন উৎসর্গ করেছেন মানুষের মধ্যে সংযম, সম্প্রীতি ও মমত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁদেরই অনুসারী বলে দাবি করে আমরা কেন পারি না জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, রং ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসতে? ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবনের ক্ষণিকের জেদ, অহংকারে ক্ষমতা, শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে অন্ধ হয়ে আমরা মানুষ বলে দাবি করে মানুষের উপর অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও নির্যাতন করি কি করে? শক্তির মহড়া দেখাতে গিয়ে আমরা মানুষ হয়ে অপর মানুষের উপর যখন নির্বিচারে অত্যাচার বা অন্যের অধিকার হরণ করি তখন আমাদের হৃদয় কি একটুও কাঁপে না, আমাদের মন কি একটুও কাঁদে না ? অথচ মানুষের প্রতি সদয়-সহানুভূতি ও সাহায্য করার জন্যেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষ বানিয়েছেন।[১৬৩] মানুষের কষ্ট ও ব্যাথা-বেদনা নিরসনের জন্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে (এরই মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে) না হয় মহান আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যে তো ফেরেশতাগণই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে? বিশ্বের প্রতি তাকালে যে দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা বড়ই করুণ বড়ই হৃদয় বিদারক। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সমগ্র বিশ্বে কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, বিগ্রহ চলছে। রং এর বৈপরীত্য, ধর্মের

১৬২। ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন, C\/¸ 3, পৃ. ৬৯
১৬৩। C\/¸ 3, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

বৈপরীত্য, ভাষায় ও মানষিকতার বৈপরীত্যের কারণে মানুষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করছে। একে অপরের সম্পদ ও সম্ভ্রম লুটে নিচ্ছে অথচ মানব হৃদয়ে একটুও কম্পন বা কষ্ট অনুভব হচ্ছেনা বসনিয়া, চেচনিয়া ও কাশ্মীরসহ বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যে পৈচাশিকতার হোলি খেলা চলছে তা দেখে যার হৃদয়ে সামান্যতম মানবিক মমত্ববোধ অছে তার হৃদয়ের কম্পন ও অশ্রু নির্গত না হয়ে পারে না।

এমন হলো কেন? মানুষের প্রতি মানুষ এমন নির্দয় নিষ্ঠুর আচরণ করছে কেন? আসলে এসব অমানষিক ও অমানবিক চরিত্রের জন্যে কলংকজনক ঘটনা সংঘটিত হয় এবং হচ্ছে বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করার কারণে। অত্যাচারী, নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যদি একটু ভেবে দেখে যে আজ থেকে শত বছর পূর্বে তার বা তাদের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে ছিল না, আবার এখন থেকে শত বছর পরও তার বা তাদের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে থাকবে না, এ বাস্তব সত্যতে উপলব্ধি করলে মানব মন থেকে তো অন্যায়, অবিচার ও পাপ পংকিলতার ভাব দূর হওয়া উচিত।

পশুত্বের পরিবর্তে কে কার কত অধিক উপকার ও কল্যাণ সাধন করে, কে কার প্রতি কত অধিক ত্যাগ, সংযম ও মমত্ব দেখিয়ে মহত্ব ও মানবিক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে এটাইতো প্রতিযোগিতার বিষয় হওয়া উচিত ছিল। যে বিষয়ে মহান স্রষ্টা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,"সৎ (মানুষ তথা সৃষ্টির জন্যে কল্যাণকর) কাজে তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা (প্রতিযোগিতা) কর। আর মন্দ (পাপ)ও শত্রুতার কাজে পরস্পরের সহযোগিতা (বা প্রতিযোগিতা) করো না ".[১৬৪] বর্তমান বিশ্বের মানব সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রায় সর্বত্রই এর বিপরীত দিক পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছি বলে যখন দাবি করা হচ্ছে, সে সময়ে মানুষের প্রতি মানুষের সংযম ও মমত্বহীন আচরণ দেখে মনে হয় যেন জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্তমান বিশ্বের মানব সমাজ বিশেষ করে জাগতিক শক্তিতে শক্তিধর গোষ্ঠি ও জাতিকে সংযমের পরিবর্তে যুদ্ধংদেহী মনোভাব এবং মহত্ব ও মমত্বের পরিবর্তে হিংস্রতা ও পশুত্ব শিখাচ্ছে। মানুষ তথা সৃষ্ঠির কল্যাণকর বিষয়াদিতে শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে অহিতকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়াদিতেই শ্রম ও অর্থ ব্যয় হচ্ছে সর্বাধিক। যা কোনমতেই মানুষের প্রতি মানুষের সংযম, সহণশীলতা ও মমত্ববোধের পরিচায়ক নয়। অথচ মানবাধিকার সংরক্ষণে বিশ্ব জোড়া কতই না বক্তৃতা, বিবৃতি ও কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ

১৬৪। আল কুরআন, ৫:২

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়, যা বাস্তবে কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৬৫] তাই সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠায় বিশ্বাসী সকল মানুষকে অন্যায়, অবিচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে, সংযমের সাথে, মানুষের প্রতি মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

মহান স্রষ্টা, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বর্তমান বিশ্ব মানব সমাজের মনে হিংস্রতা ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের পরিবর্তে সংযম ও ন্যায়পরায়ণতা শত্রুতা, পশুত্ব ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবের পরিবর্তে নম্রতা, ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ দান করার মাধ্যমে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার শক্তি দান করুন। দান করুন সৃষ্টি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টা প্রেম লাভ করার শক্তি।

১৬৫। ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন, C৷¸ ³, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

gvbem f¨Zv I m¤úúxwZ cÖwZôvq Bmjv‡gi Av‘k

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে এ পৃথিবীতে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং তাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়ার কারণে তাদেরকে সম্মানও সভ্যতা দান করার উদ্দেশ্যে প্রথম মানব ও মানবী থেকে আরম্ভ করে যুগে যুগে বিভিন্ন নিয়ম কানুন ও বিধান দান করেছেন। এসব বিধান মেনে চলার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও শান্তি নিহিত রয়েছে বলেই একে ইসলাম বা শান্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্রষ্টার দেয়া বিধান মেনে চলা সমাজই হলো সভ্য ও সম্মানিত সমাজ। এসব বিধান মেনে চলে মানবতাবোধ সম্পন্ন সভ্য মানুষ হবার শিক্ষা দেয়ার জন্যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে এক লাখ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দু' লাখ চব্বিশ হাজার অর্থাৎ অনেক অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছে। এসব নবী ও রাসূলগণের শিক্ষার মৌলিক বিষয় ছিল এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর দেয়া বিধানানুযায়ী পার্থিব জীবন যাপন করার সাথে সভ্য মানুষ হিসেবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ মমতার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করা। এসব বিধানের মাধ্যমেই শুধু মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। আল্লাহর দেয়া বিধান বিচ্যুত মানব গোষ্ঠিই হলো উচ্ছৃঙ্খল সভ্যতা বিবর্জিত মানব সম্প্রদায়। এমনি সমাজে নিরাপত্তা থাকে না মানুষের, ধস নামে মানব সভ্যতায়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইয়াহুদী, সকল ধর্মই মানবিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও মানুষের জীবন সম্পদ এবং সম্ভ্রমের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে, শিক্ষা দেয় মানুষকে মানব প্রেম তথা সৃষ্টি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টা প্রেম। কিন্তু বাস্তবে বিশ্ব মানচিত্রের প্রতি তাকালে কি দেখা যায়? বিশ্ব জুড়ে আজ মানব সভ্যতা ধ্বংসের এক নারকীয় দৃশ্য। শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য বিস্তারের ছোবলে, মানব সভ্যতা আহত ও মৃতপ্রায়। বিশ্ব মানব সমাজ স্রষ্টার বিধান অনুসরণ করা তো দূরের কথা জন্মগত মানবিক গুণাবলী (Inborn human qualities) বিবর্জিত হয়ে মানবিক অধিকার তথা মানব সভ্যতার প্রতি আঘাত করে চলেছে একের পর এক । মানুষের ভোগের জন্যেই স্রষ্টা এ সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ফলে-ফুলে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর করে দিয়েছেন মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে। শুধু নির্দেশ দিয়েছেন এসবের সঠিক ব্যবহার করার জন্যে। হুশিয়ার করেছেন যেন এ সবের অপব্যবহার না হয়। অথচ অপব্যবহার হচ্ছে প্রায় সর্বত্র।[১৬৬] যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আমি তোমাদের জন্যে লৌহ দান

১৬৬। ড. আ.ন.ম .রইছউদ্দিন, C\¸ ³, পৃ . ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

করেছি এতে মানুষের জন্যে বিবিধ উপকারের যেমন সুযোগ রয়েছে তেমনি ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহারের ভয়ও রয়েছে"।[১৬৭] অথচ মানুষ লৌহ উপকরণে নির্মিত অস্ত্র সম্ভার দ্বারা মানব সভ্যতা বিধ্বংসী কাজে লিপ্ত হয়ে সভ্যতার ধারক বাহক বলে দাবি করছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "আমি বর্ষণশীল মেঘমালা হতে মুসলধারায় পানি বর্ষণ করি যা দ্বারা আমি শস্য ও উদ্ভিদ উদগত করি এবং উদগত করি বৃক্ষরাজী বিজড়িত উদ্যান সমূহ "।[১৬৮] তাই মহান স্রষ্টার দেয়া এ দানে যে ব্যক্তি বা যে জাতির যতটুকু অধিকার রয়েছে সে ব্যক্তি বা সে জাতিকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা পৃথিবীর সকল ধর্ম বা মানবতাবোধের দৃষ্টিতেও গর্হিত অপরাধ ও অন্যায়। আর বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান অন্যায় অবিচারের কারণেই মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা ও মমত্ববোধের অভাব দেখা দিয়েছে দারুণভাবে। বস্তুত জ্ঞান ও বিবেকের আলো মানুষকে সভ্যতার গুণে গুণান্বিত করে। জ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে বিবেকের উন্নতি সাধিত হয়। আর উন্নত জ্ঞান ও বিবেকের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কর্মে যার মাধ্যমে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ ও মমত্ব ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

ইসলাম মানুষকে জ্ঞান বিবেকের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সভ্যতা শিখায় এবং মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি সমৃদ্ধির দিক নির্দেশনা দান করে। ইসলাম মানব জাতিকে সভ্যতা, এক জাতি ও বিবেকবান হওয়ার শিক্ষা দান করে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষ এক জাতি, মানব জাতি। অবশ্য তাদের জীবন ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানব জাতি দু'ভাগে বিভক্ত: (এক) বিশ্বাসী (দুই) অবিশ্বাসী।

তবে ইসলামী জীবন দর্শনে সংকীর্ণতার কোন অবকাশ নেই। এ দর্শনে সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ও জীবন সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে দু'ভাগে সম্বোধন করেছেন : (১) বিশ্বের সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেছেন, "হে মানব মণ্ডলী, তোমরা তোমাদের প্রতি পালক (রব) কে ভয় করো (তাঁর নির্দেশ মেনে চলো) যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন"।[১৬৯] তাই ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসতে শিখায়। মানুষের ক্ষতি নয় বরং মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের শিক্ষা দেয়। পারস্পরিক স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, সৌহার্দ্যবোধ,

---

১৬৭। আল কুরআন, ৫৭ : ২৫
১৬৮। আল কুরআন, ১৬:১০-১১
১৬৯। আল কুরআন, ৪:১

Dhaka University Institutional Repository

সৌজন্যবোধ, শ্রদ্ধাবোধ, সহণশীলতা ও সহমর্মিতা শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে মানুষের ভদ্রতা ও সভ্যতার শিক্ষা দেয়। এ দর্শনের ভিত্তিতে ইসলামে বিশ্বের সকল মানুষকে বিশ্ব মানব পরিবারের সদস্য হিসেবে সমান দৃষ্টিতে দেখার ও সমান আচরণ করার শিক্ষা দেয়। (২) বিশ্বের সকল বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "হে (মুমিন) বিশ্বাসীগণ তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও এবং আল্লাহ্কে ভয় করো (তাঁর নিদের্শ মেনে চলো) যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো"।[১৭০] অপর আয়াতে ঘোষণা করেছেন, "মুমিনগণ (বিশ্বাসীগণ) কে ত্যাগ করে অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না "।[১৭১] কারণ বিশ্বাসীগণই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিধানকে মানব জীবনে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে মানব সমাজে সভ্যতা, ভদ্রতা ও শান্তি, সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এক সময় ছিল যাকে অদিম যুগ প্রাচীন কাল বা প্রস্তর যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়, যখন মানুষ মহান আল্লাহ্র বিধানকে জানত না ও মানত না। ফলে 'জোর যার মুল্লুক তার'-এর প্রভাব বিস্তার লাভ করে আর মানব জাতি অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতনের শিকার হন। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আরব দেশে মানব সভ্যতা, যেমন ভূলুণ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের উদার মানবাধিকার এর প্রচার প্রসার ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুধু আরব ভূমিই নয় বরং সমগ্র বিশ্বকে মানবাধিকার ও মানব সভ্যতায় উদ্ভাসিত করেন। তেমনি হি. প্রথম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ৮ম শতাব্দীর প্রথমদিকে স্পেনে রডারিকের মানবাধিকার লংঘণের কারণে মানব সভ্যতা হুমকির সম্মুখীন হয়। '৯২ হি. ৭১১ খ্রি. মুসলিম বিজয়ের পর স্পেন শিক্ষা ও সভ্যতায় তাৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চশিখরে আরোহণ করে। বস্তুত মুমিন বা সত্যানুসারীগণ মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, যদি তারা প্রকৃত পক্ষেই সত্যাশ্রয়ী হয়।

এবং মানব প্রেম তথা সৃষ্টি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টা প্রেম লাভ করার জন্যে নিষ্ঠাবান হয় শুদ্ধভক্তি, সরল প্রান ও পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হয়। প্রভাব প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্য নয় বরং মানব প্রেমে উদ্ভাসিত হয়ে মানব সমাজকে অবিচার, নির্যাতন, ব্যভিচার ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যত্যাগী হয় তবে তাদের পক্ষেই মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করোনা। যদি তোমরা মুমিন হও

১৭০। আল কুরআন, ৩ : ২০০
১৭১ । আল কুরআন, ৩:২৮

Dhaka University Institutional Repository

তবে, তোমরাই জয়ী হবে”।[১৭২] মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সত্যানুসারী ও সত্যাশ্রয়ী হয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন করার মাধ্যমে মানবতাবোধ তথা সৃষ্টি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টা প্রেমে উদ্ভাসিত হয়ে বিশ্ব মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার শক্তি দান করুন। বিশ্ব মানব সমাজ থেকে নির্যাতন, অত্যাচার, ব্যভিচার ও বঞ্চনা দূর হোক। আমাদের সকলকে ন্যায় ও সত্য উপলদ্ধি করার শক্তি দান করুন। আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবন সুন্দর ও সুখময় হোক।

১৭২। আল কুরআন, ৩:১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

cigZ mwnÂZv I wek kwšÍ cwZôvq Bmjv‡gi Av‘k

বিশ্ব পরিবারের মানব সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মানব হৃদয়ে বিষাদের অনুভব না হয়ে পারে না। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ছয়'শ কোটি মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মতাদর্শ, ভিন্ন আচার-আচরণ ও ভিন্ন সংস্কৃতি রয়েছে। কিন্তু যে বিষয়টি মানব হৃদয়কে যন্ত্রণা কাতর করে তোলে তা হলো মানুষের প্রতি মানুষের এতটুকু স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সমঝোতার মনোভাবতো দূরের কথা মানব সমাজে যেন মনুষ্যত্বের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। একটি কথা আছে Where there is man there is religion 'যেখানে মানুষ অছে সেখানে ধর্ম আছে' অর্থাৎ মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও মানুষের নিরাপত্তা তথা মানব কল্যাণের জন্যে মানুষ কোন না কোন ধর্মের নিয়ম-কানুন ও বিধি মেনে চলে। অথচ বর্তমান সভ্যতার দাবিদার বিশ্ব সমাজের প্রতি তাকালে যে বাস্তব চিত্র পরিলক্ষিত তা হলো ধর্মের বৈপরীত্যের কারণে মানুষ মানুষকে হত্যা করছে। Might is right বা 'জোর যার মুল্লুক তার' এর রাজত্ব চলছে দেশে দেশে, সারা বিশ্বে। মানবতাবোধ, মানব প্রেম তথা মনুষ্যত্ববোধের বাণী নীরবে কাঁদছে এসব অমানষিক দৃশ্য দেখে।

বিশ্ব জুড়ে একদিকে বিশ্বসংহতি দিবস, মানবাধিকার দিবস পালিত হচ্ছে মহা সমারোহে, অপরদিকে সবলরা দুর্বলকে হত্যা করছে হায়েনার মতো। একদিকে মানবতার কথা হচ্ছে অপর দিকে মিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছে মানব বিধ্বংসী অস্ত্র বানিয়ে ও মানুষ তথা জনপদ ধ্বংস করে। বিশ্বে মানব সমাজে মনুষ্যত্বের এ মহামারী থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে আজ মানুষ পাগলের মতো হন্যে হয়ে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব বিবর্জিত বিশ্বসমাজে মানুষ শান্তির অন্বেষায় বিভিন্ন পথ ও মতের অনুস্মরণ করেছে। কিন্তু শান্তির সোনার হরিণের নাগাল পাচ্ছে না কেউ। মনুষ্যত্বের এ আকাল থেকে রক্ষার কোন উপায়ই কি নেই? উপায় অবশ্যই আছে। আর তা হলো আত্মসচেতনতা ও আত্মপরিচয়। আর আত্মসচেতনতা ও আত্মপরিচয়ের জন্য প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধিরই জন্য প্রয়োজন মনুষ্যত্বের অনুভূতির সাথে মানব প্রেম তথা সৃষ্টি প্রেম। বিশ্বের সকল ধর্ম বা মহান স্রষ্টার দেয়া জীবন বিধানের মূল তত্ত্ব বা দর্শনই হলো মনুষ্যত্ব । মানব প্রেম ও সৃষ্টি প্রেম এর মাধ্যমে স্রষ্টাপ্রেম ।[১৭৩]

১৭৩। ড. এ.কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন, mš¦vm cwi‡iv‡a Bmjvg, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৯, পৃ . ৮১

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য বিশ্ব মানব সমাজের একটি শ্রেণি আছে যাদের মধ্যে হিংসা, নিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ও সাম্প্রদায়িকতা নেই- এসব থেকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তাঁরা যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন। তাঁরা হলেন সাধক, সূফী বা সিদ্ধ পুরুষ ও প্রকৃত মানুষ। তাই জাতি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে এবং মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষকে তাঁরা সমানভাবে ভালোবাসেন। এ কারণেই বর্তমান ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অশান্ত এ পৃথিবীতে প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে মনুষ্যত্ববোধ- এর মাধ্যমে আধ্যাত্মবাদের প্রয়োজন সর্বাধিক। কেননা আধ্যাত্মবাদ বা সূফীবাদ-এর মূল শিক্ষাই হলো আত্মশুদ্ধি, বাস্তব সত্যের উপলব্ধি ও জীবন সম্বন্ধে সচেতনতা। অপরদিকে আধ্যাত্মবাদের পূর্বশর্ত হলো মনুষ্যত্ববোধ। মনুষ্যত্ববোধই বর্তমান বিশ্বের সংকট নিরসনের একমাত্র উপায়। আর এ মনুষ্যত্ববোধ সকল মানুষের মধ্যেই বিরাজমান কিন্তু তা সঞ্জীবনী শক্তিহীন। বিষয়টিকে পরিষ্কার বুঝতে হলে আগে জানতে হবে যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে দু'টি বিপরীতধর্মী শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তা হলো, মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব। আর এ দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীর সকল মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। (১) চেহারার মানুষ, (২) মানবিক গুণাবলী সম্বলিত প্রকৃত মানুষ। বর্তমান বিশ্বে প্রথম প্রকারের মানুষের কোনই অভাব নেই। অবশ্য দ্বিতীয় প্রকারের মানুষের বড়ই দুর্ভিক্ষ বলেই মানুষ মানুষকেই হত্যা করছে অহরহ।

অথচ যে মানুষ বা মানব গোষ্ঠির মনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে মানুষের তথা সৃষ্টির জন্য মমত্ববোধ নেই তাকে বা তাদেরকে সবকিছু বলা গেলেও মানুষ বলা যায় না।[১৭৪]

আত্মসচেতনতার অভাব বলা হলো এ জন্য যে , বর্তমান মমত্বহীন মানবগোষ্ঠির প্রতি তাকালে দেখা যায় যে, যান্ত্রিক শক্তির অহমিকায়, আবার কখনও বা ধর্মহীনদের ধর্মীয় উন্মাদনায় তথাকথিত মানুষের উপর অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ব্যভিচার এমনকি হত্যা করছে এ মনে করে যে, সে সব অত্যাচারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যেন পৃথিবীর বিশেষ অংশের মালিক আর তারা যেন পৃথিবীতে চিরদিন রয়ে যাবে। অথচ অত্যাচারী সে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি একবারও ভেবে দেখে না যে, তার যে নিঃশ্বাসটি বেরিয়ে গেল তা ফিরে না আসলে তার বা তাদের মৃতদেহ পৃথিবীতে থাকার অধিকারই হারিয়ে ফেলবে, তার বা তাদের মূল্যহীন এ মৃতদেহ হয় মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হবে অথবা পুড়ে ফেলা হবে। সে এখানকার কোন কিছুর মালিকও নয় এবং তার এখানে স্থায়ী কোন অধিকার বা শক্তিও নেই। এ অসহায় মানুষ অহংকার, দাম্ভিকতা ও মিথ্যা প্রভাব ও শক্তির দাবি করে শুধুই পার্থিব

১৭৪। রওশন আলী খন্দকার, mv¤c' ·wqK m¤cÖxZ c||Zôvq iyvmj (mv.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা :২০০৫, পৃ . ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের বাস্তব সত্য সম্বন্ধে সচেতনতার অভাবে। আর এ আত্মসচেতনতার অভাব দেখা দেয় মনুষ্যত্ববোধেরই অভাবে, অতীত ইতিহাসে মনুষ্যত্বহীন 'জোর যার মুল্লুক তার' এর উন্মাদনায় মত্ত কারুন, ফেরাউন, নমরুদ, হামান ও আবু জাহেল, আবু লাহাবদেরকেও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বেঁধে দেয়া নিয়মানুযায়ী পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছে। তাদের চিহ্নের লেশ মাত্রও নেই আজ এ পৃথিবীতে। আল্লাহ্ তা'আলা তাই ঘোষণা করেছেন, "মৃত্যুর নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে এক মুহূর্ত বিলম্বও করা হবে না আবার এক মুহূর্ত পূর্বেও নেয়া হবে না "।[১৭৫] পার্থিব জীবনের অবসান সম্পর্কিত মহাসত্য ও বাস্তবতা উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের সৃষ্টি হতে পারে। সৃষ্টি হতে পারে মানুষের মনে মানুষের জন্য মমত্ব ও ভালোবাসা । এরই মাধ্যমে দূর হতে পারে বিশ্ব মানব সমাজের সকল ভুল বুঝাবুঝি, অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচার এবং নিরসন হতে পারে বর্তমান বিশ্বের সকল সংকট।[১৭৬]

আমরা জানি এ পৃথিবী তখন অশান্তির চরম দুঃসময় অতিক্রম করছিল। অধীর প্রতীক্ষায় চাতকের মত চেয়েছিল একজন মুক্তিকামী মহামানবের দিকে, যিনি পৃথিবীর অবিন্যস্ত অবয়বটা পাল্টে দিয়ে নতুন করে ঢেকে সাজাবেন পৃথিবীকে। অফুরন্ত আলোর ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত করে দেবেন বিশ্বের প্রতিটি জনপদ। ইনসানিয়াতের সে ব্যাকুল প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। মানবতার সামগ্রিক জীবনে শান্তির সৌরভ ছড়িয়ে দিতে, মুক্তির চিরন্তন সওগাত, অফুরন্ত রহমতের প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতি নিয়ে পৃথিবীতে এলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ((সা.)।

তাঁর আগমণের পূর্বে হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাঁরা এসেছেন কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির হিদায়াতের জন্যে বা বিশেষ কোন জনপদের পথহারা মানুষকে পথ দেখানোর জন্যে। কিন্তু মহানবী (সা.) কে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন বিশ্বজগতের রহমতরূপে।

পবিত্র কুরআনে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ হচ্ছে, "আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্বজগতের জন্যে রহমতস্বরূপ"।[১৭৭]

১৭৫। আল কুরআন, ৭ : ৩৪
১৭৬। ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন, প্রা˛ ৩, পৃ. ৭৯
১৭৭। আল কুরআন, ২১ : ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তাঁকে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেন ,“বলুন, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার জন্যে আল্লাহর রসূল” ।[১৭৮]

মহানবী (সা.)-এর আদর্শ বিশ্বজনীন ও চিরন্তন। টমাস কারলাইল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনে বিশ্ব চরাচরে যে আলোময় পরিবেশের উদ্ভব ঘটলো, এক অনন্য আলোক সৌরভ পৃথিবী জেগে উঠলো, একটি গতিশীল জাতিসত্তা বিকশিত হলো, তার বিবরণ তুলে ধরেছেন এভাবে: ‘একটি জাতি, তার নাম আরব, নাম তাঁর হযরত মুহাম্মদ (সা.), আর সে একটি শতাব্দী, এটা কি তাই নয়– যেন একটি স্ফুলিংগ, শুধু একটি স্ফুলিংগ পতিত হলো, এমন এক পৃথিবীর উপর, দেখে মনে হতো তমশাচ্ছন্ন, অজ্ঞাত বালুকণা। কিন্তু সে বালুকণা বিস্ফোরিত হলো বারুদের মতো–আকাশ সমান আলো করে, আর সে আলোয় আলোকিত হয়ে গেলো দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত।’

বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্-প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম ইসলাম। বিশ্বের সকল সৃষ্টি যেমন সকল জীবের সেবায় সমভাবে নিয়োজিত, মহানবী (সা.) তথা ইসলামও তেমনিভাবে সবার উপকারার্থেই আত্মনিবেদিত। সকল শ্রেণির মানুষের পার্থিব জীবন সুখ ও শান্তিতে ভরে উঠুক এবং পারলৌকিক জীবনে তাদের নাজাত নসিব হোক, এটাই মহানবী (সা.) তথা ইসলামের কাম্য।

মানুষ যেহেতু সচেতন ও বিবেকবান প্রাণী, তাই জীবন ব্যবস্থা নির্ধারণে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে সে আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র ইসলামকেই জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে অথবা নিজ খেয়াল খুশি মোতাবেক অন্য কোন কল্পিত বিধানের আশ্রয়ও নিতে পারে, যদিও তা আল্লাহ্র কাম্য নয় এবং তার জন্য হিতকরও নয়। জবরদস্তিমূলক কারো প্রতিও এ বিধান চাপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা মহানবী (সা.) তথা ইসলাম অনুমোদন করে না। এ কারণেই স্বয়ং আল্লাহও এটা করেননি এবং তার অনুগত বান্দাদেরকেও এ কাজ করতে নির্দেশ দেননি।

ইসলাম বিদ্বেষী কতিপয় লেখক অন্যায়ভাবে প্রচার করেছে যে, ইসলাম তরবারির দাপটে প্রচারিত হয়েছে। অথচ এটা যে একটি নির্জলা ভ্রান্ত উক্তি ও মিথ্যার চরম বেসাতি, তা নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে। পরমত সহিষ্ণুতা বা পরধর্মের প্রতি উদারতার যে অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.) দেখিয়েছেন, তা পৃথিবীর অন্য কোনো মতাদর্শেই তা পরিদৃষ্ট হয় না। প্রফেসর রামদেব বলেন, ভ্রান্তিমূলকভাবে বলা হয়ে থাকে যে, তরবারির মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। অথচ প্রতিষ্ঠিত সত্য কথা এ যে, ইসলাম প্রচারে কখনো তরবারি ব্যবহৃত হয়নি। ঐতিহাসিক ডোজিও অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন, প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণকারী এক রহস্য হিসেবে ধরা পড়ে যে ইসলামের নতুন ধর্ম কারো উপর জোর

১৭৮। আল কুরআন, ৭ : ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

করে আরোপ করা হয়নি। বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা তো দূরে থাক, অপরের ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও অন্য ধর্মের প্রবর্তকদের প্রতিও সামান্যতম কটূক্তি করা ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
মহান আল্লাহ্ কুরআনে ইরশাদ করেন,"বল, হে মুহাম্মদ (সা.)! তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আমার দ্বীন আমার"।[১৭৯] "তোমরা বল আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুবের প্রতি এবং অন্যান্য গোত্রের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর নিকটই আত্মসমর্পণ করি"।[১৮০]
মহানবী (সা.)-এর মহান আদর্শ হচ্ছে যে, এর অনুসারী তার নিজস্ব আদর্শকে মনেপ্রাণে ভালোবাসবে এবং তা সমুন্নত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে, অথচ অপরের ধর্ম ও আদর্শকে অশ্রদ্ধা করবে না, এমনকি একই দেশে পাশাপাশি বসবাস করবে পরস্পরের প্রতি সহণশীল হয়ে। মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) সেখানে দেখতে পেলেন যে, মদীনায় প্রধানত তিন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে: ১. মদীনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়, ২. বিদেশী ইয়াহুদী সম্প্রদায়, ৩. নববায় আতপ্রাপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়। এদের পারস্পরিক আদর্শগত কোনো মিল ছিল না, এর ওপর ছিল গোষ্ঠিগত হিংসা-বিদ্বেষ। বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মের অনুসারীদের মাঝে শান্তি স্থাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রাথমিকভাবে যে ব্যবস্থা নেন, তা একখানি দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়। ৫৩ টি ধারা বিশিষ্ট এ দলিল মদীনার সনদ নামে খ্যাত। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এ দলিলের ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মাঝে বিদ্যমান হানাহানি ও ভুল বুঝাবুঝির কারণে সৃষ্ট বর্তমান বিশ্বের অশান্তি দূরীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ রচনায় তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। মদীনায় অবস্থানকারী ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সম্প্রীতি ও ঐক্যসুত্রে বন্ধনের নিমিত্তে মহানবী (সা.) যে সনদ রচনা করেন তা পরমত সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে সকলের জান-মাল ও ধর্মের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। তায়েফবাসী পৌত্তলিক প্রতিনিধিদল মদীনায় মহানবী (সা.)-এর নিকট হাজির হলে তিনি তাদেরকে মদীনার মসজিদেই অভ্যর্থনা জনান। শুধু তাই নয়, নজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলকে এ মসজিদেই তাদের সান্ধ্য উপাসনার জন্য তিনি অনুমতি প্রদান করেন। একই ছাদের নীচে খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সম্পন্ন করেছিলো তাদের সান্ধ্য উপাসনা। মুসলমানরা বায়তুল্লাহ্মুখী হয়ে আদায় করেছিলেন তাদের নির্ধারিত নামায। এমন উদারতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

১৭৯। আল কুরআন , ১০৯ : ৬
১৮০। আল কুরআন , ২ : ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিধানের আওতায় মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মানবাধিকার বিষয়ে সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র অমুসলিম সংখ্যালঘু নাগরিকদের শরীয়ত-প্রদত্ত অধিকারগুলো দিতে বাধ্য। এসব অধিকার কেড়ে নেয়া বা কমবেশি করার এখতিয়ার কারো নেই। এসব অধিকার ছাড়া অতিরিক্ত আরো ইরশাদ হয়েছে : তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জু সম্মিলিতভাবে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদন হচ্ছে পরস্পরের জন্য শান্তি কামনা করা। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে দেখলে 'আসসালামু আলাইকুম' তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। জবাবে বলা হয় 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ,"যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে তুমি বলবে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক"।[১৮১]

শান্তির দূত প্রিয় রাসুল (সা.) শান্তির দুনিয়া গড়ার জন্যে যে নীতিমালা রেখে গেছেন তা সর্বকালে সবার জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

১৮১। আল কুরআন, ৬ : ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡”Q‘

mv¤c‘wqK m¤cxwZ cwZôvq gnvbex (mv.) Gi Av‘‡ki wekRbxbZv

Agmwjg m¤c‘vq Gi cwZ gnvbex (mv.) Gi m‘vPvi I †mŠnv‘¨‡eva

যুগে যুগে এ পৃথিবী পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানবতাকে আলোর দিকে পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত হয়েছেন অগণিত নবী ও রাসুল। যাদের সংস্কারমূলক শিক্ষার আলোকে মানব জাতি জমাট বাঁধা অন্ধকারে আলোর দিশা পেয়েছে। ইতিহাসে তাদের অমর কৃতিত্ব বিদ্যমান। তন্মধ্যে আদর্শ মহামানব হিসেবে যাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়। যিনি পৃথিবীর সকল সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ, সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনায়কের কাছে অনুসরণীয় এবং অনুপম উপমা ও আদর্শের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি হলেন মহান আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে রবিউল আউয়াল ছিল সারা বিশ্বের জন্য এক ঐতিহাসিক স্মরণীয় মাস। এ মাসে সমগ্র সৃষ্টির গহীণ হতে শোনা গিয়েছিল মহানন্দ ধ্বনি। যার পবিত্র আবির্ভাবের প্রত্যাশা সমগ্র সৃষ্টি অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সে মহা মানব আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) ।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মত সর্বগুণে গুণান্বিত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আদর্শ মহামানব বিশ্বজগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তিনি যে শুধু মানুষের জন্য পূর্ণ আদর্শ ছিলেন তা নয়। সমগ্র সৃষ্টির জন্যই তিনি ছিলেন চিরন্তন আদর্শ। তিনি সকল জাতির, সকল দেশের সকল যুগের সমস্ত আলমের জন্য আল্লাহর রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, "আপনাকে এ বিশ্ব চরাচরে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি"।[১৮২] আর্য, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সকল জাতিগোষ্ঠি তাঁর উম্মত (উম্মতে দাওয়াত) এবং তিনি সকলের নবী। তিনি হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির জন্য অনুসরণীয়। কর্ম জগতে তিনি যেমন আদর্শ, আধ্যাত্মিক জগতেও ছিলেন আদর্শ।

১৮২। আল কুরআন, ২১: ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

এক বার কিছু লোক হযরত আয়িশা (রা.) কে রাসুল (সা.) এর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলার জন্য আরজ করলেন। জবাবে হযরত আয়শা (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেসা করলেন, তোমরা কি কুরআন পড় না ? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর চরিত্র ছিল জীবন্ত কুরআন।[১৮৩]

ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মার্জিত। এ পৃথিবীতে তাঁর মত চরিত্র, আদর্শ ও ব্যবহার দ্বিতীয় কারো হতে পারে না। এ ব্যাপারে আল কুরআন স্পষ্টতঃই ঘোষণা করে "নিশ্চয়ই আপনি এক মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী"।[১৮৪] এখানে মুসলিম, অমুসলিম জাতি, গোত্র ও সমাজের কোন উল্লেখ নেই। সকল শ্রেণির লোক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন আরো ঘোষণা করেছে: "তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ"।[১৮৫]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যবহার ও আদর্শ সারা বিশ্বজুড়ে মুসলিম-অমুসলিম, মুমিন-কাফির সবার প্রতি ছিল জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এক ও অভিন্ন। ইসলাম বিরোধী জেনেও তিনি কারো অযথা তিরস্কার, ঘৃনা কিংবা শাস্তি দেননি। অমুসলিম কুরায়শ, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও পারসিক কারো প্রতিই তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন না।[১৮৬] শৈশবকাল তাঁর ব্যবহার যেমনিভাবে পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তেমনিভাবে নবুওয়াত প্রাপ্তির পরও তাঁর ব্যবহার সারা বিশ্বকে অন্ধকার হতে আলোর দিশা দিয়েছে।[১৮৭]

মহানবী (সা.) আহলে কিতাব তথা অমুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের জন্য মুসলমানদের নিদের্শ দিয়েছিলেন। তাদের ধর্মমতে কোন প্রকার অসম্মান না করতে বললেন। তারা যাতে নিশ্চিন্তে নিজেদের ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারে সে ব্যাপারেও নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা আহলে কিতাব লোকদের সাথে ঝগড়া-ফাসাদ, বাকবিতণ্ডা করো না। যদি করই তা উত্তমভাবে করবে। তবে যারা যালিম, তাদের প্রসঙ্গে এ নির্দেশ নয়। তোমরা বরং বল, আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি। আর যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তার প্রতিও"।[১৮৮]

১৮৩। ইমাম মুসলিম, কিতাবুল মুসাফিয়ীন, পৃ.১৩৯
১৮৪। আল কুরআন, ৬৮ : ৪
১৮৫। আল কুরআন, ৩৩ : ২১
১৮৬। ইব্‌ন হিশাম, mxiZbex, (২য় খ.), অনুবাদ সম্পাসনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৪, পৃ . ২৮৪
১৮৭। আ.ত.ম মুছলেহ্ উদ্দীন, Av`iex mvn‡Z¨i BwZnvm, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮২, পৃ.২১
১৮৮। আল কুরআন, ২৯ : ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

অমুসলিমদের ব্যাপারে নবী করীম (সা.) এর বাণী হচ্ছে:

১। যে কেউ কোন যিম্মীকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেবে, আমি তার প্রতিবাদকারী। আর আমি যার প্রতিবাদকারী হবো, তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব।

২। যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকদের উপর যুলুম করবে ও তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ দেবে বা করতে বাধ্য করবে। কিয়ামতের দিন আমি তার প্রতিবাদকারী হয়ে দাঁড়াব।

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার আদায়ে আল কুর'আনের ঘোষণা, "ধর্মের ব্যাপারে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং দেশ থেকে তোমাদেরকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তা'তালা তোমাদেরকে নিষেধ করে না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কার কার্যে সহায়তা করছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালিম"।[১৮৯]

মহানবী (সা.) হুনায়নের সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন। পথের পাশের বেদুঈনরা খবর পেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এ পথেই প্রত্যাবর্তন করবেন। কিছু পাওয়ার আশায় তারা এক স্থানে এসে ভীড় করলো। তাদেরকে দেয়ার মত কোন কিছুই তখন তার হাতে ছিল না। কিন্তু নাছোড় বান্দারা পিছু ছাড়ল না, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের হাত থেকে নিস্তার লাভ করার জন্য একটি গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বেদুঈনদের একজন চাদর ধরে এমনভাবে টানল যে, গায়ের পবিত্র চাদরখানা তাদের হাতেই চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন তাদেরকে ডেকে বলতে লাগলেন, আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। আল্লাহ্র কসম! আজ এ বনে যতগুলো গাছ আছে, ততগুলো উটও যদি আমার সাথে থাকত তবে সবগুলো উট আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম। আমাকে তোমরা কৃপণ বা কাপুরুষ দেখতে না।[১৯০]

কয়েকজন ইয়াহুদী একবার মহানবী (সা.) এর নিকট এসে চালাকী করে 'আস্সালামু আলাইকুম-এর পরিবর্তে 'আস্সামু আলাইকুম' বললো, 'যার অর্থ তোমার মৃত্যু হোক হযরত আয়েশা (রা.) তাদের চালাকির উত্তরে বলেন,'তোমাদেরও মৃত্যু হোক আর বর্ষিত হোক আল্লাহ্র লা'নত ও ক্রোধ'।

---

১৮৯. আল কুরআন, ৬০ : ৮-৯
১৯০. ইব্ন হিশাম,C\/¸ 3, পৃ. ৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা.) বললেন, 'হে আয়েশা থামো, কঠোরতা ও কটুবাক্যের পরিবর্তে নম্রতা অবলম্বন কর'।[১৯১]

আবূযর গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মেহমান হয়েছিলাম। মহানবী (সা.)-এর ঘরে যে কয়টি বকরি ছিল, সব কয়টির দুধ আমি পান করে ফেললাম। ফলে সে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিবার পরিজন অভুক্ত অবস্থায় থাকতে বাধ্য হন। তথাপিও তিনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হননি।[১৯২]

হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তার অমুসলিম মা সাহায্য প্রার্থিনী হয়ে মদীনায় তার কাছে আগমন করেন। অমুসলিম মায়ের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে, সে সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শরণাপন্ন হলে তাকে নির্দেশ দেওয়া হলোঃ "মা যেই হন না কেন? তার সাথে সদব্যবহার করবে"।[১৯৩]

একবার রাসূলুল্লাহ দেখতে পেলেন, জনৈকা স্ত্রীলোক একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছে। তিনি একটু থেমে স্ত্রীলোকটিকে ডেকে বললেন, 'সবর কর'। স্ত্রীলোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে চিনত না। সে মুখ খিস্তি করে বলে উঠল, সর, এখান থেকে! আমার কি দুঃখ তা তুমি কি করে বুঝবে? বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি সরে গেলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর লোকেরা স্ত্রীলোকটিকে বলল! তুমি কার সাথে এমনভাবে কথা বললে? তুমি জান না, ইনি আল্লাহর রাসূল (সা.)। একথা শুনে স্ত্রীলোকটি ছুটতে শুরু করলো। কাছে এসে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করলো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন "বিপদের প্রথম আঘাতেই ধৈর্যধারণ করাই হল প্রকৃত সবর"।[১৯৪]

একদা মহানবী (সা.)-এর দরবারে এক বেদুঈন এসে হাযির হলো। প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দিলে মসজিদের ভেতরেই দাঁড়িয়ে সে প্রস্রাব করতে শুরু করলো। সাহাবীগণ তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য চারদিক থেকে ছুটে এলেন। নবী (সা.) ইরশাদ করলেন, "ওকে কিছু বলো না, ওকে প্রস্রাব করতে দাও। এক বালতি পানি এনে প্রস্রাব ধুয়ে দিলেই তো পাক হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন লোকজনের সাথে সহজ-সরল ব্যবহার করতে, কঠিন হতে নয়"।[১৯৫]

---

১৯১. ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmwven, কিতাবুল আদব, পৃ .৩৯৮
১৯২. আল্লামা শিবলী নুমানী , mxivZbex (mv.) , অনুবাদ মাওলানা মহিউদ্দিন খান , মদীনা পাবলিকেশন,ঢাকা : ১৯১০ , পৃ . ৫০২
১৯৩. ইমাম বুখারী, Cv¸ 3, (২য় খ.), পৃ . ৮৮৪
১৯৪. ইমাম বুখারী, Cv¸ 3, (১ম খ.), পৃ . ১৭১
১৯৫. Cv¸ 3, পৃ . ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (সা.) যতক্ষণ মসজিদে থাকতেন, আমরাও তাঁর সাথে বসে থাকতাম। তিনি উঠে গেলে আমরাও চলে যেতাম। একদিন মসজিদ হতে উঠে যাবার সময় জনৈক মুর্খ বেদুঈন এসে উপস্থিত হলো। হুজুর (সা.)-এর চাদর ধরে এমন জোরে টান দিল যে, নবী (সা.)-এর গর্দান মুবারক লাল হয়ে গেল। বেদুঈনের দিকে ফিরে চাইলে সে বলতে লাগল, "আমার উট দুটি খাদ্য দিয়ে বোঝাই করে দাও, তোমার নিকট যে সমস্ত মাল দৌলত আছে তা তোমার নয়, তোমার বাবারও নয়। নবী (সা.) একরোখা সরল মানুষটির এরূপ অমার্জিত কথাবার্তায় মোটেও বিরক্ত হলেন না বরং তা উপভোগ করার জন্য বলতে লাগলেন, 'তুমি আমার গর্দান ছিড়ে ফেলেছ, প্রথমে তার বদলা দাও, পরে শস্য'। বেদঈুন এ কথা শুনে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছুতেই বদলা দিব না'। নবী (সা.) মৃদু হেসে তার দুটি উটে খেজুর ও যব বোঝাই করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[১৯৬]

সুরাকা নামক জনৈক সাহাবী এক বেদুঈনের কাছ থেকে উট ক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করেনি। বেদুঈন তাকে নবী (সা.)-এর দরবারে হাযির করলো। ঘটনা শুনে নবী (সা.) উটের মূল্য পরিশোধ করে দিতে বললেন। সাহাবী নিবেদন করলেন, মূল্য পরিশোধ করার মত সামর্থ্য তার নেই। নবী (সা.) তখন সে অপরিচিত বেদুঈনকে নির্দেশ দিলেন, তোমার বিবাদীকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে তোমার পাওনা উসূল করে নাও। বেদুঈন তাকে নিয়ে বাজারে গেল এবং সত্যিই বিক্রি করে তাঁর পাওনা আদায় করে নিল। এদিকে সুরাকাকে একজন মহৎপ্রাণ মুসলমান খরিদ করে আযাদ করে দিলেন।[১৯৭]

একবার জনৈক বেদুঈন এসে দেখতে পেল, হুজুর (সা.)-এর সামনে একটি বৃহৎ ছাগলের পাল রয়েছে, সে তার অভাবের কথা নিবেদন করার সাথে সাথে গোটা ছাগল পালটাই তাকে দিয়ে দিলেন। বেদুঈন তার গোত্রে ফিরে গিয়ে প্রচার করতে লাগলো, তোমরা সকলে ইসলাম গ্রহণ কর। মুহাম্মদ (সা.) এমন একজন উদার লোক যে, নিজে দরিদ্র হয়ে যাবেন এরূপ ভয় না করেই মুক্ত হস্তে দান করতে থাকেন।[১৯৮]

একবার এক কাফির এসে মেহমান হলো। হুযুর (সা.) একটি ছাগল দোহণ করে এনে তাকে খেতে দিলেন। সে এক চুমুকেই সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলল। তারপর আর একটি ছাগল দোহণ করে আনা

---

১৯৬. আল্লামা শিবলী নু'মানী, CV¸ ³, পৃ . ৪৯৮
১৯৭. CV¸ ³, পৃ . ৪৬৪
১৯৮. CV¸ ³, পৃ . ৪৬৫

হলো এভাবে পর্যায়ক্রমে সে সাতটি ছাগলের দুধ পান করার পরও তৃপ্ত হলো না। কিন্তু হুযুর (সা.) অম্লান বদনে তাকে দুধ পান করাতে থাকলেন।[১৯৯]

মদিনার বিশ্বাস ঘাতক ইয়াহুদীদের অন্যতম লাবীদ ইব্‌ন আসাম হযুর (সা.)-এর প্রতি যাদু করে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। হযরত আয়েশা (রা.) বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ-খবর নেয়ার কথা বললে হুযুর (সা.) জবাব দিলেন, আমি লোকজনের মধ্যে একটা হৈ চৈ সৃষ্টি করতে চাইনা।[২০০]

যায়েদ ইব্‌ন সা'দ ইয়াহুদী থাকা অবস্থায় অর্থ লগ্নী ব্যবসা করতেন। একবার হুযূর (সা.) তাঁর কাছ থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। পরিশোধের সময়-সীমা কিছুটা অবশিষ্ট থাকতেই তাগাদা করতে আসলেন। পবিত্র চাদর টেনে ধরে নানা রকম কটুবাক্য শুনিয়ে ফেললেন, 'আবদুল মোত্তালিবের গোষ্ঠিরা' তোমরা সব সময়ই এমন করে থাক। হযরত উমর (রা.) নিজেকে সামলাতে পারলেন না। রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন, হে দুশমন! তুই রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে দৃষ্টতা দেখচ্ছিস। হুযুর (সা.) তখন মুচকি হেসে বলতে লাগলেন, উমর তোমার কাছ থেকে আমি অন্য কিছু আশা করেছিলাম। তাকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত ছিল। যেন নম্র-ভদ্রভাবে তাগাদা করে এবং আমাকে বলা উচিত ছিল, যেন আমি যথাসময়ে তার ঋণ পরিশোধ করে দেই। একথা বলে হযরত উমরের প্রতি ইশারা করে দিলেন, এখনই তার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং বিশ সা খেজুর ঋণের অতিরিক্ত দিয়ে দাও।[২০১]

একবার এক ব্যক্তি হুযূর (সা.) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলে সাহাবীগণ তাকে ধরে ফেললো। বন্দী অবস্থায় তাকে হুযূর (সা.)-এর খিদমতে হাজির করা হলে সে ভয়ে কাঁপতে থাকে। হুযূর (সা.) তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, 'ভয় পেয়ো না, তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও তা করতে পারতে না। এ বলে তাকে ছেড়ে দিলেন'। [২০২]

জনৈক ইয়াহুদীর ছেলে গুরুতর অসুস্থ্য হয়ে পড়লে নবী (সা.) তাকে দেখতে এলেন। ছেলেটিকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ছেলে পিতার অনুমতির অপেক্ষা করলেন। পিতা বললেন, ইনি যা বলছেন মান্য কর। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল।[২০৩]

---

১৯৯. cÖv¸³, পৃ. ৪৬৯
২০০. আবু আবদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, cÖv¸³, পৃ. ৮৫৮
২০১। আল্লামা শিবলী নু'মানী, cÖv¸³, পৃ. ৪৯৬
২০২। cÖv¸³, পৃ. ৫০৮
২০৩। আবু আবদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, cÖv¸³, wKZve j RvbvBh দ্রষ্টব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

নাজরানের খ্রিস্টানদের যে প্রতিনিধি দল মদীনায় এসেছিল, তাদেরকে মসজিদে নববীতে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দেন। নিজে তাদের মেহমানদারির দায়িত্ব পালন করেন। এমন কি, তাদের উপাসনাদিও মসজিদেই সমাধা করার ব্যবস্থা করেন। সাধারণ মুসলমান তাদের উপাসনায় বাঁধা দান করতে চাইলে নবী (সা.) তাদেরকে থামিয়ে দেন।[২০৪]

তায়িফবাসীরা মহানবী (সা.)-এর ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল, সম্পূর্ণ শরীর মুবারক রক্তাক্ত করে তায়িফ শহর হতে বের করে দিল। আল্লাহর ফেরেশ্‌তারা তায়িফের যমীনকে উল্টে দেয়ার পরামর্শ দিলেন কিন্তু রহমতের নবী কল্যাণের চিন্তা করে আযাব দেয়ার বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করলেন। এ তায়েফবাসী দীর্ঘ আট বৎসর পরেও ইসলামের দাওয়াত তীর-তরবারীর সাহায্যে প্রত্যাখ্যান করলে সাহাবীরা আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ যালিমদের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করুন'। এদের আক্রমণে নিহত অসংখ্য সাহাবীর লাশ সামনে নিয়ে মহানবী (সা.) আল্লাহর দরবারে হাত বাড়ালেন। মনে হলো তায়েফবাসী আল্লাহ্‌র তা'আলার আযাব হতে আর রক্ষা পাবে না। কিন্তু এ মুনাজাতে মহানবী (সা.) পবিত্র জবান হতে উচ্চারিত হতে লাগলো, 'আয় আল্লাহ্‌! সাকীফ গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত কর এবং বন্ধুবেশে মদীনায় হাযির কর। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সাকীফ গোত্র ইসলামে দীক্ষিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর পদতলে লুটিয়ে পড়ে'। [২০৫]

একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এক বৃক্ষতলে শায়িত ছিলেন এবং তরবারিখানা গাছের সাথে লটকানো ছিল এমন সময় তার প্রাণের শত্রু হাযির হয়ে তরবারি খানা হাতে নিয়ে দর্পভাবে প্রশ্ন করলো, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) অবিচলিত চিত্তে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌! এ পবিত্র নামটি শুনার সাথে সাথে হামলাকারীর হাত থেকে তরবারিটি খসে পড়লো। মহানবী (সা.) সঙ্গে সঙ্গে তরবারিটি তুলে নিলেন এবং হানাদার দুশমনকে বললেন, এখন বলো! তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সে বললো, আপনি মহৎ ব্যক্তি, আপনি রক্ষা করবেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তখন তাকে ক্ষমা করলেন এবং তাকে নিরাপদে যেতে দিলেন। তাকে গালি গালাজ করেন নি। বদদোয়া দেননি। তার প্রতি অকথ্য ভাষা ব্যবহার করেন নি।[২০৬]

২০৪। ড. আ.ন.ম রইছউদ্দীন, 'বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব', BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ . ১৬৭

২০৫। ইব্‌ন সা'', AvZZvevKvZ, 'viæj BqvnBqv, বৈরুত : ১৯৯৬, তায়িফের যুদ্ধ দ্রষ্টব্য ।

২০৬। আবু আবদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, cv¸ ³, পৃ . ৫৯৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)- এর মাতা মুশরিক ছিলেন। একদা বিরক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে গালিগালাজ করতে শুরু করলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) মায়ের ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে কেঁদে ফেললেন। মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমার মা আপনার সাথে বেআদবী করতে শুরু করেছেন। তার প্রতি বদ্ দোয়া করুন'। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) হাত তুলে দোয়া করলেন। 'আমার মাওলা! আবূ হুরায়রার মাতাকে হিদায়াত কর'। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বাড়ি ফিরে দেখলেন, ঘরের দরজা বন্ধ কিছুক্ষণ পর দরজা খুললে দেখলেন, তার মাতা গোসল করে কাপড় পড়ে আছেন এবং জবানে ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করছেন।[২০৭]

পরিশেষে বলা যায় যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) সমগ্র বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন। উত্তম ব্যবহার, ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমেই তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ছিলেন। কুরায়শ, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান তথা অমুসলিমরা কতভাবেই না তাকে নির্যাতন করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সকলকেই ক্ষমার দ্বারা রহমতের ছায়াতলে স্থান দিয়েছেন। ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য দোয়া করেছেন। জীবনে কোন দিন কারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তার সমগ্র যুদ্ধ-বিদ্রোহ ছিল সংশোধনমূলক, প্রতিশোধমূলক নয়। ঐতিহাসিক গীবনের ভাষায় বলা যায়, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পায়ের তলায় অবনত অবস্থায় সকল শত্রুকে পেয়েও তাদেরকে ক্ষমা করে ঔদার্য ও ক্ষমাশীলতার যে অনুপম আদর্শ প্রদর্শন করেন তার দ্বিতীয় কোন নযীর দুনিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে নেই।

মাইকেল হার্ট 'দ্যা হানড্রেড' পুস্তকে বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ক্রমানুযায়ী শ্রেষ্ঠত্ব বিন্যাস করেছেন। তালিকায় প্রথমেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নাম লিখেছেন।

বিখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক জর্জ বার্নার্ড শ বলেন, If the world was united under one leader then Muhammad would have been the best fitted man to lead the people of the various creed, dogmas and ideas to peace and happiness.

(যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদ সম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক নায়কের শাসনাধীনে আনা হত তবে একমাত্র মুহাম্মদ (সা.) সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারুপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন)। বাস্তবিকই তিনি একজন অদ্বিতীয় করুণাময় পথ প্রদর্শক। তাঁর আদর্শ, উক্তি ও ব্যবহার সর্বকালের সকলের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

২০৭। ইমাম মুসলিম, C৺¸ ³, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

mv¤c‘wqK m¤cwxZ cwZôvq gnvbex (mv.) KZK MnxZ c‘‡¶c mgn

ইসলামের দিশারী বিশ্বনবী (সা.) শান্তির পয়গাম নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে আগমন করেছেন। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশে রাসুলুল্লাহ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের মূর্ত প্রতীক 'রাহমাতাল্লিল আলামিন'। মানবসমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা শান্তির বাণী বাহক ও দূতস্বরূপ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তিনি মানবগোষ্ঠির প্রতি সত্য প্রচারে নিবিষ্ট হন এবং তাদের সরল, সঠিক ও শান্তির পথে পরিচালিত করেন। যাতে তারা জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে আর ইহকালীন শান্তি ও পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভ করতে সক্ষম হয়। নবী করিম (সা.) কে শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি"।[২০৮]

মহানবী (সা.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ ও পদ্ধতি ছিল অনন্য। দল-মত-গোত্র নির্বিশেষে আরবের জাতি-ধর্ম-বর্ণ সবার মধ্যে শান্তি চুক্তি ও সন্ধি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে তিনি সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনুপম চরিত্র-মাধুর্য ও সত্যনিষ্ঠার কথা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি যুদ্ধবাজ আরবদের শান্তির পতাকাতলে সমবেত করেন এবং বিবদমান গোত্রগুলো একটি সুসংহত জাতিতে রূপান্তরিত হয়।

যখন অমানিশার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত, মানুষে মানুষে কলহ-বিবাদ, গোত্রে গোত্রে রক্তের হোলি খেলা, পাশবিকতা ও হিংস্রতার জয় জয়াকার, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিগ্রহের যাতাকলে যখন মানবতা নিভু নিভু করছে তখন ধরাধামে সম্প্রীতির মশাল নিয়ে আগমন করলেন মানবতার পরম বন্ধু, মহানবী মুহাম্মদ (সা.)। তিনি আবির্ভুত হন গোটা বিশ্ববাসীর উপহার স্বরূপ। শুধু মুমিন-মুসলিম নয় সমগ্র মানব জাতির ত্রাণকর্তারূপে তিনি প্রেরিত।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,"আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি স্বাক্ষদানকারী, সু-সংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি"।[২০৯]

২০৮। আল কুরআন, ২১ : ১০৭
২০৯। আল কুরআন, ৩৩ : ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

gnvbexi AwefveKv‡j we‡ki mvgwRK I ivR‰bwZK cwiw¯wZ

একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, মহানবী (সা.) এর পূর্বে আরবে সভ্যতা বলতে কিছুই ছিলনা, সবত্রই ছিল হানা-হানি ও রাহাজানি। অসংখ্য নবী-রাসূল বিশ্বের বিভিন্ন দিগন্তে মানুষে মানুষে সাম্য ও সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিন্তু মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবকালে কেবল আরবজাহান নয় বরং সারা জাহান হতে মানুষে মানুষে ভালোবাসা ও জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি ভূলুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। মিশর, ভারত. ব্যাবিলন, গ্রীস ও চীনে মানব সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। রোম ও পারস্য আজকের ইউরোপ আমেরিকার মত সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী ছিল। কিন্তু বাস্তবতা বলতে কিছুই ছিলনা। সন্ত্রাস নির্মূল ও বিশ্বশান্তির নামে পাশ্চাত্য জগত আজ যেমন সারা বিশ্বে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। রোমক ও ইরানীগণ তখন নিজেদের মাঝে হানা-হানিতে কেবল সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং গোত্রে গোত্রে হানা-হানি ও সাম্প্রদায়িকতা সভ্যতার আড়ালে ছড়িয়ে দিত।

রোমান ও পারস্য সম্রাটগণ শুধু অবতার হবার দাবী করতোনা বরং তারা খোদা হয়ে মানব সমাজে জেঁকে বসেছিল। তাদের সাথে আতাঁত করে সাধারণ জনগণের উপর প্রভূত্ব চালাত ভূমিপুত্র ও ধর্মযাজকগণ। তাদের শোষণ নিষ্পেষণে মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে বসেছিল। কর্তৃত্বশীল শ্রেণির ভোগ-বিলাস তাদের নৈতিক সত্তাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ক্ষমতার পালাবদল হতো লড়াই সংঘর্ষের মাধ্যমে। নিত্য নতুন শাসক ক্ষমতার মসনদে আসীন হবার পর জনগণ ভাবতো আগেরটির চেয়ে এটি আরও ভয়ানক শোষক। সারাবিশ্ব স্বজনপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। মানুষের সামনে ক্ষীণতম আশার আলো জ্বালানোর মত কোন মতবাদ ছিলনা। কোন দিক হতে কোন আশার আলো দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলনা। বিশ্বজুড়ে যখন ইতিহাসের ভয়াবহতম বীভৎসতা ছড়িয়ে পড়লো, অরাজকতার ঘুট ঘুটে অন্ধকারে মানবতা ঢাকা পড়লো, তখন আকস্মিকভাবে সম্প্রীতির প্রদীপ নিয়ে প্রেরিত হলেন মানবতার শ্রেষ্টতম বন্ধু মহানবী (সা.)। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন , "তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে"।[২১০] তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, জাহিলিয়া যুগে আউস ও খাজরায পরস্পর প্রতিদন্দ্বী দু'টি সম্প্রদায় ছিল। এদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরস্পর হানা-হানি এত চরমে পৌছে ছিল যে, শুরু হবার পর আর তা শেষ হয়না। মহানবী (সা.) সম্প্রীতির অমীয় বাণী নিয়ে এধরাতে আবির্ভূত হলে তারা তা বুকে ধারণ করে। ফলে তাদের মধ্যকার চিরাচরিত হানা-হানি কেবল বন্ধই হয়নি বরং তারা সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আপন ভাইয়ের মত হয়ে গিয়েছিল।[২১১]

২১০। আল কুরআন, ৩ : ১০৩
২১১। ইবন কাসীর, gL Zvmviæ, Zvdmx‡i Be‡b Kvmxi, (১ম খ.), দারুল মা'আরিফ , বৈরুত : ১৯৮৩ , পৃ . ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

mv¤ú`ªvwqK m¤úªxwZ cÖwZôvq gnvbex (mv.) KZK MnxZ c`‡¶c mgn wb‡g Av‡jvPbv Kiv n‡jv :

wnjdj dhj MVb

পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের অঙ্গীকারমূলক একটি সংঘের নাম ছিল হিলফুল ফযূল। মুহাম্মদ (সা.) সবে মাত্র কিশোর, বয়স ১৪ বছর, ফিজারের ৪র্থ যুদ্ধ তখন সংঘটিত হয় বিবদমান দু'টি দলের মাঝে প্রধানত কুরায়শ ও হাওয়াযিন গোত্র ছিল। কুরায়শদের হয়ে তিনি চাচাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্ভাসিত ছিলেন। কুরায়শগণ ছিল এতে আত্মরক্ষার ভুমিকায়। তারা ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ। একারণেই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাতে অংশ গ্রহণ করেন। তবে তিনি কোন অস্ত্র হাতে তুলে নেননি। যুদ্ধভীষণ আকার ধারণ করেছিল।[২১২]

রনাঙ্গনে উপস্থিত থাকায় যুদ্ধের বিভীষিকা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। গোত্রে গোত্রে এরূপ তাণ্ডব লীলা তাকে প্রচণ্ড ভাবে আহত করে। আরবদের মাঝে এরূপ নির্মমতা চিরকাল হতে চলে আসছে। কোন দিনেই তাদের পাষাণ হৃদয়ে সহমর্মিতার উদ্রেক হয়নি। এবারই ব্যতিক্রম, কতিপয় যুবকের অন্তরে যুদ্ধ বন্ধ ও মানব সমাজে সম্প্রীতির ভাবনা তৈরী হয়। কারণ বিশ্ব মানবতার ত্রানকর্তা, করুণার ছবি ও ইনসানিয়্যাতের রবির আলোকচ্ছটা পড়েছে সে যুবসমাজের অন্তরে।

ফিজার যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর বনু হাশেম গোত্রের পতাকা উড্ডয়ন কারী যুবায়ের একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলেন। তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ (সা.) এর চাচা । তার অন্তরেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অন্তরের প্রতিচ্ছায়া সম্যক রূপে প্রতিফলিত হয়েছিল। সমাজে সম্প্রীতি সৃষ্টির ভাবনা তাঁর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছিল। উপস্থিত যুবকগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাতে সাড়া দিল। আপন গোত্রের কেউ কোন অন্যায় করলে তাকে সর্বাত্মক সমর্থন করা, তার মান ইজ্জত রক্ষার্থে অকাতরে ধন-প্রাণ বিলিয়ে দেয়া ছিল আরবে সাধারণ নিয়ম। এ প্রথাকে বিসর্জন দিয়ে যুবকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞায় ঐক্যমত পোষণ করায় বালক মুহাম্মদ (সা.) মনেপ্রাণে খুশি হয়েছিলেন।[২১৩]

আব্দুল্লাহ ইবন জুদ'আনের গৃহে একটি সম্মেলনের মাধ্যমে হিলফুল ফযূলের কার্যক্রম শুরু হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ সম্মেলনে স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন। অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। নুবুওয়াত লাভের পর তিনি বলতেন, আব্দুল্লাহ ইবন জুদ'আনের গৃহে শপথ করে যে

২১২। ফুয়াদ হামযা, Kvje Rvhx iwZj Avie, মিসর : ১৩৫২ হি.,পৃ . ২৬০
২১৩। আস- সুহায়লী, Avi ivI`j Dbd, (২য় খ.), মিশর : ১৯১৪, পৃ . ৭১

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিজ্ঞা করে ছিলাম তার বিনিময়ে আমাকে লাল লাল উট দান করলেও আমি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে সম্মত নই। আজও যদি কোন নিপীড়িত ব্যক্তি হে হিলফুল ফযূলের সদস্যগণ! বলে আহবান করে তবে আমি তার সে ডাকে সাড়া দেব। কারণ ইসলাম ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং নির্যাতিতের সাহায্যের জন্যই এসেছে।[২১৪]

তাই তো পি.কে হিট্টি বলেনঃ Nobody can refuse the contribution of `hilful fuzul' in promoting world peace. যার ধারা সমূহে অন্তর্ভূক্ত ছিল (ক) আমরা দেশের অশান্তি দূর করার নিমিত্তে যথাসাধ্য চেষ্ঠা করব। (খ) বিদেশী লোকদের জান-মাল, মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্ঠা করব। (গ) দরিদ্র ও নিঃসহায় লোকদের সহায়তা করতে আমরা কখনো কুণ্ঠিত হবোনা। (ঘ) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করব। (ঙ) অত্যাচারী ও তার অত্যাচারের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার প্রাণপন চেষ্টা করব।

nvRv‡i Avml Iqv' cwZ¯vc‡b mó mv¤c'wqKZvi wbimb

কা'বা ঘর ও হাজারে আসওয়াদ ছিল ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে সকল গোত্রের কাছে সম্মানিত। সে আদম (আ.) হতে তা সকল শ্রেণির মানুষের প্রিয় স্থান বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তখনও নুবুওয়াত লাভে ধন্য হননি। তাঁর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন কা'বা গৃহ মেরামত করার প্রয়োজন পড়ে। সকলে মিলে মিশে কা'বার নির্মান কাজ করতে লাগলেন। মক্কার কোন গোত্রই যেন এ বরকতময় কাজ হতে বঞ্চিত না হন, সেজন্য ঘরের প্রতিটি অংশকে এক এক গোত্রের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়। সম্মিলিত ভাবে কা'বার কাজ চলছিল। হাজারে আসওয়াদ যেই স্থানে সংস্থাপন করার কথা সেখানে আসার পর কর্মরত গোত্রগুলোর মাঝে মতভিন্নতা সৃষ্টি হলো। কোন গোত্রের লোকজন পাথরটিকে যথাস্থানে স্থাপন করবেন তা নিয়ে মহা বিভ্রাট সৃষ্টি হলো। কারণ এর সাথে সামাজিক মর্যাদার বিষয় জড়ানো ছিল। প্রতিটি গোত্র এমর্যাদায় ছাড় দিতে নারাজ। এর ফলে দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করল। গোটা শহর হাঙ্গামার ভয়ে আতংকিত হয়ে ওঠল। চারদিন পর্যন্ত থম থমে ভাব বিরাজ করছিল। এরই মাঝে রণ প্রস্ততি চলছিল। কোন কোন গোত্র তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী রক্তে হাত ডুবিয়ে মরণের প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত করে ফেলল। যুদ্ধ বন্ধে বয়োজ্যেষ্ঠ আবু উমাইয়া (মতান্তরে তাঁর ভাই ওয়ালীদ) বিবদমান দলগুলোকে যুদ্ধ বন্ধে একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। তিনি বললেন, বিষয়টি

২১৪। আল- হাকীম নিশাপুরী, Avj-ghZv' ivK, (২য় খ.), হায়দ্রাবাদ : ১৩৪৫ হি, পৃ . ২২০

Dhaka University Institutional Repository

মীমাংসা করার জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে, আগামী দিন বনু শায়বা নামক গেইট দিয়ে যিনি সর্বাগ্রে প্রবেশ করবেন তাঁর হাতে এ ঝগড়ার মীমাংসার ভার দেয়া হোক। এ প্রস্তাবকে মীমাংসার সুন্দরতম পন্থা বলে সকলে মেনে নিলেন। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে উদ্বেগের কারণ ছিল সে গেইট দিয়ে কে প্রবেশ করে তার কৌতুহল নিয়ে। অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হল সেই গেইট দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রবেশের মাধ্যমে। তাকে দেখে সবাই বলে উঠল, সে তো 'আল-আমীন' আমরা তাঁর উপর সন্তুষ্ট। তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হলো, তিনি বললেন যে সকল সম্প্রদায় হাজারে আসওয়াদ যথা স্থানে স্থাপনের অধিকারী বলে দাবীদার, তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন করুন। তিনি একখানা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাতে হাজারে আসওয়াদ কে এর মাঝখানে রেখে প্রতিনিধিগণকে চাদরের এক প্রান্তে ধরে তা উঠাতে বললেন ফলে সম্মিলিত ভাবে তারা তা যথা স্থানে স্থাপনের সুযোগ লাভ করল। অতঃপর তিনি নিজ হাতে চাদর হতে পাথরটিকে যথা স্থানে রেখে দিলেন। এতে সকলেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। এভাবে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এক সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেল।[২১৫]

gnwRi I Avbmvi‡'i gv‡S åvZ‡Zi eÜb

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরতের পর দেশ ত্যাগী সাহাবায়ে কেরাম ও আশ্রয়দাতা আনসারগণের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে সম্প্রীতির এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দু'টি অঞ্চলের মানুষ, যারা পেশা ও সংস্কৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় অভ্যস্ত, তাদেরকে এক সুতোয় গাঁথার জন্য যেই কর্ম কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল, তাহলো, তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ পয়দা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) তা-ই করে গোটা উম্মাহকে সোনালী সমাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আমার গৃহে কুরায়শ ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করছিলেন, তার থেকে বর্ণিত অন্য রেওয়ায়াতে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আবূ উবায়দা ইবনুল জারাহ ও আবূ তালহার মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন"।[২১৬] এ ভ্রাতৃত্ব এমন ভাবে সুদৃঢ় করে দেয়া হয়ে ছিল যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এর দ্বারা পরস্পর উত্তরাধিকারও হওয়া যেত। পরবর্তীকালে আল কুরআনে উত্তরাধিকার আইন স্পষ্ট ভাবে নাযিল হলে এর কার্যকারিতা রহিত হয়ে যায়।

২১৫। আল ইবন বুরহানুদ্দীন, Avm-mxivZj nvjweqv, (১ম খ.), মিশর : ১৯৭৭, পৃ. ১৬০
২১৬। ইমাম মুসলিম, cv¸ ³, পৃ. ৩০৮

Dhaka University Institutional Repository

kwšÍ cÖwZôvq gnvbex (mv.) Gi Abe'¨ fwgKvi Abb¨ ¯ÍviK û'vqweqvi mwÜ×

যখনি তার কাছে শান্তি চুক্তির প্রস্তাব এসেছে তিনি তৎক্ষনাত তাতে সম্মতি দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি তার জলন্ত নযির বাহ্যিক পরাজয়মূলক হওয়া সত্ত্বেও কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। বিশ্বশান্তির অগ্রদূতের সাহস, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা তখনকার মানুষকে যেমন বিমুগ্ধ করে, তেমনি অনাগত মানুষদের জন্যও শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর শান্তিপূর্ণ 'মক্কা বিজয়' মানবেতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। কার্যত তিনি বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, বিনা ধ্বংসে মক্কা জয় করেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে কি মক্কার জীবনে, কি মদিনার জীবনে সর্বত্রই ষড়যন্ত্র, সংঘাত, যুদ্ধ ও মুনাফেকি মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে। শত অত্যাচার-নির্যাতন ও যুদ্ধ করে আজীবন যে জাতি নবী করিম (সা.)-কে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, সেসব জাতি ও গোত্রকে মক্কা বিজয়ের দিন অতুলনীয় ক্ষমা প্রদর্শন করে এবং তাদের সঙ্গে উদার মনোভাব দেখিয়ে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমা ও মহত্ত্বের দ্বারা মানুষের মন জয় করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এমন নজির বিশ্বে দুর্লভ।

৬৩ বছরের মাক্কি ও মাদানি জীবনে তিনি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সূচারুভাবে সমাপন করে গিয়েছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, তেমনি প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করেছেন শান্তি রক্ষার জন্য। জীবনে অনেক যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে, অথচ এর কোনোটিই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ছিল না। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) ২৭টি প্রতিরোধমূলক যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন এবং দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাহাবিদের নেতৃত্বে ৫৭টি অভিযান পরিচালনা করেন। ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের পর মহানবী (সা.) বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানের সঙ্গে সংলাপ, সমঝোতা করে অসংখ্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। এগুলো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিরাট অবদান রাখে।

সমস্যা সংকুল বিশ্বে যেখানে মানুষ মৌলিক মানবিক অধিকার বঞ্চিত, দেশে দেশে হানাহানি ও যুদ্ধবিগ্রহ, ঝরছে নিরীহ মানুষের রক্ত, যেখানে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতপার্থক্য সহ্য করা হচ্ছে না, সেখানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শ এবং সার্বজনীন শিক্ষা অনুসরণই বহু প্রত্যাশিত শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে । সুতরাং বলা যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ (সা.) এর অবদান ছিল অতুলনীয়।[২১৭]

২১৭। মুফতি মতিউর রহমান, (নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত), mv¤ú'wqK m¤úÖxwZ cÖwZôvq Bmjvg, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৯, পৃ . ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

g‘xbv mb‘ : mv¤c‘wqK m¤cxwZi AfZce ‘wjj

৬২৩ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) পৌনে ছয় বর্গমাইলে ছোট একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়। তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন, এখানে অন্যান্য ধর্মানুসারী লোকজনও রয়েছে। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) মদিনায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠি ও ইয়াহুদীদের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও রাজনৈতিক সমীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মাধ্যমে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। যা ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিতি লাভ করে।[২১৮] এটা ইতিহাসে লিখিত প্রথম সংবিধান। এর পূর্বে শাসকের মুখোচ্চারিত কথাই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন। 'জোড় যার মুলুক তার' এটাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের শাসন নীতি। খ্রিষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর পূর্বে মেসোপটেমিয়ার যেসব আইন বিধিবদ্ধ করা হয় তা ছিল অসম্পূর্ণ এবং আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্হার সঙ্গে সাংঘর্ষিক পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সংবিধান যুগোপযোগী ও প্রগতির পরিচায়ক।[২১৯]

মদিনায় বসবাসরত মুসলমান, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান কলহ-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে তিনি একটি ইসলামিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প করেন। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের আহবান করে একটি বৈঠকে বসে তাদের বিশ্ব মানবতার ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবশ্যকতা বুঝিয়ে একটি সনদ প্রস্তাব করেন। মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সবাই এ সনদ মেনে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ নানা দিক বিবেচনা করে মদিনার সনদ প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করেন মানব ইতিহাসের প্রথম প্রশাসনিক সংবিধান মদিনা সনদ।

মদিনায় স্থায়ী ভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মদিনায় বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী, বিশেষ করে ইয়াহুদীদের সঙ্গে তিনি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। এভাবে তিনি মদীনার জীবনে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করে শান্তি স্থাপনে বলিষ্ট উদ্যেগ নেন।

২১৮। রওশন আলী খন্দকার (সম্পাদিত), mv¤ú‘wqK m¤úxwZ cwZôvq ivmj (mv.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৫, পৃ. ৫০

২১৯। ইবন হিশাম, cv¸ ³, পৃ. ৫৫৪

Dhaka University Institutional Repository

gw‘bv mb‡‘i 53wU aviv

ইবন হিশাম মদিনা সনদের ৫৩টি ধারা উল্লেখ করেছেন। তা নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এটি নবী মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষ হতে লিখিত। কুরায়শ, ইয়াসরিব ও এখানকার বসবাসকারীদের নিয়ে সম্পাদিত।

১.অন্যদের বিপরীতে এখানকার সকলেই এক উম্মাহ বলে গণ্য হবে।

২.কুরায়শ মুহাজিরগণ পূর্ব প্রথা অনুযায়ী রক্তপণ আদায় করবে। বন্দিদের মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাদেরকে মুক্ত করবে। যাতে মুমিনদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৩.বানূ-সা‘ইদাহ তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে।

৪.বানু আউফের আনসারগণ পূর্বের মত মুক্তিপণ পরিশোধ করবে। প্রত্যেক পক্ষই বন্দিগণকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে, যাতে মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক সাম্য ও সংহতি অব্যাহত থাকে।

৫. বানূ হারিস, বানূ জু’শাম, বানূ নাজ্জার, বানূ নাবীত ও বানূ আউস প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা পূর্ব প্রথা অনুযায়ী মুক্তিপণ পরিশোধ করবে। যাতে ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপনে সকলেই সমান সুযোগ পায়। (এ মর্মে ৬,৭,৮,৯,১০টি ধারা লিপি বদ্ধ ছিল)

১১. মুমিনদেরকে মিসকীন ও অভাবগ্রস্তরূপে ছেড়ে দেয়া যাবেনা। প্রয়োজন কালে যাতে যাবতীয় পাওনা তারা পরিশোধ করতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. কোন মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিন ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া অন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না।

১৩. যে ব্যক্তি অন্যায় অনাচার ও পাপ পংকিলতায় লিপ্ত থাকবে, মুত্তাকী মুমিনগণ সম্মিলিত ভাবে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।

১৪. কোন মুমিন ব্যক্তি কোন অবিশ্বাসী লোকের বিপরীতে কোন মুসলিমকে হত্যা করবে না। এমনকি কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে সহযোগিতা করা যাবেনা।

১৫.আল্লাহর জিম্মা সর্বজন মান্য। কোন সাধারণ নাগরিক কাউকে নিরাপত্তা দিলে সকলকে তার মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ইয়াহুদীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাদের আনুগত্য পোষণ করবে সেও সাম্য ও সমতার অধিকারী বলে গণ্য হবে। সে কোন অন্যায়ের শিকার হবেনা।

১৭. মুসলিমগনের সন্ধি অভিন্ন সন্ধি। আল্লাহ্র পথে কোন মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শত্রুর সাথে সন্ধি করা চলবেনা।

১৮.আমাদের পক্ষের শক্তিরূপে যারা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে, তারা একে অপরের সহযোগিতা করবে।

১৯.মুমিনগণ আল্লাহ্র পথে মারা গেলে একজনের রক্তের বদলা অপরজনকে নিতে হবে।

২০. মুমিনগণ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সহজ-সরল তথা সিরাতে মুসতাকীমে রয়েছে।

২১. কোন মুশরিক বা পৌত্তলিক ব্যক্তি মক্কার কোন কাফির কুরায়শ লোকের সম্পদ বা প্রাণের আশ্রয় দাতা হবেনা। কোন মুমিন ব্যক্তিকে এব্যাপারে বাঁধা প্রদান করা যাবেনা।

২২.কোন মুমিনকে যে ব্যক্তি হত্যা করবে আর সাক্ষ্য প্রমাণে তা সাব্যস্থ হবে, তার থেকে কিসাস নেয়া হবে। হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে। তবে হ্যা, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ রক্তপণ নিয়ে তাকে মাফ করে দিতে সম্মত হলে আর মুমিনগণের তাতে সায় থাকলে ভিন্ন কথা। এছাড়া কিসাসের কোন বিকল্প নেই।

২৩. যে ব্যক্তি এ চুক্তি নামার বিষয় বস্তুর সাথে একমত পোষণ করেছে আর সে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার জন্য কোন নতুন ফিতনা সৃষ্টিকারীদের সাহায্য করা ও আশ্রয় দান করা বৈধ হবেনা।

২৪. তোমাদের মাঝে কোন বিষয় নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে তা আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের নিকট উত্থাপন করতে হবে।

২৫. ইয়াহুদীগণ যে পর্যন্ত মুসলিমদের সাথে মিলে মিশে যুদ্ধ করবে সে পর্যন্ত তারা এ যুদ্ধের ব্যয়ও বহণ করবে।

২৬. বানূ আউফের ইয়াহুদীগণ মুমিনদের সাথে একই উম্মাহ রুপে গণ্য হবে। ইয়াহুদীগণ তাদের ধর্ম এবং মুসলিমগণ তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীন থাকবে। এটি তারা এবং তাদের অধীনস্ত গোলামদের জন্য ও প্রযোজ্য থাকবে। যে ব্যক্তি অন্যায় ও অপরাধ করবে, এর দায় সে এবং তার গৃহবাসীগণ ছাড়া অন্য কেউ বহণ করবেনা।

২৭. বানূ নাজ্জার ইয়াহুদীগণ বানূ আউফের ইয়াহুদীগণের মত স্বাধীনতা ভোগ করবে।

২৮. বানু হারিসের ইয়াহুদীগণও বানু আউফের মত অধিকার লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. বানূ সা'ইদা

৩০. বানূ জু'শাম

৩১. বানূ আউফও

৩২.বানূ সা'লার এসকল গোত্রের ইয়াহুদীগণও বানু আউফের ন্যায় অধিকার ভোগ করবে।

৩৩. জাফনা গোত্র ও সা'লাবার শাখা গোত্র, সা'লাবারা যে রূপ অধিকার ভোগ করবে তারাও তার অধিকারী হবে।

৩৪. বিশ্বস্ততায় বানূ শুতায়বা ও সে সকল অধিকার ভোগ করবে, যা বানূ আউফ করে থাকে। বিশ্বাস ভঙ্গে তা রহিত হয়ে যাবে।

৩৫. সা'লাবা গোত্রের অধীন তার দাস-দাসীগণও মূল গোত্রের মত স্বাধীনতা লাভ করবে।

৩৬. ইয়াহুদীগণের শাখা গোত্রগুলোও মূল গোত্রের ন্যায় অধিকার লাভ করবে।

৩৭. কোন গোত্র ও উপগোত্র মহানবী মুহাম্মদ (সা.)- এর অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে বের হবে না।

৩৮. জখম করার প্রতিশোধ গ্রহণের পথে কোন বাঁধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হবেনা। রক্তপাতে যে ব্যক্তি উদ্ধত সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং নিজ পরিজনের জন্যও ধ্বংস ডেকে আনবে। তবে নিপীড়িত ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, সে আল্লাহর আনুকল্য পাওয়ার উপযুক্ত।

৩৯. মুসলিম ও ইয়াহুদীগণের ব্যয়ভার তাদের নিজেদের উপর বর্তাবে।

৪০. এ চুক্তিপত্র গ্রহণকারী কোন গোত্র যদি অপর গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তাহলে অস্ত্র ধারীদের বিরুদ্ধে সকলে সম্মিলিত ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। চুক্তি গ্রহণকারীগণ একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, বিশ্বাস ভঙ্গ করবেনা। পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও মঙ্গল কামনার সম্পর্ক বজায় থাকবে।

৪১. কোন পক্ষ তার মিত্র পক্ষের অপকর্মের জন্য দায়ী হবেনা, তবে অত্যাচারিত সাহায্যের অধিকার লাভ করবে।

৪২. যত দিন পর্যন্ত ইয়াহুদীগণ মুসলিম সমাজের সঙ্গী ও সহযোদ্ধারূপে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তারাও যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহ করবে।

৪৩. ইয়াসরিব (মদীনা) অঞ্চল এ চুক্তি নামার সকল পক্ষের কাছে পবিত্র ভূমি বলে বিবেচিত হবে।

৪৪. কোন পক্ষের আশ্রিতরা আশ্রয়দাতার সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে। তাদের কোন ক্ষতিসাধন করা যাবেনা এবং তাদের সাথে অপরাধমূলক কোন কাজ করা যাবেনা।

৪৫. কোন মহিলাকে তার পরিবারের লোকজনের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. চুক্তিপত্রে একমত পোষণকারী পক্ষসমূহের মাঝে যদি নতুন করে কোন সমস্যার উদ্ভব হয়, যার ফলে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে এর মীমাংসার জন্য তা আল্লাহ ও তার রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে উত্থাপন করতে হবে। এ চুক্তি নামার বিষয়বস্তু আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকাও তার কাছে প্রিয়।

৪৭. মক্কার অবিশ্বাসী কুরায়শ সম্প্রদায় বা তাদের সহযোগী যে কোন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৪৮. চুক্তির সকল পক্ষ ইয়াসরিব আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

৪৯. অন্যদেরকে যখন সন্ধির জন্য আহবান জানানো হবে, তখন তাদেরকে আহবানে সাড়া দিতে হবে। অনুরূপ মুসলিমগণকেও সন্ধির জন্য আহবান জানানো হলে তাদেরও সন্ধিবদ্ধ হতে হবে। তবে কেউ যদি ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ন হয়, তবে তার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হবেনা।

৫০. প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার নিজের দিকের প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

৫১. আউসের ইয়াহুদীগণ নিজেরা এবং তাদের দাস-দাসীগণ এ চুক্তির শরীক পক্ষ হিসেবে সমান অধিকার লাভ করবে।

৫২.এ চুক্তিপত্র কোন অত্যাচারী বা অপরাধীর সহায়ক বিবেচিত হবেনা। যুদ্ধের যাত্রী ও মদীনায় অবস্থানকারী উভয়ই নিরাপত্তার অধিকারী বলে বিবেচিত হবে। তবে অত্যাচারী ও অপরাধী এর ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে।

৫৩. আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল (সা.) ঐ ব্যক্তির পক্ষে রয়েছেন, যে ব্যক্তি চুক্তি পালনে নিষ্ঠাবান ও আল্লাহভীরু।

সিরাতবিদ আল্লামা শিবলী নু'মানী বলেন, এ সনদের মাধ্যমে ইয়াহুদীগণ ও মুসলিমগণের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সনদে মদীনাবাসী ইয়াহুদী খ্রিস্টান, মজূসী, অগ্নি উপাসক এক কথায় সনদে স্বাক্ষরিত সকল সম্প্রদায় উম্মাহ ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়।[২২০]

এ সনদের ফলে

প্রথমত: বহুধা বিভক্ত মদীনাবাসীদের গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২২০। AMc¨_K, জুলাই-আগষ্ট, ২০১৩ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত: জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইয়াহুদী নাগরিকের সমান অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও কর্তব্যের সীমারেখা নির্ধারিত হয়।

তৃতীয়ত: স্বদেশত্যাগী মুহাজিরীনদের মদীনায় বাসস্থান ও জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা হয়।

চতুর্থত: মুসলমান এবং অমুসলমানের মধ্যে মৈত্রী, সদ্ভাব ও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে।

পঞ্চমত: মদীনায় ইসলামের ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐকমত্য বৃদ্ধি পেয়ে ধর্ম প্রচার ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। স্পষ্টতঃ এটা গোত্র ভিত্তিক আরববাসীদেরকে ধর্ম ও রাজনীতির ভিত্তিতে নতুন আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করে।

ষষ্ঠত: এ চুক্তি সম্পাদনকারী সব মানুষের জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তার গ্যারাণ্টী প্রদান করা হয়।

সপ্তমত: বর্ণ-গোত্র-গোষ্ঠি, ভাষা ও আঞ্চলিকতার উর্ধে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃ সমাজ, এক উম্মাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ চুক্তির ফলে মদীনায় নগর রাষ্টের উদ্ভব হল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পক্ষ হতে এ নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান স্বীকার করে নেয়া হল । রাসূলুল্লাহ(সা.) এর জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ গঠনের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

অষ্টমত: এ চুক্তির বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) আইন, বিচার, প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক বিষয়সমুহ নিজের ও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে দেন।

নবমত: এ চুক্তি অত্যাচার, বৈষম্য, অবিচার এবং এ প্রকৃতির অন্যান্য গর্হিত বিষয়গুলোর দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। আরববাসীদের ব্যক্তিগত ভাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রাচীন পদ্বতির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বিষয়টিকে একটি সম্মিলিত কর্তব্য রূপে সাব্যস্ত করা হয়।

দশমত: প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মূর এর বক্তব্য অনুসারে এ চুক্তির কল্যাণে রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন মহান পরিকল্পনাবিদ ও পরিচালকরূপে ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় বহুধা বিভক্ত, আদর্শ- বিশ্বাসে বিভিন্নমুখী ও পরস্পর হতে চরম বিচ্ছিন্ন একটি জনগোষ্ঠিকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করার সুকঠিন কাজটি একজন শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের ন্যায় পরম দক্ষতার সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন একটি রাষ্ট্র এবং এমন একটি জনসমাজ প্রতিষ্ঠার সাফল্য অর্জন করেন, যা ছিল আন্তর্জাতিক রীতিনীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।[২২১]

২২১। ইবন হিশাম, C৵¸ ³, পৃ. ৫৬১

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস প্রমাণ করে এই ঐতিহাসিক সনদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদমান কলহ ও অন্তর্ঘাতের অবসান ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি, প্রগতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, গোত্রীয় দম্ভ, ধর্ম বিদ্বেষ ও অঞ্চল প্রীতি মানবতার শত্রু ও প্রগতির অন্তরায়। মদীনা সনদ এর সবগুলোকে মুছে ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে।

এ সনদের প্রতিটি ধারা পর্যালোচনা করলে মহানবী (সা.) এর মানবাধিকার ঘোষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয়। ১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট, ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস এ্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) এর চৌদ্দশত বছর আগে মানবতার ঝাণ্ডাবাহী মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম মানুষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা করেন।

পরস্পর বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মহানবী (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র মানবমণ্ডলী ও অখণ্ড মানবতার এক চূড়ান্ত উত্তোরণ। পরিশেষে বলা যায়, মধ্যপন্থা, উদারতা, মানবিকতা, পরমত সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরায়নতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহানবী (সা.) এর আদর্শের বিশ্বজনীনতা। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য তাঁর আগমন। তিনি তাঁর নবুয়ত জীবনে এক দিকে মানুষের আত্মীক উন্নতি তথা, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টি, অন্য দিকে এ পৃথিবীতে মানুষের সাথে মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক কেমন হবে, তারও শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর এ শিক্ষা যতদিন পর্যন্ত মানুষ যথাযথ ভাবে পালন করেছে, ততদিন দুনিয়ার বুকে শান্তি বিরাজ করেছে। যখনি মানুষ তাঁর শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে তখনি দেখা দিয়েছে নানা সংকট ও সমস্যা। রাসুল (সা.) বিশ্ববাসীর সামনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে নজির রেখে গেছেন তা যেমন বিশ্বজনীন তেমনি কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালে ও সর্ব সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

mv¤c'vwqK m¤cxwZ cwZôvq KiAvb I nv'x‡mi fwgKv

আল কুরআন সকল মানুষের সার্বিক দিক ও বিভাগের সমন্বিত একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। সন্ত্রাস মুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে কুরআন উদাত্ত আহবান জানিয়েছে সকলকে। ইসলাম বিশ্ব মানবতার ধর্ম। সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে ইসলাম তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছে এবং সন্ত্রাস বা জনগণের মাঝে অশান্তি বিস্তারের ভয় দেখিয়েছে। সন্ত্রাসের বিপক্ষে এবং শান্তি ও সম্প্রীতির স্বপক্ষে কুরআন ও হাদিসের কতিপয় উল্লেখ্যযোগ্য অমীয় বাণী এখানে তোলে ধরা হলো :

১। "ধর্মে বাধ্যবাধকতা বা জোরের কোন স্থান নেই"।[২২২]

২। "সত্য এসেছে তোমার প্রভুর নিকট থেকে, যার ইচ্ছা হবে বিশ্বাস করবে এবং ইচ্ছা হবে অবিশ্বাস করবে"। [২২৩]

৩। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করেন। ন্যায় বিচার করবে, ইনসাফ করবে। এটাই তাকওয়া- খোদাভীতির নিকটতর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর তার সম্যক খবর রাখেন"।[২২৪]

৪। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "নিশ্চিত আমি আদম সন্ত্রানকে সম্মান দান করেছি"।[২২৫]

৫। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "ফিৎনা- ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন ব্যাপার"।[২২৬]

৬। "পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি কর না"।[২২৭]

৭। পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে,"তোমরা তাদেরকে মন্দ বল না যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে"। [২২৮]

৮। ইসলামের শিক্ষা হলো, অপরাধ যার শাস্তি ও তার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কেউই অন্য কারোও ভার গ্রহণ করবে না"।[২২৯]

২২২। আল কুরআন, ২:২৫৬
২২৩। আল কুরআন, ১৮:২৯
২২৪। আল কুরআন, ৫:৮
২২৫। আল কুরআন, ১৭:৭০
২২৬। আল কুরআন, ২:১৯১
২২৭। আল কুরআন, ৭:৫৬
২২৮। আল কুরআন, ৬:১০৮
২২৯। আল কুরআন, ১৭:১৫

Dhaka University Institutional Repository

৯। মানবতার মতৈক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পবিত্র কুরাআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে"।[২৩০]

১০। সামাজিক জীবনে সু-সর্ম্পক ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা ও সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে"।[২৩১]

১১। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে"। [২৩২]

১২। পরিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করবে আর আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও"। [২৩৩]

১৩। অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,"মনে রেখো যদি কোন মুসলমান অমুসলিম নাগরিকগণের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার উপর সাধ্যাতিত বোঝা (জিযয়া বা প্রতিরক্ষা কর) চাপিয়ে দেয় অথবা তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বণ করবো"।[২৩৪]

১৪। "প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি যার কথা ও হাত (কাজের নিপীড়ন) থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকেন"।[২৩৫]

২৩০। আল কুরআন, ৩:১০৩
২৩১। আল কুরআন, ৮:৪৬
২৩২। আল কুরআন, ৩:১১০
২৩৩। আল কুরআন, ৪৯:১০
২৩৪। সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাহ ওয়াল বাই, হাদীস নং-৩০৫২
২৩৫। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, মিশকাতুল মাসাবিহ, ইমান অধ্যায়, পৃ . ২

১৫। আল কুরআনের নির্দেশ হলো : "তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহ রজ্জু দৃড়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"।[২৩৬]

১৬। "বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়েও জঘণ্য"।[২৩৭]

১৭। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয়া, দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্খায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমি মহা পুরষ্কার দিব"।[২৩৮]

১৮। রাসুল (সা.) বলেন, "মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে তার ভাই এর অভাব পূরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অভাব পূরণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার বিপদ সমূহের মধ্যে থেকে কোন বিপদ দূর করবেন, আর যে কোন মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন"।[২৩৯]

১৯। রাসুল (সা.) বলেছেন, "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন । আল্লাহর কাছে প্রিয় সৃষ্টি হলো সে, যে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে"।[২৪০]

২০। আল কুরআন আজকের মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি ! তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য"।[২৪১]

২১। "আল্লাহ্র নিকট সে সর্বাপেক্ষা উত্তম যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম"।[২৪২]

২২। "ইহসান কর পিতা-মাতার প্রতি, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকীন, নিকট ও দূর পড়সী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের দাস-দাসীদের প্রতি"।[২৪৩]

২৩। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে মুমিনগণ ! "কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে ; কেন না, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী, অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা

২৩৬। আল কুরআন, ৩ : ১০৩
২৩৭। আল কুরআন, ২ : ১৯১
২৩৮। আল কুরআন, ৪ : ১১৪
২৩৯। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (২য় খ.), C/, ³, পৃ . ৪৬৩
২৪০। C/, ³, পৃ . ৪৬৩
২৪১। আল কুরআন, ৩:১১০
২৪২। ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, wgkKvZj gvmvwen, কলিকাতা : ১৩৫০ হি, পৃ.৪২৬
২৪৩। আল কুরআন, ৪ : ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরের মন্দ নামে ডেকো না, ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা তওবা না করে তারা জালিম"।[২৪৪]

২৪। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আমি বনী ঈসরাইলদের প্রতি (এ বিধান) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি, যে ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যে হত্যার অপরাধে অপরাধী নয় বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করলো, আর যে কোন ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রাখে"।[২৪৫]

২৫। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে ,"পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ"।[২৪৬]

২৬। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাঁধা দেয়ার কারণে সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ, তোমাদেরকে যেন কখনোই সীমালজ্ঘণে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালজ্ঘণে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর"।[২৪৭]

সুতরাং ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। বিশ্ব মানবতার মুক্তি, কল্যাণ, শান্তি নিহিত রয়েছে ইসলামে। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্ম থেকে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তারা কোন লোভে পড়ে, অত্যাচারিত হয়ে, অস্ত্রের ভয়ে বা ঝোকের মাথায় এটা করছেন না। বরং ব্যাপক অধ্যায়ন, গবেষণা, পর্যালোচনার পর ইসলামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন। সাম্প্রতিক কালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী অধিকাংশ নও-মুসলিমই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাষ্ট্রপ্রধান, ডক্টর, খেলোয়াড়, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার, ধনকুবের, সাংবাদিক, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এমনকি খ্রিস্ট ধর্মের ধারকবাহক, অনেক বিখ্যাত পাদ্রীও বর্তমানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন। তাঁরা অস্ত্রের মুখে, লোভে পড়ে, অত্যাচারিত হয়ে বা ঝোঁকের মাথায় নয় বরং বহু লেখাপড়া, চিন্তা, গবেষণার পর ইসলাম ধর্মকে ভালোবেসে মুসলমান হয়েছেন। তাই বলা যায়, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সর্বস্তরের মানুষকে উপহার দিতে পারে একটি শান্তি, সাম্য, সম্প্রীতির সমাজ, জাতি ও বিশ্ব ।

২৪৪। আল কুরআন, ৪৯ : ১১
২৪৫। আল কুরআন, ৫ : ৩২
২৪৬। আল কুরআন, ৪ : ৩২
২৪৭। আল কুরআন, ৫ : ২

Dhaka University Institutional Repository

5g Aa¨vq

c_g cwi‡”Q‘

Bmjvg ce evsjv‡‘‡ki agmgn

বাংলাদেশ বর্তমান অমুসলিমদের ঐতিহ্য ও সামাজিক লোকাচার ও অনুষ্ঠান সমূহের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রথমত প্রচলিত এসব ধর্মের ইতিহাস জানা অত্যাবশ্যক। তদুপরি এদেশে ইসলামের আগমন ও বিকাশের ফলে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে মুসলিমদের যে সম্পর্ক ও যোগসূত্র গড়ে ওঠে তারও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ জরুরী। এদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের ধর্ম ও জীবনধারার কালক্রমিক পরিবর্তন এবং সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে ইসলামের আগমন ও সমাজ জীবনে এর ব্যাপক প্রভাব বাংলার হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহণ করে থাকে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আর্যপূর্ব বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসের সুসংগঠিত রূপ ছিল না। বরং প্রাচীন বাংলার লোকজন নানা কৌমে ভাগ হয়ে বসবাস করতো।[১] এসব কৌমের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস ছিল। আর এসব বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো তাদের ধর্মানুষ্ঠান। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোন স্বীকৃত রূপ ছিল না। বরং সমাজ বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী ধর্মপূর্ব সমাজের ম্যাজিক, টোটেম, ট্যাবু ইত্যাদিই ছিল প্রাচীন বাংলার ধর্মের শাশ্বত রূপ। সীমিত ক্ষমতার মাধ্যমে প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে কিংবা প্রকৃতির রোষাণল হতে বাচাঁর জন্য এর তোষামোদ, পূজা-অর্চনা করা, জীব বলিদান, শক্তি ও তন্ত্র সাধনা ইত্যাদিই ছিল প্রাচীন বাংলার কৌমসমূহের ধর্ম বিশ্বাস। কৃষি প্রধান ও সমাজের ফল-ফসল বৃদ্ধির জন্য ধর্মানুষ্ঠান, বৃষ্টিপাতের জন্য পূজা-অর্চনা কিংবা ফসল উঠানোর কৃতজ্ঞতা উৎসব তৎকালীন ধর্ম বিশ্বাসের অন্যতম অঙ্গ হিসেবেই বিবেচিত হতো।[২] পরবর্তীতে আর্যদের আগমন এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১৭৫০ সনে উড়ান পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত কিরঘিজ অঞ্চল হতে আর্যদের কয়েকটি গোত্র ইরানে প্রবেশ করে।[৩]

---

১. অজয় রায়, evOvjx, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৭৭, পৃ. ১৩৪

২. A.K. Sur, *Prehistory and Beginnings of Civilization in Bengal,* K.P.Bagchi and co, Calcatta : 1969, P. 69

৩. এ কে এম নাজির আহমদ, evsjv‡'‡k Bmjv‡gi AvMgb, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা : ২০০৬, পৃ.৫

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর কালক্রমে আর্যগণ সিন্ধু, পাঞ্জাব হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাতেও আর্যদের আগমন ঘটে এবং চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আর্য প্রভাব বিস্তার লাভ করে।[৪] আর্যদের আগমনে প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। তাদের মাধ্যমেই প্রাচীন বাংলার জনগণ সর্বপ্রথম ধর্মের সুসংগঠিত রূপ প্রত্যক্ষ করে। আর্য সমাজ ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান। নানা প্রকার কল্পিত দেবদেবী ও প্রকৃতির পূজা ছিল আর্যদের ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য। তাদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। আর্যগণ বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে ভারতে আগমন করে। ড. সুকুমার সেনের মতে, "ভারতবর্ষে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি সম্ভবত দুই বা ততোধিক ধারায় এসেছিল। প্রথমে যা এসেছিল তাকে বলতে পারি প্রাচীন বা প্রাক-বৈদিক ধারা। পরে যা এসেছিল তা অর্বাচীন বা বৈদিক ধারা"।[৫]

বাংলাদেশে আগত আর্যগণ ছিলেন মূলত পরবর্তী তথা বৈদিক ধারা। তাদের প্রচারিত ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল তৎকালীন বাংলার প্রধানতম ধর্মবিশ্বাস। প্রচলিত বিভিন্ন কৌমের অসংগঠিত ধর্মবিশ্বাসকে আর্যদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্যবাদ এতটাই আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, সে সময়কার কৌম ধর্মগুলো ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য ধর্মানুষ্ঠান কিংবা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর্যপূর্ব যুগের বহু লোকাচার আর্যসমাজেও স্থায়ী আসন লাভ করে।

আর্যদের ব্রাহ্মণ্যবাদ ব্যাপকতা লাভ করে মূলত গুপ্ত শাসনামলে। গুপ্ত রাজাগণ আর্যদেরকে ভূমিদাস করে এদেশে বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেন।[৬] তাদের স্থায়ী বসতির ফলে এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনা, ইত্যাদির প্রচলন ঘটল বাঙ্গালী সমাজে। ধর্ম চর্চার সাথে এসময় বেদ-বেদান্ত ও সংস্কৃতি চর্চাও শুরু হলো। আর্যদের এ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব এত বেশি ছিল যে বাংলাদেশে নানা ধর্মের উত্থান ও আগমনেও এটি কখনই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। যদিও নানা কারণে ধর্মচর্চা কিংবা ব্রাহ্মণ্যবাদ স্তিমিত হলেও যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তা আবার স্বরূপে উজ্জীবিত হয়েছে যুগে যুগ। বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে রাজা শশাঙ্কের শাসনামলে। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৬০১ সনে গৌড়ের রাজা হোন শশাঙ্ক।[৭]

---

৪. ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, cvPxb evsjvi BwZnvm I ms¯wZ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা: ২০০৯, পৃ.৯২
৫. ড. সুকুমার সেন, evsjv mvwn‡Z¨i BwZnvm (১ম খ.), পৃস্তক বিপনি. কলিকাতা : ১৯৯৩, পৃ. ৯
৬. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, ivRv Aw'ïi I mvgjegv KZK e‡½ ^ew'K evÿY Avbqb: GKwU mvgwRK †cÿvcU, গবেষণা পত্রিকা,
কলা অনুষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ সংখ্যা, রাজশাহী : ১৯৯৮-৯৯, পৃ.৭১
৭. এ. কে. এম নাজির আহমদ , cv¸ ³, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রসারের চেষ্টা চালান। এসময় তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালান বলেও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনরায় বিস্তৃত হয় গৌড় ও বরেন্দ্র অঞ্চলে সেন বংশের শাসনামলে। সেন রাজাগণ ছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী। খ্রিস্টীয় ১০৯৮ সন হতে ১১৬০ সন পর্যন্ত রাঢ়ের রাজা ছিলেন বিজয় সেন।[৮] তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কুলীন প্রথা ইত্যাদির প্রচলন করেন। তার সময়ে ব্রাহ্মণগণ ব্যাপক রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সেন রাজবংশই ছিল বাংলার শেষ হিন্দু রাজ বংশ। পরবর্তীতে মুসলিমগণ এদেশে প্রভাব বিস্তার করেন এবং বাংলার সমাজ ও ধর্মীয় বিশ্বাসে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকতর হতে থাকে।

†eŠ× ag

আর্য যুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ ব্যতীত অপর যে ধর্মটি সমাজে সবচেয়ে বেশি বিস্তার করেছিল তা ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। মগৃধের রাজা বিম্বিসার এর শাসনামলে (খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৫ সন হতে খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৩ সন) মহামতি সিদ্ধার্থ গৌতম বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার শুরু করেন। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত এ ধর্মমত অতি অল্প কালেই বঙ্গদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠে।[৯] ঐতিহাসিক মতানুযায়ী মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্ব কালের (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ হতে ২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) পূর্বেই বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপকতা ও সমৃদ্ধির বর্ণনা পাওয়া যায়।[১০]

মৌর্য বংশীয় শাসকগণ যদিও ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়া সমথর্ক বলে পরিচিত ছিলেন তথাপিও দেখা যায় যে মহামতি অশোক নিজে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতোা তাকে বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা ও শান্তির বাণী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীতে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন।[১১] মৌর্য পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় সম্রাটগণ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন। তাদের সময় ব্রাহ্মণগণ ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কিন্তু এসময়ও বৌদ্ধ ধর্ম সমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের গুপ্ত রাজাগণও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেন।

বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ ছিল পাল রাজাদের শাসনামল। এসময় বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। পাল রাজাগণ সকলেই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং রাজবংশীয়ভাবে এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মূলত পাল রাজাগণই ছিলেন তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল। এ প্রসঙ্গে ড. সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় লিখেন:

---

৮. cÖv¸³, পৃ.১৬
৯. অজয় রায়, cÖv¸³, পৃ.১১৬
১০. RC Majumdar, *History of Ancient Bengla*, K.B. Printers, Calcutta :1974, p. 530
১১. এ, কে, এম নাজির আহমেদ, cÖv¸³, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

> "পালযুগে বাঙ্গালী শুধু বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েই ক্ষান্ত হয় নি; বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, বৌদ্ধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করে খ্যাতি লাভও করেছে। ধর্ম জীবনে এ প্রদেশব্যাপী আলোড়নের ফলে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম বন্যার জলের ন্যায়ই দেশের আনাচে কানাচে প্রবেশ লাভ করলো।[১২]

বস্তুত বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল বেশ সমৃদ্ধ। শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয় বরং এ ধর্মটি বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাবক হিসেবে কাজ করছিল। বাংলায় আগত পরিব্রাজকদের বর্ণনায় তদানীন্তন বৌদ্ধ শাসিত বাংলার উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিবরণ এর উৎকৃষ্ট প্রমান স্বরূপ। পঞ্চাশ শতাব্দীতে ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত নগরীতে ২২টি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন।[১৩] পরবর্তীকালের পরিব্রাজক ইউয়ান চুয়াং, শেং-চি, উৎ-সিং প্রমুখের বর্ণনায় বৌদ্ধ ধর্মের নানা বিবরণ ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। ইউয়ান চুয়াং তৎকালীন বাংলার চারটি আঞ্চলিক রাজ্যে মধ্য-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বিস্তীর্ণ ফসলভরা গ্রামাঞ্চল, জনবসতিপূর্ণ নগরী ও বৌদ্ধ বিহার প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি প্রতিটি রাজ্যেই অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিটি বিহারে এক বা দুইশত ভিক্ষু অবস্থান করতেন বলেও মন্তব্য করেন।[১৪] ঐতিহাসিক ব্যারি মরিসন বাংলার ভূমি সংক্রান্ত লিপিমালা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম মেহোনার পূর্বাঞ্চলে সমৃদ্ধ ছিল এবং এ ধর্ম এ অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।[১৫]

বাংলার পাল সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম তার সোনালীযুগ অতিক্রম করলেও ভারতের অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের তখন পতনের যুগ শুরু হয়ে গেছে। ক্রমে বাংলাতেও এর ছোঁয়া এসে লাগে। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি বা পতনের জন্য দায়ী বাংলার অন্যান্য ধর্ম। বিশেষ করে হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপ ও প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম রূপান্তরিত হতে থাকে। এসময় তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির অনুরূপ মহাযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা ধরণের মতবাদ সাধন ভজন পদ্ধতি গড়ে

---

১২. ড. সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ms¯'Z mwn‡Z¨ ev½jxi Ae'vb, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা : ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪

১৩. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, cv¸³, পৃ.৭১

১৪. J. Legge (ed), *A Record of Buddhist Kingdoms by Fa-hiem*, Oxford Unfversity Press, USA : 1886, p.100

১৫. S. Beal, *Buddhist Record of the Western World II*, Macmillan Press Ltd, London : 1884, p.194

উঠে।[১৬] প্রাচীন বাংলার বিশ্বাস ও আচারের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম এতটাই আত্মসমর্পণ করে যে ব্রাহ্মণ্যবাদের মত বৌদ্ধ ধর্মেও দেবদেবীর পূজা-অর্চনা শুরু হয়ে যায়। যা তৎকালীন লৌকিক হিন্দু ধর্ম হতে খুব একটা ভিন্নতর ছিল না। মূলত এভাবেই স্বকীয়তা হারিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের শাখা হিসেবেই পরিবর্তিত হয় যা পরবর্তীতে এর বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। প্রখ্যাত গবেষক ট্রেভর লিং বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের পতনের জন্য রূপান্তরকেই দায়ী করেন। তার মতে, বৌদ্ধদের এ অবনতির জন্য ইসলাম দায়ী নয় বরং তার নিকটতর ব্রাহ্মণ্যবাদ ও প্রাচীন বাংলার ধর্মগুলোর ব্যাপক প্রভাবই ছিল প্রধানতম কারণ।[১৭]

ˆRb ag

আর্যদের অপর ধর্মমত জৈন ধর্মও একসময় বাংলার রাঢ় অঞ্চলে তৎপরতা লাভ করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন তীর্থংকর মহাবীর যখন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রাঢ় দেশে এসেছিলেন তখন সে সময়কার লোকেরা তার উপর কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল বলে জৈন পুথিতে উল্লেখ রয়েছে।[১৮] কিন্তু তা সত্ত্বেও জৈন ধর্ম বাংলায় বেশ প্রসার লাভ করে। বিশেষ করে সম্রাট অশোকের সময় পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে নির্গ্রন্থ জৈনদের বসবাসের প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতকে উত্তর-বাংলাতে জৈন ধর্মের প্রচার ও প্রসারের বর্ণনাও বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত। সর্বোপরি এদেশে জৈন ধর্মের প্রসারের প্রধানতম দলীল সম্ভবত জৈন গোদাসগনীয় ভিক্ষুদের চারটি শাখার নামকরণ হতে গ্রহণ করা যায়। জৈনকল্প সূত্রে এ চারটি শাখার নাম তাম্রলিপ্ত, কোটিবর্ষীয়া, পোংডবর্ধনীয়া ও খব্বডীয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] লক্ষণীয় যে এ নামগুলো প্রাচীন বাংলার তাম্রলিপ্ত, কোটিবর্ষ (দিনাজপুর), পুণ্ড্রবর্ধন (বগুড়া) ইত্যাদি অঞ্চলের নাম হতেই গৃহীত। স্বভাবতই এটি প্রাচীন বাংলার জৈন ধর্মের প্রচলন ও প্রসারের অন্যতম প্রমাণস্বরূপ।

গুপ্ত শাসনামলে জৈন ধর্মের ব্যাপক প্রসারতার কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে গোয়াল ভিটা (প্রাচীন গোহালী) নামক স্থানে আবিষ্কৃত জৈন বিহারের ধ্বংস বিশেষ গুপ্ত যুগেরই নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়। সুন্দরবন, দিনাজপুর, বাকুঁড়া ইত্যাদি স্থানে আবিষ্কৃত জৈন

---

১৬. অজয় রায়, c৷¸ ³, পৃ. ১৬৮

১৭. Trevor Line, *Buddhist Bengal and After, D. Chattopadhayaya (ed), History and Society,* Calcutta : 1978, p.320-323

১৮. অজয় রায়, c৷¸ ³, পৃ. ১৬৪

১৯. c৷¸ ³, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

বিহারের ধ্বংস বিশেষ গুপ্ত যুগেরই নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়। সুন্দরবন, দিনাজপুর, বাকুড়া ইত্যাদি স্থানে আবিষ্কৃত জৈনমূর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাল আমলের জৈন ধর্মের প্রচলনের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। চালুক্যরাজ বীরবলের মন্ত্রী বস্তপালের জৈনতীর্থ দর্শনের ইতিবৃত্ত হতে এয়োদশ শতকেও বাংলায় নির্গ্রন্থ জৈনদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এর পরবর্তী সময় হতে জৈনদের উল্লেখযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বস্তুত পাল আমল হতেই জৈনদের পতন শুরু হয় এবং কালক্রমে একসময় বাংলায় এদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

‰eòe gZev`

হিন্দু, বৌদ্ধদের পাশাপাশি বাংলায় বৈষ্ণব মতবাদেরও জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক। বিশেষ করে পঞ্চম শতাব্দীকাল হতে এয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ মতবাদ বাংলার ধর্মীয় জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন এ মতবাদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছিল। সে সময়কার ভূমি সংক্রান্ত লিপিমালা বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত গবেষক ব্যারি মরিসন প্রমাণ করেছে যে- "সে যুগে সবচেয়ে জনপ্রিয় মতবাদ ছিল বৈষ্ণব মতবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ কিংবা বৌদ্ধ ধর্ম নয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, উত্তর, মধ্য ও পূর্ববঙ্গে সে সময় নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে ভূমিদান সংক্রান্ত যে সব লিপিমালা জারি হয়েছিল তন্মধ্যে ৭২টি লিপিই ছিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য। বাকী দু'টি ছিল শৈব প্রতিষ্ঠানের"।[২০]

বস্তুত বৈষ্ণব মতবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদেরই অংশ বিশেষ। যদিও কিছুকালের জন্য এটি আলাদা ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সত্ত্বেও বলা যায় যে প্রাচীন বাংলার অন্য ধর্মগুলোর প্রভাবে এটি বেশি দিন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেনি। বিশেষত রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারানোর ফলে এর প্রচার ও প্রসার রুদ্ধ হয়ে ক্রমে এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

Ab¨vb¨ ag

প্রাচীন বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধ ধর্ম, কিংবা জৈব ও বৈষ্ণব মতবাদ ছাড়াও আরো বেশ কিছু স্বতন্ত্র ধর্ম ও মতবাদের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। তবে প্রকৃতপক্ষে এসব মতবাদ কোনটিই আর্যপূর্ব কৌম ধর্ম ও আর্য ধর্মের লোকাচার, বিশ্বাস ইত্যাদির ভিতকে নাড়াতে পারেনি। বরঞ্চ সামান্য পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে পৃথক ধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিছু কিছু ধর্ম আবার

---

২০. Barrie M. Morison, *Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal*, Tucson : 1970, P. 154

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণ্যবাদ এর বিশেষ ব্যাখ্যা হিসেবে মূল আর্য ভিত্তিকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় ছোট ছোট এসব ধর্ম ও মতবাদ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আজীবিক ধর্ম, শৈবধর্ম, নাথ ধর্ম, পৌরানিক ধর্ম, গণেশ্বর মতবাদ, সহজিয়া মতবাদ ইত্যাদি। জৈনপূর্ব কিংবা সমসাময়িক ধর্ম হিসেবে আজীবিক মতবাদ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রচারক ছিলেন দাস বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মখলিপুত্র গোসাল। তিনি গৌতম বুদ্ধের গুরু ছিলেন বলেও জানা যায়। বাংলার পাঠালিপুত্র, রাঢ় ইত্যাদি অঞ্চলে এদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। বিশেষ করে মহাবীর যখন রাঢ় অঞ্চলে জৈন ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন তখন তিনি বড় বড় লাঠিধারী আজীবিক ধর্ম প্রচারকদের দেখা পেয়েছিলেন।[২১] পরবর্তীতে আজীবিকগণ নির্গ্রন্থ জৈনদের সাথে মিশে যায়। আর্যপূর্ব কৌম সমাজের ধ্যান ধারণা ও ধর্ম বিশ্বাসের সর্বাপেক্ষা সাদৃশ্য নিয়ে শৈবমিত্র বাংলায় একসময় প্রচলিত ছিল। মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ও শশাঙ্কের মাধ্যমে এ ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছিল। সহজিয়া মতবাদ ছিল বাংলায় তুলনামূলক নবীন মতবাদ। মুলত এটি ছিল প্রাচীন ধর্মগুলোর প্রতিক্রিয়া হতে সৃষ্ট ধর্ম। বিশেষ করে সেন শাসনামলে হিন্দু ধর্মের প্রভাবে সমাজে নানা বর্ণভেদ ও বৈষম্যের প্রতিবাদেই এ মতবাদের উদ্ভব ঘটে। রমেশচন্দ্র মজুমদার স্পষ্ট ভাবেই হিন্দু শাসনের শেষভাগে এ মতবাদের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।[২২] এ সম্প্রদায় ছিল মূলত অতীন্দ্রিয়বাদী ও আধ্যাত্ম সাধনায় বিশ্বাসী। তারা তুচ্ছ জাত বিচারের উর্ধ্বে উঠে মানুষের অন্তর্নিহিতো ঐক্যের কথা বলতেন। বস্তুত এটি নতুন কোন মতবাদ ছিল না। বরং পূর্বতন ধর্মের মধ্যেই এর বীজ লুকিয়ে ছিল। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে চর্যাপদে, প্রাথমিক পর্যায়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে, নাথ ও বাউল সাহিত্যে এ মতবাদ বিবৃত ছিল। তবে এ মতবাদ ব্যাপক প্রসার লাভ না করার পেছনে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সহজিয়া মতবাদ ব্যক্তি জীবনকে যেরূপ প্রভাবিত করেছিল, সমাজ ও রাজনীতিকে সেরূপ প্রভাবিত করতে পারেনি। এজন্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এটি ব্যক্তি পর্যায়েই রয়ে যায়। বর্তমান কালেও এ ধরণের মতবাদের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। তবে পূর্বকালের ন্যায় আজো এটি ব্যক্তি দর্শন হিসেবেই পরিচিত। ব্যাপক প্রচার পায়নি কখনোই।

---

২১. অজয় রায়, C৶¸ ³, পৃ. ১৬৫

২২. ট্রেভর লিং, C৶¸ ³, পৃ. ৩২০

Dhaka University Institutional Repository

Bmjvgce ag¸‡jvi ‰ewkó¨

বাংলায় ইসলামপূর্ব যে সব ধর্ম প্রচলিত ছিল তা মূলত ছিল দু'ধরণের। আর্যপূর্ব কৌম ও আর্য ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে আর্য ধর্মগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেও বাংলায় এটি তাদের মূল রূপ ধরে রাখতে পারেনি। বরঞ্চ কৌম ধর্মগুলোর প্রভাবে এগুলো ব্যাপকভাবে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় কৌম ধর্মগুলোর আচার-অনুষ্ঠান আর্য ধর্মে নব্যদীক্ষিত লোকজন ছাড়তে পারেনি বরং দু'ধরণের ধর্মকে একীভূত করে বাংলার এক ভিন্ন ধরণের ধর্মবিশ্বাস চালু করে। আর্য ধর্মের উপর কৌম ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাবে ইসলামপূর্ব বাংলার ধর্মগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

1| gvZZwšKZv

বাংলার আর্যপূর্ব কৌমগুলো ছিল মাতৃতান্ত্রিক। আর্য ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদে এ মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব ছিল ব্যাপক। এজন্যই দেখা যায় যে আর্য ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের শান্তির মূল নিয়ামক একজন দেবীরূপী নারী। দেব সাধনার তুলনায় আর্য ধর্মে দেবীদের সাধনাই প্রধান হয়ে ওঠে। দেবীরূপে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রমুখ মূলত কৌম সম্প্রদায়গুলোর মাতৃতান্ত্রিকতারই প্রভাব বলে মনে করা যায়। হিন্দুদের নানা দেবী সম্পর্কে অজয় রায় মন্তব্য করেন :

> ÒAbgvb Kiv nq RwZ‡Z Giv wQ‡jb wewfb †KŠ‡gi Aviva¨ †‘ex| Kvj µ‡g wewfb †KŠ‡gi †gjv‡gkvi wfZi w‘‡q Gme †‘ex‡‘i I mgv‡Ri A½xfZ n‡q‡Q| hv wQj GKKv‡j cvPxb wekvm µ‡g Zv-B evþY cavb mgv‡Ri ag wekv‡mi Ask wn‡m‡e পরিগণিত হয়েছে। বিভিন্ন কৌমের আরাধ্য দেবীরা ক্রমে দুর্গা, কালী, চণ্ডী প্রভৃতি রূপের সাথে মিশে গেছেন"। [২৩]

2| agvbôvb

কৌম সমাজের ধর্মানুষ্ঠান আর্য প্রধান ধর্মকে প্রভাবিত করেছে নানা ভাবে। দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করা, অদৃশ্য শক্তির আরাধনা, বিশেষ গাছ-পাথরকে সিদুঁর, কলাপাতা ইত্যাদি দিয়ে পূজা-অর্চনা করা, গ্রাম দেবতা, বনদেবতা ইত্যাদি পৃথক পৃথক দেবতার উপাসনা মূলত কৌমদেরই ধর্মানুষ্ঠান। পরবর্তীতে যা হিন্দু ধর্মের মূল আচার অনুষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত হয়ে যায়। পরবর্তীতে বৈদিক ব্রাহ্মণরা

---

২৩. অজয় রায়, cv¸³, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

পাথর পূজা ও গ্রাম দেবতা ইত্যাদির পূজা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানগুলোর প্রভাব ব্রাহ্মণদের এরূপ বিধান কার্যকর করতে দেয়নি কোনদিন।

3| Kwl cavb Abôvb

বাংলার প্রাচীন কৌমগুলো ছিল কৃষি প্রধান। কৃষিই ছিল তাদের জীবন ও জীবিকা। তাদের দৈনন্দিন চলাফেরা, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি সবই ছিল কৃষি ভিত্তিক। এজন্য সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ধর্মানুষ্ঠানেও ছিল কৃষি প্রাধান্য। কৃষির সফলতায় পূজা পার্বন করা কিংবা ধর্মানুষ্ঠানে কৃষি উপকরণ ব্যবহার ইত্যাদি ছিল কৌম সম্প্রদায়েরই প্রচলন।

পরবর্তীতে হিন্দু সমাজেও এসবের প্রচলন ব্যাপকতা পায়। পূজা-অর্চনা ও সামাজিক লোকাচার ধান, দূর্বা, ধানগুচ্ছ, কলাগাছ, হলুদ, পান-সুপারি ইত্যাদির ব্যবহার প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিরই নিদর্শন। তাছাড়া নবান্ন উৎসব, বীজ ছাড়াবার অনুষ্ঠান, শালিক ধান বুনবার অনুষ্ঠান, প্রথম ফলনকে কেন্দ্র করে উৎসব, পিঠা-পুলী উৎসব ইত্যাদি ছিল বাঙ্গালীর কালক্রমিক রূপান্তরিত ধর্মানুষ্ঠান। বর্তমানেও এগুলো সমাজ ও সংস্কৃতিরই পরিচায়ক।

4| ag wekvm

কৌম সম্প্রদায়গুলোর ধর্মবিশ্বাস আর্য ধর্মগুলোতে প্রভাব পেয়েছিলো ভালভাবেই। কৌম সমাজের আদিমতম ভয়, আশা, বিশ্বাস ইত্যাদিকে হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করতে পারেনি কোনদিন। যাদুবিশ্বাস, টোটেম, ট্যাবু ইত্যাদির প্রচলন আজো লক্ষণীয়। হিন্দুদের চড়ক পূজার অনুষ্ঠান আমাদেরকে আদিম সমাজের যাদুবিদ্যা অনুষ্ঠানের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া কৌম সমাজের টোটেমও বর্তমানে লক্ষণীয়। কৌম সমাজে নানা পশুপাখি ছিল টোটেম স্বরূপ। এগুলির মূর্তি কিংবা ছবি তারা পূজা করতো। পরবর্তীতে বৈদিক আর্য ধর্মেও এর সাদৃশ্য বিস্ময়কর হলেও সত্য। পৌরানিক কাহিনীতে নানা পশুপাখির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-সরস্বতীর বাহণ হাস, লক্ষ্মীর বাহণ প্যাঁচা, দুর্গার বাহণ সিংহ, বিষ্ণুর বাহণ গরু ইত্যাদি। তাছাড়া গনেশ, মনসা ইত্যাদির পূজাও টোটেম এরই আধুনিক ও পরিবর্তিত সংস্করণ হিসেবে আজো টিকে আছে সারা বাংলায়।

5| Kms¯‹vi I ‡cŠiwbKZv

প্রাচীন কালের ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম দিক ছিল কল্পনা প্রবণতা ও কুসংস্কার। বস্তুত জ্ঞানের অভাব ও প্রকৃতির সামনে অসহায়তার কারণে মানুষ বাধ্য হয়েই নানা কল্পকাহিনী, পৌরানিক রূপকথা তৈরি

করতো, আশ্রয় নিত নানা কুসংস্কারে। বাংলার প্রাচীন কৌমগুলোতে এগুলো ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পরবর্তীতে মানুষ এসব কল্পনা প্রবণতা ও কুসংস্কার হতে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বরং যখনই কোন সমস্যার যৌক্তিক সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে জন্ম নিয়েছে নানা কল্পনা ও কুসংস্কার। এমনকি মুসলিম শাসনের অব্যবহিতো পূর্বেও বাংলায় পৌরানিক মতবাদের উত্থান এসবেরই সাক্ষ্য বহণ করে। কৌম সম্প্রদায়ের মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়ে রাখার প্রথা আজো খাসিয়াদের মাঝে বর্তমান।[২৪] মৃত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য শ্রাদ্ধ, মৃতদের খাবার দেয়া, আত্মার শক্তিশালী হয়ে ওঠা, গ্রামদেবতার কাছে মানত করা, পশু বলি এমনকি নরবলি দেয়া ইত্যাদি কুসংস্কার বাংলার প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল।

6| Zšmvabv I Ava¨wZ¦KZv

প্রাচীন যুগের ধর্মগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তন্ত্রসাধনা ও আধ্যাত্মিকতা। এগুলো ছিল ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী আচার অনুষ্ঠান। যাদু-মন্ত্র, ঝাঁড়ফুঁক, বান মারা ইত্যাদির মাধ্যমে আলৌকিক শক্তির সাহায্য প্রার্থনা ছিল তৎকালীন ধর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বস্তুত প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি দুর্বলতা ও অজ্ঞানতা হেতুো এ বিষয়গুলো সমাজে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কৌম সমাজের এসব তন্ত্রসাধনাই পরবর্তীতে আর্য ধর্মের ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে হয়। অজয় রায় লিখেছেন, "ভাল ফসল, জমি উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি কামনায় সে কালের মানুষ যে অনুষ্ঠানসমূহ পালন করতো কালে আদি তাৎপর্য হারিয়ে পরবর্তীকালের ধর্মচেতনার প্রলেপে রঞ্জিত হয়ে তা-ই তান্ত্রিক সাধন-ভজন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে"।[২৫]

তন্ত্র ও শক্তি সাধনার পাশাপাশি আত্মিকতাও ছিল ইসলামপূর্ব ধর্মগুলোর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। ধ্যান-জ্ঞান, সাধনা, সন্ন্যাসব্রত পালন, গৃহত্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক পরিচর্যার দৃষ্টান্ত ঐসব ধর্মে ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। বিশেষ করে সেন শাসনামলে হিন্দু জাতিভেদ প্রথার ব্যাপক উত্থানের প্রতিক্রিয়ায় বাংলায় মরমীবাদের জন্ম হয়েছিল।[২৬]

সাধন-ভজনের এ ধারা অবশ্য নানারূপে বাংলার সমাজে ঠাঁই পেয়েছিল। গৃহত্যোগ করে গুহাবাসী হয়ে ধ্যান করা কিংবা আশ্রয়স্থলে সামাজিকভাবে সাধনা করা বা বাউল গান, দেহতোত্ত্বিকগণের মাধ্যমে অধ্যাত্ম সাধনা করার নজির ছিল লক্ষণীয়। অনেক গবেষক অবশ্য মনে করেন যে এসব

---

২৪. অজয় রায়, cÖv¸³, পৃ.১৬১
২৫. অজয় রায়, cÖv¸³, পৃ.১৫৯
২৬. ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, cÖv¸³, পৃ.৯৫

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক সাধনার উপাদানসমূহ তন্ত্রসাধনারই অন্যরূপ। অর্থাৎ তন্ত্রসাধনার কঠোর ও ভয়াবহ পদ্ধতির বিপরীতে কোমলধর্মী ও আর্য নিয়ন্ত্রণের এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলেই জন্ম নেয় আধ্যাত্মবাদ।

7| eYev‘

বাংলায় ইসলামপূর্ব আর্য ধর্ম, ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা সনাতন ধর্মের প্রধানতম সামাজিক সংগঠন ছিল বর্ণবাদ বা বর্ণাশ্রম প্রথা। সমাজের মানুষদেরকে একই ধর্মের মধ্যে রেখেও উঁচু-নীচু বিভেদ তৈরী করে সামাজিক বৈষম্য ও অনাচারের পথ সুগম করতে এ প্রথা ছিল অদ্বিতীয়। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরাই ছিল সর্বপ্রধান। এমনকি তাদের নামানুসারে সে ধর্মকে ব্রাহ্মণবাদও বলা হতো। বাকী স্তরগুলো ছিল যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র। এছাড়া চণ্ডাল বা অস্পৃশ্য নামে অলিখিত বর্ণ ও ছিল প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনে। বস্তুত মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ কর্তৃক তাদের ধর্মকে ব্যবহার করে সমাজে নানা স্তরের সৃষ্টির ফলে শাসক ও ধর্ম প্রধানদেরই পার্থিব সুবিধা অর্জিত হয়। বর্ণবাদের এ প্রথা সমাজে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে যুগে যুগেই বাংলার মানুষ এ প্রথার হাত হতে বাঁচার জন্য ধর্মান্তরিত হয়। বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ক্ষেত্রে এর অবদানও কম নয়। এমনকি সেন বর্মণ যুগে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানে বর্ণ প্রথা পুনরুজ্জীবিত হলে এর প্রতিক্রিয়ার মরমীবাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় বলে জানা যায়।

8| D‘viZv I gvbeZv‡eva

প্রাচীন বাংলায় ধর্মসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহণশীলতার উদাহরণ ছিল বেশ লক্ষণীয়। বিশেষ করে কৌম ধর্মগুলোর আচার অনুষ্ঠান আর্য ধর্ম আসার পরও প্রচলিত ছিল বিনা বাঁধাতেই। যদিও আর্য ধর্মের ব্যাপক প্রভাব ও আত্মীকরণের ফলে কৌম ধর্মগুলো স্ব স্ব অবস্থান ধরে রাখতে ব্যার্থ হয়। বস্তুত বাংলার জনগণ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানে নিজেদের উদার ও মানবতাবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সর্বদাই। এজন্য দেখা যায় গোত্রতান্ত্রিক কৌমগুলোর পৃথক ধর্ম থাকার পরও ক্রমান্বয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক, বৈষ্ণব মতবাদ, সহজিয়া মতবাদ ইত্যাদি ধর্ম বাংলায় প্রসারিত হয় কোণরূপ সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই। সামগ্রিকভাবে এ কথা বলা যায় যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাংলা নিজের মতো করে গড়ে তুলেছিল, আগত বৈদিক ধর্ম বিশ্বাসকে নিজের আর্যপূর্ব মানষিকতা ও স্থানীয় উদারতা দিয়ে সিক্ত করেছিল, যার মধ্যে মানবতা ও উদারতা প্রধান্য লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল।[২৭] গবেষক নীহাররঞ্জন রায় লিখেন, ‘‘এ উদার সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শের ওপরই মধ্যযুগীয় বাংলার বৃহত্তম ও গভীরতম ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের অর্থাৎ চৈতন্যদের প্রভাবিত সমাজ ও ধর্মান্দোলনের প্রতিষ্ঠা” ।[২৮] অবশ্য বাংলার এ ধর্মীয় উদারতার দৃষ্টান্ত কেবল জনমনেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন বাংলার এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে দেখা যায় সম্রাট বা রাজাগণ অন্য ধর্মের উপাসনালয়গুলোতে অর্থ সাহায্য করেছেন। তাদের প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানে একত্মতা ঘোষণা করেছেন, ধর্ম কাজে ভূমিদান করেছেন। আমার তৎকালীন সাহিত্যে ও গানে ভিন্নধর্মী রাজাদের প্রশস্তি ও বন্দনার উল্লেখও বিরল ছিল না। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রাজাগণ বেশ উদার ছিলেন বলে দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা অহিংসা ও সাম্য-শান্তির বাণী অনুসারে তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারে পৃষ্টপোষকতা করলেও অন্য ধর্মের প্রতিও ছিলেন যথেষ্ট সহণশীল। এমনকি অনেক সময় বৌদ্ধ রাজাদের সহণশীলতার এরূপও মনে হয়েছে যে তারা বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছেন।[২৯] শাসকদের এসব উদারতার প্রভাব বাংলার জনগণের মাঝেও প্রশান্তি নিয়ে এসেছিল। ধর্মীয় সম্প্রীতির এ ধারা পরবর্তীতে বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের অংশ হয়ে যায়।

9| we‡iva I msNl

ধর্মীয় উদারতা ও মানবতাবোধ বিদ্যমান থাকলেও প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় কারণে নির্যাতন ও বিরোধের ঘটনাও বিরল ছিল না। তবে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় দেখা যায় যে এসব নির্যাতন, বিরোধ কিংবা সংঘর্ষ ছিল মূলত রাজা ও শাসকদের দ্বারাই। সাধারণ জনগণের এখানে কোন স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল না। এমনকি সাধারণ জনগণের দ্বারা সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় দাঙ্গা কিংবা সংঘর্ষের কোন ঘটনাই ইতিহাসে প্রমাণিত হয়নি।

রাজাগণ স্বীয় ধর্ম প্রচারার্থে অন্য ধর্মাবলম্বীদের অত্যাচার-নিপীড়ন করতেন। রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপর ব্যাপক অত্যাচার চালান। তিনি বৌদ্ধদের বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেন, বহু বৌদ্ধ বিহার ও নিদর্শন নষ্ট করে ফেলেন। এমনকি বৌদ্ধদের হত্যো করার জন্য সরকারি নির্দেশও জারি করেন।[৩০] রাজা অশোক পুণ্ড্রবর্ধনের নিগ্রহ জৈনদের অপরাধে পাটালীপুত্রের প্রায় ১৮০০০ আজীবিকদের হত্যো

২৭. আব্দুল মমিন চৌধুরী, “বাংলায় ইসলাম বিস্তারের পটভূমি”, evsjv‡'k GwkqwUK †mvmvBwU cwÎKv, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, (চতুর্থ খ.), ঢাকা : ১৯৮৩, পৃ. ৬৩

২৮. নীহাররঞ্জন রায়, ev½vjxi BwZnvm, আদিপাঠ, কলিকাতা : ১৯৪৯, পৃ. ৮৬০

২৯. নীহাররঞ্জন রায়, cv¸³, পৃ.৮৬৩

৩০. এ, কে, এম নাজির আহমদ, cv¸³, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়।[৩১] তাছাড়া সেন আমলে হিন্দু ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর যে অত্যাচার চালানো হয় তা আজো বাংলার ধর্মীয় সম্প্রীতির ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে গণ্য হয়। মূলত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসব বিরোধ ও অত্যাচার ইতিহাস বাদ দিলে প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য মানবতাবোধ ও সহণশীলতায় পরিপূর্ণই ছিল বলা যায়।

10| ivóªxq c„ô‡cvlKZv

প্রাচীন বাংলার ধর্মগুলো মূলত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাতেই পরিপুষ্ট হয়েছে। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যেসব ধর্ম রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা লাভ করেছে সেগুলোই প্রচারও লাভ করেছে সর্বাধিক। অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতার অভাবে অনেক ধর্মই বিলুপ্ত হয়েছে কালক্রমে। যেমন- আজীবিক ধর্ম, নাথ ধর্ম, অবধৃতদের ধর্ম ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলার রাজাগণ প্রায় সবাই ছিলেন নিজ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। অন্য ধর্মের প্রতি সহণশীলতা বজায় রাখলেও নিজ ধর্মের সাহায্য সহযোগিতায় তারা পুরো রাজশক্তি ব্যবহার করতেন। ফলে যুগে যুগে বাংলায় রাজধর্ম হিসেবে নানা ধর্ম বিশেষ করে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। প্রাচীন রাজাগণ ও রাজবংশগুলো যে ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতো তা হলো-[৩২]

পৃষ্ঠপোষক	শাসনাধীন অঞ্চল	ধর্ম
• রাজা বিম্বিসার	মগধ	বৌদ্ধ ধর্ম
• নন্দ বংশ	মগধ	বৌদ্ধ ধর্ম
• হর্যঙ্ক	মগধ	বৌদ্ধ ধর্ম
• মৌর্য বংশ	মগধ	ব্রাহ্মণ্যবাদ
• অশোক মৌর্য	মগধ	বৌদ্ধ ধর্ম
• গুপ্ত বংশ	মগধ	ব্রাহ্মণ্যবাদ
• রাজা শশাঙ্ক	গৌড়	ব্রাহ্মণ্যবাদ
• ভদ্র বংশ	বঙ্গ	ব্রাহ্মণ্যবাদ
• খড়গ বংশ	সমতট	বৌদ্ধ ধর্ম

৩১. অজয় রায়, cv¸³, পৃ.১৩৭
৩২. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, cv¸³, পৃ.৮

Dhaka University Institutional Repository

• দেব বংশ	সমতট	বৌদ্ধ ধর্ম
• পাল বংশ	গৌড়	বৌদ্ধ ধর্ম
• চন্দ্র বংশ	সমতট	বৌদ্ধ ধর্ম
• বর্মণ বংশ	গৌড় বরেন্দ্র	ব্রাহ্মণ্যবাদ
• সেন বংশ	গৌড়	ব্রাহ্মণ্যবাদ

তৎকালীন প্রাচীন বাংলা নানা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আর বিভিন্ন রাজারা অঞ্চল শাসন করতেন। ফলে দেখা যায় যে একই সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধর্মের শাসন প্রচলিত ছিল। বস্তুত রাজাদের এসব পৃষ্ঠপোষকতার ফলে তৎকালীন সময়ে ঐসব অঞ্চলে কোন বিশেষ ধর্মের প্রতিপত্তি ব্যাপক প্রসার লাভ করতো।

11| i/cvšÍi I AvZ¥KiY

ধর্মসমূহের রূপান্তর, পরিবর্তন ও পারস্পরিক আত্মীকরণ ছিল প্রাচীন বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম পূর্ব যুগে প্রায় প্রতিটি ধর্মই ছিল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। উৎপত্তিগতভাবে কিছু ধর্ম বা মতবাদ ছিল মূল ধর্মের শাখা স্বরূপ। যেমন : আর্য ধর্ম সনাতন হতে ব্রাহ্মণ্যবাদ, পৌরানিক ধর্ম, শক্তি ধর্ম, বৈষ্ণব মতবাদ, সন্ন্যাস ধর্ম ইত্যাদির জন্ম। আবার অনেক ধর্ম নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে পরবর্তীতে কালের পরিক্রমায় অন্য প্রধান ধর্মের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। যেমন- জৈন, আজীবিক, নাথ ধর্ম ইত্যাদি। এছাড়াও কোনটি ধর্ম হিসেবে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেও অন্য ধর্মের প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। যেমন- আর্য ধর্মের উপর কৌম প্রভাব, কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি। মূলত ধর্মসমূহের এ রূপান্তর ও আত্মবিলোপ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস জুড়েই সংঘটিত হয়েছে বারবার।

আর্যপূর্ব কৌম ধর্মগুলোই ছিল প্রধানত বাংলার অধিকাংশ ধর্মানুষ্ঠানের মূল। আর্য ধর্ম হিসেবে সনাতন, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদির আবির্ভাব হলেও কৌম ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান কোনটাই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং এগুলো ক্রমে আর্য ধর্মের রঙ গ্রহণ করে রূপান্তরিত হয়ে নতুন ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে উঠে। তদ্রুপ জৈন ধর্মের প্রায় সমসাময়িক আজীবিক মতবাদও একসময় নানা প্রভাবে জৈন ধর্মে

Dhaka University Institutional Repository

মিশে যায়।[৩৩] পাল আমল পর্যন্ত বাংলার জৈন ধর্মের প্রচার প্রসার থাকলেও পরবর্তীতে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। ইতিহাসবিদদের মতে তা ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলুপ্ত হয়।

বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্ম বৌদ্ধ ও এ রূপান্তর প্রক্রিয়া হতে মুক্ত থাকতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন,

> Ò‡hme wekvm I AvPvi Abôv‡bi weiæ‡× Ges hv cZvL¨vb K‡i e× wb‡R Zvi aggZ ceZb K‡iwQ‡jb| c‡i †eŠ×ag ZviB Kv‡Q AvZ¥mgcb K‡iwQ‡jb| mi eK‡gi †'e‡'exi (†Kvb †Kvb †ÿ‡Î bZb bvg w'‡q, Avevi †Kvb †ÿ‡Î bvg cwieZb bv K‡iB) cRv I AvPvi Abôvb †eŠ× a‡g Abc‡ek K‡i c_g GK i/c cwiMn K‡iwQj hv †jŠwKK wn›' ag †_‡K Le GKUv wfb wQj bvÓ|[34]

বৌদ্ধদের এ পরিবর্তন মূলত বাংলার আর্যপূব জাতির উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত। অনেকের মতে, এধরণের রূপান্তরের ফলেই বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিকাশ বাঁধাগ্রস্ত হয় এবং এর পতন তরান্বিত হয়। বাংলার অপর ধর্মগুলো যেমনঃ বাউল মতবাদ, মরমীবাদ, সহজিয়া মতবাদ, সন্ন্যাসবাদ ইত্যাদিও প্রকৃত অর্থে কোন আলাদা ধর্মবিশ্বাস নয়। বরং পূর্বতন আর্য ধর্মের নানা উপাদান ও কৌম বিশ্বাসগুলোর সমন্বয়ে তৈরী মতবাদ হিসেবেই এগুলো পরিচিত। যার অনেকেই পরবর্তীতে নানা নামে আবার মূল ধর্মগুলোতেই রূপান্তরিত হয়েছে। প্রধান আর্য ধর্ম হিসেবে প্রাচীন বাংলার সনাতন ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যবাদ অন্য কোন ধর্মে মিশ্রিত না হলেও এতে রূপান্তর ঘটেনি এমন বলা যায় না। বরং নানা ঐতিহ্য-সংস্কৃতি আর ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে এটিও স্বীয় বৈদিক ধ্যান-ধারণা বজায় রাখতে পারেনি। কৌম ধর্মগুলোর প্রভাবে এ আর্য ধর্ম সময়ের পরিক্রমায় বাঙ্গালী হিন্দু ধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যাতে বৈদিক রীতি নীতির তুলনায় দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাবই বেশি প্রতিফলিত হয়।

12| mf¨Zv I ms¯‹wZ

প্রাচীন বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। এর ইতিহাস ঐতিহ্য, সাহিত্যে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সবগুলোতেই পাওয়া যায় প্রাচীন ধর্মগুলোর ছোঁয়া। কৃষি প্রধান কৌমগুলোর প্রভাবে বাংলার

---

৩৩. অজয় রায়, cv¸ ³, পৃ. ১৬৫

৩৪. Chimpa Lama, and D. Chattopadhyaya, *Taranatha's History of Baddhism in India*, Simla Press, India : 1970, Preface, p. XII-XIII

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যে কৃষি সংক্রান্ত উৎসব, পার্বণ যেমন- প্রধান স্থান দখল করে রয়েছে, তেমনি মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবে এদেশের আচার অনুষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের ভূমিকাই মূখ্য দেখা যায়। বস্তুত কালের পরিভ্রমণে আর্য পূর্ব সমাজের সেসব অনুষ্ঠান আজকের বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রধান অংশে পরিগণিত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার সভ্যতার নিদর্শন বুঝাতেও ধর্মগুলোর আশ্রয় নেয়া আবশ্যক। এখন পর্যন্ত হাজার বছরের বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও সভ্যতার যেসব নিদর্শন আমরা পেশ করি তা হয়তো কোন বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু মন্দির নয়তো কোন মূর্তি। দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাণে নানা প্রকার কারুকার্য ও অলংকার আমাদের উন্নত স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন। এছাড়া ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত কাসা, পিতল বা তামার তৈরী নানা উপাদান এবং ত্রিশূল, তীর, ধনুক, ঢাক-ঢোল, বাঁশী ইত্যাদিই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন।

অন্যদিকে সাহিত্যো বিবেচনায় ও বাংলাকে ধর্ম হতে আলাদা করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ মূলত ধর্মীয় সাহিত্যো হিসেবেই পরিচিত। সরহপা, লুইপা, হিল্লোপা, কাহ্নপা, শবরপা, ভুসুকপা, কুক্কুরীপা প্রমুখ বৌদ্ধ সিদ্ধাচর্যদের রচিত চর্চাপদ আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যো সম্পদ। এর পরবর্তীতে মধ্যযুগীয় পর্যায়ের বাংলার সাহিত্যো ছিল ধর্ম নির্ভর। বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রামায়ন, মহাভারত, নানা পৌরানিক রূপকথা ইত্যাদি সাহিত্যো উপর্যুক্ত বক্তব্যেরই সার্থক প্রমাণ স্বরূপ। এমনকি হাল আমলে প্রচলিত বাউল গান, লোকসঙ্গীত ইত্যাদিতেও ধর্মীয় প্রেরণা ও ভাবের আদান-প্রদানই বেশি লক্ষণীয়। বস্তুত ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বাংলার শিল্প-সাহিত্যো-সংস্কৃতি।

evsjv‡'‡ki mv‡_ Avie‡'i cv_wgK †hvMv‡hvM

বাংলাদেশ ইসলামের বিজয় পতাকা বহণ করে নিয়ে আসেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী (মৃ. ১২০৬ খ্রিঃ) তবে তারও পূর্বে বাংলাদেশের সাথে আরবদের প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল। তার বঙ্গ বিজয়ের বহু পূর্বেই বাণিজ্যিক সূত্রে আরব বণিকগণ এদেশে আগমন করতেন। কেননা, সূদুর অতীত কাল হতেই আরবগণ সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপে পৃথিবীর সেরা জাতি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। এ আরবগণ সাগর পাড়ি দিয়ে পাশ্চাতের বহু দূর দেশ আগমন করেছিল। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে বসতি স্থাপনের ফলে স্বভাবতঃই প্রাচ্য ও ভারতের সঙ্গে আরব বাণিজ্য আরও সম্পস্রারিত হয়। বাণিজ্যর উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক আরব বণিক

Dhaka University Institutional Repository

সিংহলো ও মালাবার অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন করে। আরব বণিকদের প্রাচ্য দেশীয় বাণিজ্য এত বেশিপ্রসার লাভ করে যে, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর আরব জলাশয়ে পরিণত হয়। অজ্ঞতার যুগ হতেই আরব বণিকগণ সমুদ্র পথে চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা যাবার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়াতেন এবং এখানে পণ্য বিনিময় করতেন। সে যোগাযোগের সূত্র ধরে দক্ষিণ চীনে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে এবং হিজরি প্রথম শতকে সম্ভবত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনকালেই আরবের মুসলিম বণিকগণ ও ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক এ দেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা হয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে এবং সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এ দেশে আরব বণিকগণ এসেছিল বলে সুনির্দিষ্ট কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বর্তমান যুগে ব্যাপক পর্যালোচনা ও গবেষণায় এমন কিছু প্রমাণাদি পাওয়া যায়, যাতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, অজ্ঞতার যুগে বঙ্গদেশের সাথে আরবদের ব্যবসা ছিল এবং হিজরি প্রথম শতাব্দীর অর্থাৎ ঈসায়ী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই তদানিন্তন হিন্দ তথা বাংলাদেশের সাথে আরব মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং এ দেশে ইসলামের আলো পৌঁচেছে।[৩৫] মরু আরবে কৃষিযোগ্য জমির অভাব থাকায় আরবগণ বরাবরই বাণিজ্যিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তারা স্থল ও জল উভয় পথেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে আসছিলেন। তাদের উটের বহর পাশ্ববর্তী সকল দেশে চলাচল করতো।[৩৬] ইসলামী সভ্যতা বিকাশের পূর্ব থেকেই আরবগণ নাবিক হিসেবে সমুদ্র যাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন।

আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আবির্ভাবের পর তাদের ধর্মীয়, আত্মিক জীবনের ন্যায় সামুদ্রিক জীবনের কর্মকাণ্ডেও ঢেউ লাগে এবং তারা দুনিয়ার সকল অংশেই দুঃসাহসিক যাত্রা করতে থাকেন। কেননা, আরব দেশ সমুদ্র পথে অন্যান্য বড় বড় দেশের সঙ্গে যুক্ত। আরব ও ভারতের মধ্যে রয়েছে ভারত মহাসাগর। একটি নদী দ্বারা ইরানের একটি অংশের সাথেও আরব যুক্ত। যে আবিসিনিয়া এক সময়ে আরবদের ব্যবসা বাণিজ্যের বিশাল কেন্দ্র ছিল তাও সমুদ্র পথে আরবদের সাথে যুক্ত। চীনা দ্রব্য সম্ভার চীন সাগর ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌছাত আরব দেশে।

সিরিয়া হয়ে ভূ-মধ্যসাগরে পৌছে তারা রোমীয় ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে এসেছিল। বাহরাইন, হাজরামাউত, ইয়ামান ইত্যাদির উর্বর ও শস্য-শ্যামল এলাকাসমূহ সবই সমুদ্র উপকূলবর্তী। এ সব

৩৫.ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দীন,” বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব,Ó BmjvwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা : ১৯৮৭, পৃ.১৬৭

৩৬. সৈয়দ সুলায়মান নদভী (অনু: হুমায়ুন খান), Avie †bŠeni, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা:১৯৮২, ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-প্রকৃতিগত কারণেই আরবরা সমুদ্রগামী জাতিতে পরিণত হয়।[৩৭] বিশ্বের দেশে দেশে তারা পাল তোলা জাহাজে পণ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাদের এ জীবনধারা এ উপমহাদেশেও এসে থেমেছে, এটা সহজেই অনুমেয়।[৩৮]

জনাব মুহিউদ্দীন খান সৈয়দ সুলায়মান নদভীর গ্রন্থ 'আরব ওয়া হিন্দকে তা আলণ্ডুকাত' গ্রন্থের সূত্র ধরে বলেছেন, "আরবদের সামুদ্রিক প্রসিদ্ধ বানিজ্য প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে-পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং আমাদের চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলাম প্রচার-পূর্ব কয়েক শতাব্দী পূর্বে গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। আরব দেশ থেকে বছরে অন্তত দু'বার এসব উপনিবেশের নৌবহর এসে নোঙ্গর করতো। ফলে বাণিজ্য পণ্যের যেমন আদান-প্রদান হতো তেমনি সংবাদাদির আদান-প্রদানও চলতো।[৩৯] এমনিই যদি তদানীন্তন অবস্থা, তবে এটা নিশ্চিত যে, ইসলামে পূর্ণাঙ্গ আবির্ভাবের সাথেই তা এদেশের জনগণের কাছে পৌঁছেছিল।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে সময় ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরসমূহে ইসলামের আবির্ভাব, সে সময়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামী, ভাবধারার আগমন ও প্রসার ঘটে। চট্টগ্রাম বন্দরের আরবিয় বণিকদের যাতায়াত ছিল।

বিশেষ করে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরে ছিল তাঁদের সমুদ্রপথে পূর্বদিকে যাতায়াতের একমাত্র পথ। আরব বণিকদের মাধ্যমে এ দেশ থেকে মসলা, মিহি সূতী ও রেশমী বস্তু, হাতির দাঁত, নানাবিধ রত্ন এ সব সামগ্রী চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানী হতো।[৪০] ইসলামের আবির্ভাব তখন সমগ্র আরবে একটা বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই এমন একটা সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে অর্থাৎ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আরবিয় উপনিবেশগুলোতে পৌঁছেছে, তা সহজেই অনুমেয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতেই আরবিয় বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম চট্টগ্রাম ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[৪১]

---

৩৭. সৈয়দ সুলায়মান নদভী, cv¸³, ভূমিকা।

৩৮.ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, evsjv‡'‡k Bmjvg cPv‡i mdx‡'i Ae'vb (১৭৫৭-১৮৫৭), পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ((অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা:১৯৯৬, পৃ. ৩৯

৩৯. মুহিউদ্দীন খান, "বাংলাদেশে ইসলামঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র", BmjwgK dvD‡Ðkb cwÎKv, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা : ১৯৮৮, পৃ.৩৪৫

৪০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, evsjv‡'‡ki BwZnvm (1g L.), cvPxb hM, কে.বি. প্রিন্টাস, কলিকাতা : ১৯৮১, পৃ.৫২

৪১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, cv¸³,পৃ.৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা বাণিজ্যই এসব বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবে বাণিজ্যিক পণ্যের সাথে তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে ইসলামের আদর্শ ও নবীর সুন্নাহ বহণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাচ্যের দেশগুলোতে, বিশেষতঃ জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও সুদুর চীন দেশে। ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় বাংলাদেশের দিকে। তাঁরা মনে করেছিলেন প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র স্থলে ইসলাম প্রচার করতে পারলে দেশের অপরাপর অঞ্চলেও তা আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়বে।

2q cwi‡”Q‘

Bmjv‡gi AwwefveKv‡j evsjv‡‘‡ki mvgwRK, ˆbwZK I agxq †c¶vcU

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় কোন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। বহিরাগত ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি এবং এ দেশের নিজস্ব অধিবাসীদের অনার্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ হয়েছিল বহু দিন ধরেই। কিন্তু তাদের সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবন ও সমাজ সৃষ্টি হয়নি।

ছিল গ্রাম্য সভ্যতা যেখানে আপন ধারায়, বহু বিচিত্র আচার-ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সমাজ চালু ছিল। এ গ্রাম্য সমাজের কর্তা ছিল হিন্দুগণ। সমাজের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য প্রচলিত ছিল। সেন আমলে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি হওয়ায় তা নূতন ও আদর্শ সমাজ সংগঠনের পথে প্রবল বাঁধা ও অন্তরায় ছিল। সেখানে জাত্যাভিমান ও বহিরাগত ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃনাএবং যুক্তিহীন আত্মসর্বস্বতা তাদের জীবনকে অধিকার করেছিল এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের উপর প্রভুত্ব করতো।[৪২]

আরবে যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে ভারতবর্ষে তখন পৌত্তলিকতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সতীদাহ, কালীদেবীর নামে নরবলি, আঞ্চলিক যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি হয়ে উঠে বহুল প্রচলিত। সাধারণ মানুষ যেন আর্তনাদ করছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে। বর্ণপ্রথা তখন এতই কঠোর ছিল যে, কোন শুদ্র যদি ব্রাহ্মণের পথ দিয়ে হেঁটে যেতো, তাহলে তাকে ফাঁসি দেয়া হতো। মানুষে মানুষে এত প্রভেদ পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও দেখা যায়নি। বহু ঈশ্বরবাদ, কুসংস্কার ও বহু বিবাহের ব্যাপারে ভারত ও আরবের অবস্থা ছিল একই।[৪৩]

মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক উত্তর ভারতের শাসক ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রি.)। তাঁর রাজধানী ছিল থানেশ্বর ও কোণৌজ। দক্ষিণ ভারত তখন ক্ষুদ্র কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শশাঙ্ক

---

৪২. আল-বেরুণী,(অনু:আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ),fviZË, (১মখ.), দিব্য প্রকাশ, ঢাকা:১৯৭৪, পৃ. ২৩

৪৩. S. Rahman, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy,* Mullick Brothers, Dhaka :1963, P. 21

Dhaka University Institutional Repository

(৬০০-৬৩৭ খ্রি.) ছিলেন ঐ সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক তিনি গৌড়ের রাজ্য (উত্তর ও পশ্চিম বাংলা) শাসন করতেন। পূর্ব বাংলা ছিল ব্রাক্ষণ শাসনাধীন।

এ যুগের শাসকগণ ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ-পূর্ববাংলা শাসন করতেন খাদগা নামে এক বুদ্ধ বংশ। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত তাদের অসৃত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন দেব বংশ নামে আরেক বৌদ্ধ গোষ্ঠি। প্রায় একই সময় পশ্চিম ও উত্তর বাংলায় এক বৌদ্ধ পরিবার পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার আর একটি রাজ বংশের রাজা ভদ্রদত্ত, ধর্মদত্ত ও কান্তিদেব রাজ্য শাসন করেন। কান্তিদেব নবম শতাব্দীর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। কান্তি দেব ও তার উত্তরাধিকারীদের পর দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় চন্দ্র বংশের রাজাগণ ক্ষমতা অধিকার করেন। দশম শতাব্দীর শুরু থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এ বংশ রাজত্ব করেন। এ বংশের পূর্ণা চন্দ্র, সুবর্ণ চন্দ্র, ত্রৈলোক্য চন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণ চন্দ্র, লৌড় চন্দ্র, গোবিন্দ চন্দ্র প্রমুখ রাজা রাজত্ব করেন।

এসময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজাগণ আধিপত্য স্থাপন করেন। জাতবর্মা এ বংশের প্রথম শক্তিশালী নৃ-পতি। জাত বর্মার পর তার পুত্র হরিবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তীতে সামলবর্মা রাজা হোন। তিনিই প্রথম বৈদেশিক ব্রাহ্মণদের বাংলাদেশে আনেন। পরবর্তী রাজা হোন তার পুত্র ভোজ বর্মা। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেন বংশের বিজয় সেন বর্মরাজকে পরাস্ত করে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র রাজাদের রাজত্বকালের অবসান করেন।

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল। যথা-হিন্দু-বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম। আর্যদের সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশের লোকেরা বৈদিক ধর্মের সংগে পরিচিত হয়। সম্রাট অশোকের সময় এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও প্রসার লাভ করে। গুপ্ত যুগে বাংলা তান্ত্রিক মতবাদ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বিজয় সেন ও বল্লাল সেন ছিলেন শৈব। লক্ষণ সেন নিজেকে পরম বৈষ্ণব বলে প্রচার করলেও সেন আমলে পৌরানিক হিন্দু ধর্মই প্রবল হয়ে উঠে। ফলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বাংলা ম্লান হয়ে যায় এবং হিন্দু ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে।[৪৪] সপ্তম শতকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি

---

৪৪. আল-বেরুণী , C/, [3] ,পৃ.৪২

Dhaka University Institutional Repository

রাজমহলো পুন্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ) সমতট ও কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর দেখা পেয়েছিলেন। তিনি বৌদ্ধ বিহারে নানা ধর্মের শিক্ষিত ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আনাগোনার কথা উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকে বৌদ্ধ ধর্ম খুব শক্তিশালী ছিল। বৌদ্ধগণ জ্ঞান ও ধর্ম নিষ্ঠায় সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সপ্তম শতকে শীলভদ্র নামে এক বাঙ্গালী বৌদ্ধচার্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য পদ অলংকৃত করেছিলেন। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক বিষ্ণু মূর্তি নির্মিত হয়েছিল রাজা লক্ষণ সেন নিজেকে পরম বৈষ্ণব বলে প্রচার করেন। জয়দেব বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণলীলা সম্ভবত বাংলায় সর্ব প্রথম প্রচলিত হয় এবং পরে তা ভারতের অন্যত্র প্রচলিত হয়। পাহাড়পুর মন্দিরে কৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনী খোদিত আছে। একটি প্রস্তরে কৃষ্ণ ও একটি নারী মূর্তি খোদিত দেখা যায়। বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে ড.এম. এ. রহীম বলেন-"In Vishnuism, also called Vaishnavism, the principal God was Vishnu (narayana). The krishna legend fermed an essential element of Vaishnavism in Bengal contributed to the systemization of the Theory of Avatara; Varaha Narashimaha. Vamana. Parsurama Matsya, Kurma, Rama, Balarama, Buddha kalki ten Avatars, (Incarnations) of Vishnu. Another special feature of Bengal vaishnavism was the Radha Krishna cult which was established at the time of the poet Jayedeva in the tewelfty century".[৪৫]

গুপ্ত যুগে শৈব ধর্ম ও প্রচলিত ছিল। ৬ষ্ঠ শতকে মহারাজ বৈন্য গুপ্ত ও সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক শৈব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাহাড়পুর মন্দিরে শিবের কয়েকটি মূর্তি খোদিত দেখা যায়।

পাল সম্রাট নারায়ণ পাল একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং মন্দিরের পূজারীদের ভূমি দান করেছিলেন। সদাশিব ছিলেন সেন রাজাদের ইষ্ট দেবতা। সেন রাজাদের মুদ্রায় সদাশিবের মূর্তি খোদিত দেখা যায়। বাংলায় প্রাচীনকালে শাক্ত পূজারও প্রচলন ছিল। বাংলার বামাচারী শাক্ত সম্প্রদায় নানাভাবে দেবীর উপাসনা করতেন। বাংলার বহুতান্ত্রিক গ্রন্থে শাক্ত মতের কথা বলা হয়েছে।

---

৪৫. D. M.A. Rahim, The Adventure of Islam in Bangladesh, Islam in Bangladesh through ages, Islamic foundation Bangladesh, Dhaka : 1995, P. 6

বাংলায় সৌর সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ছিল। বিশ্বরূপ সেনও কেশব সেন সূর্য পূজারী ছিলেন। হিন্দু রাজা শশাঙ্কের আমল থেকে বৌদ্ধ ও সেন ধর্মের উৎখাতের চেষ্টা চলে এবং প্রক্রিয়া সেন আমলের শেষ পর্যন্ত অব্যাহতো থাকে। সে সময় মহাশক্তির পাদমূলে নরবলীর প্রথা ও প্রচলিত ছিল নিষ্ঠাবান হিন্দু ভক্তিসহকারে প্রত্যেক শীলা ও শিবপূজা, শরৎকালে দুর্গাপূজা এবং বিভিন্ন সময়ে সূর্য, শিব, মহেশ্বর, শ্যামা, কালী, চণ্ডী, কার্তিক, গনেশ, লক্ষী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা করতো। বাংলায় ৭০টি বিহার, ৮০০ ভিক্ষু এবং ৩০০টি দেব-দেবীর মন্দির ছিল।[৪৬] সেকালের হিন্দুরা, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে গণ্য করতো। প্রথমটা দশ হারা ও পরবর্তীটা অষ্টমী স্নানরূপে পরিচিতি ছিল।[৪৭] দোর যাত্রা, রথ যাত্রা ও হোলী উৎসব খুবই প্রচলিত হয় এ যুগে। দ্বাদশ শতকের পূর্বে হোলী উৎসবের উৎপত্তি হয়। প্রচুর ফসল কামনা করে হিন্দুরা দেবীকে (কালী) প্রসন্ন করতে নরবলীর মাধ্যমে এ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতো। হোলীর সঙ্গে কাম দেবতার উৎসব জড়িত ছিল।[৪৮] পাল রাজাদের আমলে পুনরায় বৌদ্ধ ধর্ম ক্ষীণ বল হয়ে প্রায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যত্র বৌদ্ধ ক্ষীণ বল হয়ে প্রায় বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম বাংলা ও বিহারে বেশ প্রভাবশালী হয়েছিল। তাদের আমলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। পাল রাজাগণ বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন।

" বৈদেশিক আক্রমণের ফলে বাংলার বৌদ্ধ বিহারগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এ যুগের বুদ্ধের বহু মুর্তি বাংলার নানা স্থানে আবিস্কৃত হয়েছে। পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম সহজিয়া ধর্মরূপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা মূল বৌদ্ধ ধর্ম থেকে পৃথক ছিল। আধুনিক মহাযান মতবাদ বজ্রযান ও তন্ত্রযান ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। এদেরকে সহজিয়া বা সহযান ধর্ম বলা হয়ে থাকে" ।[৪৯]

বৌদ্ধ ধর্ম যখন পরবর্তীকাল বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রী দেবতা বা তান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা প্রভাম্বিত হয় তখন সহজিয়া মতবাদের উৎপত্তি হয়।[৫০]

সহজিয়া ধর্ম মতে গুরুর স্থান সকলের উপর। বেদিক ধর্ম ও পৌরানিক বিরোধী সহজিয়াপন্থিগণ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে বিদ্রুপ করে থাকে। সহজিয়া ধর্ম আর্যগণ 'সিদ্ধাচার্য" নামে পরিচিত। দশম

---

৪৬. কাজী দীন মুহাম্মদ, Avh fviZxq †mb Avg‡j evsjvÕ evsjv‡'‡ki DrcwË I weKvk, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৩, পৃ. ১১৩

৪৭. R.C MajUmdar, *History of Bengal*, Dhaka University, Dhaka: 1993. P. 608

৪৮.ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, evsjvi mvgwRK I mvs¯‹wZK BwZnvm, (১ম খ.), বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৮২. পৃ. ৩১৮

৪৯. কে. এম. iBQDwÏb, evsjv‡'k BwZnvm cwiµgv, অন্বেষা প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৯৬, পৃ. ১৫১

৫০. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cv¸³, পৃ. ৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব ঘটে। এরা অপভ্রংশ ও লৌকিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন।[৫১] সিদ্ধাচার্যগণ প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মমর্তের তীব্র সমালোচনা করে ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণের পরিচয় দেন।

সহজিয়া সাধন প্রণালী নানাবিধ রহস্যে আবৃত। এর সাধন প্রণালী এক প্রকার যোগ বিশেষ। ড. রমেশ চন্দ্রের ভাষায়," চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গোপাথ রহস্যে আবৃত থাকার সহজিয়া ধর্ম ক্রমেই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পথে অগ্রসর হতে লাগল। বৌদ্ধ ধর্মের বিধি-বিধান যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ পেল।[৫২]

ক্রমে সহজিয়া ধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনা একাকার হয়ে বাংলার ধর্ম জগতে এক বীভৎসতার সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালে সহজিয়া ও অন্যান্য তন্ত্র সম্মত ধর্মগুলো প্রধানত নিম্ন শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর্যদের সমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠি চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যেমন- ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সৎ এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করার মত যাদের প্রতিভা ছিল, তাদের ব্রাহ্মণ বলা হয়। এরাই শিক্ষা লাভ করতেন এবং শিক্ষা দান করতেন। এরা গুরু বা শিক্ষক হিসেবে সমাজে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করতেন।

যারা দৈহিক পরাক্রম অর্জন করতেন, সে সব রাজা রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধাদের বলা হয় ক্ষত্রিয়। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি ও শ্রম শিল্পে আত্মনিয়োগ করতেন এবং সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনে আনন্দ লাভ করতেন তাদের বলা হতো বৈশ্য। এসব বৃত্তি বা পেশার পক্ষে আবশ্যক মেধা যাদের ছিল না, যারা ছিল সাধাসিধে ও রুক্ষ, যারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একমাত্র কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করতো তাদের বলা হতো শূদ্র। শূদ্রদের জীবন ছিল বিড়ম্বিত। তারা উচ্চ শ্রেণির দাসত্বে নিয়োজিত থেকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হতো। ব্রাহ্মণরা তাদের পৌরহিত্যো পর্যন্ত করতো না। তাদের খাদ্য গ্রহণ ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্যদের ছায়া মাড়ালেও 'গোসল' করে ব্রাহ্মণদের শূচিতা অর্জন করতে হতো। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পালিত কুকুর একজন আদিবাসীর চেয়ে বেশিসম্মান পায়।[৫৩] অস্পৃশ্যদের দেশ বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশে আগমন করাই ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ।[৫৪]

---

৫১. কাজী দীন মুহাম্মদ, evsjv mwn‡Z¨i BwZnvm (১ম খ.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৬, পৃ. ১২৯
৫২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, cv¸³, পৃ. ২১৫
৫৩. আবুল হাশিম, Bgjv‡gi ggK_v, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮১, পৃ. ৭২
৫৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, cv¸³, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ রাজাদের যুগেও ব্রাহ্মণবাদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তেমন কোন শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি, বরং ব্রাহ্মণ সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্নই ছিল। তাদের চেষ্টায় কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে শূদ্রদের চেয়ে নিচ আরও একটি অন্তজ শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল।[৫৫]

এ দের শূদ্রের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হতো। সমাজ জীবনে তাদের যেমন প্রতিষ্ঠা ছিল না তেমনি তাদেরকে মানুষই মনে করা হতো না। তাদের জীবন ছিল পশুর চেয়েও অধম। শূদ্র ও তার নিচের শ্রেণি লোকেরা লোকালয়ের বাইরে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হতো। কোনক্রমে পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের অজ্ঞাতসারেও যদি শাস্ত্রবাণী শুনে ফেলত, তবে তাদের কর্ণকুহরে গলিত সীসা ঢেলে দিয়ে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিক বা সংস্কৃতি ভাষায় শাস্ত্র আলোচনা, এমনকি দেশীয় ভাষায় শাস্ত্র বাণী শ্রবণ করা বা বলা দুই-ই নিষিদ্ধ ছিল। বিধান ছিল-

" অষ্টাদশ পুরাণিক রামন্য চরিততানিব
ভাষারং মানবা শ্রুত্বা রৌর রং নরকং ব্রজেৎ"।

অর্থাৎ "লোকিক ভাষায় অষ্টাদশ পুরান ও রাম চরিত্র ইত্যাদি যে মানব শুনবে তার ব্যবস্থা বৌরং নরকে"।[৫৬]

বাংলার প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রের সত্য, শৌচ, দয়া, দান প্রভৃতি সর্ববিধ গুণের মহীমা কীর্তন এবং ব্রহ্মহত্যো্যা, মদ্যপান, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার ইত্যাদি কঠিন পাপ বলে গণ্য হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সমাজে দুর্নীতি এবং অশ্লীলতা প্রচলিত ছিল। তৎকালে আর্যহিন্দু সমাজ অধঃপতিত ছিল। অব্রাহ্মণদের উপর, বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ভয়াবহ ছিল"।[৫৭] কবি বৃহস্পতির মতে," সে কালের মেয়েরা বেশি রকম যৌন বিলাসিনী যে নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, রাজ কর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের কাম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন তার বিবরণ বাৎস্যায়নই রেখে গেলেন"।[৫৮]

কালবিবেক গ্রন্থ ও কালিকা পুরাণের বর্ণনায় জানা যায় যে, হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে যেমন-দুর্গাপূজা, হোলী উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যে, মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনাচার ও কদর্যতা চলতো। 'কামমহোৎসব' নামে পরিচিত একটি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে হিন্দু নারী-পুরুষেরা দেবতাকে খুশি

৫৫.D. M.A. Rahim, *Social and cultural History of Bengal*,Karachi Unfversity Press, Pakistan :1963, P.7
৫৬. ড.মুহাম্মদ রুহুল আমীন, cÖv¸³, পৃ. ৩২
৫৭. নীহার রঞ্জন রায়, evOvjxi BwZnvm: (আদি পর্ব), পশ্চিম বঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা : ১৯৮০ পৃ. ৫২৫
৫৮. নীহার রঞ্জন রায়, cÖv¸³, পৃ. ৫২৫

Dhaka University Institutional Repository

করে পুত্র সন্তান ও সম্পদ লাভের জন্য এক ধরণের যৌন নৃত্য করতো। কবি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দময়' গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র ফুঠে উঠেছে।[৫৯]

আর্য ব্রাহ্মণ সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না, তবে সহমরণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ধন-সম্পত্তি তথা সমাজে তাদের আইনগত কোন অধিকার ছিল না"। [৬০] তান্ত্রিকবাদ ও শক্তিবাদ সেকালের হিন্দু সমাজের অধঃপতনের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী ছিল।

এভাবেই প্রাক ইসলাম যুগে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় সর্বস্তরের অধঃপতন নেমে আসে। এ অধঃপতনের জন্য সমাজে ব্রাহ্মণের নির্বিচার প্রাধান্যই ছিল বহুলাংশে দায়ী। তাদের প্রাধান্যের ফলে সমাজ দেহ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণরা ছিলেন সমাজের উচ্চাসনে। জনসাধারণের চিন্তা-ভাবনা-কর্ম প্রচেষ্ঠা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারত না। নবম ও দশম শতকে রচিত বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থে এবং বর্মসেন আমলের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণরা সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

সমাজে ব্রাহ্মণের পরে ছিল শুদ্রদের স্থান। আর তাদের পরে ছিল অগণিত অন্তজ-ম্লেছ সম্প্রদায়, যারা সর্বপ্রকার সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত, নিগৃহীত, নিষ্পেষিত গণমানুষের দল। সমাজে এ তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঁধার প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। ফলে সমাজে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের অন্তর্বিরোধ, ঘৃনা ও অবিশ্বাসের গোপন বিষক্রিয়া শুরু হয় যা একাদশ ও দ্বাদশ শতকের বাংলার সমাজ দেহকে কলুষিত বিষাক্ত করে তুলেছিল। বাংলার সমাজ দ্রুত ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছিল।

একদিকে সামাজিক গোঁড়ামী ও অধিকার বঞ্চিত মানুষের নিদারুন হাহাকার, অন্যদিকে বিলাস ও কামবাসনার উচ্ছ্বাসময় আতিশয্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেহগত বিলাস, চারিত্রিক অধঃপতন, অমানবিক ঘৃনাও অবহেলোা বাংলার সমাজকে অন্তঃসার শূন্য করে দিয়েছিল।

evsjv‡'‡k Bmjv‡gi Awwefve, aiY I cKwZ

বাংলাদেশের জনমানব ও চিন্তাধারায় যখন এমন একটি শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হয়, তখন অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হোন। খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে

---

৫৯. cÖv¸³, পৃ. ৫২৫
৬০. D. M.A. Rahim, Op.cit. P.9

চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও সন্নিহিতো অঞ্চলে আরবিয় বণিক ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তা এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। তখন আরব ও মধ্যে এশিয়ার বহু পীর দরবেশ ও সূফী সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[৬১] তারা ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

ইসলামের প্রচার কাজে তাদের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই জাতি, বর্ণ ও ধর্মভেদে জর্জরিত ও এদেশের জনসমাজের সম্মুখে এক নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটে। ক্রমে ধীর ও নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এতে নীরবে ইসলাম প্রচারের জন্য এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পবিবেশ গড়ে উঠে।[৬২]

এস. এম. তাইফুর বলেছেন- "Another equally important factor about the increase of Muslim poplation was the missionary and proselytising zeal of the great sufis who preached principles of Islam, In fact the missionary activities were first started by Arab navigators and merchants long before the conquest of Bengal by Bakhtyar Khalji. The masses of Bengal were then groaning under the heels of the heaven born Brahmin oligarchy who usend them helots and outcastes and denied them even the elementary right of human beings."[৬৩]

সুতরাং খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশের সাথে আরবিয় মুসলমানদের যে প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- অষ্টম শতাব্দীতে বহু আবর বণিক দলে দলে বাণিজ্য জাহাজ চালনা করে বিভিন্ন দেশে গমনাগমন করতেন এবং এভাবে ভারতের সঙ্গে ও তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারা তাদের ব্যবসা বাণ্যিজ্য উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও সন্নিহিতো অঞ্চলসমূহে উপনিবেশ গড়ে তোলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন

---

৬১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, ce cwK¯Í‡b Bmjvg, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা:১৯৪৮, পৃ. ১৬
৬২. কাজী দীন মুহাম্মদ," বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশ; কিছু ভাবনা," gwmK AMc_K, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯
৬৩. S.M. Taifur, *Glimpses of old Dacca*, Dhaka: 1965, Intro

Dhaka University Institutional Repository

করেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের (সোমপুর বিহার) ধ্বংস স্তুপে আবিষ্কৃত একটি মুদ্রা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ মুদ্রাটি আরবিয় খলীফা হারুণ-অর-রশীদের শাসনামলে (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে আল-মুহাম্মদিয়া টাকশালে মুদ্রিত হয়েছিল। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক এর উপর ভিত্তি করে বলেছেন, "পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত খলীফার মুদ্রাটি অন্ততঃ খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গের সহিতো ইসলামের সম্বন্ধ সূচনা করছে"।[৬৪] কিন্তু ড. আব্দুল করিম ও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার নানা যুক্তি দেখিয়ে ড. হকের প্রাপ্ত মুদ্রা সম্পর্কীয় এ ধারণাকে মেনে নিতে পারেনি।[৬৫]

মুসলিম ভূগোলবিদদের ও পর্যটকদের মধ্যে সুলায়মান (জ. ৮১৫ খ্রি.) আবু জায়দুল হাজান (সুলায়মানের সমসাময়িক), ইবনে খুবদাবা (মৃ. ৯১২ খ্রি.) আল মাসুদ (৯৫৬ খ্রি.) ইবনে হা য়কাল (৯৭৬ খ্রি.), আল-ইদরিসী প্রমুখের বর্ণনামতে আরাকান হতে মেহোনা নদীর পূর্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগটি খ্রিস্টীয় অষ্ট শতাব্দী হতে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল। এসব আরব ভূগোলবিদ ও পর্যটকগণ তাদের বর্ণনায় এমন একটি দেশ ও বন্দরের নাম উল্লেখ করেছেন, যে দেশকে বাংলাদেশ হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে এবং বন্দরকে বাংলাদেশের উপকূলের একটি বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তারা এদেশকে 'রুহমী' বা 'রাহমী' নামে এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে 'সমন্দর নামে অভিহিতো করতেন। ড. এ. এইচ. দানী, ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ড. আবদুল করিম বহু যুক্তি প্রমাণের আলোকে আরব ভূগোলবিদদের বর্ণিত উক্ত 'রাহমী' দেশকে বাংলাদেশ এবং 'সমন্দর' বন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন।[৬৬]

আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাদজাতুয়ে' একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। এতে বলা হয়েছে ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের আরাকানের রাজা সুলতইঙ্গ চন্দয়ত সুরতন জয় করে সে দেশে একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাজার উক্তি অনুসারে তার নাম হয় চেত্তাগৌং অর্থাৎ যুদ্ধ করা অনুচিত।[৬৭] এখন প্রশ্ন হলো, আরাকান রাজা কাদের সাথে যুদ্ধ করা সমীচীন নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন? মুসলমানদের সাথে? চট্টগ্রামে কি তখন আরবিয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কি আরাকান রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল? এ সম্ভাবনা একেবারে অমূলক বলে মনে হয় না। তাই পণ্ডিতদের মধ্যে

---

৬৪. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, cÖ¸³, পৃ. ১২
৬৫. ড. আব্দুল করিম, evsjvi BwZnvm mjZvbx Avgj, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৫১-৫২
৬৬. D. A.H. Dani, *Proceding of the Pakistan Conference* , Karachi Unfversity Press, Pakistan:1951, P. 191
৬৭. ড. আবদুল করিম, cÖ¸³, পৃ. ৩৬

কেউ কেউ মনে করেন, ‘সুরতন’ শব্দটি ‘সুলতান’ শব্দের আরাকানী রূপ এবং তদানুসারে তারা বলেন, চট্টগ্রামে এ সময়ে মুসলমানরা একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন।[৬৮]

কিন্তু এ ব্যাপারে ড. আবদুল করিম নেতিবাচক মন্তব্য করে বলেছেন, চট্টগাম বন্দরের সঙ্গে যে আরব মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চট্টগ্রামে মুসলমানেরা আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিল বলা অতিরঞ্জন বৈ নয়। একটি মাত্র শব্দ ‘সুরতন’ যার অর্থ পরিষ্কার নয়, তার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত. আরাকান বংশাবলী পড়ে মনে হয় ‘সুরতন’ শব্দটি সুলতানের বিকৃতরূপ নয়, বরং তা অধুনালুপ্ত কোন এক স্থানের নাম বহণ করে। [৬৯]

উপরন্তু ইসলামের আবির্ভাবের যুগের পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মহানবী (সা.)- এর জীবনকালেই তাঁর মাতুল সাহাবী আবূ ওয়াককাস (রা.) (যিনি ইসলাম গ্রহণকারী নবম ব্যক্তি) সমুদ্রপথে বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়েন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবী কায়স ইবন হুযায়ফ (রা.), উরওয়া ইবল আছাছা (র.) এবং আবূ কায়িস ইবল হারিস (রা.)। হযরত আবূ ওয়াক্কাসের (রা.) নেতৃত্বে দলটি আবিসিনিয়ার হাবশা হতে যাত্রা করার পর অনূন্য নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিতো করে চীন পদার্পন করেন। তিনি চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থানকালে যে কোয়াংটা সমজিদ নির্মাণ করেন, কালের নিরব সাক্ষী হিসেবে তা আজও বিদ্যমান রয়েছে।[৭০] চীনে পর্দাপণ করার পূর্বে তিনি যে নয় বছর পথিমধ্যে অতিবাহিতো করেন, এ সময় তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে (সমন্দর) বন্দরেও অবস্থান করেছিলেন, ঘটনা প্রবাহ সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

যাহোক, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে (৭ম শতাব্দীতে) কয়েকজন প্রচারক (মুবাল্লিগ) বাংলাদেশে আসেন। এদের নেতা ছিলেন হযরত মাহমুদ ও মুহামিন। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসেন হযরত হামিদ উদ্দীন (রা.), হযরত হোসেন উদ্দীন (রা.), হযরত মুর্তযা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ (রা.) ও হযরত আবূ তালিব (রা.)। এ রকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র বা বই-কিতাব থাকতো না। তাঁরা রাজ ক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাঁদের প্রচার পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এ যে, তাঁরা এ দেশের প্রচলিত ভাষার মাধ্যমেই ধর্মপ্রচার করতেন। এরা গ্রামে বাস করতেন এবং সফর করে ধর্ম প্রচার করা এদের প্রধান কাজ ছিল।

---

৬৮. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ও আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, AvivKvb ivRmfvi evsjv mwnZ¨, পুস্তক বিপনী, কলিকাতাঃ ১৯৩৫, পৃ.৪৫

৬৯. আব্দুল করিম, cv¸ ³, পৃ.৬২

৭০.ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, cv¸ ³, পৃ. ৫৫-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

এরপর আরও পাঁচটি দল মিসর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এদের বলা হতো আবিদ। এরা বিভিন্ন স্থানে খানকা বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচার কার্য চালিয়ে যেতেন।[৭১] এরপর ইসলাম প্রচারের জন্য ক্রমান্বয়ে প্রচারকদের আগমন অব্যাহতো থাকে। এ উপমহাদেশে বর্ণপ্রথা ও সামন্ত শাসকদের অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষের মুক্তিদানে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যর্থতার ফলে ইসলামের আহবান আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। সুতরাং দেখা যায়, খ্রিস্টীয় ৭ম থেকে ১০ম শতকের বাংলাদেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। তবে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যের অভাবে কখন, কারা, কিভাবে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন, তাদের সকলের নিশ্চিত বিবরণ জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও একাদশ শতকের আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত একটি পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সুতরাং উপযুক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে, খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে আরবিয় মুসলমানগণের যেমনি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তেমনি চট্টগ্রাম বন্দরও আরব উপনিবেশে পরিণত হয় এবং আরাকান থেকে মেহোনা নদীর পূর্ববর্তী ভূ-ভাগ আরব বণিকদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। রোশাঙ্গ রাজ সুলতৈং চন্দয়ত বাঙ্গালা অভিমুখে অভিযান করে সুলতান উপাধিধারী জনৈক মুসলিম আমীরকে পরাজিত করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টীয় দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম বহু বিস্তৃতি লাভ করে। যে কোন জনপদে ইসলামের বাণী প্রচার করা প্রতিটি জ্ঞানবান মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব, তাতে কেউ তাকে সাহায্য করুক বা না করুক। সে হিসেবে আরবিয় মুসলিমগণ প্রত্যেকেই ইসলামের প্রচারক ছিলেন। আল কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন যারা (মানুষকে) কল্যাণের পথে আহবান করবে, সৎকার্যের নির্দেশ দেবে, অসৎকার্যের নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।[৭২] আল-কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ আরবিয় মুসলিমগণ নিষ্ঠাপূর্ণভাবেই পালন করেছিলেন। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়েই সে যুগের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ ইসলাম প্রচারার্থে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। সুদূর সে মহাচীনেও গিয়েছিলেন, যার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল সে সপ্তম শতকে। ভারতীয় বণিকগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে বাণিজ্যের সঙ্গে ইসলাম প্রচারেও মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামে বায়‘আত দিয়ে স্থানীয় রমনীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। এসব বণিকদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম সূফী ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশের বিভিন্ন স্থানে আগমন করেন।

---

৭১. ড. হাসান জামান, mgvR mwnZ¨ I ms¯‹wZ, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা : ১৯৮০, পৃ. ৫২

৭২. আল কুরআন, ৩ :১০৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় বিদেশাগত সূফী দরবেশগণের আগমনের ধারাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে (ক) মুসলিম বিজয়ের পূর্বকাল (খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়। (খ) মুসলিম বিজয় থেকে হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস পর্যন্ত অর্থাৎ ১২০১ থেকে ১২৫৮ খ্রি. পর্যন্ত। (গ) ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকাল। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে যেসকল সর্বত্যাগী ওলী সত্য প্রচারের অদম্য বাসনা নিয়ে বাংলায় আগমন করেন, তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন, কখনো বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসতি স্থাপন করে আল্লাহ ও রাসূলের সত্যবাণী জনসমাজে প্রচার করেন।

নিজেদের চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে স্থানীয় লোকের হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করেন। ধীরে ধীরে দরবেশগণের আদর্শ জীবনধারার প্রতি জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা জাগে। কেউ কেউ ইসলামের সহজ সরল উন্নততর শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে কোন দরবেশের প্রতি অনুরাগী হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। স্থল বিশেষে স্থানীয় রাজা উপাধিধারী কোন প্রতাপশালী ভূ-স্বামী আতঙ্কিত হয়ে ইসলাম প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, দরবেশগণের উপর উৎপীড়ন চালান। দরবেশগণ আত্মরক্ষার্থে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শহীদ হোন, কোন কোন ক্ষেত্রে জয়ী হোন। সেখানে এরূপ প্রচারের ধারা স্বাভাবিক ছিল বলে মনে হয়।

ধর্ম প্রচারকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ ইবাদাত ও পূণ্যের কাজ বলে মনে করতেন। প্রয়োজন হলে এরূপ কাজে শহীদ হওয়াকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে বিশ্বাস করতেন এবং পরকালে অনন্ত সুখের জীবন লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করতেন। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকারের মহত্তম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা ত্যাগের এরূপ মহান কাজে মগ্ন হতেন। তাঁদের সে ত্যাগ বৃথা যায়নি। পরোক্ষভাবে তাঁরা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী রাজশক্তি বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন।

মুসলিম বিজয়ের পূর্ব যুগে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর, ঢাকা জেলার রামপাল ও হরিরামগর, বগুড়া জেলার মহাস্থান ও উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়া, দেবকোট প্রভৃতি স্থানে ইসলাম যে প্রচারিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন সূফী দরবেশের জীবন সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত লোক-কাহিনী ও কিংবদন্তির উপর নির্ভর করে কোনকোন পণ্ডিত মনে করেন যে, তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া আক্রমণের পূর্বে এসব সূফী-দরবেশ বাংলাদেশে এসে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে যেসব সূফী দরবেশ বাংলাদেশে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়, তাঁদের মধ্যে বিক্রমপুরের রামপালের বাবা আদম শহীদ, ময়মননিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার (বর্তমানে

Dhaka University Institutional Repository

জেলা) মদনপুরে শাহ সুলতান রুমী, বগুড়া জেলার মহাস্থানের শাহ সুলতান মাহী সাওয়ার এবং পাবনা জেলার শাহজাদপুরের মাখদুম শাহদৌলা শহীদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭৩] মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিতো পরে ৫০/৬০ বছরের ভেতরে বাংলাদেশে কোন বিদেশী সূফী দরবেশ এসে থাকলেও তাঁদের পরিচয় জানা যায় না।

এমনকি বাগদাদ ধ্বংসের পূর্বে সমগ্র উপমহাদেশে সূফী প্রভাব অতি ক্ষীণ ছিল, যদিও খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে সূফী প্রভাবের স্রোত অবাধ গতিতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিতো হতে থাকে। এ সময়ের আরব, পারস্য, ইরাক, ইয়ামেন ও মধ্য এশিয়ার সূফী-দরবেশগণ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশেও এসব ধারাই সম্প্রসারিত হয়। বস্তুত বাংলা অঞ্চলের সূফী মতকে উত্তর ভারতীয় সূফী মতবাদের শাখাস্রোত বলা হয়।

মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী তাঁরাই ‘সূফী’ নামে পরিচিত। সূফীগণ নির্জনবাস এবং দারিদ্র্য পছন্দ করতেন এবং নিভৃত সাধনা ও কুরআন মজীদের মর্ম উদঘাটনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতেন। সুতরাং সূফীগণ তাঁদের অনুপ্রেরণা লাভ করেন আল কুরআন থেকেই। তাঁরা কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করেন মারিফাত বা গুপ্তজ্ঞানের আলোকে। সূফীমতে ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য হলো আত্মার সংযম, কেবল কতকগুলো বাহ্যিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র নয়। ‘আততাসাউফ’ বা সূফীবাদ হচ্ছে, স্রষ্টার জন্য গভীর ও তীব্র ভালোবাসার মাধ্যমে আত্মার উন্নয়ন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাধনা। সূফীদের মতে, জীবনের মুল উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তি সত্তার চেতনার বিলোপ এবং পবিত্র সত্তায় অব্যাহতো অস্তিত্ব তাসাউফের লক্ষ্য।

তাসউফ ইসলামের বাতিনী দিকের পরিচায়ক। শরীয়তের সামাজিক বিধি-বিধানের নির্দেশক। পরম সত্তাকে চেনার ও জানার আকাঙক্ষা মানুষের চিরন্তন। মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার মানষে তার অন্তরের মধ্যে সে পরম সত্তার সন্ধান লাভ করে যার সাথে নিবিড় যোগসূত্রে সে মিলিত হয়। তার এ পরম সত্তা আল্লাহ প্রেমময়, তিনিই একমাত্র সত্তা, জগত তাঁর পরম সুন্দরের বহিঃপ্রকাশ। জগতের যাবতীয় বস্তু আল্লাহ হতে নিঃসৃত। সমস্ত বস্তুতে তাঁর মহিমা বিচ্ছুরিত। এজন্য আল্লাহ পরম দয়ালু, তিনি সকল প্রেম ও সমস্ত জ্ঞানের আঁধার। তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রেমের। প্রেমেই ধর্ম। আল্লাহর প্রেম লাভই মানব জীবনের পরম সম্পদ। আল্লাহর প্রেমে শক্তিশালী হওয়াই মানব জীবনের

---

৭৩. ড. আব্দুল করিম, C\/, [3], পৃ. ৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য। প্রেমের মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরের অন্তঃস্থলে তার প্রেমাস্পদের উপলব্ধি করে। তিনি তার মাহবুবের অন্তরের আহবানে সাড়া দিয়ে থাকেন।

সূফী চিন্তাধারার মূল সুরই হলো আল্লাহ। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। যা কিছু প্রকাশমান সবই তাঁর বিকশিত রূপমাত্র। এ বিশ্বজগত সে পরম সুন্দরের প্রকাশ। সব কিছু তাঁর থেকে নিঃসৃত হয়েছে এবং জগতের সব কিছু তাঁরই মহিমা, তাঁরই গুণ ও সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত। এ পরম সত্যটি যখন একজন মানুষের গভীর উপলব্ধিতে আসে, তখন তিনি তাঁর প্রাণে এক অজানা শূন্যতা উপলব্ধি করেন। সে শূন্যতা তাকে নিয়ে যায় গভীরে, যেখানে তিনি দেখতে পান ব্যথা ও হাহাকার। জীবনের প্রতিটি হিয়ায় জগতের সকল সৃষ্টির মাঝে তিনি দেখতে পান এক পরম সত্তার সৌন্দর্য ও মহিমা। সে সৌন্দর্য ও মহিমা তাকে জানিয়ে দেয় অনন্তের সাথে তাঁর আত্মীয়তা রয়েছে। এ জন্য পরমাত্মার সাথে মিলনের জন্য মানবাত্মা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সূফীদের মতে, মানুষ সৃষ্টির চরম কারণ নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে পরম সত্তার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর চিন্তায় মানুষ প্রথম উত্থিত হয়েছিল এবং বিবর্তনের শেষ স্তরে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথম সৃষ্টি সার্বিক প্রজ্ঞা, যা সমগ্র বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতায় মহিমান্বিত করেছে। জগতের সমুদয় বস্তু স্তরে স্তরে নিঃসৃত হয়েছে। তাসাউফ মানুষকে একটি ক্ষুদ্র জগত বলে অভিহিতো করেছে।[৭৪] সূফীরা কুরআন ও হাদীস হতেই তাদের মতের ভিত্তি গ্রহণ করেছেন।

সূফীবাদ অনুসারে জগতের সব বিছুই থাকে আল্লাহর সত্তায়, সব কিছুই আল্লাহর প্রকাশ স্বরূপ। সূফীগণের অধিকাংশই আশাবাদী। তাদের মতে এ জগত সর্বোৎকৃষ্ট জগত, এখানে অশুভের কোন বাস্তবতা নেই। আমরা যাকে অশুভ বলি, আসলে তা একটি অসত্তা। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আসলে এ জগতে অশুভ বলে কিছু নেই। সবকিছুই পরিণামে শুভ ও কল্যাণকর। যা অশুভ ও অকল্যাণকর বলে প্রতিভাত হয়, তা নিতান্তই একটি আত্মগত ব্যাপারে। এটা এমন ব্যাপার যার কোন অস্থিত্ব নেই।[৭৫] চেতনা যখন ক্ষুদ্রতর উর্ধ্বে উন্নীত হয় তখন মানুষ কোন অশুভ, অমঙ্গল বা অনিষ্ট দেখতে পায় না। যতক্ষণ মানুষ অহং দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অশুভ শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে। কিন্তু ইলাহী আলোকে আলোকিত মানুষ অশুভের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। সে জগতব্যাপী আল্লাহর অভিব্যক্তি দেখতে পায়। তাই তাসাউফ শিক্ষায় আত্মিক অনুশীলনের

---

৭৪. ড. রশীদুল আলম, gm‖jg ‘k‡bi f‚gKv, সাহিত্য কুঠির, বগুড়া :১৯৮১, পৃ. ৩৫০

৭৫. S. Rahman, Op.cit., P. 124-25.

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা অধিক।[৭৬] সূফীগণ আত্মার উন্নয়ন ও বিকাশে বিশ্বাসী। তাদের মতে, আত্মার উৎপত্তি ঘটেছে এক ঐশী আদি নিবাস থেকে। ভাগ্যক্রমে তা সেখান থেকে অধঃপতিত হয়েছে। সুতরাং আদি পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করতে হলে তাকে অবশ্যই বেশ কয়েকটি পর্ব অতিক্রম করতে হয়। এ হলো সূফী চিন্তাধারার মূল কথা। এরূপ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই সূফীগণ ইসলাম প্রচার ও মানব সেবার ব্রত গ্রহণ করেন। মানব সেবাকেই তাঁরা স্রষ্টার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও প্রেম রূপে বিবেচনা করে থাকেন। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবতার কল্যাণে তাঁরা সে পরম সত্তার সান্নিধ্যে যেতে চান সেখান থেকে তাঁরা এসেছেন। বাস্তবিকই কবি শায়খ সাদী বলেছেন, "সৃষ্টি জীবের সেবা ছাড়া তরীকত নিস্ফল, শুধু খিরকাই তসবীহ ও জায়নামাযে তরিকত হয় না।[৭৭] মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী (র.) বলেছেন, "মানুষের চিত্ত জয় করাই মহোত্তম তীর্থযাত্রা এবং একটি হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও শ্রেয়। কাবা তো কেবল ইব্রাহীমের গৃহ, কিন্তু হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র আবাস। ধর্ম প্রচার ও মানব কল্যাণকর কার্যাবলীর এ সমুদয় আদর্শ নিয়েই ইসলামের প্রথম যুগের সূফীগণ বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন। সূফীগণ শুধু সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন না, বরং নিজের আত্মার দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতেন। সুতরাং তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আত্মার পরিশুদ্ধি মারফত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। সূফীগণ জীবন সাধনার পথকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করতেন। (ক) শরিয়ত বা প্রকাশ্য ইবাদত (খ) তরীকত বা গুপ্ত ইবাদত। ইসলামে প্রকাশ্য বিধি-নিষেধ সম্বলিত আইন-কানুন মেনে চলাই শরিয়ত। তরীকতের পথে উপযুক্ত নিকটবর্তী মুর্শিদের নিকট বায়'আত নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুশীলনের দ্বারা সাধনা করতে হয়। তরীকতের যাত্রাপথ যিনি গ্রহণ করেন, তিনি সালিক বা পথিক। যাত্রাপথে পথিককে উন্নতির বিভিন্ন স্তর (মকাম) ও অবস্থা (হাল) পাড়ি দিতে হয়। এ স্তর বা মাকামসমূহ হলো মারিফাত বা আল্লাহর পূর্ণজ্ঞান ও হাকীকাত বা আল্লাহর প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি। তরীকতের বিশেষ শিক্ষা লাভ করেই আল্লাহর মা'আরিফাত দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে মিলন হয়। সূফীগণ মনে করেন, মানুষ জীবিতাবস্থায় আল্লাহর অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে পারেন। আবার পরলোকেও আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। বস্তুত মানবাত্মা পরমাত্মা থেকে উদ্ভব হয়েছে সুতরাং পরমাত্মার সঙ্গে মিলন অবশ্যম্ভাবী। পরমাত্মার অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব মিশে যাওয়াকে কোন কোন সূফী বলেছেন 'বাকাবিল্লাহ'। তাঁরা মনে করেন, বাকাবিল্লাহ হলো অহংলোপ কিন্তু বাকাবিল্লাহ

---

৭৬. ড. রশীদুল আলম, cv¸ ³, পৃ. ৩৫০
৭৭. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, mdxev' I Avgv‡'i mgvR, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা: ১৯৬১, পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্থে বুঝায় পারমাত্মার সাথে স্থায়ীভাবে বিলীন হওয়া। ফানাফিল্লাহর শেষ পরিণতিই হলো বাকাবিল্লাহ (আল্লাহ স্থায়িত্ব প্রাপ্তি)।[৭৮]

evsjv‡`‡ki mvgwRK †cÖ¶vc‡U mdxmvaK I Zv‡`i ZixKvi weKvkaviv

এতে বুঝা যায়, সূফী মতবাদের উদ্ভব বাংলাদেশ বা উপমহাদেশ নয়, বরং বাইরে। এ মতবাদ মহানবী (সা.)-এর পরে প্রায় দু'শ বছরের মধ্যে বেশ জোরালো হয়ে উঠে এবং আরব ও পারস্য ইত্যাদি মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে এ মতবাদ পাক-ভারতে এবং বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের মুসলিম আমলের প্রাথমিক যুগের সূফীগণ সবাই বহিরাগত পরে অবশ্য বাংলাদেশেও অনেক সূফী জন্ম গ্রহণ করেন। সূফীগণের যাত্রা পথের চলবার প্রক্রিয়া অনুসরণের ভিন্নতা থেকে বিভিন্ন তরীকার মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ইসলাম অধ্যুষিত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন সময়ে শত শত সূফী দরবেশ বাংলাদেশে আগমন করেন। সূফীগণ অনেক তরীকাতে বিভক্ত ছিলেন। বিশেষ করে তাঁরা চিশতিয়া ও সোহারাওয়ার্দীয়া অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাইরের দেশ থেকে আগমন ঘটলেও বাংলাদেশ সূফীবাদ বিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়। সূফীবাদ সমগ্র বাংলাদেশ এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে খানকাহ ও দরগাহ দেশের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের মাটিতে সূফীবাদ এত বেশি প্রসার লাভ করে যে, কয়েকজন বিখ্যাত বাঙ্গালী সূফীর শিক্ষার ভিত্তিতে এখানে কয়েকটি নতুন মরমী সম্প্রদায়ের বিকাশ হয়।[৭৯]

বাংলাদেশে যেসব তরীকার সূফীগণ আগমন করেন এবং ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত হোন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। পঞ্চদশ শতকের জৌনপুরের বিখ্যাত সূফী মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (র.) কর্তৃক জৌনপুরে সুলতান ইবরাহীম শার্কীর নিকট লিখিত একটি চিঠিতে বাংলাদেশের কয়েকটি সূফী তরীকার নাম পাওয়া যায়। রাজা গণেশের নির্যাতনের হাত থেকে বাংলাদেশের সূফীদেরকে রক্ষার জন্য এ চিঠি লিখিত হয়। তিনি বলেন, "সব প্রশংসাই আল্লাহর! কি চমৎকার দেশ এ বাংলা, যেখানে অসংখ্য সাধু-দরবেশ ও তাপসগণ বিভিন্ন দিক থেকে আগমন করেন এবং বাংলাকেই তাঁদের দেশ ও বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নেন"।[৮০] উদাহরণস্বরূপ পীরানা পীর হযরত শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর সত্তরজন নেতৃস্থানীয় মুরীদ দেবগায়ে চিরশান্তিতে শায়িত আছেন। সোহরাওয়ার্দী

---

৭৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cÖv¸³, পৃ. ৬৯

৭৯. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, e‡½ mdx cÖfve, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৪৮, পৃ. ১৮

৮০। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, cÖv¸³ , পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

তরীকার কয়েকজন সূফী পুরুষ মহীসুনে এবং জালালীয়া সম্প্রদায়ের সূফীরা দেওতলায় সমাহিতো আছেন। শায়খ আহমদ দামিস্কীর কয়েকজন প্রধান শিষ্য আছেন নারকোটিতে। 'কদরখাণী' দ্বাদশ সূফীদের অন্যতম হযরত শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সেনানাগাঁয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁরই প্রধান মুরীদ ছিলেন হযরত শায়খ শারফুদ্দীন মানেরী। এছাড়া হযরত বদর আলম এবং বদর আলম জাহেদী ছিলেন। মোট কথা বাংলাদেশে শুধু বড় বড় শহরের কথা বলি কেন, এমন কোন গ্রাম বা শহর নেই যেখানে পুণ্যাত্মা সূফী পুরুষগণ গমণ করেননি ও বসতি স্থাপন করেননি। সোহরাওয়ার্দীয়া সম্প্রদায়ের সিদ্ধ পুরুষদের অনেকেই বিগত কিন্তু যারা জীবিত আছেন তাঁদের সংখ্যাও অনেক।"[৮১]

হযরত পীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্র থেকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি সূফী তরীকার নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন পাণ্ডুয়ার শায়খ আলাউল হকের মুরীদ। পাণ্ডুয়ার শিক্ষকের খানকায় তিনি কয়েক বছর অতিবাহিতো করেছিলেন। সুতরাং তাঁর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য। তিনি বাংলায় বহু সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূফী সাধকগণ অতীন্দ্রিয় সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং সেখানে তাঁরা সমাহিতো রয়েছেন।

এ কেন্দ্রগুলো হচ্ছে-দেবগাঁও, মহিসুর এবং নারকোটি ছিল বাংলার মুসলমানদের প্রাথমিক বাসস্থল। দেবগাঁও হচ্ছে দেবকোট যেখানে বখতিয়ার খিলজী তিব্বত অভিযান থেকে ফিরে এসে তাঁর শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। এটা দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পরগণার অন্তর্ভূক্ত।[৮২] কুতুবউদ্দীন আইবেকের গর্ভনর কেমাজ রূমীর হাতে পরাজিত হয়ে মুহাম্মদ সিরাজ খিলজী মহিসুরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি মহিসুরে কাটিয়েছিলেন। পাণ্ডুয়া থেকে ১৫ মাইল উত্তরে দেবকোটগামী বাদশাহী সড়কের পাশে দেওতলা অবস্থিত। দেওতলায় শায়খ জালালুদ্দীন তাবরীযীর একটি চিল্লাখানা আছে। দেওতলায় তিনি এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, তাঁর সম্মানার্থে দেওতলা নাম হয় তাবরীয়াবাদ।[৮৩] স্বাধীন সুলতানী আমলে সোনারগাঁও একটি বিখ্যাত মুসলিম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। এটা ছিল সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ এবং ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহের রাজধানী। এটা ঢাকা থেকে প্রায় ২০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্রে সোহরাওয়ার্দীয়া, জালালীয়া এবং কদরখানী তরীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্য কয়েকজন সূফীর নামও উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁদের তরীকার পরিচয় নেই। অন্য এক জায়গায় তিনি 'আলাই

---

৮১. Hasan Askari, *Bengal; Past and present*, Vol. XVII, Serial No- 130, 1988, P. 35-36

৮২. Kunninghum, *Report of the Archaeological Survey of India*, Vol. 15, P. 95

৮৩. Abid Ali Khan, *memories of Gour and Pandua*,Calcutta:1924, P. 170

Dhaka University Institutional Repository

সূরী' হুসাইনী এবং রূহানীয়াও তরীকার উল্লেখ করেছেন। জালালীয়া সূফী মতবাদের সূচনা হয় বিখ্যাত সূফী শায়খ জালালুদ্দীন তাবরীযী থেকে। তিনি প্রথমে শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর মুরীদ ছিলেন অর্থাৎ সোহারাওয়ার্দীয়া তরীকাভুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি চিশতিয়া তরীকা অবলম্বন করেন। সম্ভবত তিনি দেবতলায় সমাহিতো আছেন। সুতরাং জালালীয়া তরীকা হয় সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকা বা চিশতীয়া তরীকার শাখা বিশেষ।

'আলাই' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় পাণ্ডুয়ার খ্যাতনামা সূফী আলাউল হক থেকে। শায়খ আলাউল হক ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.)-এর বংশধর। এ কারণে তাঁর সম্প্রদায় খালিদীয়া নামেও পরিচিত। তাঁর খ্যাতনামা সন্তান হযরত নূর কুতুব আলম থেকে যে সূফী সম্প্রদায়ের সূচনা হয়েছিল তাঁর নাম হয় নূরী। আলাউল হকের একজন মুরীদ শায়খ হুসাইন যুক্কারপোশ হুসাইনী সূফী মতের প্রচলন করেন। এরা সকলেই চিশতীয়া তরীকা অনুসরণ করতেন। সুতরাং এগুলোকে চিশতীয়া তরীকার শাখারূপে গণ্য করা যায়। 'রূহানীয়া' নামে পরিচিত আরও একটি সূফী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় বাংলায়। এ তরীকা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

কদরখানী তরীকার আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কাদিরীয়া তরীকা এ উপমহাদেশে এবং বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়। এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.) কে এখানে বড়পীর বলা হয় এবং আজও তাঁর প্রভাব এদেশের মুসলিম সমাজে ব্যাপক। সিলেটের হযরত শাহজালাল (র.) তুর্কীস্তানের শায়খ সৈয়দ আহমদ ইয়াসভীর মুরীদ ছিলেন অর্থাৎ তিনি ইয়াসভী তরীকা অবলম্বন করতেন। ইয়াসভী তরীকা পরে নকশবন্দীয়া তরীকার রূপ লাভ করে।[৮৪]

শাহজালাল নকশবন্দীয়া তরীকাভুক্ত ছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে নকবন্দীয়া তরীকাও বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো ছাড়া 'কলন্দরীয়া' এবং 'শাত্তারীয়া' তরীকাও বাংলার মাটিতে প্রসার লাভ করে। মাদারীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা বদীউদ্দীন শাহমাদার বাংলাদেশে আগমন করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিতের প্রতি আরোপিত শূন্য পুরানে মাদারীয়া তরীকার উল্লেখ কয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে চিশতীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, মাদারীয়া, নকশবন্দীয়া, কলন্দরীয়া, শাত্তারিয়া তরীকার সূফীদের প্রভাব ছিল এসব সূফীবাদের শাখা-প্রশাখা এবং অসংখ্য খানকাহ্ ও দরগাহর অস্তিত্ব বাংলায় সূফীবাদের জনপ্রিয়তার স্মৃতি বহণ করে। সিমনানীর পত্রানুসারে, দেবকোট ও মহিসুনের মত প্রাথমিক বসতিগুলোর সোহরাওয়ার্দী সাধকগণ বসবাস করেছিলেন, যার একমাত্র

৮৪. ড. আবদুল করিম, C', ³, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

দেবকোটেই সত্তর জন সাধক চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, এসব সূফীদের নাম আজও অজ্ঞাত। প্রাথমিক যুগের সাধকের মধ্যে কেবল শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর মুরীদ হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরীযীর নাম পাওয়া যায়। সিমনানীর পত্রানুসারে, তাঁর বহু মুরীদ দেওতলায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। নারকোটিতেও কয়েকজন বিখ্যাত সাধকের বাসস্থান ছিল। তাঁরা সবাই ছিলেন শায়খ আহমদ দামেশকীর সহচর, যার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সোনারগাঁও ছিল শায়খ শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার আবাসস্থল। সিমনানী সেখানে প্রাথমিক যুগের সূফীদের সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন পাণ্ডুয়ার শায়খ আলাউল হকের মুরীদ। এ সময় থেকে চিশতীয়া সূফীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সুতরাং দেখা যায়, সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকাভুক্ত সূফীগণ সর্বপ্রথম বাংলাদেশ আগমণ করে ইসলাম প্রচার করেন। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের কর্মতৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় উপমহাদেশে এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ বাহাউদ্দীন যিকরীয়া মুলতানী।

তিনি সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার আদি পুরুষ শিহাবুদ্দীন আবু আমর সোহরাওয়ার্দীর খলিফা ছিলেন। তিনি মুলতানে ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানে ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর মুরীদগণ ভারতীয় উপমহাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে চিশতীয়া পন্থিদের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

সোহরাওয়ার্দীয়া পন্থিদের পর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যাদের আগমন ঘটে এবং অসামান্য অবদান রাখেন, তাঁরা হলেন চিশতীয়াপন্থি সূফীগণ। উপমহাদেশের চিশতিয়া সম্প্রদায়ের অগ্রদূত ছিলেন ভারতের বিখ্যাত সাধক খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) (১১৪২-১২৩৬ খ্রি.)। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে নবীন রাজশক্তির সঙ্গে নতুন ভাবধারা প্রচলনের অগ্রদূত। তাঁর ইন্তেকালের পর ভারতের নানা স্থানে চিশতীয়াপন্থি সূফী দরবেশগণ ইসলাম প্রচার করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মুঘলো যুগে দিল্লী এ চিশতীয়াপন্থিদের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৮৫]

ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উপমহাদেশে আর কোন নতুন সূফীগণের আগমনের সংবাদ পাওয়া যায় না। অতঃপর নতুন এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে কাদিরিয়াপন্থিরা। বাগদাদের জিলান নগরের অধিবাসী শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.) (১০৭৮-১১৫৬ খ্রি.) এ তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কোনদিন ভারতে আসেননি বটে; কিন্তু তদ্বংশজাত সৈয়ত মুহাম্মদ গাউস জিলানী

---

৮৫. S.A. Abbas Rezvi, *A History of Sufism in India,* Peoples Pubs house, New Delhi: 1983, P. 279

Dhaka University Institutional Repository

১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসে এ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি ভারতের রাজপুনায় 'উচ্চ' নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[৮৬]

কলন্দরীয়া তরীকাপন্থিগণ সম্ভবতঃ চিশতিয়াপন্থিদের পর বাংলাদেশে আগমন করেন। কেউ কেউ কলন্দরীয়া সম্প্রদায়কে চিশতিয়াপন্থিদের শাখা হিসেবে গণ্য করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তা ঠিক নয়। এটা একটা নতুন তরীকা। বু আলী শাহ কলন্দর এ সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ। তিনি ছিলেন স্পেন দেশীয়। তিনি চিশতিয়াপন্থি হলেও পরে এ সম্প্রদায়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে নিজস্ব একটি মতবাদ গড়ে তোলেন এবং তাকে সংগঠিত করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের পর তিনি ভারতে এসে উপস্থিত হোন এবং দিল্লীর নিকটবর্তী পানিপথ নামক স্থানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তিনি ১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[৮৭] বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় কলন্দর আখ্যাধারী দরবেশগণ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশেষভাবে আসতে থাকেন বলে প্রকাশ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁরা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ 'কলন্দর' শব্দ দ্বারা সর্বশ্রেণির সূফী-দরবেশকে অভিহিতো করতেন। তার প্রমাণ চট্টগ্রাম থেকে আবিস্কৃত ও আরবি হরফে 'যোগ কলন্দর' নামক কতকগুলো বাংলা পুঁথি।[৮৮]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে উপমহাদেশে নকশবন্দীয়াগণ প্রবেশ করেন। এ তরীকার আদি পুরুষ তুর্কীস্তানের আদিবাসী বাহাউদ্দীন নকশবন্দীয়া। ভারতে এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা খান মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ। তিনি তুর্কীস্থান থেকে এ মতবাদ ভারতে আনয়ন করেন। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী প্রবর্তিত সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকা ও হযরত খান মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) প্রবর্তিত চিশতীয়া তরীকার অনুসারী সূফী দরবেশগণ অদ্বৈতবাদে (ওয়াদাতুল অজূদ) বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাথমিক যুগের সূফী দরবেশগণের প্রায় সবই এ দুই তরীকাপন্থি। কাজেই তাঁরা অদ্বৈতবাদের অনুসারী ছিলেন। পাক-ভারত-বাংলাদেশের মানষক্ষেত্রে এ মতবাদ অনুকূল ছিল বলে এ

---

৮৬. ড. গোলাম সাকলায়েন, evsjv‡'‡ki mdxmvaK, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা :১৯৮৯, পৃ.১৮

৮৭. ড. গোলাম সাকলায়েন, cv¸³, পৃ. ১৮

৮৮. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, cv¸³, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

দুই পন্থিদের মতবাদ এ দেশে সহজেই স্থায়ী আসন লাভে সমর্থ হয়। আনুষ্ঠানিক ইসলামে এ মতবাদ কখনও স্থান পায়নি।[৮৯]

হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.)-প্রবর্তিত কাদিরীয়া তরীকায় ও হযরত বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ-প্রচলিত নক্‌শবন্দীয়া তরীকায় দ্বৈততা অর্থাৎ স্রষ্টার পার্থক্য স্বীকার করা হয়। এ দুই পন্থিদের মতবাদ অতি ধীরে এ দেশের মাটিতে স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু জনপ্রিয়তায় সোহরাওয়ার্দীয়া ও চিশতিয়া মতবাদকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। এ অবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপে অসাধারণ প্রতিভা ও প্রতিপত্তির অধিকারী বিজ্ঞ আলিম নকশবন্দিয়া তরীকাপন্থি হযরত শায়খ আহমাদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক) ষোল শতকে বিরাট সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন। এ সংস্কারের ফলে কাদিরীয়া ও নকশবন্দীয়া পন্থিগণ উপমহাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশে এর শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ সময় থেকে সংস্কৃত নকশবন্দীয়া অনুযায়ী "মুজাদ্দিদিয়া" নামে পরিচিত হয়।[৯০]

সূফী চিন্দাধারার ক্ষেত্রে শায়খ আহমাদ সরহিন্দীর অবদান ছিল বৈপ্লবিক। তিনি আল্লাহ ও জগতের একত্ব বিষয়ক সর্বেশ্বরবাদী ধারণা (ওয়াহদাতুল ওজুদ) কে খণ্ডন করেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির অতিবর্তন প্রমাণ করেন।[৯১] কেননা, ওয়াহদাতুল ওজূদ এক জটিল চিন্তাধারা। এ ধারণা থেকে যে বাস্তব অনুমান গ্রহণ করা চলে তা হলো, আল্লাহকে বহুভাবে আরাধনা করা যায় এবং সর্বধর্মের মধ্যে সত্য আছে। আল্লাহ যদি সব কিছুতে প্রকাশিত হোন, তাহলে একটা গো বৎস বা যে কোন কিছুতে উপাসনা করা যেতে পারে। কাজেই সমুদয় মতের প্রতি সহণশীলতা থাকা উচিত।[৯২]

তিনি স্বীয় মুরীদবর্গকে যেমন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করেন, যা তাসাউফ সাধনার একটি নতুন পন্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার চিন্তাধারা দূর-দূরান্তে বিস্তার লাভ করে। এজন্যই তিনি গৃহীত হোন ইসলামে নব প্রাণের সঞ্চারক হিসেবে।[৯৩] শাহওয়ালী উল্লাহ হতে শাহ সৈয়দ আহমাদ বেরলভী পর্যন্ত অনেক ইসলামী চিন্তাবিদই ছোটখাট পরিমার্জনসহ তার শিক্ষাবলী গ্রহণ করেন, যার প্রবাহমাণ ধারা আজও বিদ্যামান। এ প্রসঙ্গে এস রহমান বলেন, "Sufism, which deeply permeated the life of Muslims all over the world, specially in the sub-containent of

---

৮৯. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, cÖv¸³, পৃ. ২১০

৯০. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ cÖv¸³, পৃ. ২১০

৯১. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী, gvKZzevZ kixd (১ম খ.) নং ২৭২ ও ২৯১

৯২. ড. তারা চাঁদ (অনুঃ মজিবউল্লাহ), fviZxq ms¯‹…wZ‡Z Bmjv‡gi cfve, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা:১৯৯১, পৃ.৬৫

৯৩. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী, cÖv¸³, মাকতুব নং-১

Dhaka University Institutional Repository

Indo-Pakistan, had been responsible for so many un-Islamic ideas, creeping into Islam, In fact, Islam had deivated from its fundamental teaching and it was the Mujaddid who brought it nearer into its original purity. His writings caused a revolution, his ideas spread far and wide and he was therefore accepted as the renewer of Islam. Many distinguished sufis such as Shah Waliullah, Khaja Mir Nasir, Khaja Mir Dard, Ghulam Yahya, Shah Rafiuddin and Shah Syed Ahmned Brelwi who flourished after the mujaddid accepted his teachings with minor modification and tried to inspire Muslims with the motto-"Away from platinus and his host and back to mohammd." [৯৪]

এ অবস্থায় প্রতিক্রিয়ারূপে অসাধারণ প্রতিভা ও প্রতিপত্তির অধিকারী বিজ্ঞ আলিম নকশবন্দিয়া তরীকাপন্থি হযরত শায়খ আহমাদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কার) ষোল শতকে বিরাট সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন। এ সংস্কারের ফলে কাদিরীয়া ও নকশবন্দীয়া পন্থিপণ উপমহাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশে এর শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ সময় থেকে তা'মুজাদ্দিদিয়া' নামে পরিচিত হয়।[৯৫] সূফী মতবাদের এ ধারাই বর্তমানে প্রচলিত।[৯৬]

---

৯৪. S. Rahman, Op.cit., P. 237-38

৯৫. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, c৷¸ ³, পৃ. ২১০

৯৬. Saydur Rahman, op.cit., P. 238

Dhaka University Institutional Repository

3q cwi‡”Q‘

mv¤ú‘wqK m¤úxwZ cwZôvq mdx‡‘i Ae‘vb

উপমহাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সূফী মতবাদ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির সেতু বন্ধন রচনায় এগিয়ে এসেছে। সূফী-দরবেশগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের কার্যাবলী শুধু তাঁদের খানকার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁরা জনগণের মন ও সমাজের ওপরও প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আরব-পারস্য এবং মধ্য এশিয়া থেকে মুসলমানগণ যখন এ দেশ জয় করেছিলেন, তাঁদের বিজয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধক আগমন করে এদেশের নব সমাজ গঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বাংলার জনমানষ ও চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ জনসমাজে, মননে ও চিন্তায় মুসলিম সূফী-সাধক ও পীর-দরবেশগণের নিকট থেকে অনাড়ম্বর সহজ-সরল জীবনাচরণের আদর্শ লাভ করলো যা ছিল তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব ও বিস্ময়কর। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম পীর-ফকিরগণ ইসলামের মহিমা ও ঐশ্বর্য অনাড়ম্বরভাবে তুলে ধরায় এবং জনসাধারণের ব্যথা-বেদনা ও বিষাদের অংশ নিজেরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করায় বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ অসঙ্কোচে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্রই তাঁদের আবাসস্থল ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর দৃশ্যস্থান রয়েছে। সর্বত্র তাঁরা তাঁদের চরিত্র ও কাজের প্রভাব রেখে গেছেন। নানা ভাবে তাঁরা ইসলাম ও সমাজের সেবা করেন এবং মুসলিম সমাজের উন্নতি কল্পে তাঁরা মুসলিম বিজেতা, সেনাপতি ও শাসনকর্তাদের অপেক্ষা অধিক স্থায়ী অবদান রেখে যান।[৯৭]

সূফী দরবেশগণ এদেশে আগমন করে কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় খানকাহ নির্মাণ করতেন, সেখানে তাঁর চতুস্পার্শ্বে ভক্ত ও শিষ্যগণ এসে উপস্থিত হতেন। এদের শিষ্যদিগকে নানা রকমের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নির্দেশ দেয়া হতো। সূফীগণ জনসাধারণের সম্মুখে ইসলামের যে সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ তুলে ধরলেন তা সম্পূর্ণ নতুন। প্রকৃতপক্ষে এ সকল সাধু-দরবেশগণের সাধুতা, নিষ্ঠা, নির্লিপ্ততা এ দেশের অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের হৃদয় জয় করেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে শিষ্যগণ এসে সূফী-দরবেশগণের নিকট উপস্থিত হতেন, তাঁদের কেউ কেউ পীরের খানকাহর নিকটেই ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে বাস করতেন এবং সেখানেই তাঁদের ইন্তেকাল হতো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের

---

৯৭. A.K. Banarjee. *West Bengal District Gazeteer (Howrah)*, Calcutta:1922, P. 128

Dhaka University Institutional Repository

দরগাহগুলো দেখে মনে হয় আরব, পারস্য, বোখারা প্রভৃতি দেশ থেকে আগত সূফী সাধকগণের চতুস্পার্শ্বে যে ভক্তগণ এসে উপস্থিত হতেন তারা কেবল বড় বড় শহর বন্দরেই খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে বাস করতেন না, তারা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল এমনকি তাঁরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে খানকা প্রতিষ্ঠা করতেন। ড. আব্দুর রহীম তাই বলেছেন, "Hundreds of Sufis came to bengal in different times from the lands of Islam in western and central Asia as well as Northern India. They belonged to various orders particularly to the Chishtia and suhrawardia. Though imported from outside, Bengal proved to be most congential field for the development of Sufism.

It spread throughout Bengal even to the remotest villages, so that khanqahs and shirines grew up in every nock and corner of the country. Sufism had prospered so much in the soil of Bengal that several new mystic orders developed on the basis of the teachings of some of the distinguished Bengali Sufis." [৯৮]

সূফীদের আদর্শ চরিত্র, অসাধারণ নৈতিক বল এবং দুঃস্থ্য মানবতার জন্যে তাঁদের গভীর সহানুভূতি ও সেবা অমুসলিম জনসাধারণকেও তাঁদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামের উদারতা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য যা সূফীসাধক তৎকালীন আদর্শ অনুসন্ধানকারী ও সমাজের নির্যাতিত ও অধঃপতিত মানুষের নিকট তুলে ধরেছিলেন। সুতরাং এ সকল নিষ্ঠাবান আদর্শ সূফী পুরুষের প্রচারকার্য অমুসলিম, বৌদ্ধ ও সমভাবে সকল শ্রেণির হিন্দুদেরকে ইসলামের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আকৃষ্ট করেছিল।[৯৯]

হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ও তাঁর অনুগামী শিষ্যগণের প্রচেষ্টায় উত্তর বঙ্গের মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁরা পাণ্ডুয়া আগমন করলে বিপুল সংখ্যক লোক তাঁদের নিকট ইসলাম গ্রহণ করে শায়খ আঁখি সিরাজ, শায়খ আলাউল হক, তদীয় পুত্র হযরত শায়খ নূর কুতবুল আলম প্রমুখ সূফীদের প্রচেষ্টায় উত্তর বাংলায় ব্যাপক ভাবে ইসলাম প্রসার ঘটে। মূরদেশীয় পরিব্রাজক ইবনে বতুতার মতে, সিলেটের অধিবাসীগণ হযরত শাহ জালালের (র.) এর ধর্মীয় প্রচারকার্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়। একটি লোক সঙ্গীতে উল্লেখ আছে, সিলেটে

---

৯৮. D. M.A. Rahim, Op.cit. p.76

৯৯. D. M.A. Rahim, Op.cit. p.80

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ লক্ষ হিন্দু ছিল, কিন্তু কোন মুসলমান ছিল না। শাহ জালালই সর্বপ্রথম সে স্থানে আযান দেন অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করেন।[১০০]

হযরত শাহ জালালের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে সিকান্দার খান গাযী কর্তৃক সর্বপ্রথম শ্রীহট্টে মুসলমানদের বিজয় হয়। হযরত শাহ জালাল (র.) ও তাঁর খলিফাগণের প্রচারের ফলেই সিলেট জেলা এবং পাশ্ববর্তী ভূ-ভাগে ইসলাম বিস্তৃত হয়।

উপরন্ত তাঁর অনেক খলিফাই ঢাকা, নোয়াখালী, কাছাড়, রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। কথিত আছে যে, জেলা চব্বিশ পরগণায় পীর সৈয়দ আব্বাস ওরফে পোরচাঁদ তাঁর খলিফা ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে শহীদ হোন। তাঁর মাযার জেলা ২৪ পরগণায় বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে আছে।[১০১]

মুজাহিদ দরবেশ খানজাহান আলীর প্রচেষ্টায় খুলনা ও যশোরে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। এ দুই জেলায় ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী আদর্শ প্রচারে তাঁর কর্মতৎপরতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ অঞ্চলে তাঁর শিষ্য ও অনুগামীদের প্রেরণ করে ইসলাম প্রচারের সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা, দূরদর্শিতা ও আদর্শ চরিত্র মাহাত্মে এ অঞ্চলের বিধর্মীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় ও অকৃত্রিম ভক্তে পরিণত হয় । চট্টগ্রাম-নোয়াখালি অঞ্চল চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। তথাপি এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান।[১০২]

এটা কিভাবে সম্ভব হলো? ড.আব্দুর রহীম বলেছেন, "বাস্তবিক এটা ছিল মুসলমান সূফী দরবেশগণের অমর কীর্তি, তাঁরা এ অমুসলমান অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে ইসলামের ধর্মবিশ্বাস লোকদের মধ্যে বিস্তার করেন। স্থানীয় জনপ্রভাব এ মহান দরবেশগণের কীর্তিরাজিতে উজ্জ্বল। ইতিহাস সম্মত সঠিক প্রমাণের অভাবে এ সব কিংবদন্তির অনেক বর্ণনাই হয়তো গ্রহণ করা কঠিন, তবুও এগুলোতে বাংলার বিভিন্ন এলাকার সূফী দরবেশগণের ব্যাপক ধর্মপ্রচারমূলক কার্যাবলীর প্রতিফলন দেখা যায়।[১০৩]

ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কবি কৃত্তিবাসের মতে, মুসলিম প্রভাব এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, সংমিশ্রণের ভয়ে পূর্ব বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ তাঁদের পৈতৃক ঘরবাড়ী ত্যাগ করেন। তিনি লিখেছেন যে, "তাঁর পূর্ব পুরুষ নরসিংহ ওঝা, যিনি সোনারগায়ের দনুজমর্দন দেবের

১০০. ড. মুহাম্মদ এনামল হক, e‡½ mdx cfve, cÖv¸³, পৃ. ৯৮
১০১. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, Bmjvg cÖm½, রেনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা:১৯৬২, পৃ. ৯৯
১০২. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, cÖv¸³, পৃ. ২০৩
১০৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cÖv¸³, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

একজন সভাসদ ছিলেন, (ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে) তিনিও ঐ সময়ে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন" ।[১০৪]

মুসলমানগণ সোনারগাঁও অঞ্চল জয় করেন ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সে সময় ঐ অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, সংমিশ্রণের দ্বারা ব্রাহ্মণরা তাদের জাত ও কৌলিণ্য হারাবার মত অবস্থার সম্মুখীন হয়? এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বিজয়ের বহু পূর্বেই পূর্ব বঙ্গে ইসলামের অগ্রগতি হয়েছিল।

মনে হয় এ অগ্রগতির মূলে আরব বনিকগণ বা অন্যান্য ধর্মপ্রচারকগণ যারা চট্টগ্রাম ও উত্তর বঙ্গের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গে আগমন করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের সপ্তদশকে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে খানকাহ ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুর রহীমের মন্তব্য উল্লেখ করার মত। তিনি বলেন, "Sonargaon was a lively seat of learning from the later year of the thirteenth entury. It began under the propitious patronage of the renowned scholar Maulana Sharf-al-Din Abu Tawwama. Maulana Abu Tammana founded this seminary of advanced learning and devoted his life to teaching at his place. His renown as a scholar attracted student from far and near."[১০৫]

এ এলাকায় মুসলমানদের জন্য এমন একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় এ ধারণা দৃঢ় হয় যে, শায়খ আবূ তাওয়ামার সোনারগায়ে আগমনের পূর্ব থেকেই সেখানে মুসলিম অধিবাসী ছিল। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে সোনারগাঁয়ে মুসলিম জনসংখ্যার অস্তিত্ব সূফী-দরবেশগণের প্রচারমূলক কার্যাবলীরই ফলশ্রুতি।

---

১০৪. D. M.A. Rahim, op.cit., P. 289

১০৫. Ibid, P. 289

Dhaka University Institutional Repository

wkÿv I ms¯‹wZ‡Z mdxM‡Yi Ae`vb

বিদেশ থেকে আগত সূফী-দরবেশগণের মধ্যে অনেকে পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলীম ছিলেন। সূফী-দরবেশগণ বাংলাদেশে প্রথম আগমনকাল থেকেই লোকদের শিক্ষা দানের দিকে মনসংযোগ করেন। সেজন্য খানকাহর সঙ্গে তাঁরা মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁরা গণশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহগুলো ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানের কেন্দ্র।

এসব শিক্ষা কেন্দ্র চতুর্দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করেছে। কিছু সংখ্যক ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যায় যেগুলো সূফী-দরবেশগণের খানকায় গড়ে উঠেছিল এবং এগুলোর বিচ্ছুরিত জ্ঞানালোকে বাংলা ও উত্তর ভারত আলোকিত হয়েছিল। এ শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত ছিল।

কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী (মৃ. ১২১৮ খ্রি.) বঙ্গে মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি ছিলেন আলী মর্দান খিলজীর (১২১০-১৩ খ্রি.) রাজত্বকালে লক্ষ্মণাবতীর কাজী । তাকে সমরকন্দে বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও সূফী কাজী রুকনুদ্দীন আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আলীর সহিতো অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। ব্লকম্যানের মতে, "তিনি বাংলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ের কাজী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন 'কিতাবুল ইরশাদের' লেখক এবং 'আল খিলাফি ওয়াল জাদাল' (দার্শনিক বিরোধিতা) বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে বুখারায় মৃত্যু বরণ করেন"।[১০৬] কামরূপের ভোজর ব্রাহ্মণ নামে একজন যোগী লক্ষ্মণাবতী আসেন এবং তাঁর সাথে ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনায় পরাস্ত হোন। ইসলামের উচ্চতর আদর্শ অনুধাবন করে এ হিন্দু যোগী ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তিনি ইসলামী শাস্ত্রে এত বেশি পারদর্শীতা লাভ করেন যে, মুসলিম ধর্মবেত্তাগণ তাকে মুফতীর মর্যাদা দেন এবং ধর্ম বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার অনুমতিও প্রদান করেন। তিনি কাজী রুকনুদ্দীনকে 'অমৃতকাণ্ড' নামক গ্রন্থ উপহার দেন, যা হিন্দু মরমীবাদের উপর লিখিত।[১০৭] এ যোগীর সহযোগিতায় কাজী রুকনুদ্দীন 'অমৃতকাণ্ড' গ্রন্থটি সংস্কৃত থেকে আরবি ও ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি নিজেও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন অভ্যাস করেন।[১০৮]

---

১০৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, C\¸ ³, পৃ . ৮৬

১০৭. C\¸ ³, পৃ. ৫০

১০৮. C\¸ ³, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে অন্য আরেক জন ব্রাহ্মণযোগীর সহায়তায় জনৈক অজ্ঞাতনামা লোক কর্তৃক 'অমৃতকাণ্ড' পুনরায় আরবিতে অনূদিত হয়।[১০৯] এ যোগীও ভোজর ব্রাহ্মণের ন্যায় কামরূপের অধিবাসী ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বলেছেন, "মরমীবাদ সম্পর্কিত এ সংস্কৃত পুস্তকের আরবি ও ফারসী অনুবাদ মুসলিম বাংলার সাহিত্যে ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ঘটনা। বাস্তবিকই এটি আরবি ও ফারসী ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু মরমিয়া চিন্তাধারা যে মুসলিম সূফীবাদে সঞ্চারিত হয়েছে অমৃতকাণ্ডের অনুবাদের দ্বারা তা প্রকাশ পেয়েছে। এ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের সঙ্গে যে ঘটনাটি জড়িত আছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু ঋষি ও দার্শনিকগণ ইসলামের মহান আদর্শ বুঝতে পেরেছিলেন এবং এর ফলে তাঁরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। দু'জন ব্রাহ্মণ যোগী ও পণ্ডিতের ইসলাম গ্রহণ এ সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ" ।[১১০]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও দরবেশ হলেন শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা। ইসলামী শিক্ষাও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর বুৎপত্তি ছিল । তিনি সোনারগাঁয়ে একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি ছিল তৎকালের এক বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি উত্তর ভারত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে সমবেত হতেন।

আবূ তাওয়ামা 'মাকামাত' নামে তাসাউফ বা ইসলামী মরমীবাদের উপর এক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সমগ্র উপমহাদেশ ব্যাপী শিক্ষিত মহলে মাকামাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। এ গ্রন্থের চাহিদা লাহোরের মত সুদূর অঞ্চলে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে।[১১১] সোনারগাঁও থেকে ফিক্হ শাস্ত্রের উপর লিখিত 'নাম-ই-হক' নামক গ্রন্থটি সমগ্র উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে স্বীকৃত।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার খ্যাতনামা শিষ্য ও জামাতা মাখদুম শরফুদ্দীন ইয়াহোনয়া মুনায়রী কর্তৃক ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব ও তাসাউফের উপর বহুসংখ্যক গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। শায়খ মুনায়রী সেসব গ্রন্থ সোনারগাঁয়ের শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষকের নিকট থেকে অর্জিত মূল্যবান জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন।

শায়খ আলাউল হকের শিষ্য সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সীমনানী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে ফার্সী ভাষায় সূফীবাদ সংক্রান্ত বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ 'লাতাইফ-ই-আশরাফী' সংকলন করেন তাঁরই শিষ্য হাজী গরীব ইয়েমেনী। তাঁর মাকতুবাত (চিঠি পত্র) সংকলন করেন আব্দুর রাজ্জাক ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এতে

---

১০৯. C◊¸ ³ ,পৃ. ৫২

১১০ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, C◊¸ ³ , পৃ .১৫৩-৫৪

111.D.Muhammad Enamul Hoq, *A History of sufism in Bangle.* Asiatic Socicty of Bangladesh, Dhaka :1948, P. 274

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ব ও মরমী বিষয়ক গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।[১১২] চতুর্দশ শতকের প্রথমে ‘কামাল-ই-করিম’ রচিত ‘মাজমু-ই-খানি ফী আয়নাল মাআনী, নামে ফিকহ্ শাস্ত্রের উপর এক গ্রন্থ আরবি ভাষায় সংকলিত হয়।

হযরত আবু তাওয়ামা (র.) প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁয়ের মত আরও অনেক উচুঁ মানের শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লক্ষ্মণাবতীতে, বর্তমান রাজশাহী জেলার মাহীসুনে, সাওগাঁও-এ, নগোর-এ, মান্দারণে, পাণ্ডুয়ায়, বাঘায়, রংপুরে ও চট্টগ্রামে।[১১৩]

শায়খ আঁখি সিরাজ, শায়খ আলাউল হক এবং নূর কুতুব আলম এঁরা সকলেই তাঁদের বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তারেই নয়, সাধারণ শিক্ষা বিস্তারেও সমান আগ্রহী ছিলেন। নূর কুতুব আলম একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং পরবর্তী সময়ে সুলতান হোসেন শাহ এ প্রতিষ্ঠানের জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন। এ খ্যাতনামা সূফী পুরুষ ও পণ্ডিতদের খ্যাতি উত্তর ভারত ও বাংলার সর্বত্র থেকে শিষ্য শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করে। মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, শায়খ নাসির উদ্দীন মানিকপুরী, শায়খ হোসেন যুক্কারপোশ এবং উত্তর ভারতের আরও অনেকে শায়খ আলাউল হকের নিকট তাঁর পাণ্ডুয়ার শিক্ষাকেন্দ্রে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত নূর কুতুব আলমের যে সামান্য কয়েকটি পত্র পাওয়া গেছে তাতে তাঁর ইসলামী মরমীবাদ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে। এ সব পত্রাদির কিছু সংখ্যক দরবেশ, উলেমা ও শিষ্যদের নিকট লিখিত হয়েছিল।[১১৪] তাঁর রচিত ‘আনিসুল গুরাবা’ হাদীসের ব্যাখ্যাসহ একটি অনুবাদ গ্রন্থ। এতে তাঁর কুরআন, ইসলামী শিক্ষা ও ফার্সী ভাষায় গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। নূর কুতুব আলম ফার্সী ভাষায় একজন ভাল কবিও ছিলেন। তাঁর কিছু কিছু কবিতা ‘সুবহ-ই-গুলশানে’ প্রকাশিত হয়েছে।[১১৫]

এ সময়ে মুসলমানদের সাহিত্যে চর্চা প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করে ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বলেছেন, “এসময়ে মুসলমানদের উদ্যোগে বাংলা পদ্যে কয়েকটি ধর্মীয় ও সূফীবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। এ সব গ্রন্থকারদের আরবি ও ফারসী ভাষায় দক্ষতা ও ইসলামী বিষয়াদিতে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকারগণ কুরআন, হাদিস এবং ধর্মীয় ও মরমী বিষয়ক গ্রন্থগুলোকে তাঁদের

---

১১২. Prof. Hasan Askari, op.cit, p. 38

১১৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, C¡¸ ³, পৃ. ১৬১-৭২

১১৪. Prof. Hasan Askari, op. cit, P.38

১১৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, C¡¸ ³, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সংকলনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। আরবি ও ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকেরা যাতে সহজে বুঝতে পারে তার জন্য ধর্মীয় বিষয়াদি তাঁরা বাংলায় লিখেন। তাঁদের লেখায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকারগণ উপলদ্ধি করেছিলেন যে, মুসলিম সমাজে বিভিন্ন রকম মিশ্র ভাবধারার অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ইসলামী ভাবধারা জনপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। ইসলামের বিধি ব্যবস্থা সঠিকভাবে তুলে ধরে মুসলমানদের সংহতি বজায় রাখা এবং তাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করার ব্রত তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁদের রচনায় এটাও প্রতিফলিত হয়েছে যে, সমসাময়িক মুসলিম সমাজ রক্ষণশীল ছিল এবং সমাজে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ধর্মীয় বিষয়াদি কেবল আরবি ও ফারসী ভাষাতেই লিখিত হতে পারে। কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ও কবি অবশ্য সমাজের এ ধরণের রক্ষণশীলতা পরিহার করে সাধারণ মানুষের উপকারার্থে বাংলায় ধর্মীয় বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করার চিন্তা করেন। প্রতিভাশালী কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর যিনি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১০৯৮-১৪০৯ খ্রি.) রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি এ ভাবধারাই রূপ দান করেছেন। তিনি তাঁর 'ইউসুফ-জুলেখা' নামক গ্রন্থে বলেন যে, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হোন যে, ধর্মীয় বিষয় বাংলায় লিখলে অপরাধ হয় এরকম চিন্তা করার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। তিনি বরং বাংলায় ধর্মের বিষয় লেখা পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। কেননা, এর ফলে মুসলমানদের অতীতের মহান ঐতিহ্য সাধারণ মুসলমানের ভাষা বাংলায় তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ 'ইউসুফ-জুলেখা' রচনা করেন"।[১১৬]

বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল। মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মক্তব্যেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হতো। এ সকল মক্তব প্রতিটি মসজিদ এবং অভিজাত শ্রেণির লোকের বাড়ীর নিকটবর্তী ছিল। ফলে প্রত্যেক শহর এমনকি গ্রামেও প্রাথমিক শিক্ষায়তন বিদ্যমান ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ মক্তবের ব্যয়ভার হয়ত রাষ্ট্র থেকে নয়ত স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের জমি দান ইত্যাদি থেকে বহণ করা হতো। হিন্দু এলাকায় ক্ষুদ্র মুসলমান পাড়ায় ছেলে-মেয়েদের মক্তব ছিল। [১১৭] মুসলমানদের বিশেষত উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চার বছর চার মাস এবং চার দিন বয়সে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা শুরু করার সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুদের এ আনুষ্ঠানিক প্রবেশ 'বিসমিল্লাহখানি' অনুষ্ঠান নামে পরিচিত ছিল। একজন জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বিশেষ নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকের নিকট শিশু তাঁর প্রথম

---

১১৬. ড. আব্দুর রহীম, C//¸ ³, পৃ. ৩৪৪

১১৭. C//¸ ³, পৃ. ৩৪৪

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ গ্রহণ করতো এবং শিক্ষক পবিত্র কুরআন থেকে নির্বাচিত একটি আয়াত পাঠ করতেন এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করতো।[১১৮]

ধর্মীয় শিক্ষা দান ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। বালক বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান শিশু সন্তানকে ধর্মের মূলনীতিসমূহ ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া হতো। ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়াদিও মক্তবে পড়ান হতো।[১১৯]

মাধ্যমিক শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করে ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বলেছেন, "মাদ্রাসাসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা দান করা হতো। উৎকীর্ণ লিপি ও দলিল-পত্রাদিতে কিছু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ প্রদেশে (বঙ্গে) বহু সংখ্যাক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বেশির ভাগ শহর ও গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান এলাকাসমূহে মুসলমান অধিবাসীদের শিক্ষাগত প্রয়োজন মিটাবার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। বহু মসজিদ ও ইমারত বাড়ী মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। সরকার ও অবস্থাশালী ব্যক্তিরা মাদ্রাসা ও মসজিদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে উদারভাবে লাখেরাজ জমি দান করেছেন। কাজী নাসিরুদ্দীন ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও ছাত্রদের ব্যয়ভার বহণ করার জন্যে সুব্যবস্থা করেছিলেন। বাঘার মাদ্রাসার জন্য ৪২টি গ্রাম দান করা হয়েছিল। শিক্ষা ছাড়াও ছাত্ররা বিনা খরচে আহার, বাসস্থান, কাপড়-চেপড়, তেল, প্রসাধনী দ্রব্যাদি এবং মূলগ্রন্থ ব্যবহারের প্রয়োজনে পাণ্ডুলিপি নকল করার জন্যে দরকারী জিনিসপত্র সবকিছু পেত। কুরআন, হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, আইন শাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়াদি মাধ্যমিক পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান যেমন-যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং অন্যান্য বিষয়ও মাদ্রাসায় পড়ান হতো"।[১২০]

শিক্ষার জন্য এ সকল বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা দান ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন সূফী দরবেশগণ। মাদ্রাসার বাইরে উচ্চতর শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় সদৃশ একাডেমীও ছিল।[১২১]

---

১১৮. C¦¸ ³, পৃ. ৩০১

১১৯. C¦¸ ³, পৃ. ৩০১

১২০. C¦¸ ³, পৃ. ১৭৪-৭৫

১২১. C¦¸ ³, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

mgvR Rxe‡b mdx‡‘i Ae‘vb

সমাজ জীবনে সূফী দরবেশগণ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যে সব অঞ্চলে সূফী দরবেশগণের খানকাহ্ বা ধর্মপ্রচার কেন্দ্র থাকতো লোকজন সেখানে যাতায়াত করতো। তাদের ধর্মনিষ্ঠা, জ্ঞান ও অসাধারণ কার্যাবলীর সাথে পরিচিত হতো। তাঁরা সমাজে বিভিন্ন স্তরের আধ্যাত্মবাদ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে আদর্শরূপে তুলে ধরেন। তাঁরা সঠিকভাবে অধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডলে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন এবং ইহজগতের প্রতি একটা অনীহা ভাব প্রদর্শন করেন। তাঁরা ধর্মের উদার দৃষ্টিভঙ্গি জনসমাজে তুলে ধরেন। ফলে সাধারণ লোকজন তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হতো।

দলে দলে তারা আসত দরবেশগণের দোয়া নিতে। এভাবে সর্বশ্রেণির মানুষের সাথে ভাব বিনিময় ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে এ দেশের সাধারণ মানুষ পীর-দরবেশগণের নিকট হতে আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করেন।[১২২] পূর্ব বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পীর দরবেশগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরাই বাংলাদেশের ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সভ্যতার প্রকৃত মশালবাহী। ইসলামের মহান আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে বিধর্মীদের মধ্যে সত্যধর্ম প্রচার ও মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্যই এ সব পীর দরবেশ আরব ও মধ্য এশিয়ার দূর-দূরান্ত থেকে সুদূর বাংলায় আগমন করেন।[১২৩]

বিভিন্ন সময়ে দেশত্যাগী সূফী-দরবেশগণ এ দেশে আসতেন এবং খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের চারপাশে মুরীদ জড়ো করে শিক্ষা দান করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত হোন। যে সকল সূফী এ দেশে জন্মেছিলেন ও লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাঁরাও একই সাংস্কৃতিক বৃত্তিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। এভাবে সূফীগণ মুসলিম সমাজে শাসক শ্রেণি ও আলেমগণের সঙ্গে আরও একটি শক্তির সংযোজন ঘটিয়েছিলেন। ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেছেন, "বিভিন্ন সময় শত শত সূফী-দরবেশ ও তাঁদের অনুগামী শিষ্যরা বাংলায় আগমন করেন এবং বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে এমনকি প্রদেশের নিভৃততম কোণেও ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এবং অতীন্দ্রিয়বাদ ও স্বর্গীয় প্রেমের প্রসার সাধন করেন। এভাবে তাঁরা মানুষের নৈতিক ও মানষিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করেন। তাঁদের আদর্শ চরিত্র, অসামান্য নৈতিক বল এবং দুঃস্থ্য মানবতার জন্যে তাঁদের গভীর সহানুভূতি ও সেবা অমুসলমান জনসাধারণকেও তাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামের উদারতা ও

---

১২২. D. Mohammad Mohor Ali, *History of Muslims of Bengal*, Riyadh:1985, P. 832
১২৩. D. Mohammad Enamul Haq, Op. cit. P. 260

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক প্রাধান্য, যা সূফী পুরুষগণ তৎকালীন আদর্শ অনুসন্ধানকারী ও সমাজের নির্যাতিত ও অধঃপতিত মানুষের নিকট তুলে ধরেছিলেন।[১২৪]

সুতরাং এ সকল আদর্শবান পুরুষের প্রচারকাজ অমুসলমান, বৌদ্ধ ও সমভাবে সকল শ্রেণির হিন্দুগণকে ইসলামের ছায়াতলে আকৃষ্ট করেছিল। তারা নিজেদের মুসলমান বলে আখ্যায়িত করতো। আবার সে সাথে তাঁদের কিছু ধর্মবিশ্বাস ও ক্রিয়া-পদ্ধতি অটুট থেকে যেতো; অবশ্য নাম বদলে যেতো।

সূফীগণের দরগাহগুলোর অবস্থান বিবেচনা করা হলে দেখা যায় সূফীগণ শুধু প্রধান শহরগুলোয়ই জড়ো হোননি, পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে পশ্চিমে মঙ্গলকোট ও পূর্ণিয়া এবং দক্ষিণে বাগেরহাট ও ছোট পাণ্ডুয়া থেকে উত্তরে কান্তাদুয়ার ও রংপুর পর্যন্ত সারা দেশে তাঁরা ছড়িয়েছিলেন। জীবনকালে তাঁরা জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং আজও শত শত মানুষ তাঁদের দরগাহ ও সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসে।

সূফী-দরবেশগণের খানকাহসমূহ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এখানেই স্রষ্টা সন্ধানী মানুষেরা তাঁদের মনের শান্তি খুঁজে পেত এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হতো। খানকাহগুলো ছিল একাধারে চিকিৎসাকেন্দ্র এবং আশ্রয় স্থান, যেখানে দুঃস্থ্য, বদ্ধ উন্মাদ এবং রুগ্নব্যক্তি সরাসরি আশ্রয় লাভ করতো। তাঁরা শায়খ ও তদীয় শিষ্যদের নিকট হতে চিকিৎসা, সেবা ও যত্ন লাভ করতো। প্রতিটি খানকাহর সঙ্গে একটি করে লঙ্গরখানা বা বিনা খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকতো যেখানে থেকে গরীব ও অভূক্ত লোকদের খাবার দেয়া হতো, লঙ্গরখানার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিষয় সম্পত্তিও দান করা হতো। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ও পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সূফী-দরবেশগণের প্রতিষ্ঠিত খানকাহ সমূহের বিরাট আয়ের লাখারাজ জমি ছিল। এভাবে সাধু-দরবেশগণের খানকাহ ও লঙ্গরখানাগুলো দুঃস্থ্য মানুষের নিকট এক মহামুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বিনা খরচে খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সাধু দরবেশগণ দেশের দীন-দুঃখী ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে এবং তাঁদের অনুভূতি ও আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝতে সক্ষম হোন।[১২৫]

তাঁদের খানকাহ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের নিরাপদ আশ্রয়। দেশী-বিদেশী, ধনী-দরিদ্র, আর্ত-পীড়িত, পথিক-আগন্তুক সকলের জন্য তাঁদের খানকাহ অবারিত দ্বার। তাঁদের

---

১২৪. ড. আব্দুল করিম, (অনু. এন. এম. রহমান), evsjvi gmjgvb‡'i mvgvwRK BwZnvm, বাংলা একাডেমী, ঢাকা:১৯৯৬, পৃ. ১৭৬

১২৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cÖv¸³, পৃ. ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

লঙ্গরখানায় সবার জন্য ভোজ্য ও পানীয় সর্বদা মজুদ ও সহজলভ্য থাকতো। এ জন্যই সূফীদের দরগাহগুলোকে দুনিয়ার বিশ্রাম দানকারী অট্টালিকারূপে বিবেচনা করা হতো যেখানে জনসাধারণের আশা পুরণ ঘটে।[১২৬] ড. এনামুল হকের ভাষায় "জনসাধারণ তাঁদের সম্পর্কে মনে মনে এ ধারণা পোষণ করতো যে, তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহাপুরুষ; অলৌকিক ক্ষমতা বলে তাঁরা পীড়িত ও তাপিতকে সবল ও নিরাময় করতে পারেন; শোকাতুরকে তার মনের ক্লেদ ও গ্লাণি মুহূর্তের মধ্যে মুছে দিতে পারেন। এদের কর্মের দিক সম্পর্কে আলোচনা করলে ভক্তি ভরে মস্তক আপনা আপনি বিনীত হয়ে পড়ে। সংসারের সুখ-দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করে কর্ম ও সাধনার জন্য তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন"।[১২৭]

সমাজ জীবনে দরবেশগণ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়েছেন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়েছেন, পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে বসে তাদের সেবা করেছেন; মৃত্যুর পরেও কাঁধে করে কবর দিয়েছেন। এদের সংস্পর্শে এসে পাপী পাপাচরণ ত্যাগ করে সাধু হয়েছে, সংসারী পরোপকারে আত্মবিলিয়ে দিয়েছে, বস্তুত পক্ষে তাদের দেখলে সত্যই মনে হতো যে, তাঁরা 'শান্তির দূত'। তাই মানুষ সূফী দরবেশগণের পেছনে ছুটে চলতো। এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, বাংলাদেশের সমাজ জীবনে পূণ্যশ্লোক এ সাধকদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল গভীর।[১২৮]

সুফী-দরবেশগণের খানকাহগুলো হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সকল মতের লোকদের মিলন কেন্দ্র ছিল। এ কেন্দ্রগুলো অবারিত প্রতিষ্ঠান ও খোলাখুলি আলোচনার স্থানে পরিণত হয়। এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ সব প্রতিষ্ঠান একটা উদারনৈতিক ও অনুকুল পরিবেশের সৃষ্টি করে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ একে অন্যের নিকটতর হয় এবং একে অন্যের মতকে বুঝতে পারে। এ উদার পরিবেশে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক মতবাদ 'সত্যপীর' পূজার উদ্ভব হয় এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

সূফী-দরবেশগণের সততা ও ব্যক্তিত্ব তাঁদের মানবতা ও সেবা, প্রীতি ও উদারতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণির হিন্দুকে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাদের অনেকেই দরবেশগণের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। বস্তুতপক্ষে সূফী-দরবেশগণ এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, দেশের শাসক ও সুলতানগণ যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন এরা সেখানে

---

১২৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম,C৶¸ ³, পৃ. ১২৮

১২৭. D. Mohammad Enamul Haq, op.cit., P. 262

১২৮. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, C৶¸ ³, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

আশাতীতরূপে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। এক কথায় বলা যায়, সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা প্রণালী, দৃঢ় চরিত্র বল ও গভীর আত্মবিশ্বাসের জন্য এরা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁদের জীবনে ইসলামের সনাতন আদর্শ এমন অকৃত্রিমভাবে প্রকাশিত হতে দেখে এদেশের মানুষ অতি সহজেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবার অনেকেই নিজেদের ঐতিহ্যগত ধর্ম বিশ্বাসকেই রক্ষা করে আসছিল। তথাপি তারা সুফী-দরবেশগণের একান্ত ভক্ত হয়ে উঠে এবং তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানায়। এমনকি বহু শতাব্দী ব্যাপী হিন্দুরা ভক্তির সঙ্গে সূফী-দরবেশগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছে এবং তাঁদের আশীর্বাদ লাভের আশায় মাযার শরীফ পরিদর্শন করছে।[১২৯]

বিদেশাগত সূফী-দরবেশগণ যখন বাংলায় আগমন করে তখন বাংলায় সর্বত্র উৎকট তান্ত্রিক গুরুবাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। কালীসেবী সুরাপায়ী তান্ত্রিকতাবাদের বীভৎস নরবলীর ভয়ে যখন সারাদেশ আতংকগ্রস্ত সে সময়ই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অলী-দরবেশগণ এ দেশে আগমন করেন। তাদের নিকট তান্ত্রিক মারণ, উচাটন ও বশীকরণ সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্র নিস্ফল প্রমাণিত হয়। তান্ত্রিক গুরুগণ দরবেশগণের নিকট পরাজিত হয়ে হয় ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। গুরুর পরাজয়ে স্থানীয় লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে ফলে তান্ত্রিক শক্তি বিলুপ্ত হয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সূফী-দরবেশগণ ঐ দেশে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে প্রধানত দেশীয় ভাষা বাংলা ব্যবহার করেছেন। অমুসলিম জনসাধারণ আরবি, ফারসী ভাষা বুঝতে না পারার কারণে পীর-দরবেশগণ এদেশের লোকজনের আঞ্চলিক ভাষায় আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন। আবার কুরআন, হাদীসের বিষয়বস্তু আরবি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নবদীক্ষিতদের মধ্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে সূফী-দরবেশগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। ফলে বাংলা ভাষার ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয়।[১৩০]

মুসলমান পীর-দরবেশগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও জনহিতোকর কার্যাবলীর দ্বারা হিন্দু জনগণের মনে গভীর ও স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। ।[১৩১] সংস্কৃতি ভাষায় লিখিত 'শেক শুভোদয়ার' লেখক হলোয়ুধ মিশ্র শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিজীর প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেন। দুঃখ-

---

১২৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, c‍¸ ³, পৃ-১২৮

১৩০. D. M.A. Rahim, op.cit., p. 216

১৩১. সুকুমার সেন সম্পাদিত, †kK ï‡f v‘qv, কলিকাতা:১৯২৭, ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের আশায় তারা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতো ও তাঁর পবিত্র নামে তাদের বিষয় সম্পত্তি অর্ধেক উৎসর্গ করতো।[১৩২] হিন্দু কবি বিদ্যাপতি মহান তাপস খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, জাফর খাঁ গাযী, বড় খাঁ গাযী ও ইসমাইল গাযীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর কাব্য 'সত্যপীর পাঁচালী' মুসলমান পীর-দরবেশ সত্যপীরের আদেশে রচনা করেন।[১৩৩] বাংলাদেশের সূফী-দরবেশগণ উত্তর ভারতের সূফীদের অনুকরণে খানকাহ পরিচালনা করতেন। শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে এসে সেখানে একটি খানকাহ ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর খানকাহতে অগণিত লোকজন প্রতিপালিত হতো। তাঁদের খানা খেতে সময় লাগত। ফলে তাঁর প্রধান শিষ্য শরফুদ্দীন ইয়াহোনয়া মানেরী খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে খাওয়া বন্ধ করে দেন। কারণ তাতে তাঁর সময় নষ্ট হতো; লেখা-পড়ার ব্যাঘাত ঘটত।[১৩৪] সিলেটের হযরত শাহজালালের আস্তানায় বহু লোকের যাতায়াত ছিল। তাঁরা আসবার সময় সঙ্গে করে খানা নিয়ে আসতেন এবং তখনই তা শিষ্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন। স্বহস্তে খানকাহ পরিস্কার করতেন এবং কাপড়-চোপড় ধৌত করতেন।[১৩৫] শায়খ আলাউল হক সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। তথাপি তাঁর খানকাহতে হাজার হাজার দুঃস্থ্য, দরিদ্র মুসাফির প্রতিপালিত হতো।[১৩৬]

আগেই বলা হয়েছে যে, জনসাধারণ বিশ্বাস করতো যে, তাঁরা কারামাত বা অতি মানবীয় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁরা আল্লাহ কর্তৃক অনুপ্রাণিত, তাঁদের অন্তর ঐশ্বরিক উপলব্ধিতে আলোকিত এবং তাঁরা হচ্ছেন সত্যের ভাণ্ডার। তাঁরা সরল ও অত্যন্ত আত্মসংযমী জীবন যাপন করা সত্ত্বেও জনগণের মনে এ সব বিশ্বাস ছিল । তাঁরা সামান্য কাজ এমনকি গুরুর আদেশে ঝাড়ুদারের কাজ করতেও দ্বিধারোধ করতেন না। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী তাঁর পীর শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর জন্য এবং শায়খ আলাউল হক তাঁর পীর শায়খ আঁখি সিরাজুদ্দীন উসমানের জন্য উষ্ণ খাদ্যসহ উত্তপ্ত উনূন সর্বদা মাথায় নিয়ে চলতেন।[১৩৭]

---

১৩২. এম. কে. সেন ,cÖv¸³, পৃ. ৮০

১৩৩. cÖv¸³, পৃ. ৮০

১৩৪. সুখময় মুখোপাধ্যায়, evsjvi BwZnv‡mi ‘yÕ‡kv eQi, কলিকাতা:১৯৬৬, পৃ. ৪৬৯

১৩৫. সুখময় মুখোপাধ্যায়,cÖv¸³, পৃ. ৪৬৯

১৩৬. D. M.A. Rahim. op.cit., P.289

১৩৭. D. Mohammad Enamul Haq, op.cit., p. 173

শায়খ নূর কুতবুল আলম বলেছেন যে, তাঁর গুরু (তাঁর পিতা শায়খ আলাউল হক) তাকে দয়ার সূর্য, বিনয়ের পানি এবং ধৈর্যের মাটির মত হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৩৮]

মহান সূফী-সাধকদের এসব অসাধারণ কার্যাবলী ও গুণাবলীর জন্যই তাঁদেরকে নানাবিধ উপাধি প্রদান করা হতো। শায়খ আলাউল হককে 'সদয় শ্রদ্ধেয় দরবেশ'রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৯] শায়খ নুর কুতবুল আলম বলেছেন যে, "হযরত সুলতান-উল-আরিফীন (দরবেশগণের সুলতান, কুতুব উল আকবর আলোর আলো বিকিরণ কেন্দ্র) ধর্মের আকাশের সূর্য এবং সত্যের ভাণ্ডারের চাঁদ, আধ্যাত্মিকতার প্রদর্শকরূপে"।[১৪০]

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত "দেবদূত সদৃশ স্বভাবের অধিকারী এবং ধর্ম ও বিশ্বের সুলতান"।[১৪১] সূফী সাধকদের সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা প্রণালী, দৃঢ় চরিত্র বল ও গভীর আত্মবিশ্বাসের জন্য সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রতি ঝুঁকে পড়ত। ফলে লোকজন সূফীদের খানকাহ ও আস্তানায় গিয়ে ভীড় জমাত এবং ইসলাম গ্রহণ করে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের চেষ্টা করতো। জাগতিক কোন কারণ স্থানীয় জনগণকে ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেনি। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য এবং বর্ণগত বাঁধা, নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণদের উৎপীড়ন, নিশ্চিতভাবেই ধর্মান্তরণের প্রধান কারণ ছিল। ব্রাহ্মণরা কিভাবে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করেছিল এবং কিভাবে বৌদ্ধরা খোদা, পয়গাম্বর, পীর, গাযী ইত্যাদির সাহায্য প্রার্থনা করেছিল তারই একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে শূণ্যপুরাণের 'নিরাঞ্জনের রুস্মা' অধ্যায়ে।[১৪২]

এভাবে সর্বশ্রেণির জনসমাজেই সূফী-দরবেশগণের প্রভাব ছিল বিপুল। গলি থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁদের প্রভাব সমভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তৎকালীন সমাজে সূফীবাদ একটি শক্তিশালী উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সূফী দরবেশগণ এ দেশে আগমন করে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় খানকা নির্মাণ করতেন, সেখানে তাঁদের চতুষ্পার্শ্বে ভক্ত ও শিষ্যগণ এসে উপস্থিত হতেন। এতে শিষ্যদিগকে নানা রকমের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নির্দেশ দেয়া হতো। সূফিগণ জনসাধারণের সম্মুখে ইসলামের যে সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ তুলে ধরলেন, তা সম্পূর্ণ নতুন।

---

১৩৮. ড. আব্দুল করিম, cÖv¸³, পৃ. ১৯৬
১৩৯. cÖv¸³, পৃ. ১৯৬
১৪০. Abid Ali Khan op.cit., P.104. 170
১৪১. Ibid, P. 104
১৪২. সি. সি. বন্দোপাধ্যায়, cÖv¸³, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে এ সকল সাধু-দরবেশগণের সাধুতা, নিষ্ঠা এ দেশের অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের হৃদয় জয় করেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে পুণ্যার্থীগণ এসে সূফী-দরবেশগণের নিকট উপস্থিত হতেন। তাঁদের কেউ কেউ পীরের খানকাহর নিকটেই ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে বাস করতেন এবং সেখানেই তাদের ইন্তেকাল হতো।

উপরন্তু বাংলাদেশে সূফী সাধকগণের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রমাণ তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও তৎকালীন শাসকগোষ্ঠি সহজে এ দেশে সূফী-দরবেশগণের আগমন ও ধর্ম প্রচারকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে অনেক সময় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতো এবং নির্যাতন চালাতো। সে কারণে তাদের সঙ্গে অনেক সময় যুদ্ধও করতে হয়েছে। যুদ্ধে অনেকে শহীদ হয়েছেন। অনেকে তাঁদের জীবনচরিত্র, কর্ম ও চিন্তাধারায় শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিপুল সংখ্যক জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইসলামের প্রভার বিস্তার পড়েছে। সূফী-দরবেশগণ অনেক সময় অলৌকিক কারামতি দেখিয়েও লোকদের উপর প্রভার বিস্তার করতেন। বস্তুত ইসলামের মূলনীতি একত্ববাদ ও ইসলামের অন্তর্নিহিতো আধ্যাত্মিক শক্তির জোরেই পৌত্তলিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তাঁরা জয় লাভে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং সূফীগণ ও তাঁদের দরগাহগুলো বাংলার মুসলিম সমাজের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সূফীগণ কেবল তাঁদের জীবদ্দশায় সমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন তা নয়, বরং মৃত্যুর পরেও তাঁদের মাযার বা দরগাহগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এখনও করছে। বাংলায় অনেক দরগাহ তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। শুধু তাঁদের উরসের দিনে বা মৃত্যু বার্ষিকীতেই নয়, সারা বছরই এগুলোতে জনতার ভীর লেগে থাকতো। চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফীগণ কোন দান বা উপহার গ্রহণ করতেন না, তাঁরা নিতেন ফুতুহ বা অযাচিত দান। তাঁদের দরগাহগুলো ছিল জীর্ণ-শীর্ণ এবং শিষ্যদের নিয়ে তাঁরা দীনহীন ও একান্ত অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু পাণ্ডুয়ার শায়খ নূর কুতবুল আলমের দরগাহকে বলা হয় শাস হাজারী বা ছয় হাজারী, অর্থাৎ দরগাহর ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল ছয় হাজার টাকা। আলাউদ্দিন হোসাইন শাহ এ জমি দান করেছিলেন, তবে দরবেশের জীবদ্দশায় নয়, তাঁর মৃত্যুর পরে। এতে দেখা যায় যে, সূফীরা তাঁদের মৃত্যুর পরেও যেমন মানুয়ের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তেমনি সূফীগণের পূর্ব পুরুষরা রাষ্ট্র থেকে ইনাম বা দান হিসেবে জমি লাভ করতেন এবং এভাবে তাঁরা ইনামদার জমির মালিক হতেন।[১৪৩] সুতরাং সূফীগণ ও তাঁদের দরগাহগুলো বাংলার মুসলিম সমাজের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বাস্তবিকই মুসলিম পীর-দরবেশগণ যথার্থরূপে বাংলার আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিজয়ের প্রতীক স্বরূপ ছিলেন।

kvmb KZc‡ÿ i Dci mdx-'i‡ekM‡Yi cfve

---

১৪৩. ড. আব্দুল করিম, C\/¸ ³, পৃ.২০০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সূফী-সাধকগণ বিভিন্নভাবে শাসন কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন। তাঁরা অনেক সময় এ দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতেন এবং কখনও কখনও বাদশাহদের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের উপর তাদের প্রভাব খাটাতেন। ইসলামে যেহেতু্ পেশাদার ধর্ম প্রচারকদের কোন ব্যবস্থা নেই সেহেতু্ ধর্মীয় কর্তব্যবোধের তাগিদেই দরবেশগণ দেশের সর্বত্র ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁরা ইসলামের জন্য মানব কল্যাণমূলক কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতেন। ফলে সাধারণ মানুষের নিকট তাঁরা পুন্যাত্মা হিসেবে প্রতিভাত হতেন। মানব সেবাকেই তাঁরা স্রষ্টার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও প্রেম রূপে বিবেচনা করে থাকেন। মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী বলেছেন, "মানুষের চিত্ত জয় করাই মহোত্তম তীর্থযাত্রা এবং একটি হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও শ্রেয়। কাবা তো কেবল ইব্রাহীমের গৃহ কিন্তু হৃদয়ই হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র বাস"।[১৪৪]

ধর্ম প্রচার ও মানবকল্যাণকর কার্যাবলীর এ সমুদয় আদর্শ নিয়েই তাঁরা ইসলাম প্রচার করতেন। বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুসলমান বিজেতা এবং শাসকগণও কৃতিত্বের অংশীদার এ ব্যাপারে তাদের কৃতিত্ব সূফী-দরবেশদের তুলনায় ততটা তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও উল্লেখযোগ্য। বহুক্ষেত্রে তাদের কার্যাবলী সে সব মহান আধ্যাত্মিক সাধকদের কার্যের পরিপূরক ছিল। পীর-দরবেশদের ধর্মীয় কার্যাবলী বাংলার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিজয়ে এবং প্রদেশে শাসন সংহতোকরণে সাহায্যে করেছে। মুসলিম বিজেতা ও শাসনকর্তাগণ তাদের মহান ব্রতের অগ্রগতির জন্য নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছেন। ধর্মান্তরিত লোক সংগ্রহে এবং ধর্মের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ সৃষ্টিতে বাস্তবিকই রাজকীয় শক্তির সহযোগিতা ও সমর্থন ধর্মীয় নেতাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করেছিল। ধর্মের প্রতি শাসনকর্তাগণ নিজেরা অনুরক্ত ছিলেন এবং স্বভাবতঃই তারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় এর উন্নতি বিধান করতে আগ্রহী ছিলেন। তারা অনুভব করেছিলেন যে মুসলমান সম্প্রদায় বাংলাদেশে শক্তিশালী থাকলে তা প্রদেশে মুসলিম রাষ্টের পক্ষে একটা সমর্থনের উৎস হবে এবং একে শক্তি জোগাবে। সুতরাং তারা উলামা ও পীর-দরবেশগণকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন এবং ইসলামের উন্নতিকল্পে তাদেরকে সমর্থন দান করতেন"।[১৪৫]

অনেক স্থলে সুফীগণ বংশ পরস্পরায় ইসলাম প্রচারে জান-মাল কুরবান করাকে জীবনের পরম পাওনা বলে মনে করতেন। তবে বহু স্থানে তাদের নিজেদের জীবিকা বা পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের চিন্তা করতে হতো না। মুসলিম শাসক ও সুলতানগণ স্বেচ্ছায় সে ভার বহণ করতেন। সূফীদের প্রতি

---

১৪৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cÖ¸³, পৃ.৬৯
১৪৫. Mv¸³, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাদের প্রভাবে সুলতানগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় উপদেশ দান, শিক্ষা প্রচার ও সূফী বিদ্যা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা করেন। সুলতানগণের ন্যায় তাদের আমীর-উমারাও সূফী-দরবেশ প্রিয় ছিলেন এবং বহু স্থানে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গ বিজয়ী মুসলিম বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী শায়খদের জন্য অনেক খানকাহ নির্মাণ করেন এবং তাঁর সহচরবৃন্দও এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।[১৪৬]

মিনহাজের মতে, গিয়াস উদ্দিন আওয়াজ খিলজী পীর-দরবেশদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সূফী-দরবেশগণকে বৃত্তি ও ভাতা দানের ব্যাপারে আওয়াজ খুব উদার ছিলেন। যেমন- তার শাসনামলে খ্যাতনামা আলিম ও ধর্ম প্রচারক মাওলানা জালালুদ্দীন গজনবী লক্ষ্মণাবতীতে আগমন করেন। আওয়াজ খিলজী তাকে দরবার কক্ষে একটি ভাষণ দানের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। বক্তৃতা শেষে তিনি তাকে প্রায় দু'হাজার তংকা উপহার দেন এবং আমির, মালিক, মন্ত্রী ও অন্যান্যদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা উদারভাবে উপহার দিয়ে মাওলানাকে সম্মানিত করেন। এভাবে মাওলানা তিন হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লাভ করেন। মিনহাজের ভাষায়, "লক্ষ্মণাবতী থেকে মাওলানা স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকালে আরও অতিরিক্ত পাঁচ হাজার মুদ্রা উপহার হিসেবে সংগৃহীত হয়। এভাবে উদার প্রকৃতির এ খ্যাতনামা সুলতানের দৃষ্টান্তধর্মী ধর্মানুরাগের ফলে সে ইমাম ও ইমামের পুত্র মাওলানা জালালুদ্দীন দশ হাজার মুদ্রা অর্জন করেন"।[১৪৭]

সুলতান বলবনের সময় বাংলার শাসনকর্তা মুগীস উদ্দিন তুগ্রিল পীর-দরবেশগণের প্রতি এত বেশি অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের দরবেশগণকে তিন মণ স্বর্ণ দান করেন।[১৪৮] ইবনে বতুতার মতে, ফকির ও সূফী-দরবেশগণের প্রতি ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের গভীর ভক্তি ছিল। তিনি বলেন, "ফকিরদের প্রতি ফখরুদ্দীনের এতবেশি ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি সৈয়দানা নামে একজন কলন্দর দরবেশকে সাদকাওয়ানে (চট্টগ্রামে) তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। তিনি ফকিরদের ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত করেন এবং ঐ ভ্রমণকালে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন।[১৪৯] সুলতান ফখরুদ্দীন নির্দেশ দেন যে, নদী পথে ফকিরদের নিকট থেকে কোনরূপ ভাড়া নেয়া হবে না এবং যাদের নিকট

---

১৪৬. মিনহাজ-ই-মিরাজ, ZvevKvZ-B-bvwmix, বাংলা একাডেমী, ঢাকা:১৯৭৬, পৃ. ১৫১

১৪৭. মিনহাজ-ই-মিরাজ, ZvevKvZ-B-bvwmix, cv¸³, পৃ. ১৫৮

১৪৮. জিয়া উদ্দিন বারণী, ZvwiL- B-wdivæRkvnx, evsjv GKv‡Wgx, XvKv:1982, পৃ. ৯১

১৪৯. M.K. Batta Sali, *Ibn Battuta, Coins & Chronology etc,* Baroda Oriental Institute, India: 1963, P.136

Dhaka University Institutional Repository

কোন কিছুই নেই তাদেরকে ভ্রমণ পথে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। যখন কোন ফকির গ্রামে আগমন করেন, তখন তাকে দিনার দেয়া হবে।[১৫০]

রাষ্ট্র ও সুলতানদের প্রতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূফীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিভিন্ন রকম। সোহরাওয়াদীয়া সম্প্রদায়ের সূফীগণ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তাঁরা সুলতান ও যুবরাজদের নিকট হতে উচ্চ পদ ও ধনদৌলত গ্রহণ করতেন। অপরদিকে চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফীগণ দরবার ও সুলতানদের নিকট থেকে দূরে থাকতেন এবং তাদের প্রতি উদাসীন ছিলেন। রাষ্ট্র প্রদত্ত কোন উপহার বা উচ্চপদ গ্রহণ করতেন না। সে যাই হোক, দিল্লীর সুলতানগণ সূফীদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

কোন সূফী দরবেশ দিল্লী আগমন করলে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে রাজধানীর বাইরে চলে আসতেন। বলবন এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলোকের মত শক্তিশালী সুলতানগণও সমসাময়িক দরবেশগণের প্রতি অনুগত ছিলেন।[১৫১]

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ পীর-দরবেশগণকে খুব সম্মান করতেন। গোরক্ষপুর অঞ্চল বিজয়কালে তিনি বাহরাইনে অবস্থিত শায়খ মাসউদ গাযীর মাযার জিয়ারত করতেন। সে সময় তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি তিনি দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন তাহলে তিনি শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার দরগাহ যিয়ারত করবেন এবং এ বিখ্যাত দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। যখন সুলতান ইলিয়াস শাহ্ সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলোকের সৈন্য বাহিনী কর্তৃক‘একঢালা’ দুর্গে অবরুদ্ধ হোন, সে সময় পাণ্ডুয়ায় শায়খ রাজা বিয়াবাণী মৃত্যু বরণ করেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ্ এ দরবেশের খুব অনুরক্ত ছিলেন। দরবেশের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইলিয়াস শাহ্ ফকিরের ছন্দবেশে ‘একঢালা’ দূর্গ বের হয়ে আসেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি প্রিয় শায়খের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।[১৫২]

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ সূফীদেরকে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। তিনি তার বাল্যবন্ধু শায়খ নূর কুতবুল আলমকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতেন। জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ সূফী দরবেশগণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সোনার গাঁয়ে নির্বাসিত দরবেশ শায়খ যাহিদকে পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রায়ই তাঁর নিকট উপস্থিত

১৫০.Ibid, P. 140

১৫১. K. A. Nizami, *Some Aspects of Religion and Polities in India in the Thirteen Century*, Peoples pubs house, New Delhi:1982. P. 240

১৫২. গোলাম হোসায়ন সলীম,(আকবর উদ্দীন অনুদিত), wiqvR-Dm-mvjvZxb,ঢাকা:তা.বি., পৃ.৯৭

Dhaka University Institutional Repository

হতেন। বাংলার আফগান শাসক সুলায়মান কররানী ১৫০ জন শায়খ ও আলিমের সঙ্গে ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনায় কাঁটিয়ে দিতেন।

মুসলমান সভাসদবর্গ ও কর্মচারীগণ শায়খদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে শাসনকর্তা ও সুলতানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন।

পীর দরবেশগণের মাযার যিয়ারতের ব্রত গ্রহণ করা তাদের মধ্যে খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। তারা পীর-দরবেশগণের মাযারে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন এবং তাঁদের দরগাহ্ ও লঙ্গরখানা সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাখারাজ জমি ইত্যাদির সংস্থান করতেন।

প্রথম যুগের মুসলমান শাসকগণ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতেন। ইসলামী আইনের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধার ফলে একজন সামান্য নারী বা পুরুষ এমনকি একজন শক্তিশালী সুলতানের বিরুদ্ধেও নালিশ করতে পারতেন এবং অধিনস্ত কর্মচারী কাযী সুলতানকে পর্যন্ত একজন সাধারণ আসামীরূপে বিচারালয়ে ডেকে পাঠাতে পারতেন। কথিত আছে যে, একদা সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ যখন তীর নিক্ষেপের অভ্যাস করছিলেন, তখন আকস্মিকভাবে একটি তীর এক বিধবা মহিলোার পুত্রের শরীরের বিদ্ধ হলে সে মারা যায়। পুত্র হারা মা কাযীর দরবারে সুলতানের বিরুদ্ধে হত্যাার অভিযোগ দায়ের করে। কাযী সুলতানকে ডেকে পাঠালে সুলতান একজন সাধারণ আসামীর মত কাজীর দরবারে উপস্থিত হোন। কাজী সাধারণ অপরাধীর মতই সুলতানের বিচার করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এই সন্তানহারা মা সন্তুষ্ট হয়ে আইনানুমোদিত কিছু স্বর্ণ গ্রহণ করে সে সুলতানকে ক্ষমা করে দেয়। শরিয়তের অনুশাসন বিশ্বস্তভাবে অনুসরণের জন্য সুলতান কাযীর প্রশংসা করেন এবং তাকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করেন।[১৫৩]

বাংলার মুসলিম শাসকগণ তাদের ধর্মনিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব এবং শরিয়তের অনুশাসনের প্রতি বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তারা তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ধর্মীয় চরিত্রের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। সুলতান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতেও নেতৃত্ব দিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টিতে সহায়তা করতেন। তারা মক্কা মদীনায় পবিত্র শহরগুলোতে উপহার-উপঠৌকন প্রেরণ করতেন এবং হজ্জ পালনের জন্য লোকদেরকে সুযোগ-সুবিধা দান করতেন। শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহোনয়া মানেরীর শিষ্য মুযাফ্ফর শামস বলখীর অনুরোধে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ সূফীদের হজ্জের জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করতেন।

---

১৫৩. গোলাম হোসায়ন সলীম, C ¸ 3 , পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

এ সব জাহাজ হজ্জ যাত্রীদেরকে চট্টগ্রাম থেকে আরবে নিয়ে যেতো। সুলতানের নিকট একটি পত্রে মুযাফ্‌ফর শামস লিখেন, "এখন হজ্জের মৌসুম আসছে; মক্কায় যাবার উদ্দেশ্যে গরীব দরবেশগণের একটি দল আমার নিকট জমায়েত হয়েছে; তাদেরকে প্রথম জাহাজেই জায়গা দানের নির্দেশ দিয়ে চাটগাঁয়ের কর্মচারীদের নিকট অনুগ্রহ পূর্বক একটি ফরমান জারি করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি"।[১৫৪]

মুসলমান শাসকগণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিপুল মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। সেগুলোতে তাদের ধর্মীয় আবেগ, ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে তাদের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। আমির-উমারা, রাজকর্মচারীগণ এবং এমনকি অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ সুলতানদের এ মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলেন। অসংখ্য মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বহু শহর ও গ্রামে আবিস্কৃত হয়েছে। ১৩৬৪-৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুলতান সিকান্দার শাহ কর্তৃক পাণ্ডুয়ার আদিনায় নির্মিত বিরাট মসজিদটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাড়ে সাতান্ন ফুট দীর্ঘ এবং দুইশত সাড়ে পঁচাশি ফুট প্রস্থ। বিশাল চিত্তাকর্ষক মসজিদটি এ উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় ভবন। আদিনা মসজিদটি সুলতান সিকান্দর শাহের আবেগের মূর্ত প্রতীক এবং বিরাট জামাতের নামাযের মাধ্যমে মুসলমানদের সংহতির জন্য তার আগ্রহের বাহ্যিক প্রকাশ।[১৫৫]

মুসলমান শাসক ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের অনেকেই যেমন ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তেমনি তাঁরা শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিশেষ আগ্রহীও ছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্ ও শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্ এদের প্রত্যেকের বিদ্যাবত্তায় খ্যাতি ছিল। একটি উৎকীর্ণ লিপি সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহকে এ যুগের একজন বড় আলিমরূপে উল্লেখ করে। তিনি কুরআনের ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে এবং ধর্মীয় জ্ঞানে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করেন।[১৫৬]

মুসলমান শাসক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ মুসলমানদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এদের উন্নয়নের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। মিনহাজ বলেন, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[১৫৭] সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউসের

---

১৫৪. গোলাম আলী আজাদ, LwRbvn-B-Awgivn, কলকাতা : ১৯০০, পৃ. ১৮৪

১৫৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cÖ¸ ³, পৃ. ১৪৫

১৫৬. D.Enamul Haq, Op.cit., p.290

১৫৭. D.Enamul Haq, Op.cit., P. 282

Dhaka University Institutional Repository

রাজত্বকালে কাযী আল নাসির মুহাম্মদ ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিবেনীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।[১৫৮]

জাফর খান কর্তৃক ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রিবেনীতে আর একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটি 'দারুল খায়রাত' নামে পরিচিত হয়।[১৫৯]

সুতরাং দেখা যায় যে, মুসলমান শাসকদের প্রতি সূফী-দরবেশগণের ব্যাপক প্রভাব ছিল। তারা দরবেশগণের ভরণ-পোষণের জন্য লাখারাজ সম্পত্তি দান করতেন এবং তাদের কার্যকলাপে সহায়তা ও সুয়োগ-সুবিধার জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ প্রভৃতি নির্মাণের ব্যয়ভার বহণ করতেন। এ সব মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও লঙ্গরখানা নিয়ে এক একটা বিশালায়তন ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো, যেখানে শিক্ষার্থী ও দুঃস্থ্য মানুষের জন্য থাকতো শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা, থাকতো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় যখন সূফী দরবেশগণ ছড়িয়ে পড়লেন এসব মানব কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানেও তখন সারাদেশ ছেয়ে গেল। কোথাও তা হতো মহাবিদ্যালয়ের অনুরূপ।[১৬০]

এ সব প্রতিষ্ঠান বংশ পরস্পরায় সূফী-দরবেশগণের প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তাদের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় ইসলাম সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে সুতরাং সুলতানদের দরবেশ ও আলিম প্রীতিই এদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম বিস্তৃতির প্রধান কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "যে সকল কারণে দরবেশগণের এহেোন প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তন্মধ্যে মুসলমান নরপতিদের দরবেশ প্রীতিই প্রধান। মুসলমান রাজত্বের সময় এ দেশের কোন পেশাধারী ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। কিন্তু বিদেশী ও দেশী দরবেশ সম্প্রদায় এবং 'মৌলানা' ও 'মৌলভী' আখ্যাধারী উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানগণ, মুসলমান রাজত্বের এ অভাবপূর্ণ করেছিলেন। বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান সুলতান এক একজন মহা দরবেশ ভক্ত বা শিক্ষাপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

বঙ্গীয় দরবেশগণ ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ দেশীয় মুসলমান নরপতিদের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ফলে তারই জন্য এ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় তাদের যেমন হাত ছিল তেমন ভারতের আর কোন প্রদেশে ছিল কিনা তা এখনও প্রমাণিত হয় নি। মুসলমান বাদশাহ ও দেশের

---

১৫৮. তাবাকাত-ই-নাসিরী, C\/¸ ³, পৃ. ১৫১

১৫৯. D.Enamul Haq, Op.cit., P. 13

১৬০. D.Enamul Haq, Op.cit., P. 303

.

Dhaka University Institutional Repository

আমির-উমরাগণ ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা দেশে যে সকল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা এক একটি বংশ পরম্পরাগত প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেল। যুগ যুগান্তর ধরে এ আশ্রমগুলো হতে চতুপার্শ্ববর্তী স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। এরূপ ভাবে সংস্কার মুক্ত ও উদার দরবেশগণের প্রচারের ফলে দেশের সর্বত্র ইসলামের মত একটি বিদেশীয় চিন্তাধারা ও ধর্ম পদ্ধতি বাংলার ঘরে ঘরে আরব, পারস্য, সমরকন্দ ও বোখারায় প্রতিধ্বনি তুলেছিল।[১৬১]

সুতরাং দেখা যায় যে, বাংলায় সুলতান ও সূফীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এর ভিন্নতর চিত্রও পাওয়া য়ায়। এমনও দেখা যায় যে সূফীগণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে সুলতানদের রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণকে তাঁরা প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন আবার মাঝে মাঝে সুলতানগণও কোন কোন সূফীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সর্ব প্রথম এর শিকার হোন শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা।

সাধারণ লোক থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বস্তরের লোকজন তাঁর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হওয়ায় সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন শংকিত হয়ে পড়ে এবং রাজ্য নেয়ার ভয়ে আবূ তাওয়ামাকে সোনার গাঁয়ে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেন।[১৬২]

সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭-৯২খ্রি.) শায়খ আলাউল হককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও এক পর্যায়ে তার শ্রদ্ধেয় শায়খকে সোনার গাঁয়ে নির্বাসিত করেন। কেন তিনি নির্বাসনের শিকার হলেন? কারও মতে, দরবেশের বদান্যতা ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত বা শংকাগ্রস্ত হয়েই সুলতান তাঁকে নির্বাসনে পাঠান। [১৬৩]

তবে এটাকে যথেষ্ট কারণ বলে মনে হয় না। ড. আব্দুল করিম যুক্তি দিয়ে বলেছেন, “গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক মতভেদ বিশেষ করে অমুসলিম কর্মচারীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ বিষয়ে মতভেদই নির্বাসনের প্রকৃত কারণ”।[১৬৪] কেননা এরূপ নীতির ফলেই সাময়িকভাবে হলেও রাজা গণেশের গৌড়ের সিংহাসন দখল করা সম্ভব হয়েছিল। সুলতান সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আযম শাহকে (১৩৯২-১৪১০ খ্রি.) বিহার সূফী মাওলানা মুযাফ্ফর শামস বলখী যে সকল পত্রাদি লেখেন তা থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

---

১৬১. আসকার ইবনেশাইখ, gmwjg Avg‡j evsjvi kvmbKZ©i, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ পৃ. ২২৪-২৫
১৬২. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, cÖv¸³, পৃ. ১৩৬
১৬৩. cÖv¸³, পৃ. ৯২
১৬৪. ড. আব্দুল করিম, cÖv¸³, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

পত্রের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন- "সংক্ষেপে বলতে গেলে কুরআন মজীদের তাফসীরকারকগণ বলেন, মুমিনগণের কখনও উচিত নয় যে অসুসলিম ও অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ এবং মন্ত্রণা দাতারূপে গ্রহণ করে"।[১৬৫] এ সব থেকে মনে হয় সুলতান সিকান্দার শাহ সুলতান ইলিয়াস শাহ্ ও তার পুত্র-পৌত্রগণ রাজনৈতিক সুবিধা হিসেবে অমুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতে এবং সম্ভবত সুলতান সিকান্দার শাহের সঙ্গে শায়খ আলাউল হকের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্যই তাঁর নির্বাসন দণ্ডের কারণ। তাই ড. আব্দুর রহীম যথার্থই বলেছেন, "সূফী-দরবেশগণ বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় ইসলামী নীতির সমর্থক ছিলেন। সাধারণত তাঁরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের দিনে তাঁরা কখনও নির্বিকার থাকেননি। বাংলায় ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ রাজকার্যে অধিক সংখ্যায় হিন্দুদের নিয়োগ করার নীতি গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদও তাদের উপর ন্যাস্ত করেন। এ ধরণের জাতীয় নীতি অনুসরণ করে তারা উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে দরবেশ ও উলামা রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ অসমীচীন মনে করেন। শেখ আলাউল হক বুঝতে পেরেছিলেন যে এ ধরণের নীতি অনুসরণের মধ্যে বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্যে বিপদের সম্ভাবনা নিহিতো আছে। সেজন্য শেখ আলাউল হক সুলতান সিকান্দার শাহের নিকট এ সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু সুলতান তাঁর কথায় কোনরূপ কর্ণপাত করেননি। উপরন্তু পাণ্ডুয়া অধিবাসীদের উপর শেখের বিরাট প্রভাবে সংকিত হয়ে তিনি তাঁকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করেন। পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা য়ায় যে শেখ আলাউল হক রাষ্ট্রীয় নীতির পর্যালোচনায় সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ছিলেন।
যদি সুলতান সিকান্দার শাহ্ শেখের পরামর্শ গ্রহণ করতেন তাহলে রাজা কংসের মাধ্যমে হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন মুসলমানদেরকে যে দূর্ভোগ ভোগ করতে হয় এবং সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ যে বিপদের সম্মুখীন হয় তা শুরুতেই এড়ানো যেতো।[১৬৬]

হিন্দুদেরকে রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করার মত নির্বুদ্ধিতায় সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে পরামর্শ দেয়াকে শায়খ তাঁর নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করছিলেন। কিন্তু সুলতান সেদিকে কর্ণপাত

---

১৬৫. M.K.Batta Sali, 'Ibn Battuta,Coins And Chronology', *Journal of the Bihar Rescarch Socicty*, Part-42, Vol.11, 1956, P.8
১৬৬. S. Rahman ,op. cit., p. 143

Dhaka University Institutional Repository

করেন নি। ফলে তার উত্তরাধিকারীদের খুব দূর্ভোগে পড়তে হয় এবং মুসলিম রাষ্ট্র এ বিপদ থেকে মুক্তি পায়। বাংলায় তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সুলতানগণ হয়ত এ রকম উদারনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এর ফলে রাজা গণেশের অভ্যুথান এবং উলামা-দরবেশগণের উপর তার অকথ্য উৎপীড়ন নির্যাতনে বিচলিত হয়ে শায়খ নূর কুতবুল আলম রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হোন। তিনি এ সংকটাপন্ন অবস্থা হতে মুসলমান ও মুসলিম রাষ্ট্রকে উদ্ধারের জন্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শার্কীকে অভিযানের জন্য অনুরোধ করেন। এমনকি সৈয়দ সিমনানীকেও ইব্রাহীম শার্কীর নিকট পত্র লিখে বঙ্গীয় মুসলিমদের সাহায্যের জন্য আসতে অনুরোধ করার জন্য বলেন। ফলে ঘটনাক্রমে মুসলিম বাংলার পুণরুদ্ধার সম্ভব হয়।[১৬৭]

সুতরাং দেখা যায় যে, বাংলার সূফী সাধকগণ কেবল ইসলামই প্রচার করেননি। ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষণে দেশের রাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে রাজনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপও করেছেন। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রে সংহতি রক্ষা পায়।[১৬৮] তাই ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বলেছেন, "বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের সংহতির ক্ষেত্রেও সূফী দুরবেশগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিকই মুসলমান সেনাপতিদের সামরিক ও ভৌগোলিক বিজয়ের সঙ্গে সূফী-দরবেশগণ ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারী ও শিষ্য সংগ্রহ করে নৈতিক বিজয় যুক্ত করেন এবং এভাবে একটি অমুসলিম দেশে মুসলিম রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও শক্তির উৎস প্রদান করেন। সাধু-দরবেশগণের নিরব সাধনা ব্যতিরেকে শুধু সামান্য সংখ্যক সৈন্যদের উপর নির্ভর করে বিপুল সংখ্যক ভিন্ন ধর্মীয় অধিবাসীদের উপর প্রভূত্ব বজায় রাখা মুসলমান শাসকদের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াত"।[১৬৯]

---

১৬৭. Prof. Hasan Askari, op. cit., P. 35

১৬৮. D. M.A. Rahim, op.cit., P.143

১৬৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, C৷¸ 3, পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

lô Aa¨vq

c_g cwi‡”Q‘

evsjv‡‘‡k mv¤cÖ‘vwqK m¤cÖxwZi HwZnvwmK †c¶vcU (1900 - 2000)

বৃটিশ উপনিবেশিক আমলের পূর্বে কেবল বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন নজির দেখা যায়নি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা ধর্ম নিয়ে হিংসাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নানা ঐতিহাসিক কারণে বৃটিশ আমলেরই সৃষ্টি।[১] তবে এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যদিও ধর্মীয় পার্থক্যের একটি অস্বাস্থ্যকর চেতনা উভয়ের মধ্যে শত শত বৎসর ধরে বিরাজমান ছিল। তথাপি ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এ চেতনা কখনো তেমন তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি। ইংরেজরা এ চেতনাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে তার মধ্যে তীব্রতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল।[২]
সাধারণভাবে বলা যায় ধর্মীয় কারণে অসহিষ্ণুতা বা বৈষম্য প্রাক-বৃটিশ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল না। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এ দেশে হিন্দু ও মুসলমান বহু শতাব্দী কাল ধরে পাশাপাশি একত্রে বাস করে এসেছে এবং পরস্পরের আচার-বিচার ও সংস্কারকে সহজভাবে মেনে নিয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে কখনো সম্প্রীতির অভাব দেখা যায়নি।[৩]

তাই আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাক-বৃটিশ আমল, বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

cÖvK-eÖwUk Avgj

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব সাম্প্রতিক কালের ঘটনা হলেও এ দেশ একটি প্রাচীন সভ্যতার বাসভূমি। প্রাচীনতম কাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন নরগোষ্ঠি বাংলাদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেছে। এদের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন আদি অষ্টেলীয়, মঙ্গোলীয় আর্য বা ইন্দো, আর্য এবং শক। এ সকল নরগোষ্ঠি তাদের সংগে এনেছে তাদের নিজস্ব বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপাদান। এ সকল বহিরাগত উপাদান বা উপকরণের সংগে বাংলার দেশজ উপাদানের সংমিশ্রণ ও সম্বন্ধ সাধিত হয়েছে এবং এর ফলেই বাংলার সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে যুগে যুগে।

১। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদক), evsjv‡‘‡ki ew×ewËt ag-m¤ú‘vwqKZvi msKU, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ.৫

২। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, cÖv¸³, পৃ.২৩৯

৩। cÖv¸³, পৃ.৫৪

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টীয় তের শতকের প্রথম দিকে উত্তর পশ্চিম থেকে আগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী দুর্ধর্ষ তুর্কী আফগানদের দ্বারা বাংলাদেশ অধিকৃত হয়। তার পূর্বে আট শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় চারশত বছর পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এরপর দক্ষিণ ভারতে কর্ণাট থেকে আগত সেন রাজবংশ বাংলাদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, সেন রাজারা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং তাদের আমলে ব্রাহ্মণদের এনে তাদের বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্ম বাংলাদেশে গভীরভাবে শেকড় গাঁথতে পারেনি। তের শতকের প্রথম দিকে মুসলিম বিজয়ের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ধর্ম মতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপাদানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের সামাজিক ভিত্তি দূর্বল ছিল বলেই তুকী সৈন্য ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর পক্ষে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে অতি সহজে বাংলাদেশ জয় করা সম্ভব হয়েছিল।

তের শতকে মুসলিম বিজয়ের পর এদেশে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। সমাজের বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের মানুষ হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য অনুশাসনের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইসলামের সহজ সরল বাণী এবং সামাজিক সাম্যের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ধর্মান্তরিত হবার ফলে তারা নিজস্ব দেশজ সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়নি।[৪]

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। এক একটি কোমের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক একটি জনপদ। প্রায় ক্ষেত্রে কোমের নামে জনপদের নাম হয়েছে। যেমন বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ও রাঢ়। তবে এটা উল্লেখ যে, খ্রিস্টীয় এগার শতকে 'বাঙ্গাল' নামে একটি স্বতন্ত্র জনপদ ছিল যার পূর্ব সীমান্ত ছিল ভাগিরথী। সে সময় বাঙ্গালা দেশ বলতে প্রায় সমস্ত পূর্ব বঙ্গের ও দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র তটশয়ী সমস্ত ভূখণ্ডকে বোঝাত। বর্তমান এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমানার সঙ্গে এর বেশ কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। একটা কথা মোটামুটি বলা যায় যে, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক এবং পরবর্তীকালে পাল ও সেন রাজারা বাংলার সমস্ত জনপদকে গৌড়ের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা সফল হয়নি। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি স্বাধীন পাঠান সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রায় সমগ্র অঞ্চলকে জয় করে ঐক্যবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট আকবরের সময় বাংলাদেশ 'সুবা বাঙ্গালা' নামে পরিচিত ছিল।[৫]

আগে পরধর্মে অবজ্ঞা ছিল সুপ্ত, গুপ্ত কিংবা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হনন লীলার কারণ ঘটাত না। কিন্তু বৃটিশ ভেদনীতি প্রয়োগের শাসনে শোষণে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার গরজে ভারত বর্ষের তুর্কী মুঘল আমলের এক বিকৃত ইতিহাস খাড়া করলো। তুর্কী মুঘল রাজত্ব হলো মুসলিম রাজত্ব, প্রজা হলো হিন্দু। তুকী মুঘলরা ছিল অসহিষ্ণু, মুর্তি পূজক বিদ্বেষী দেউল, দেহারা, বিনাশক, হিন্দু পীড়ক,

---

৪। C/¸ 3, পৃ.১-২
৫। C/¸ 3, পৃ.৪

Dhaka University Institutional Repository

শোষক এবং হিন্দুকে জোর-জুলুমে মুসলিম বানিয়েছিল। কাজেই ছয়শ বছর ধরে মন্দির মূর্তি ভাঙ্গা আর হিন্দুকে শাসনে শোষণে পীড়নে রাখা, তার ধর্ম কাড়াই ছিল তুর্কী মুঘলের নিত্যকার কাজ। তারা তুর্কী মুঘল আমলে বাদশার জাত ও জ্ঞাতি হিসেবে ছিল গুণে-মানে ধনে-বিদ্যায়-বিত্তে শ্রেষ্ঠ আর হিন্দুরা ছিল তাঁদের প্রজা। এ মিথ্যে ধারণাই তাদের মনে উপ্ত করলো দ্বেষণার বিষবৃক্ষ। হিন্দুরাও জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে সহায়তা যাচাই করলো না। ভেদনীতি প্রয়োগের লক্ষ্যে বৃটিশ লিখিত ইতি কথা, কেবল মুখস্থ করলো, আক্ষরিকভাবে সত্য বলে বুঝলো এবং জানলো। সাক্ষ্য-প্রমাণ-যোগে যাচাই বাছায়ের প্রয়োজন বোধ করল না। কোথায় কোন জনপদে গ্রামে-গঞ্জে-বন্দরে-শহরে হিন্দুদের তরবারির মুখে ভয় দেখিয়ে মুসলিম বানালো, কিংবা হত্যা করলো সে প্রমাণ দলিল-আজো সংগ্রহের আগ্রহ নেই কারো, তারা মনে রাখেনি। ফলে হিন্দু-শুদ্র মুসলিমরাই তুর্কী-মুঘল আমলে তাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়েছে, তাদের মন্দির মূর্তি ভেঙ্গেছে। কাজেই তারা চিরশত্রু অথচ পরিত্যাক্ত জীর্ণ বা ভাঙ্গা মন্দিরের ইট-পাথর অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত মুসলমানরা মসজিদে লাগিয়েছে বটে, কিন্তু হিন্দু পারার কোন মন্দির মূর্তি তুর্কী-মুঘলরা ভেঙ্গেছে বলে প্রমাণ মেলেনা।[৬]

ইংরেজ পূর্ব যুগ ভারতে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামসমূহই ছিল তার সমাজ ও আর্থিক জীবনের প্রাণ কেন্দ্র। এ গ্রামগুলো ছিল দ্বীপ সদৃশ এবং সারা ভারতবর্ষ ছিল বিশাল এক দ্বীপ-পুঞ্জ। অন্ন-বস্ত্র এবং জীবনের যাবতীয় আয়োজনের দিক দিয়ে গ্রাম বহির্ভূত কোন কিছুর প্রতি তাদের বিশেষ কোন নির্ভরতা ছিল না। প্রয়োজনে তাদের ছিল অতি পরিমিত এবং ব্যাপক বিনিময় ব্যবস্থা, যৌথ গ্রাম্য প্রচেষ্টায় তারা সে প্রয়োজন পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম ছিল। ভারত বর্ষের বিভিন্ন এলাকায় অল্প বিস্তর পার্থক্য থাকলেও এ ছিল তখন সারা দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক জীবন যাত্রা। এ আত্মনির্ভরশীলতাই ভারতীয় জীবন যাত্রার প্রাচীন জীবন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে নিজেকে রেখেছিল অব্যাহত। ইংরেজদের আগমনে সে জীবন যাত্রা ব্যাহত হল।[৭] জমিদার হিন্দু এবং প্রজা মুসলমান হবার কারণে জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহগুলোকেও হিন্দু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বিরোধে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।[৮] তবে এ কথা বলা যায় যে, উপমহাদেশের কৃষক নানা ঐতিহাসিক কারণে ধর্মভীরু ছিল বটে কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিল না।

ইংরেজদের পূর্বে অন্যান্য দেশীয় এবং বৈদেশিক রাজচক্রবর্তীদের সাথে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল রাজস্ব লেনদেনের। রাজা এবং রাজবংশের পতন উত্থানের অর্থ তাদের কাছে তাই ছিল রাজস্ব-গ্রহিতার পরিবর্তন মাত্র কিন্তু ইংরেজদের আগমনে শাসক শাসিতের সম্পর্ক শুধু রাজস্ব লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলনা। তারা ভারতবর্ষে শুধু নতুন সাম্রাজ্যের পতন করে নতুন

৬। লতা হোসেন (সম্পাদিত), ÒcmsMt mv¤ú'wqKZvÓ M'¨ weivbbeŸB, সানন্দ প্রকাশ, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ . ১১

৭। লতা হোসেন, cv¸³, পৃ .৩৪

৮। সুপ্রকাশ রায়, fvi‡Zi ˆecøweK msMv‡gi BwZnvm, ডি,এন,এ ব্রাদাস, কলিকাতা : ১৯৭০, পৃ . ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

রাজবংশ আমদানী করেই ক্ষান্ত হলোনা-তারা সাথে নিয়ে এল নতুন জীবন ব্যবস্থা, জনসাধারণের জীবনে স্থাপন করল আর্থিক যোগাযোগ। নিজেদের পন্য দ্রব্য ভারত বর্ষের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে তারা পরিণত করল ভারতীয় মহাদেশে। আশোক আকবরের সুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে যে ঐক্য এবং অখণ্ডতা এনেছিল সে ঐক্য ছিল বাহ্যিক শাসনের, ইংরেজ তার পণ্য দ্রব্যের মাধ্যমে এদেশে যে ঐক্যের সূচনা করলো সে ঐক্য শাসনের যেটুকু তার থেকে অনেক বেশি জীবন যাত্রার।

eªUk Avgj

ইংরেজরা ভারতবর্ষে জীবন-যাত্রার যে নতুন আয়োজন করেছিল তাতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সমানভাবে এগিয়ে আসেনি। ইংরেজরা মুসলমানদের ক্ষমতাচ্যুত করেই ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিল। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে তারা মুসলমানদের যেমন সুনজরে দেখতো না, তেমনিভাবে মুসলমানরাও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে নিজেদের পতন মনে করে ইংরেজদের চিহ্নিত করেছিল শত্রু হিসেবে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই এদের মধ্যে তৈরী হয় একটি সুস্পষ্ট দূরত্ব যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় মুসলমানরা।

এদিকে ভারতের অপর বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দুদের কাছে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন নিজেদের পতনের অনুরূপ ছিল না। এটি ছিল তাদের কাছে কেবল প্রভুর পরিবর্তন। তাই ইংরেজরা জীবন ব্যবস্থার যে নতুন আয়োজন করলো সেখানে তারা সাড়া দিল বিপুল উৎসাহে। ফলে ইংরেজদের আনুকূল্য লাভ করে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি এবং জীবনের বিভিন্ন ও বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে এক শতাব্দী ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।[৯] হিন্দুদের মধ্যে অকুলীন ব্রাহ্মণরা ছিলেন ব্রাহ্ম্য সমাজের উদ্যোক্তা যারা ইংরেজের সঙ্গে সমন্বয়কে স্বাগত জানাতে পেরেছিলেন।[১০]

এরপর এলো সিপাহী বিদ্রোহ। বিদ্রোহের অবসানে মুসলমানদের মধ্যে এলো এগিয়ে চলার তাগিদ। সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে জাগ্রত হলো ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার আয়োজন।

এদিকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেকে ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি ও শিক্ষা দীক্ষায় অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করার পর তার মধ্যে সহযোগিতার উৎসাহ সিপাহী বিদ্রোহের পর অনেকখানি কমে এলো। মুসলমানদের পিছিয়ে রেখে তারা অনেকখানি এগিয়ে এলো। ইতিমধ্যে ইংরেজদের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতার পালা শেষ করে শুরু হলো এবার তাদের রেষারেষির পালা। কিন্তু মুসলমানদের সাথে ইংরেজদের

৯। বদরুদ্দীন উমর, mv¤ú ̈`vwqKZv, মুক্তধারা, ঢাকা ; ১৯৮০, পৃ.১৪
১০। বদরুদ্দীন উমর, cÕ, ³, পৃ .১৫

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতাকে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি সুনজরে দেখতে পারলোনা। কারণ সেখানে তাদের স্বার্থহানির বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল। তাই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাথে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হল ইংরেজ এবং মুসলমান সম্প্রদায়। এ বিরোধিতা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে একদিকে জন্ম দিল জাতীয় চেতনার বোধ, যার সরাসরি টার্গেট ছিল ইংরেজ শাসক, অপরদিকে জন্ম দিল সাম্প্রদায়িকতার বোধ যার টার্গেট ছিল মুসলিম সম্প্রদায়।

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সুচনায় হিন্দু-মুসলমানের এ স্বার্থগত সংঘর্ষকে ইংরেজরা উপেক্ষা করলো না। উপরন্তু নিজেদের সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এ বিভেদকে স্বীকৃতি দিয়ে অনেক কৌশলে এককে অন্যের বিরুদ্ধে তারা স্থাপন করল। এভেদ নীতির মুনাফা নিয়ে ইংরেজের হিসেবে কোন ভুল ছিল না।[১১]

ইংরেজ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোলকাতার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এদের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করে এদের দ্বারা সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়ার জন্য ইংরেজরা একটি পলিসি তৈরী করলো। এ পলিসির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল হিন্দু মুসলিম বিরোধকে একটি স্থায়ী রূপ দিয়ে উভয়কে চিরদিনের জন্য বিভক্ত করে দিয়ে তাদের একটিকে অন্যটির বিরুদ্ধে স্থাপন করা। বৃটিশ রাজ্যের উদ্দেশ্যটি ছিল ‘Divide and rule’ ভাগ কর এবং শাসন কর। এ বক্তব্যটি রেখেছিলেন একজন ইংরেজ সামরিক অফিসার ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে। তার লেখাটিতে ছিল : ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সামরিক এবং অসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্যে এ নীতিটিই প্রকৃষ্ট। ১৮৫৮ সালের মহা বিদ্রোহ বৃটিশ শাসককে এভাবে ভাবতে বাধ্য করে। প্রথম পরামর্শটি আসে বোম্বাই এর গভর্ণর এলফিন স্টোনের কাছ থেকে এবং সেটাই সুকৌশলে সর্বত্র প্রয়োগ হয়। এ ‘ভাগ কর এবং শাসন কর’ নীতি প্রয়োগের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অস্ত্রটি ছিল ধর্ম।

কংগ্রেসের জন্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে বৃটিশ রাজ একটি আবেদন নিবেদনের হিন্দু রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেও তা দিয়ে দীর্ঘ সময় নিজের স্বার্থ হাসিল করতে পারলোনা। তখন বৃটিশ সরকার মুসলিম জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয়ার আয়োজন করে। এরকমটি করতে গিয়ে ইংরেজরা পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের নাম করে প্রধানত সম্প্রদায়গত দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯০৫ সালে বঙ্গ প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা এটিকে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের সোপান হিসেবে মনে করে এটির প্রতি নিরংকুশ সমর্থন প্রদান করে। অপরপক্ষে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় এটিতে তাদের স্বার্থহানির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পায়।

১১। বদরুদ্দীন উমর, c¦¸ ³, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

ফলে তারা এর বিরোধিতায় সোচ্চার হয়। আর এভাবেই কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালী সমাজ জীবনে বিভক্তি আনে এবং এর ভেতর দিয়ে মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গভঙ্গের এক বছরের মধ্যেই ১৯০৬ সালে বৃটিশের পৃষ্টপোষকতায় মুসলিম লীগের জন্ম হয় ঢাকাতেই। এর পর থেকেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে।[১২] বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে মুসলিমলীগ, এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয় কংগ্রেস। মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা একটু বেশি শিক্ষিত এবং অধিক সংগঠিত ছিল বলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তারা ব্যাপক ও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃটিশরা বঙ্গভঙ্গকে রদ করে দেয়।

মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করে হিন্দুদের। তারা বুঝতে পারে যে, হিন্দুরা তাদের নূন্যতম উন্নয়ন ও সহ্য করতে পারছে না। মুসলমানদের ক্ষতিসাধন এবং তাদেরকে পেছনে ফেলে রাখাই হল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাই মুসলমানদের মনেও হিন্দুবিরোধী মনোভাব তীব্রতর হয়। পশ্চাদপদ মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরি ক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিযোগিতায় দ্রুত উন্নতির ভরষা পেলনা। ইংরেজদের কাছে তারা দাবি করলো বিশেষ সুবিধা। ১৯০৬ সালের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে ভারতে প্রচলিত হলো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন।[১৩] এভাবে ১৯১১ সালের শাসন সংস্কার এবং সর্বশেষ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের জন্য পৃথক নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।[১৪]

এরপর থেকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংগ্রামের আর তেমন সুযোগ পেলনা। লাক্ষ্ণৌচুক্তি ও খেলাফত আন্দোলনে যে সমঝোতা গড়ে উঠেছিল তা ছিল নিতান্ত সাময়িক। কংগ্রেস যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু মুসলিম মিলিত সংগঠন হিসেবে গঠিত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত মুসলিমলীগের নেতৃত্ব গেল মুসলমানদের হাতে। কংগ্রেসের মধ্যে যে সমস্ত খ্যাতিমান মুসলমান নেতৃস্থানে ছিলেন তাদের অধিকাংশ একে একে এলেন মুসলিমলীগে।

পৃথক নির্বাচনই ইংরেজদের ভেদবুদ্ধির সব থেকে নিদারুন অস্ত্র। ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হলো সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক পথে এবং পৃথক নির্বাচনের মহিমায় হিন্দু-মুসলমানের এক সাথে চলার পথ হলো বন্ধ।[১৫] অবশেষে সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে বিভক্ত হলো ভারতীয় উপমহাদেশের, প্রতিষ্ঠিত হলো দু'টি নুতন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান।

১২। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, C/¸ ³, পৃ . ২৩
১৩। বদরুদ্দীন উমর, C/¸ ³, পৃ . ১৫
১৪। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, C/¸ ³, পৃ . ৫৯
১৫। বদরুদ্দীন উমর, C/¸ ³, পৃ . ১৫

Dhaka University Institutional Repository

অতএব বলা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিশ্ব শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের ধর্মপ্রীতির অতিশয্যের উৎস আধ্যাত্মিক নয়। এর উৎসস্থল বৃহত্তর ভারতীয় আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবন ক্ষেত্র। মূলত হিন্দু-মুসলমান, বিশেষত মুসলমান মধ্যবিত্তের স্বার্থসিদ্ধির নিশ্চিত হাতিয়ার রূপে পরিণত হয়েছিল ধর্ম। অন্যদিকে ধর্মের দিক থেকে ইংরেজরা খ্রিস্টান। নিজ দেশে তারা যথেষ্ট রক্ষণশীলও বটে। কিন্তু ভারতবর্ষে শাসন করার বেলায় তারা কোন চার্চের অনুশাসন চালু করেনি, যদিও পাদ্রীরা নগর জনপদে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টা করেছে। এ জন্য টাকাকড়ি খরচ করেছে দেদার। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা তাদের শাসন কাজ যথাযথভাবে নির্বাহ করতে ধর্ম প্রচার কাজের উপর নির্ভর করেনি, তারা নির্ভর করে রাজনৈতিক কুটকৌশলের উপর। নিজ ধর্মের অনুশাসন রাজনীতির উপর চাপিয়ে না দিলেও ইংরেজরা ভারতীয় ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছে যথেষ্ট। এক ধর্মের লোকদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছে অন্য ধর্মের লোকজনের উপর।

cwK¯Ívb Avgj

বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ের মূল চেতনা অসাম্প্রদায়িক হলেও শেষ পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র পক্ষ থেকে বাঙ্গালীর মাতৃভাষাকে 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে স্বীকৃতিদানে অনিচ্ছা প্রকাশের মুহূর্ত থেকেই এ দেশের মানুষ, বিশেষত তার অগ্রসর অংশ, সদ্য গঠিত মুসলিম রাষ্ট্রটি সম্পর্কে বিরূপ হতে শুরু করে। এরপর পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শাসক শ্রেণির নিরন্তর বৈষম্যনীতি ও বিদ্বেষ পরায়ণ আচরণ থেকে পূর্বাঞ্চলের বাঙ্গালী জনসাধারণ বুঝে উঠতে শুরু করে, রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান আসলে পাক-পবিত্র কিছু নয়। ক্রমশঃ প্রমাণ হয়ে উঠে যে, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রটি দেশের পূর্বাঞ্চলের জনগণের জন্য ইসলামের কথিত শান্তি বয়ে আনবে না। ক্রমেই এ দেশের মানুষ দেখতে পেল যে, পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি নানান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শাসন-শোষণের নির্মম অশান্তি চাপিয়ে দিচ্ছে ইসলামেরই নামে।[১৭]

জিন্নাহর মৃত্যুর ছয়মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁন পাকিস্তান গণপরিষদে সরাসরি বলে দিলেন যে, পাকিস্তান একটা মুসলিম রাষ্ট্র।[১৮]

১৬। ড. নীম চন্দ্র ভৌমিক, বাসুদেব ধর, mv¤ú'wqK ^elg¨ Kvi ¯v‡_, শ্বাশত প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৯৮, পৃ . ৯
১৭। কীথ কালার্ড, cwK¯Ívb t G cwjwUK¨vj ÷wW, জর্জ এ্যালেন এ্যাণ্ড আনউইন, ঢাকা : ১৯৫৭, পৃ . ৫৬
১৮। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, cv¸³, পৃ . ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

বাঙ্গালী জাতির ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অর্থনীতির উপর পাকিস্তানী শাসকরা গোড়া থেকেই আঘাত হানতে শুরু করে। এরই মধ্যে ১৯৪৮ সালে সূচিত ভাষা আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে গণ আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর প্রথম বিজয় সূচিত হয়। এ বিজয়ই ১৯৫৪ সালে মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে হক-ভাষানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ের ভিত্তি রচনা করে এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নবতর গতি সঞ্চার করে। উল্লেখ্য যে, এ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারাকে শক্তিশালী করতে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থায় নির্বাচিত ৭২ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিনিধি (প্রায় ২৩%) যুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ান। পাকিস্তানী স্বৈরাচারী ও সাম্প্রদায়িক শাসকদের জন্য এটা ছিল এক প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ। এ অঞ্চলে গণচেতনা তীব্র হয়ে উঠায় যুক্তফ্রন্টের উপর নানা ভাবে আঘাত আসে এবং অবশেষে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেয়া হয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহিত করতে ১৯৫৮ সালে জারি করা হয় সামরিক শাসন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ সামরিক শাসন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করা হলেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেমে থাকেনি। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র জনতার আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে ১৯৬২ সালে।

লক্ষ্য করা যায়, জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যত তীব্র হয়ে উঠে, পাকিস্তান শাসকদের বিভেদনীতি তত প্রকট আকার ধারণ করে। জনগণকে ধর্মের নামে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমণ করাই ছিল পাকিস্তানের কৌশল। এ লক্ষ্যেই ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়।[১৯]

পাকিস্তানের কায়েমী শোষক–শাসকেরা পূর্ব বাংলার উপর তাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও তাদের যাবতীয় সুযোগ ও স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিশালী অস্ত্ররূপে নতুন করে প্রয়োগ করতে থাকে। তারা ইসলামী তমাদ্দুন ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের নামে ধর্মান্ধতা এবং সংখ্যাগুরু বাঙ্গালীর জাতিসত্তা, স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি বিরোধী নীতি গ্রহণ ও কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে একের পর এক, একটানা। পূর্ব বাংলার সামাজিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিষাক্ত করে তোলার প্রয়াস পায় তারা এ প্রক্রিয়ায়। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি, ধর্মান্ধতাকে প্রশয় দান এবং তথা কথিত ইসলামী তমদ্দুন ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের শ্লোগান-এ তিনটি দিকে পরিচালিত হয় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি ও তাদের সহযোগীদের কার্যকলাপ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারে ভেসে যাওয়া ভারতবর্ষের রাজনীতিক ডামাডোলের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতির ফলস্বরূপ ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হয়। কিন্তু এ রাষ্ট্রে বহুল প্রতিশ্রুত

১৯। ড. নীম চন্দ্র ভৌমিক, C\/¸ ³, পৃ . ২১

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক মুক্তি, সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও ইসলামভিত্তিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে সংখ্যাগুরু পূর্ববাংলার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানী কাঠামোয় পূর্ববাংলা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। আর তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই তৎকালীন পূর্ববাংলার জনমণ্ডলীর স্বপ্ন ও মোহভঙ্গ হতে থাকে অতি দ্রুত এবং তারা যেন 'স্বদেশ প্রর্তাবর্তন' করে। ভৌগোলিকভাবে দ্বিখণ্ডিত এবং পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের ভেতর কোনোরূপ সাদৃশ্যবিহীনতার ফলে কেবল ধর্মের জোড়াতালি দিয়ে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার ভেতরই ছিল একটি অবৈজ্ঞানিকতা। তদুপরি, পাকিস্তানের রাজধানী হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলে, সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস, শিল্প-ব্যাংক-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল তথায়। আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীতে ছিল পশ্চিমাঞ্চলের চরম একাধিপত্য এবং এগুলোর হেডকোয়াটারও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এদিকে মুসলিমলীগের হাই কমাণ্ডও ছিল অবাঙ্গালী ও তথায় বসবাসকারী। পুঁজিপতি শ্রেণি ও ব্যবসায়ীরা ও ছিল মূলত অবাঙ্গালী ও পশ্চিমাঞ্চলের বসবাসকারী। এ সবের ফলে সরকারি নীতি-কর্মসূচী ও পরিকল্পনার সুফল, অর্থ-বাণিজ্য-শিল্প-কৃষি নীতির সুযোগ, আমদানি-রপ্তানী, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা, বৈদেশিক ঋণ ইত্যাদি যাবতীয় কিছু মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে চলে যায় এবং পূর্ববাংলা নিগৃহীত ও শোষিত হতে থাকে। উন্নয়নে অসমতা দেখা দেয়। আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীতে বাঙ্গালীদের প্রায় অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত রাষ্ট্র ক্ষমতাও পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে।

এ ভাবেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির একটানা শোষণ-শাসন ও দুষ্কৃতিই পূর্ববাংলার জনমণ্ডলীর সহ্যের সীমা ভেঙ্গে দেয়। বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালী জনতা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সংগ্রাম ও তা বিপুল বিজয় অর্জনের মাধ্যমে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পর পর দু'বার স্পষ্টতম জবাব দেয়।[২০]

শাসকগোষ্ঠি মুসলিমলীগ নেতৃবৃন্দ এবং সরকার সমর্থক সংবাদপত্রসমূহ সকলেই এরপরেও মুসলিমলীগকেই পাকিস্তানের মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে দাবী করতে থাকেন। ইসলামের হেফাজতের জন্যই পাকিস্তানের আবির্ভাব। সুতরাং মুসলিমলীগের বিরুদ্ধতা মানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা মানে ইসলামের বিরুদ্ধতা, এ কথা বলতে শুরু করেন।[২১] পূর্ব বাংলায় ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে মোট ছয়টি সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে ১৯৫২ সালের ১৭ থেকে ২০শে অক্টোবর ঢাকায় তমাদ্দুন মুসলিমের উদযোগে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী সম্মেলন' ব্যতীত আর পাঁচটি সম্মেলনই ছিল পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক

২০। হাসান উজ্জামান, ag\bi‡c ÿZv I evsjv‡'k HK¨g‡Z¨i BwZnvm AbmÜvb, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা : ১৯৯২, পৃ . ২০

২১। আহমেদ, আবুল মনসুর, Avgvi †'Lv ivRbxwZi cÂvk ermi, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা : ১৯৬৮, পৃ . ৩১৩

Dhaka University Institutional Repository

চেতনা সমৃদ্ধ। সাতচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পূর্ব বাংলার যে হাল হয়েছিল, সে প্রেক্ষিতেই বাঙ্গালী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সাধারণ সংস্কৃতি কর্মীরা সম্মেলনগুলোতে নিজেদের অভিজ্ঞতা-শিক্ষা-চেতনাকে তুলে ধরেছিলেন। এ সবের মাধ্যমে তারা নিজেদের বুঝতে চেয়েছিলেন, বোঝার প্রয়াস পেয়েছিলেন পরস্পরের কাছে সবার কাছে সমষ্টিগতভাবে। এ সম্মেলনগুলো পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি-সংস্কৃতিকে প্রতিহতকরণ, মুসলিম ও পাকিস্তানী জাতীয়তার ভিত্তি উৎপাটন ইত্যাদিতে ব্যাপক অবদান রাখে।[২২] এর ফলে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন রূপান্তরিত হয় শক্তিধর রাজনৈতিক আন্দোলনে।

বস্তুত পাকিস্তানের স্বপ্ন সত্য অর্থে ধর্মপ্রাণ ভারতীয় মুসলমানদের ইসলামী জীবন যাপনের স্বপ্ন নয়। এ স্বপ্ন মূলত মুসলমান মধ্যবিত্তের শ্রেণি স্বার্থ প্রতিষ্ঠার। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ইসলাম ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করতে মোটেও সক্ষম হয়নি। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান যে মুসলমান মধ্যবিত্তের শ্রেণি স্বার্থ আদায়ে অনেকখানি সফল হয়েছিল সে বিষয়টিকে অস্বীকার করা যায় না। ভারত বিভক্তির মাধ্যমে তারা ধর্ম ও স্বাধীনতা এবং উভয় উদ্দেশ্য আদায়েই পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ভেতর স্বপ্ন রোপন করেছিল মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষায় সভ্যতায় অগ্রসর একদল মানুষ। তাঁদের উদ্দেশ্য অবশ্য মুসলমানদের রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার কিংবা প্রসার নয়, মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশে নিজেদের শোষণের রাজনীতি কায়েম করা। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

evsjv‡‘k Avgj

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ছিল ধর্মের রাজনীতিকরণের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদ। তবে ধর্মকে প্রত্যাহার করে নয়।[২৩]

পাকিস্তান শাসনামলে ধর্মীয় চেতনার নামে বাঙ্গালীদের উপর পরিচালিত বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনই কার্যতঃ এতদঞ্চলে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গিকে সজাগ করে তুলেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের মৌলিক নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সত্যি বলতে কি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠে, তা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য মোটেই অনুকূল ছিলনা। মাত্র কয়েক বছর আগে যে বাঙ্গালী মুসলমানরা ধর্মীয়

২২। হাসান উজ্জামান, Cv¸³, পৃ. ৬৯

২৩। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, Cv¸³, পৃ. ২৭১

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের পক্ষে এতো কম সময়ের মধ্যে সে জাতীয়তাবাদী মনোভাব অথবা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়কে পুরোপুরি বিসর্জন দেয়া সম্ভব ছিল না। দুঃশাসন এবং অর্থনৈতিক শোষণের মুখে তারা কেবল সাময়িকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়েছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে নিজেদের মিলকে বড় করে দেখেছিলেন। নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য তারা ভারতের মুখাপেক্ষীও হয়েছিলেন।[২৪] মুশতাকের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে মুশতাক কর্তৃক গৃহীত পলিসিগুলোকেই অব্যাহত রাখেন। এরপর ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থান জারির ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান নিহত হন। জিয়াউর রহমানের শাসনকালের পর এরশাদ সরকার গঠন করেন এবং দীর্ঘ নয় বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন।[২৫]

তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে স্থান দেয়ার জন্য অষ্টম সংশোধনী বিল পাশ করান। অষ্টম সংশোধনী বিলে বলা হয়েছিল যে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্টধর্ম হবে ইসলাম। তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবেন।[২৬] এ কথা সত্য যে,তৎকালে এদেশে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হলেও এর অর্থ এ নয় যে, এখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গেছে। এ হুকুমত কায়েম দেশে ও সরকারে ইসলামী মানুষ ছাড়া, একটি সুশিক্ষিত কর্মীবাহিনী ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। এরপর ১৯৯১ সালে বি.এন.পি সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাঁধাগ্রস্ত করার জন্য মহল বিশেষ অপতৎপরতা চালায় যার অন্যতম ছিল কার্যত সংখ্যালঘু নির্যাতন।[২৭] উল্লেখ্য ১৯৯৩ সালের ১০ই আগষ্ট মঙ্গলবার হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্মাষ্টামীর মিছিলে হামলা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ করা হয়। পাশাপাশি এক শ্রেণির অতি তৎপর সংখ্যালঘু নেতা দেশে হিন্দুদের ধর্ম পালনে বাঁধা দেয়ার প্রতিবাদ স্বরূপ দুর্গাপূজা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন না করার আহ্‌বান জানান। এ দিকে এ হামলা সম্পর্কে একটি জাতীয় দৈনিকের উপসম্পাদকীয় কলামে ঘটনার বিশ্লেষণপূর্বক বলা হয়, ঢাকার জন্মাষ্টামীর মিছিলে গোলযোগ সৃষ্টির অপতৎপরতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসূত কোন ঘটনা নয়, এ ঘটনা রাজনৈতিক। একই ভাবে এরা ৯১ থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত সরকারকে বিতর্কিত করতে সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করে।[২৮] এরপর

২৪। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, cv¸ 3, পৃ . ১৫৩
২৫। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম , cv¸ 3, পৃ . ২৭১
২৬। মোঃ আবদুল হালিম, msweavb, mvsweawbK AvBb I ivRbxwZ : evsjv‡'k cm½-evUk kmb e¨e¯'v Ges gwKb h3 iv‡ói cvmwi½K welqmgn, রিকো প্রিন্টার্স, ঢাকা : ১৯৯৫, পৃ .১৩১
২৭। মেহেদী হাসান পলাশ, msL¨vjN ivRbxwZ, বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা : ২০০১, পৃ . ১৫
২৮। মেহেদী হাসান পলাশ, cv¸ 3, পৃ.৪৮

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামীলীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তথাকথিত সন্ত্রাসীরা দেশে যে ব্যাপক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায় তার শিকার হিন্দু সম্প্রদায়ও হয়েছিল। অতঃপর ১লা অক্টোবর ২০০১ এর নির্বাচনে বি.এন.পি নেতৃত্বাধীনে চারদলীয় ঐক্যজোট বিজয় লাভের পর সারা দেশে বিচ্ছিন্ন কতিপয় সহিংসতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও নির্যাতনের ঘটনাকে কতিপয় পত্রিকা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছে। যেসব ঘটনা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, প্রশাসনিক তদন্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদিও নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক কারণে দু'একটি ঘটনা কোথাও কোথাও ঘটেছে কিন্তু তা কোন মতেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পড়েনা। এরপর ২৯ শে ডিসেম্বর ২০০৮ এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে । বর্তমানেও (২০১৬ সন) আওয়ামীলীগ ক্ষমতাসীন দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মর্যাদা, অধিকার ও দাবী দাওয়ার প্রশ্নে যথেষ্ট স্বোচ্চার ও আন্তরিক ভূমিকা পালন করছেন। কাজেই বলা যায় দেশে রাজনৈতিক এলিটরাই কায়েমী স্বার্থে ধর্ম/ধর্ম নিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক/ সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিতর্কিত ইস্যুকে জাগ্রত করে তুলে। সুতরাং রাজনৈতিক এলিটদের ক্ষমতার কোন্দলই ধর্ম, রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টিকে জটিলতর করে তুলে। পূর্বে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কিন্তু বর্তমানে সে ভিত্তি আর নেই। ১৯৪৭ সালের পর থেকে তা দ্রুতগতিতে অপসারিত হয়েছে। পূর্বে ভিত্তিভূমি থেকে রস সংগ্রহ করে সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে নিজেকে শক্তিশালী রাখতো আজ আর তার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল অথবা মোর্চার পক্ষে এদেশে ক্ষমতা দখল আর সম্ভব নয় কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন নেই, মোটেই তা নয়। তবে তার সচেতন ও সক্রিয় বিরোধিতার মাধ্যমেই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡”Q‘

ckcÎ c×wZi gva¨‡g M‡elYvq cvß Z_¨

সারণী আকারে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের প্রকাশ ও বিশ্লেষণ

আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে যেসকল প্রাথমিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোকে সারণী আকারে প্রকাশ করে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

mviYx-1

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর বয়স ও লিঙ্গ সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ						
বয়স	পুরুষ	%	মহিলা	%	পুরুষ ও মহিলা	%
-২০	৫	৫.২৬	২	৬.৬৭	৭	৫.৬০
২০-৩০	৪৫	৩১.৫৮	২০	৬৬.৬৭	৬৫	৫২.০০
৩০-৪০	৩০	১০.৫৩	৪	১৩.৩৩	৩৪	২৭.২০
৪০-৫০	১০	৫.২৬	৩	১০.০০	১৩	১০.৪০
৫০-তদুর্ধ্ব	৫		১	৩.৩৩	৬	৪.৮০
মোট	৯৫		৩০		১২৫	

বিশ্লেষণ: সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০-৩০ বছরের মধ্যকার লোকদের কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সর্বাধিক। ৯৫ জন পুরুষের ৪৫ জন (৪৭.৩৭%) এবং ৩০ জন মহিলার ২০ জন

Dhaka University Institutional Repository

(৬৬.৬৭%) মিলে সর্বমোট ৬৫ জন অর্থাৎ ৫২.০০% ভাগ ছিল এ বয়স সীমার অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয় সর্বাধিক পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ৩০-৪০ বছর বয়সের অন্তর্ভূক্ত লোকদের কাছ থেকে ৩০ জন পুরুষ (পুরুষের ৩১.৫৮%) এবং ৪ জন মহিলা (মহিলা ১৩.৩৩%) মিলে সর্বমোট ৩৪ জন অর্থাৎ ২৭.২০% ভাগ ছিল এ বয়স সীমার অন্তর্ভূক্ত। ৪০-৫০ বছর বয়সের অন্তর্ভুক্তদের অবস্থান তৃতীয় স্থানে। ১০ জন পুরুষ (পুরুষদের ১০৫৩%) এবং ৩ জন মহিলা (মহিলা ও পুরুষের ১০.০০%) মিলে এ বয়সসীমার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে ১৩ জন, যা পুরুষের ১০.৪০%। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে অনুর্ধ্ব ২০ বছর বয়সের অন্তর্ভুক্ত এরা ছিল ৫জন পুরুষ (পুরুষের ৫.২৬%) ও ২ জন মহিলা (মহিলাদের ৬.৬৭%) মিলে সর্বমোট ৭ জন যার শতকরা হার হচ্ছে ৫.৬০% ভাগ। সর্বশেষ অবস্থানে রয়েছে ৫০ উর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিরা। পুরুষ ও মহিলা (৫+১) মিলে এদের সংখ্যা ৬ জন, যা মোট নমুণার ৪.৮০% ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx -2

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ		
পেশা	নমুণার পরিমাণ	শতকরা হার
ছাত্র/ছাত্রী	৫০	৪০.০০%
শিক্ষক/শিক্ষিকা	২৫	২০.০০%
রাজনীতিবিদ	২৫	২০.০০%
ব্যবসায়ী	১৫	১২.০০%
অন্যান্য পেশাজীবী	১০	৮.০০%
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, মতামত প্রদানকারীর ৪০.০০% ভাগ (৫০জন) হচ্ছে ছাত্র/ছাত্রী। শিক্ষক/শিক্ষিকা ও রাজনীতিবিদ-এ দু'পেশা থেকে নমুণা নেয়া হয়েছে প্রতিটি থেকে ২৫টি করে। এখানে উভয়ের শতকরা হার ২০%। ব্যবসায়ী নেয়া হয়েছে ১৫ জন বা ১২.০০% ভাগ এবং অন্যান্য পেশাজীবী নেয়া হয়েছে ১০ জন বা ৮.০০% ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 3

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর আয় সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ

মাসিক আয়	নমুণার পরিমাণ	শতকরা হার%
৫০০০ টাকার কম	নিম্নবিত্ত ৪০	৩২
৫০০১-১০,০০০	মধ্যবিত্ত ৪৫	৩৬
১০,০০১ টাকার উর্ধ্বে	উচ্চ বিত্ত ৪০	৩২

বিশ্লেষণ: উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, মোট নমুণার ৪০ জন অর্থাৎ ৩২% নিম্নবিত্ত যাদের মাসিক আয় ৫০০০ টাকার কম, ৪৫ জন অর্থাৎ ৩৬% মধ্যবিত্ত যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০,০০০ টাকার মধ্যে এবং ৪০ জন অর্থাৎ ৩২% উচ্চবিত্ত, যাদের মাসিক আয় ১০,০০১ টাকার উর্ধ্বে।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 4

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ধর্ম সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ

ধর্ম	নমুণার পরিমাণ	শতকরা হার%
মুসলমান	৭৫	৬০
হিন্দু	৪০	৩২
অন্যান্য	১০	০৮

বিশ্লেষণ: উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, মোট নমুণার ৭৫ জন অর্থাৎ ৬০% মুসলমান, ৪০ জন অর্থাৎ ৩২% হিন্দু এবং ১০ জন অর্থাৎ ০৮% অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 5

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর এলাকা সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ

এলাকার নাম	নমুণার পরিমাণ	শতকরা হার %
ধানমণ্ডি, গুলশান, বারিধারা	উচ্চবিত্ত ৪০	৩২
ফকিরাপুল, হাতিরপুল, কাঁঠালবাগান	মধ্যবিত্ত ৪৫	৩৬
গোপীবাগ বস্তি, আগার গাঁও বস্তি, কাঁটাবন বস্তি	নিম্ন বিত্ত ৪০	৩২

বিশ্লেষণ : উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, মোট নমুণার ৪০ জন অর্থাৎ ৩২% ধানমণ্ডি, গুলশান, বারিধারা, ৪৫ জন অর্থাৎ ৩৬%, ফকিরাপুল, হাতিরপুল, কাঁঠালবাগান এবং ৪০ জন অর্থাৎ ৩২% গোপীবাগ বস্তি, আগার গাঁও বস্তি থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 6

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তিগুলোর অবস্থান সম্পর্কে মতামতের বিন্যাস		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. তাদের ক্ষমতা অত্যাধিক	২৯	২৩.২০
খ. মোটামুটি শক্তিশালী	৭৩	৫৮.৪০
গ. শক্তি আছে, তবে সামান্য	২৩	১৮.৪০
ঘ. ক্ষমতা নেই	০	০০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, মতামত প্রদানকারীদের বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ ৫৮.৪০% মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তিগুলো মোটামুটি শক্তিশালী। ২৩.২০% মনে করেন যে দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর ক্ষমতা অত্যাধিক। "শক্তি আছে, তবে সামান্য"-এ মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন ১৮.৪০% উত্তরদাতা। এদের "ক্ষমতা নেই"- সে মন্তব্যকে কেউ সমর্থন করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 7

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক কি-সে সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের অভিমতের বিন্যাস		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. দু'টিই ওতপ্রোতভাবে জড়িত	৬	৪.৮০
খ. জড়িত তবে সামান্য	২৬	২০.৮০
গ. দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন	৯৩	৭৪.৪
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, "ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্কে বিষয়ে মতামত প্রদান করতে গিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক ভিন্ন জিনিস বলে অভিহিত করেছেন। এদের সংখ্যা হচ্ছে ৯৩ জন যা মোট নমুণার ৭৪.৪০%। এদের মধ্যে ২৬ জন অর্থাৎ ২০.৮০% উত্তরদাতা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা পরস্পরের জড়িত তবে সামান্য।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 8

সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক রাজনৈতিক প্রভাব কোনটি সে সম্পর্কে সংগৃহীত মতামতের বিন্যাস		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারে না	৩	
খ. রাজনৈতিক আধুনিকায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়	১৪	২.৪০
গ. উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না	১৫	১১.২০
ঘ. এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সন্ত্রাস একটি স্থায়ী আসন দখল করে	৭	১২.০০
ঙ. জাতীয় সংহতি হয় হুমকির সম্মুখীন	১	৫.৬০
চ. রাজনীতির ধর্ম নিরপেক্ষ মূল্যবোধ স্বকীয়তা লাভ করতে পারে না	২	০.৮০
ছ. সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার সক্ষমতা হারায়।	২	১.৬০
জ. একাধিক উত্তর	৮১	১.৬০
মোট	১২৫	৬৪.৮০

বিশ্লেষণ: এ সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৮১ জন বা ৬৪.৮০% উত্তর দাতাই একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন। ১৫ অর্থাৎ মোট উত্তর দাতার ১২.০০% এর মতে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় প্রভাব হচ্ছে যে, এর ফলে উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 9

সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রভাব কোনটি সে সম্পর্কে প্রদত্ত মতামতের বিন্যাস		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসে দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় যা দেশের অগ্রগতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে।	১৫	১২.০০%
খ. এর দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়, ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যবহৃত হয়।	৭	৫.৬০
গ. এদের দ্বারা সৃষ্ট জাতিগত অসন্তোষের কারনে দেশীয় ও বিদেশী পূঁজিপতিরা বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে পেলেন।	৩	২.৪০
ঘ. সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের কালোটাকার পাহাড় তৈরী করছে।	২৪	১৯.২০
ঙ. সংখ্যালঘু শ্রেণির অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে পরে।	৬	৪.৮০
চ. অর্থনৈতিকভাবে তেমন কোন প্রভাব রাখে না	৩	২.৪০
ছ. একাধিক উত্তর	৬৭	৫৩.৬০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: এ সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, বেশিরভাগ উত্তরদাতা সাম্প্রদায়িকতার ফলে সৃষ্ট প্রভাবগুলোর মধ্যে একাধিক প্রভাবকেই সর্বাধিক ক্ষতিকারক বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ তাদের মতে সাম্প্রদায়িকতা দেশে এক সাথে একাধিক ক্ষতিকর প্রভাব তৈরী করছে। এরকম উত্তর দাতাদের সংখ্যা হচ্ছে ৬৭ জন এবং মোট নমুণার ক্ষেত্রে এদের শতকরা হার হচ্ছে ৫৩.৬০%। তবে ১৯.২০% উত্তর দাতা একটি বিশেষ প্রভাবের কথা বলেছেন। তাদের মতে, সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু স্বার্থবাদী মহল নিজেদের কালো টাকার পাহাড় তৈরী করছে। আর ১২.০০% মনে করেন যে, এদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসে দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় যা দেশের অগ্রগতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 10

সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাব কোনটি সে সম্পর্কে প্রদত্ত মতামতের বিন্যাস		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়	৯	৭.২০
খ. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাসের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ে	৮	৬.৪০
গ. সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়	১	০.৮০
ঘ. সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়	৩৫	২৮.০০
ঙ. মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়	৭	৫.৬০
চ. একাধিক উত্তর	৬৫	৫২.০০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৫২.০০% উত্তর দাতা একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন। তাদের মতে সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক প্রভাব একটি নয় বরং একাধিক। ২৮.০০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এরফলে সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 11

সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাব কোনটি সে সম্পর্কে প্রদত্ত মতামতের বিন্যাস		
মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতিতে আঘাত হানে।	৮৩	৬৬.৪০
খ. জনগণের একটি বৃহৎ অংশ সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মের অংশ মনে করে।	৪২	৩৩.৬০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: সাম্প্রদায়িকতার সর্বাধিক ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাব সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে গিয়ে ৬৬.৪০% উত্তরদাতা অভিমত প্রকাশ করেন যে, এরফলে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতিতে আঘাত হানে। এরা হচ্ছে মোট নমুণা ১২৫ জনের মধ্যে ৮৩ জন। অন্যদিকে মোট নমুণার ৪২ জন অর্থাৎ ৩৩.৬০% উত্তরদাতা, জনগণের একটি বৃহৎ অংশ সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মেরই অংশ মনে করে বলে মতামত প্রদান করেন। এর ফলে এক শ্রেণির লোক সাম্প্রদায়িকতার জন্য ধর্মকেই দোষারোপ করছেন এবং ধর্মকে ভুল, বিকৃত এবং ত্রুটিযুক্ত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 12

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তিগুলো নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে সে সম্পর্কে মতামতের বিন্যাস

মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. এরা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না	১০২	৮১.৬০
খ. এ ব্যাপারে তাদের কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই	২৩	১৮.৪০
গ. নারী স্বাধীনতার প্রতি এরা যথেষ্ট সোচ্চার এবং ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।	০	০০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: উপরে সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ১০২ জন অর্থা ৮১.৬০ ভাগ উত্তর দাতা মনে করেন যে, এরা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না। আর ২৩জন অর্থাৎ ১৮.৪% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, এক্ষেত্রে তাদের কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। কেউই বলেনি যে, সাম্প্রদায়িক শক্তি নারী স্বাধীনতার প্রতি যথেষ্ট সোচ্চার এবং ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 13

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধীদের মূল চালিকা শক্তি কোনটি সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস

মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. রাজনৈতিক দল	২৬	২০.৮০
খ. ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক দলসমূহ	০	০০
গ. কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণি	৯৯	৭৯.২০

বিশ্লেষণ: সর্বাধিক সংখ্যাক উত্তর দাতা কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণি এর মূল চালিকা শক্তি বলে অভিহিত করেছেন। এদের সংখ্যা হচ্ছে মোট নমুণার ৯৯ জন অর্থাৎ ৭৯.২০%

Dhaka University Institutional Repository

mviYx -14

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তিগুলোর বর্তমান ক্ষমতা সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের অভিমতের বিন্যাস

মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. এদের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে	২৬	২০.৮০
খ. এদের ক্ষমতা যেমন আছে তেমন থাকবে	৯৩	৭৪.৪
গ. এদের শক্তি বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান	৬	৪.৮
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: এ সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৯৩ জন উত্তরদাতা অর্থাৎ ৭৪.৪০ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, এদের ক্ষমতা যেমন আছে তেমন থাকবে। আর ৬ জন বা ৪.৮ ভাগ এদের শক্তি বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান বলে জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 15

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তি অদুর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে কিনা সে সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৪৪	৩৫.২০
না	৮১	৬৪.৮০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫.২০% অর্থাৎ ৪৪ জন উত্তরদাতা মনে করেন যে, এরা অদুর ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে এবং ৮১ জন অর্থাৎ ৬৪.৮০% মনে করেন যে, তাদের পক্ষে অদুর ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 16

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে মতামতের বিন্যাস

মতামত	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত	৫	৪
খ. বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িকতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।	২৭	২১.৬
গ. কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে মদদ যোগায়।	২০	১৬
ঘ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে	৭৩	৫৮.৪০
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৫ জন অর্থাৎ ৪% উত্তরদাতা মনে করেন যে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত এবং ২৭ জন অর্থাৎ ২১.৬% মনে করেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িকতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে ও ২০ জন অর্থাৎ ১৬% মনে করেন, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে মদদ যোগায় এবং সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ৭৩ জন (৫৮.৪%) উত্তর দাতা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে বলে মতামত প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

mviYx - 17

eাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য উত্তরদাতারা যে সকল সুপারিশ প্রদান করেছেন, সে সম্পর্কে তাদের অভিমতের বিন্যাস

সুপারিশমালা	সুপারিশ প্রদানকারীর সংখ্যা	%
ক. ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা	৮	৬.৪০
খ. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পাঠ্যবিষয় সংযুক্ত করা।	৯	৭.২০
গ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা	১	০.৮০
ঘ. পারিবারিকভাবে সন্তানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব তৈরী করা	৭	৫.৬০
ঙ. অধিক মাত্রায় গণসচেতনতার সৃষ্টি করা	৩৫	২৮
চ. একাধিক উত্তর	৬৫	৫২
মোট	১২৫	

বিশ্লেষণ: এ সারণীতে দেখা যায় যে, সর্বাধিক ৬৫ জন উত্তরদাতা একাধিক সুপারিশ প্রদান করেছেন। বাকীরা কেবল একটি করে সুপারিশ প্রদান করে সন্তুষ্ট থেকেছেন। যারা একটি করে প্রদান করেছেন। তাদের ৩৫ জন অধিক মাত্রায় গণসচেতনতা সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। একটি মাত্র প্রদানকারীদের মধ্যে এ সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পাঠ্য বিষয় সংযুক্ত করা। সমর্থনের দিক দিয়ে ৩য় পর্যায়ে রয়েছে ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এর পরের সুপারিশ হলো পারিবারিকভাবে সন্তানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব তৈরী করা।

আলোচ্য অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িকশক্তি বিরোধীদের ক্ষমতা, প্রভাব এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সকল সারণী বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তিগুলোর অবস্থান সম্পর্কে মতামত

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করতে গিয়ে ৫৮.৪০% উত্তরদাতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তিগুলো মোটামুটি শক্তিশালী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সর্বাধিক ক্ষতিকারক রাজনৈতিক প্রভাব হিসেবে ১১.২০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। সর্বাধিক ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রভাব হিসেবে ৮৪ জন অর্থাৎ ৬৭.২০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের কালো টাকার পাঁহাড় তৈরী করে থাকে। সর্বাধিক ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাব হিসেবে ৯০ জন অর্থাৎ ৭২.০০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এর ফলে সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়। সর্বাধিক ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাব হিসেবে ৮৩ জন অর্থাৎ ৬৬.৪০%উত্তরদাতা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতিতে আঘাত হানে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মোট নমুণার ৯৯ জন অর্থা ৭৯.২০% ভাগ কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণিকে এর মূলচালিকা শক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

৯৩ জন অর্থাৎ ৭৪.৪ % উত্তর দাতা মনে করেন এদের ক্ষমতা যেমন আছে তেমন থাকবে। ৮১জন অর্থাৎ ৬৪.৮% উত্তরদাতা এরা অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে না বলে মতামত প্রদান করেছেন। সবশেষে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ৬৬ জন অর্থাৎ ৫২.৮০% উত্তরদাতা অধিক মাত্রায় গণসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৩৮ জন অর্থাৎ ৩০.৪০% উত্তর দাতা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পাঠ্য বিষয় সংযুক্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০ জন অর্থাৎ ১৬.০০% উত্তরদাতা সরকারও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো সমন্বিত উদ্যোগের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ২৫ জন অর্থাৎ ২০.০০% উত্তরদাতা ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপর অভিমত পোষণ করেন। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অনুমতি সিদ্ধান্তগুলো প্রমাণিত।

Dhaka University Institutional Repository

mßg Aa¨vq

evsjv‡‘‡ki msL¨vjN m¤ú‘vq I mv¤ú‘vwqK m¤úxwZi eZgvb wPÎ

c_g cwi‡”Q‘

evsjv‡‘‡k gvbewaKvi

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় মুল্যবোধের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধ জগত এবং বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের দেশসমূহও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে একদিকে যেমন ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন রয়েছে ঠিক তেমনি রয়েছে ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত করার সাংগঠনিক প্রয়াসও। তবে এখানকার প্রধান রাজনৈতিক ধারাটি হচ্ছে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের প্রশ্নে মধ্যপন্থা অনুসরণ। বাংলাদেশের ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, কর্মী, রাজনৈতিকশক্তি কখনও সাম্প্রদায়িকতাকে মদদ যোগায়নি। কারণ ইসলাম বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম। সূফীবাদের প্রভাবের কারণে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ধর্মীয় উদারতায় বিশ্বাসী। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মানুরাগী হলেও সাম্প্রদায়িক নয়। এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবস্থা অনেক উন্নত। যদিও বাংলাদেশে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা ঘটতে দেখা যায় তবে এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিস্কার। ইসলামে সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত অধিকারকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের অধিকার রক্ষার অধিকাংশ দিকই ইসলামী বিধিমালার অনুরূপ।

evsjv‡‘‡k gvbewaKvi

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র । আমাদের রয়েছে একটি লিখিত গণতান্ত্রিক সংবিধান। বাংলাদেশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে এদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার তথা মানবাধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ একটি লিখিত গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সংবিধানে এদেশের জনগণের জন্যে সুনির্ধারিত মৌলিক অধিকারের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।[১১] আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠিগত বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ, সরকারি চাকুরি লাভে সমতা, আইনের আশ্রয় লাভ, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা, ন্যায়বিচার লাভে নিশ্চয়তা, বাধ্যতামুলক শ্রম নিষিদ্ধকরণ, মতামত প্রকাশ, চলাফেরা, সংগঠন গড়া ও সমাবেশের স্বাধীনতা, পেশা, ধর্মপালন, সম্পত্তি অর্জনের স্বাধীনতা প্রভৃতি বাংলাদেশ সংবিধানে গৃহীত মৌল অধিকারের অন্যতম। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার তালিকার প্রায় পুরোটাই বাংলাদেশ সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সংবিধান প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সকল আইন বাতিল হয়ে যাবে এবং এসব অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এমন আইন রাষ্ট্র কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রণীত হতে পারবেনা।

মানবাধিকারের বিষয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসাযোগ্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হিসেবে মানবাধিকার পরিস্থিতির ক্রম উন্নয়ন ঘটাতে বাংলাদেশের নীতিগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের বর্ণ বৈষম্য রোধ বিষয়ক কনভেনশনের দলিলেও স্বাক্ষরদানকারী দেশ। শিশু অধিকার সুরক্ষা সম্পর্কিত জাতিসংঘ ঘোষণাও বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে। লিঙ্গ, ধর্ম ইত্যাদি থেকে বৈষম্য দূরীকরণের জাতিসংঘ সনদও বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে। আই, এল,ও এর সদস্য হিসেবে শ্রমিকের এবং সমাজের পশ্চাদপদ শ্রেণিসমূহের অধিকার সুরক্ষায়ও বাংলাদেশ ওয়াদাবদ্ধ। বাক স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠন গড়ার অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

evsjv‡`‡ki msweav‡b AwaKvi

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে রচিত বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রে বসবাসকারীদের মৌলিক অধিকার রক্ষা সম্বলিত যে অনুচ্ছেদগুলো রয়েছে তা হলোঃ

ïa evsjv‡`‡ki bvMwiKiv †fvM Ki‡Z cv‡i Ggb †gŠwjK AwaKvi¸‡jv n‡jv :

১. AvB‡bi `wó‡Z mgZv : সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী।

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

২. ধনী-দরিদ্র, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিক আইনের দ্বারা সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।

৩. ag, eY, bvix ciæl ˆelg¨ Kiv hv‡e bv : ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠি নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না এবং উক্ত কারণে নাগরিককে সাধারণ বিনোদন ও বিশ্রাম কেন্দ্রে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ বা ভর্তি হতে বঞ্চিত করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। তবে নারী, শিশু ও অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।[২]

৪. PvKwii mgvb m‡hvM : প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের চাকুরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না।[৩]

৫. we‡`kx iv‡óªi †LZve cfwZ MnY : রাষ্ট্রে পূর্বানুমতি ব্যতিত কোন নাগরিক বিদেশী কোন উপাধী, সম্মান, পুরস্কার বা খেতাব গ্রহণ করতে পারবে না।[৪]

৬. AvB‡bi Avkÿq jv‡fi AwaKvi : বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল ব্যক্তি কেবল আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং আইনের বিধি ছাড়া কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি করা যাবে না।[৫]

৭. Pjv‡divi ¯^vaxbZv : জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাঁধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, এর যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[৬৬]

৮. mgv‡e‡ki ¯^vaxbZv : আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাঁধা-নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমাবেশ-শোভাযাত্রা ইত্যাদি করার অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।[৭]

৯. msMV‡bi ¯^vaxbZv : জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাঁধা-নিষেধ সাপেক্ষে সংগঠন করার অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।[৮]

2| cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ২৮
৩। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ২৯
৪। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ৩০
৫। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ৩১
৬। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ৩৬
৭। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ৩৭
৮। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ৩৮

১০. evK ¯vaxbZv : রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাঁধা নিষেধ, প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হবে।[৯]

১১. ‡ckv I e„Ëi AwaKvi : আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[১০]

১২. agxq ¯vaxbZv : আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[১১]

১৩. Mn I †hvMv‡hv‡Mi AwaKvi : আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় গৃহ নিরাপত্তা লাভের , চিঠিপত্র ও যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।[১২]

evsjv‡`‡k emevmKvix bvMwiK I we‡`kxiv †fvM Ki‡Z cvi‡e Ggb †gŠwjK AwaKvi 6wU| h_v :

1. Rxeb I e¨w³ ¯vaxbZvi AwaKvi : আইনের বিধান ছাড়া কোন ব্যক্তিকে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।[১৩]

2. †MÖßvi I AvUK m¤ú‡K iÿvKeP : গ্রেফতারকৃত সকল ব্যক্তি তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।[১৪]

3. Rei`w¯Í kg wbwl×KiY : সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ এবং এর লংঘণ আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে ফৌজদারী দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ বিধাণ কার্যকর হবে না। তবে জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক শ্রমের বিধান করতে পারবে।[১৫]

৯। cv¸ ³ ,অনুচ্ছেদ, ৩৯
১০। cv¸ ³ ,অনুচ্ছেদ, ৪০
১১। cv¸ ³ ,অনুচ্ছেদ, ৪১
১২। cv¸ ³ , অনুচ্ছেদ, ৪৩
১৩। cv¸ ³ , অনুচ্ছেদ, ৩২
১৪। cv¸ ³ , অনুচ্ছেদ, ৩৩
১৫। cv¸ ³ , অনুচ্ছেদ, ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

4. wePvi I ‘Ð m¤úwKZ weavb : অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ আইনে বর্ণিত দণ্ডের বেশি দণ্ড দেয়া হবে না। এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার দণ্ডিত করা যাবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হবেন। কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না এবং কাউকে যন্ত্রণা দেয়া বা নিষ্ঠুর, অমানষিক ও লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেয়া যাবে না।[১৬]

5. agx©q ¯^vaxbZv : আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[১৭]

6. mvsweavwbK cwZKvi cvIqvi AwaKvi : মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য যে কোন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে মামলা রজ্জু করতে পারবে।[১৮] সুপ্রিমকোর্ট কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে কোনো মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ বা নির্দেশ দান করতে পারবে।[১৯] রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘণ করে আইন প্রণয়ন করবে না।[২০]

১৯৭২ সালের প্রবর্তিত সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ছিল ৪টি। যথা: ১) জাতীয়তাবাদ [২১] ২) সমাজতন্ত্র [২২]৩) গণতন্ত্র [২৩] ৪) ধর্মনিরপেক্ষতা [২৪]

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়নের অবসান। (বর্তমানে বিলুপ্ত)

ইংরেজি সেকিউলারিজম শব্দের বাংলা অনুবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ। গত আড়াই শত বছর থেকে এটা দুনিয়ার সর্বত্র একটি আদর্শের মর্যাদা লাভ করেছে। মুসলিম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম কামাল পাশা তুরস্কে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন।[২৫]

১৬। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ৩৫
১৭। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ৪১
১৮। cv¸ 3,অনুচ্ছেদ, ৪৪
১৯। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ১০২
২০। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ২৬
২১। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ৯
২২। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ১০
২৩। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ১১
২৪। cv¸ 3, অনুচ্ছেদ, ১২
২৫। গোলাম মুরশীদ, agwbi‡c ÿZv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা :১৯৭৩, পৃ . ৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা এ অনুচ্ছেদ (১২) বিলুপ্ত করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এ শব্দগুলো সংযোজন করা হয়েছে।

me‡kl ms‡kvabx 2011

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩রা জুলাই, ২০১১ইং তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে এবং এতদ্বারা এ আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

2011 mv‡ji 14 bs AvBb

সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন : সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হবে।

ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা : ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য-

ক. সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা;

খ. রাষ্ট্রকর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান;

গ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার;

ঘ. কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।[২৬]

২৬। evsjv‡`‡ki msweavb (সর্বশেষ সংশোধনী বিশ্লেষণ) সম্পাদনায় : অধ্যাপক এম ফারুক খান, আবদুল্লাহ আল মনজুর হোসেন (institutional for development of human rights and legal education (IDHRLE), জুন, ২০১২ইং, পৃ.২০৩

Dhaka University Institutional Repository

evsjv‡‘‡ki agxq m¤c‘vqmgn Ges evsjv‡‘‡k Zv‡‘i Ae¯vb

evsjv‡‘‡k RbmsL¨vi w‘K n‡Z we‡ki Ab¨Zg enËg gmwjg †‘k| জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে এর অবস্থান বিশ্বে অষ্টম। এর জনসংখ্যা ১৬ কোটি প্রায়।[২৭] স্বাধীনতার পর হতে এদেশের জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মোট চিত্র তুলে ধরা হলো:

evsjv‡‘‡ki agxq Rb‡Mwô-2016

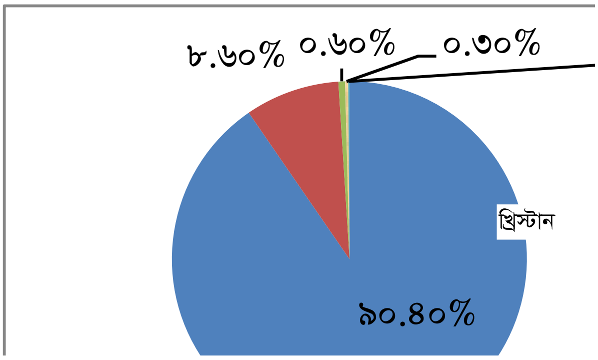

সারণী-১

ধর্ম	শতকরা
ইসলাম	৯০.৪%
হিন্দু	৮.৬%
বৌদ্ধ	০.৬%
খ্রিস্টান	০.৩%
অন্যান্য	০.১%

Religion in Bangladesh Wikipedia, The free Encyclopedia, https://en.w.wikipedia.org

---

২৭। *Statistical Pocket Book of Bangladesh* : 2008

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা

গন	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
১৯৮১	৮৭.১১
১৯৯১	১০৬.৩১
২০০১	১২৪.৩৫
২০০৭	১৪২.৬

সূত্র : Bangladesh population census 1981, 1991,

2001 সূত্রে প্রাপ্ত : Statistical Year Book 2008:

Bangladesh Bureau of Statistics

আলোচ্য সারণীতে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল মোট ৮ কোটি ৭১ লক্ষ প্রায়। পরবর্তী ১০ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ কোটি ৬৩ লক্ষতে। এর পরবর্তী ১০ বছরে এ বিশাল জনসংখ্যা আরো ১ কোটি ৮০ লক্ষ বেড়ে যায়। যার বৃদ্ধির হার ছিল ১.৫৮ শতাংশ। পরবর্তীতে ২০০৭ সাল নাগাদ এদেশের জনসংখ্যা হয় মোট ১৪ কেটি ২৬ লক্ষ। বস্তুত বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগতি শুধু এক দশকের ফল নয় এবং প্রতি দশকেই এর জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে বেড়েই চলেছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি প্রায় (১৬০ মিলিয়ন)।

বস্তুত বাংলাদেশের এ বিশাল জনসংখ্যা নানা ধর্মের লোকদের সমষ্টি। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ আরো নানা ধর্মের লোকদের সহাবস্থানের দেশ আমাদের এ বাংলাদেশ। এদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যার শতকরা হার নিম্নের সারণীতে প্রকাশ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩

বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির শতকরা হার

	২০০১	১৯৯১	১৯৮১
মুসলিম	৮৯.৫৮	৮৮.৩১	৮৬.৬৫
হিন্দু	৯.৩৪	১০.৫২	১২.১৩
বৌদ্ধ	০.৬২	০.৫৮	০.৬২
খ্রিস্টান	০.০১	০.৩৩	০.৩১
অন্যান্য	০.১৫	০.২৬	০.২৬

সূত্র : Bangladesh Census Report, 1981, 1991, 2001

সারণীতে নানা সময়ে কৃত বাংলাদেশের আদমশুমারীর ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ১৯৮১, ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিম ও অমুসলিম জনগণের শতকরা হার দেখানো হয়েছে। সারণী অনুযায়ী ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৮৬.৬৫ ভাগ। পরবর্তী দু'দশকে তা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যার ফলে ১৯৯১ ও ২০০১ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৮৮.৩১ ও ৮৯.৫৮ ভাগ।

অন্যদিকে হিন্দু জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এ অনুপাত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ১৯৮১ সালে যা ছিল ১২.১৩ ভাগ। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ১০.৫২ ভাগে। সবশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী তা আরো নেমে দাঁড়ায় ৯.৩৪ ভাগে। বৌদ্ধ জনসংখ্যা ছিল ১৯৮১ এবং ২০০১ সালে মোট জনসংখ্যার ০.৬২ শতাংশ। মধ্যবর্তী ১৯৯১ সালে অবশ্য কিছুটা হ্রাস পেয়ে ০.৫৮ শতাংশ হয়ে যায়। খ্রিস্টান জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র প্রতিফলিত হয়। ১৯৮১ এবং ২০০১ সালে ০.৩১ শতাংশ থাকলেও ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ০.৩৩ শতাংশে। প্রধান এ চারটি ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যথা-ইয়াহুদী, শিখ, মৈত্র, উপজাতীয় ধর্মাবলম্বীগণ এদেশের মোট জনসংখ্যার সামান্যই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। ১৯৮৯, ১৯৯১ ও ২০০১ সালে তাদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ০.২৯, ০.২৬ ও ০.১৫ ভাগ। জনসংখ্যার এ সারণী ও তুলনামূলক বিবরণীতে প্রতীয়মান হয় মুসলিমগণই এদেশের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় গোষ্ঠি। এছাড়াও হিন্দু জনগোষ্ঠির অবস্থান ও ভূমিকা কম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

eZgvb evsjv‡`‡ki agZwËK RbmsL¨vi wPÎ wbgi/c :

1| Bmjvg

বাংলাদেশের প্রধান ও বৃহত্তম ধর্ম ইসলাম। এদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯০ ভাগই মুসলমান। খ্রিস্টীয় ৭ম শতক হতে ১০ম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। যা ১৩ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে ক্রমবিকশিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১৩০ মিলিয়ন। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম জনসংখ্যার অবস্থান দেখানো হলো:

সারণী-৪

বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী মুসলিম জনসংখ্যার অবস্থান (শতকরা হিসেবে)

বিভাগ	মুসলিম জনসংখ্যা
ঢাকা	৯০%
চট্টগ্রাম	৮৪%
রাজশাহী	৮৬.৮৪%
খুলনা	৮২.৮৭%
বরিশাল	৮৮%
সিলেট	৮১.১৬%

সূত্র : http://en.wiki/islam-in-bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

2| wn›‘ ag

জনসংখ্যার দিক হতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হলো হিন্দু ধর্ম। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এ ধর্মের লোকদের বসবাস দেখা যায়। হিন্দু বা সনাতন ধর্ম বাংলাদেশের প্রাচীনতম ধর্ম। আর্যদের আগমনের সাথে সাথে এ ধর্ম বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে ইসলামের আগমন কাল পর্যন্ত বিকাশ লাভ করে। বর্তমান বাংলাদেশের ৬টি বিভাগের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান নিম্নে দেখানো হলো :

সারণী-৫

বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী হিন্দু জনসংখ্যার অবস্থান (শতকরা হিসেবে)

বিভাগ	হিন্দু জনসংখ্যা
ঢাকা	১০.০০
চট্টগ্রাম	১২.৬৫
রাজশাহী	১০.৫
খুলনা	১৬.৪৫
বরিশাল	১২.০৮
সিলেট	১৭.৮০

সূত্র : বাংলাপিডিয়া সূত্রে

http://en.wikipedia.org/wiki/hinduism-in-bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

3| †eŠ× ag

বাংলাদেশের প্রাচীন ধর্মসূহের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম অন্যতম। এদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বৌদ্ধ ও সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.৭ ভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেই মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বসবাস। তবে সিলেট, ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানেও তাদের দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের দেখানো হলো :

সারণী-৬

বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী বৌদ্ধ জনসংখ্যার অবস্থান (শতকরা হিসেবে)

বিভাগ	বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা
ঢাকা	<০.০৬
চট্টগ্রাম	১২.৬৫
রাজশাহী	০.০৩
খুলনা	<০.০৮
বরিশাল	০.২৩
সিলেট	০.২০

সূত্র : বাংলাপিডিয়া সূত্রে

http://en.wikipedia.org/wiki/hinduism-in-bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

4. wLÖ÷ ag

আসমানী কিতাবধারী ধর্মগুলোর মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম অন্যতম। এটি প্রাচীন বাংলার ধর্মগুলোর অন্তর্গত নয়। ইসলামের ন্যায় এ ধর্মও বাংলাদেশে বহিরাগত ধর্ম হিসেবে প্রবেশ করে। ধারণা করা হয় খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে পর্তুগিজ বণিকদের মাধ্যমে এ ধর্ম বাংলায় বিশেষত চট্টগ্রাম বন্দর অঞ্চলে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে। অতঃপর ১৫৯৯ সালে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলায় বাংলাদেশে প্রথম খ্রিস্ট ধর্মের উপাসনালয় বা গীর্জা নির্মাণ করা হয়।[২৮] পরবর্তীতে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচারে এ ধর্ম বাংলায় স্থান লাভ করে। ইংরেজ শাসনামলে বহু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের আগমন ও মিশানারীদের প্রবেশ এদেশে খ্রিস্টধর্ম বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারী কার্যক্রম শুরু হয় ১৭৯০ এর দশকে। মিশনারী কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে উইলিয়াম কেরী ও ইউলিয়াম টমাস।[২৯] খ্রিস্টানগণ বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেননি। ফলে বাংলাদেশের প্রায় সব বিভাগেই তাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে সাতক্ষীরা, নাটোর, বরিশাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ইত্যাদি অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা প্রায় ০.৩১ ভাগ।

5. DcRvZxq ag

উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রধানতম রূপ। এদেশের ইসলাম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মের পাশাপাশি উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় ৩০টি উপজাতি দল রয়েছে।[৩০] তন্মধ্যে বৃহৎ চারটি উপজাতি সম্প্রদায় হলো চাকমা, মারমা, টিপরা ও মুরং সম্প্রদায়।

এছাড়াও গারো, খাসিয়া, মগ, মনিপুরী, মুণ্ডা, ওরাং, সাওতাল, কাছারী, কুকি, হাজং, রাজবংশী ইত্যাদি উপজাতি সম্প্রদায়ও বাংলাদেশে বসবাস করে। সাধারণত বাংলাদেশের পাহাড়িয়া ও পার্বত্য অঞ্চল উপজাতীয়দের আবাসভূমি হিসেবে পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামেই তাদের বেশি দেখা যায়। এছাড়া সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানেও তাদের বসবাস রয়েছে। ১৯৭১ সালের হিসাবানুযায়ী বাংলাদেশে উপজাতীয় মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১ মিলিয়ান বা ১০ লক্ষ প্রায়।

২৮। http://en.wikipedia.org/wiki/christianity-in-bangladesh

২৯। মোঃ মাহবুবুর রহমান,"নাটোর জেলার খ্রিস্টান সম্প্রদায়", B¤Znvm m¤giZ c¤ÎKv, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, সংখ্যা ২৭-২৮, ঢাকা : ১৪০৯-১৪১১, পৃ.১২৫

৩০। http://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism-in-Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

তবে বর্তমানে এ জনসংখ্যা মাত্র ৬ লক্ষ।[৩১] উপজাতীয় জনগণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই বেশি। ধর্মানুপাতে উপজাতীয় জনসংখ্যার বর্ণনা নিম্নের সারণীতে উপস্থাপিত হলো:

সারণী-৭

১৯৮০'র দশকের মধ্যভাগে উপজাতীয় জনসংখ্যার ধর্মতাত্ত্বিক শতকরা হার

ধর্ম	শতকরা হার
বৌদ্ধ	৪৪
হিন্দু	২৪
খ্রিস্টান	১৩
অন্যান্য	১৯

সূত্র : www.bangla2000.com/bangladesh/people/htm

উপর্যুক্ত সারণী মতে উপজাতীয় জনগণের একটি প্রধান অংশ (প্রায় ৪৪ ভাগ) বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের হার যথাক্রমে ২৪ ও ১৩ শতাংশ। প্রায় বাকী ১৯ শতাংশ উপজাতি জনগণ নিজ নিজ ধর্ম পালন করে থাকে।

৩১। http://www.bangladesh.2000.com/Bangladesh/People/htm

Dhaka University Institutional Repository

msL¨vjN‡'i ghv'v I AwaKvi

আবহমান কাল থেকেই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছে। ২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৮৫.৭ শতাংশ মুসলিম, ৯.২ শতাংশ হিন্দু, ০.৭ শতাংশ বৌদ্ধ, ০.৩ শতাংশ খ্রিস্টান ও ০.১ শতাংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। তারা যুগ যুগ ধরে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। প্রায় ১৪০০ বছর আগে রাসূল (সা.) বলেছিলেন, যেখানে সংখ্যাগুরুরা হবে মুসলমান সেখানকার সংখ্যালঘুরা (অমুসলিমরা) মুসলমানদের জন্য আমানত।

আমরা আজো সে মহান আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় দাঙ্গা হয়নি বলা যায়। অথচ বিগত অর্ধশতাব্দীতে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে সাম্প্রদায়িক ছোট-বড় দাঙ্গা হয়েছে ২৬ হাজার বারেরও বেশি। মুসলমানেরা ১৪০০ বছর ধরে পুরো আরবে শাসনকার্য পরিচালনা করে আসছে। আরব জগতে এখনো এক কোটি ৪০ লাখ লোক কপটিক খ্রিস্টান। যখন এ মুসলমানেরা ভারত শাসন করেছিল ৭০০ বছর ধরে, তখনো অমুসলিমদের জোর করে ইসলামে আনা হয়নি, অত্যাচার করা হয়নি তাদের ওপর।

মুসলমানেরা যদি অমুসলিমদের সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় না রাখতো তাহলে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত যেখানে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৭ শতাংশ, সেখানে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের তার চেয়ে কম, ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটতো না। হুমকি-ধমকি দিয়ে অনুসারী বৃদ্ধি করা ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আমাদের এ বাংলাদেশে হিন্দুসহ সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার গ্যারান্টী মূলত ইসলামের মানবিক আদর্শ।

২০০৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সব জাতীয় দৈনিকে প্রশাসনের উপসচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। ৪১১ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে সংখ্যালঘু কর্মকর্তা ৬২ জন। অর্থাৎ তাদের শতকরা হার ১৭.৭৬ শতাংশ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ সংখ্যালঘু। দেখা যাচ্ছে, এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ পদে সংখ্যালঘুদের পদোন্নতির হার জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশি। যদি বাংলাদেশের যেকোনো অফিসের নিম্নপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান নেয়া যায়, তাহলে এ হার এরও বেশি পাওয়া যাবে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানেরা মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ সরকারিভাবে, ৩৫ শতাংশ

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারিভাবে।[৩২] তবুও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে তো দূরের কথা, সরকারি নিম্ন পর্যায়ের পদে তাদের জন্য ২ শতাংশের বেশি কোটা সংরক্ষিত নেই। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের গড় অর্থনৈতিক অবস্থা সংখ্যাগুরু মুসলমানদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত। এ ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার কথা বলা যেতে পারে। সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা সংখ্যাগুরুদের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে অনেক সমৃদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন বৈরী নীতি ও সংখ্যাগুরু বৌদ্ধদের নির্যাতনের কারণে তারা আজ নানা সঙ্কটে বিপন্ন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের তুলনায় পিছিয়ে নেই। ভারতের গুজরাটের মুসলমানদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল জমজমাট। তা যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে সেটা বাংলাদেশে অকল্পনীয়।

সংখ্যাগুরুরা বৈরী হলে কি সংখ্যালঘুরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে এতটা অগ্রসর হতে পারতেন আমাদের দেশে? ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের সরকার চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য মাত্র ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করার সাথে সাথে সেখানকার আদালত পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে লেগে আছে। এমন অবস্থা বাংলাদেশে কল্পনাও করা যায় না। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা মিডিয়াতেও তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ভালো অবস্থানে রয়েছেন। বাংলাদেশে সরকারি অর্থায়নে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষার পাশাপাশি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠাগার চালু রয়েছে। এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত নয় কোটি টাকা থেকে ১২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ট্রাস্টের স্থায়ী কমপ্লেক্স নিজস্ব জায়গায় নির্মাণের জন্য সরকার সাত কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। দেবোত্তর সম্পত্তি চিহ্নিত করে তা ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার সেল গঠন করেছে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্যদের জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

প্রাচীন কালের বৌদ্ধ ধর্মগুরু জ্ঞানতাপস অতীশ দীপঙ্করের নামে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। গঠন করা হয়েছে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যোগ্যপ্রার্থীদের চাকুরি ও পদোন্নতি এবং যোগ্য স্থানে পদায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের উদ্যোগে আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর দুর্গাপূজার মণ্ডপের সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার, তা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২০ হাজারেরও বেশি। আগে দুর্গাপূজায় অর্থবরাদ্দ দেয়া হতো সাড়ে তিন কোটি টাকা, বর্তমানে তা ১০ কোটি টাকারও বেশি। ভারতের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে

৩২। *Http :// www. koerkantho.com*

Dhaka University Institutional Repository

আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বাপেক্ষা ধর্মপরায়ণ সম্রাট। তিনিই ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বেশি অনুদান মঞ্জুর করেছিলেন হিন্দুদের মন্দির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য।[৩৩] সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে বলেই বাংলাদেশের একজন হিন্দু উচ্চ আদালতে কুরআন সংশোধনের মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবিতে মামলা করার পরও শীর্ষস্থানীয় আলেমরা মহাসমাবেশের আয়োজন করে সেখানে ঘোষণা দিয়েছিলেন, এ দেশে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সব ধর্মাবলম্বীর স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করার অধিকার রয়েছে। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নানুপুর মাদরাসার সীমানা দেয়ালের পাশেই বৌদ্ধমন্দির। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চলছে দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিময় সহাবস্থান। মাদরাসার মহাপরিচালক মাওলানা জমিরুদ্দীন যখন মারা যান, তখন নানুপুরের এ বৌদ্ধপল্লীর ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছিল।

এ দেশে ইসলাম এসেছে একটি ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠির হাত ধরে কিংবা তরবারির জোরে নয়। এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, অন্য দিকে তারা অন্য ধর্মের প্রতি উদার ধর্মীয়, ভাষাগত কিংবা নৃতাত্ত্বিক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর তখনই জোরজবরদস্তি, হত্যা-জুলুম চালায় যখন সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠির মাঝে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি বা পরকালের বিচারের অনুভূতি থাকে না। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ যেভাবে চলছে, তাতে ২০ বছর পর দেশে কোনো হিন্দুর অস্তিত্ব থাকবে না। তিনি বলেছেন, হিন্দুদের মন্দির ও সম্পত্তির ওপর যে চোরাগোপ্তা হামলা চলছে, সেগুলো অনুশীলনমাত্র। তার মতে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'ভয়ঙ্কর হামলা' সামনের দিনগুলোতে আসছে। তার তত্ত্ব অনুযায়ী তিনটি পন্থায় হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে- প্রথমত: সবাইকে মেরে ফেলা হবে, দ্বিতীয়ত: সবাই ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে, তৃতীয়ত: সবাই দেশ ছেড়ে পালাবে। অথচ হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার বাস্তবে কোনো কারণ নেই। কারণ বাংলাদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠেনি। ড. মিজান যদি এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে থাকেন, তবে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে হামলা রোধে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তার ভূমিকা পালন করছেন না কেন? আমি মনে করি, এমন কথা বলে তার মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছেন। মুসলমান জনগোষ্ঠিকে চরমভাবে অপমান ও হেয় করেছেন।[৩৪]

৩৩। *Http :// www. koerkantho.com*
৩৪। *Http :// www. koerkantho.com*

Dhaka University Institutional Repository

আমরা মুসলমানেরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে নিয়ে সুখে-দুঃখে আছি, এটাই বাস্তবতা। যে দেশের হিন্দুর দুঃখে মুসলমান এবং মুসলমানদের বেদনায় হিন্দুরা কাঁদে, যে মুসলমানেরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ও মন্দিরগুলো হানাদারদের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল। মিসরে ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমর যখন মিসরের গভর্ণর ছিলেন, তখন তার এক সেনাপতি সকালে পাখি শিকার করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, অমুসলিমদের একটি মূর্তির নাকের ওপর একটি পাখি বসে আছে। তিনি ভাবলেন, আমরা মুসলমানেরা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই অমুসলিমদের মূর্তিও রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। এ যে পাখিটি বসে আছে, এটি পায়খানা করলে মূর্তি অসম্মান হবে। তাই একটি তীর ছোড়া হলো পাখি তাড়ানোর জন্য। তীরটি গিয়ে মূর্তির নাকে লেগে নাকটি ভেঙ্গে গেল। যখন মূর্তি অনুসারীরা তা দেখলো, তখন মুসলমানদের দোষারোপ করলো এবং এ সিদ্ধান্ত নিলো যে, মূর্তির নাকের পরিবর্তে মুসলিম গভর্ণর আমরের নাক কাটতে হবে। গভর্ণর বললেন, আমি মূর্তি রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ, তখন আমার নাক কাটার জন্য প্রস্তুত। একজন অমুসলিম তার নাক কেটে দেয়ার জন্য সামনে এগোতে লাগলেন। তখনই পূর্বোক্ত সেনাপতি দৌড়ে এসে বললেন, দেখো, তোমরা আমার নাক কেটে নাও, কারণ আমিই এ মূর্তির নাক ভেঙ্গেছি। তিনি ঘটনা খুলে বলে বোঝালেন। তারা বললেন, ‘আমরা জানতাম না মুসলমানেরা আমাদের প্রতি এতটাই সুবিচার করতে পারে’। এ হলো মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।[৩৫]

৩৫। *Http //: www. kalerkontho.com*

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡"Q`

evsjv‡`‡k mv¤cÖ`vwqK m¤cÖxwZ I ivR‰bwZK `j

evsjv‡`‡ki cÖavb cÖavb ivR‰bwZK `‡ji †NvlYvcÎ, Bk‡Znvi I MVbZ‡š¿ mv¤cÖ`vwqK m¤cÖxwZ

ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ যুগেই সর্ব প্রথম রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। প্রথম রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। দলটির জন্ম ১৮৮৫ সালে। নিখিল ভারত মুসলিমলীগ হলো দ্বিতীয় দল, যার জন্ম ১৯০৬ সালে ঢাকায়। দেশে বর্তমানে প্রায় দু'শতাধিক রাজনৈতিক দল বর্তমান। রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কেউ কেউ গবেষণাও করেছেন। ২৬শে জুন ১৯৯৫ এর সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত খবরে বলা হয়, বাংলাদেশের বর্তমানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১৬২। তবে মোটামুটি ভাবে ধারণা করা যায় যে, দেশে সক্রিয় ও নিষ্ক্রীয় রাজনৈতিক দলের সংখ্যা দু'শতাধিক। তবে গোটা বিশেক দলের ইশতেহার-কর্মসূচী আছে। বাকী দলগুলোর ইশতেহার-কর্মসূচী নেই বললেই চলে। সুতরাং এ দেশের রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে গোটা দশ বারো দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলে। তবে বাংলাদেশে জনগণের সামনের সারিতে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তারা হচ্ছে: আওয়ামীলীগ, বি.এন.পি, জাতীয়পার্টি, জামায়াতে ইসলামী।[৩৬] তবে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আওয়ামীলীগ, বি.এন.পি, জাতীয়পার্টি এদেশে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমানেও আওয়ামীলীগ ক্ষমতাসীন দল হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন।

এ কথা সত্য যে, এ দেশ ও জাতির একাংশ জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলেও তাদের প্রতি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাধারণ মুসলিম জনতার সমর্থন রয়েছে। যদিও জামায়াতে ইসলামীসহ কোন ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দলই কখনও এদেশের ক্ষমতায় ছিল না, তবে এ ক্ষেত্রে বলা যায়, এদের মধ্যে জামায়াতে ইসলাম বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় যেতে সহায়তা করেছে। সুতরাং বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করে এ সকল দলের ঘোষণাপত্র, ইশতেহার ও গঠনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে যে সকল নীতিমালা ও কর্মসূচীর সংযোজন এবং

৩৬। আমজাদ হোসেন, evsjv‡`‡ki ivRbxwZ I ivR‰bwZK `j, শাশ্বত প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৯৬, পৃ.৬

অঙ্গীকারসমূহ ব্যক্ত করা হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার। আলোচ্য অধ্যায়ে আওয়ামীলীগ, বি.এন.পি, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক দল ও দলীয় জোটসমূহের লক্ষ্য ও কর্মসূচীসমূহ তুলে ধরা হলো এবং এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে এ দলগুলোর গঠনমূলক ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো :

evsjv‡`k AvIqvgxjxM : সাবেক পাকিস্তান আমলে ১৯৪৯ সালের জুন মাসে ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগের বিপরীতে আওয়ামীলীগের সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটে। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান দলের সভাপতি হিসেবে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তখন থেকে দলের ভাবমুর্তি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং আওয়ামীলীগের জনপ্রিয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭০ সালে এ ছয় দফা কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করেই আওয়ামীলীগ সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী হয়। নির্বাচনে জয়যুক্ত হবার পর রাজনৈতিক সংকট তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামীলীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সরকার গঠনের পর আওয়ামীলীগ দলীয়নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচী পুনর্ব্যক্ত করে। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে দলের আদর্শ ও কর্মসূচী বলে ঘোষণা করা হয় এবং এগুলো বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে।[৩৭] এ দলের ঘোষণাপত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, চলাফেরা ও সভাসমিতির সকল মৌলিক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ সকল মৌলিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।[৩৮] জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সমাজের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী অবহেলিত নারী ও শিশুদের মর্যাদা, অধিকার ও ভাগ্যন্নোয়নে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।[৩৯] জাতিগত সংখ্যালঘুসহ দেশের সকল নাগরিকের ধর্মীয় আচার বিধি পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। দেশের সকল নৃ-জাতি গোষ্ঠির ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশেষ যত্ন নেয়া হবে।[৪০] সরকারের উন্নয়নমূলক

৩৭। ড. এম.এ ওদুদ ভূঁইয়া, evsjv‡`‡ki ivR‰bwZK Dbqb, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৯৮৯, পৃ . ১৯৯

৩৮। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ঘোষণাপত্র

৩৯। নির্বাচনী ইশতেহার '১৯৯৬, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

৪০। নির্বাচনী ইশতেহার '২০০১, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে প্রনীত ২১ দফা কর্মসূচী সংবলিত নির্বাচনী ইশতেহার সামনে রেখেই আওয়ামীলীগ বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে।[৪১]

evsjv‡`k RvZxqZvev`x `j (weGbwc) : এ দলের ঘোষণাপত্রে এর আদর্শ, লক্ষ্য ও নীতিমালার সঙ্গে যুক্ত ৩১টি দফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৪২] ঘোষণাপত্রের ১৩, ২৩ এবং ২৮ নং দফায় যথাক্রমে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সহ অনুন্নত এলাকা ও জনগোষ্ঠির উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির জন্য ব্যাপক গণপ্রচেষ্ঠাসহ নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

গঠনতন্ত্রের ২ (ড) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নারী সমাজ ও যুব সম্প্রদায় সহ সকল জনসম্পদের সুষ্ঠু ও বাস্তব ভিত্তিক সদ্ব্যবহার করা এবং গঠনতন্ত্রের ২ (ত) অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে, 'বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশী জনগণের ধর্ম ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ দান করে যুগ প্রাচীন মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা।[৪৩] নির্বাচনী ইশতেহার ২০০১ এর ৩.২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক আদর্শ দেশ বাংলাদেশ। বিএনপি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গভীরতর করা, সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমানাধিকার নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করার নীতিতে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাস থেকেই বিএনপি ঘোষণা করেছে যে, সকল ধর্মের মানুষ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং সকল ভয়-ভীতির উর্দ্ধে থেকে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সংবিধানে প্রদত্ত ধর্মীয় অধিকারসহ সকল অধিকার সর্বতোভাবে রক্ষা করা হবে। সব সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হবে।

সংবিধানে সংরক্ষিত সংখ্যালঘুদের অধিকার সমূহ বিএনপি সুরক্ষিত করবে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব গভীরতর করার অব্যাহত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অনগ্রসর পাহাড়ী ও উপজাতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং তাদের জন্য চাকুরি ও শিক্ষাসহ সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখা হবে। তাদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা

৪১। নির্বাচনী ইশতেহার '২০০১, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

৪২। ড. এম.এ. ওদুদ ভূঁইয়া, Cÿ¸³, পৃ.২০৩

৪৩। ঘোষণাপত্র, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া হবে। অনগ্রসর তফসীলী সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক অতীতে প্রদত্ত উপবৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে।

হিন্দু কল্যাণ ট্রাষ্ট, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাষ্ট ও খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাষ্টের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে ও সে লক্ষ্যে এ সব ট্রাষ্টের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান বৃদ্ধি করা হবে।

এডভোকেট কালিদাস বড়াল, সমাজকর্মী আলফ্রেড সরেনসহ নিহত সকল সংখ্যালঘু নেতা হত্যা এবং সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, নারী নির্যাতন, জমিদখল, মন্দির দখল, প্রতিমা ভাঙ্গন ইত্যাদি অপরাধের বিচার করা হবে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অথবা উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।[৪৪]

Bmjvgx ivR‰bwZK ‘jmn Ab¨vb¨ ag I m¤c‘vqwfwËK ‘j

ইসলামী রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক দল ও দলীয় জোটসমূহের লক্ষ্য ও কর্মসূচীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি :

wn›‘ m¤c‘vq wfwËK ‘jmgn

বাংলাদেশে কয়েকটি মাত্র দল যারা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের দাবি দাওয়া তুলে ধরে। সেসব দল ও তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো :

evsjv‡‘k wn›‘ jxM : ১৯৮৪ সনে অবসরপ্রাপ্ত মেজর এ সি দেব এর নেতৃত্বে এ দলের জন্ম। তিনি এ দলের আহবায়ক। এ দলের কর্মসূচীতে রয়েছে মানবাধিকারবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ।

evsjv‡‘k msL¨vjN HK¨d›U : এ দলের আহবায়ক মনোজকুমার মণ্ডল। তিনি মাঝে মাঝে পত্রিকায় বিবৃতি প্রকাশ করেন।

evsjv‡‘k Zdmxjx †dWv‡ikb : এ দলের সভাপতি এ্যাডভোকেট উৎপল চৌধুরী এবং মহাসচিব এ্যাডভোকেট রঘুনাথ সরকার। এ সংগঠনের একটি বিশেষ দাবি হচ্ছে জাতীয় সংসদে তফসীলী সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ১০ ভাগ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

evsjv‡‘k wn›‘ HK¨ d›U : মনীন্দ্রনাথ সরকারের নেতৃত্বে ১৯৮৪ সনে এ দলের জন্ম। তিনি দলের চেয়ারম্যান। হিন্দু সম্প্রদায়ের নানাবিধ সমস্যাকে জাতীয় পরিধিতে জনসাধারণের গোচরে আনার

৪৪। নির্বাচনী ইশতেহার ‘২০০১, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

Dhaka University Institutional Repository

জন্য এ দল গঠন করা হয়েছে। দলীয় নীতি হচ্ছে : গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, অবাধ অর্থনীতি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা।

RvZxq wn›`y cwil` : এ দলের প্রেসিডেন্ট প্রেমরঞ্জন দেব ও সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ দাশ। প্রেমরঞ্জন অতীতে ভাষানী ন্যাপ এবং পরে বিএনপি করতেন। এ দল হিন্দু আইন সংস্কার করতে চায়।

evsjv‡`k wn›`y cwil` : এ দল হিন্দু সম্প্রদায়ের দল। হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবি দাওয়া নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই এ দলের লক্ষ্য।

evsjv‡`k RvZxq wn›`y cwU : ১৯৮৬ সনের ৩১ মার্চে খগেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এ দলের সূত্রপাত। দলের বক্তব্য হচ্ছে : গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘুদের অধিকার, সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ।

বাংলাদেশে ৮০ টির ও বেশি ধর্মবাদী দল ও সংগঠন আছে। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের দলগুলোকে সঠিকভাবে ধর্মপন্থি দল বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে, হিন্দু ধর্মাদর্শ নিয়ে কোন কথা তাদের মেনিফেস্টোতে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন রাজনৈতিক দল নেই।[৪৫] 'বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান' ঐক্য পরিষদ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছে। ঐক্য পরিষদের মূল লক্ষ্য একদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বৈষম্য বঞ্চণার অবসান, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের মুলনীতি অনুযায়ী সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সকল ধর্মের সম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করা।[৪৬]

Bmjvgcwš' `jmgn

বাংলাদেশে ৭৮টি ইসলামপন্থি দল ক্রিয়াশীল। ইসলামপন্থি দলের সংখ্যাই এখানে সবচেয়ে বেশি। এদের প্রত্যেকেরই আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। প্রত্যেক পার্টি কুরআনকে মেনে চলায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এ পর্যায়ে ইসলামপন্থি দল ও দলীয় জোটসমূহের পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪৫। আমজাদ হোসেন, cv¸³, পৃ. ৩০

৪৬। ড. নীম চন্দ্র ভৌমিক, বাসুদেব ধর, mv¤c'wqK ˆelg¨ Kvi ¯v‡_, ঢাকা : ১৯৯৮, পৃ.৩৭

Dhaka University Institutional Repository

Rvgvqv‡Z Bmjvgx evsjv‡‘k :

এ দলের গঠনতন্ত্রের ধারা-৩ এ বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান) কায়েমের সর্বাত্বক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আদর্শ ও লক্ষ্য ।[৪৭]

নির্বাচনী ইশতেহার ২০০১ এর ২১ ও ২২ নং দফায় যথাক্রমে বলা হয়েছে যে, "ইসলাম প্রদত্ত নারীর সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভা ও যোগ্যতানুযায়ী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা, সর্বত্র নারী-নির্যাতন দমণ ও নারীর সার্বিক অধিকার সংরক্ষণ, অসহায় বিধবাসহ দুঃস্থ্য ও আশ্রয়হীন মহিলাদের পুণর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে এবং নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। দেশের অমুসলিম নাগরিকদের জানমাল, ইজ্জতের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং নাগরিক ও আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করা হবে। তফসীলী সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধন এবং অমুসলিম ও উপজাতীয় মর্যাদা রক্ষাসহ শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে" ।[৪৮]

†bRvg-B-Bmjvg cvwU (gbRi) : এডভোকেট মনজুরুল আহসান এ দলের চেয়ারম্যান। এ দলের ঘোষিত নীতি হচ্ছেঃ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌতত্ব, ইসলামী মূল্যবোধ, জনগণের মৌলিক অধিকার, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি।

evsjv‡‘k BmjvwgK cvwU : ফরমান উল্লাহ খানের নেতৃত্বে এ দল গঠিত হয়। ইসলাম এ দলের ঘোষিত মূল আদর্শ। এ দল গণতন্ত্রের কথাও বলে।

evsjv‡‘k †LjvdZ Av‡›‘vjb (Mvddvi) : ১৯৮৬ সনের প্রথম দিকে মাওলানা আব্দুল গাফফারের নেতৃত্বে দলে ভাঙ্গন ঘটে। এ দলের মতে, জিহাদের মাধ্যমেই গণতন্ত্র প্রতিষ্টিত হবে।

evsjv‡‘k AvIqvgx Ijvgv cvwU : দলের প্রেসিডেন্ট খায়রুল ইসলাম যশোরী। ইনি ১৯৭২ সনে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও মুল্যবোধের প্রতিষ্ঠা এ দলের লক্ষ্য। এ দল ইসলামী ইস্যুতে যুক্তফ্রন্ট গড়ার পক্ষপাতী। ১৯৮৪ সনে এ দল ১৬ দলীয় ইসলামী যুক্তফ্রন্টে শরীক হয়।

৪৭। গঠনতন্ত্র, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

৪৮। নির্বাচনী ইশতেহার '২০০১, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

evsjv‡'k AvIqvgx Bmjvgx cwU : ১৯৮৬ সনের ৮ জুলাই এ ধর্মবাদী দলের জন্ম। এ দলের সাংগঠনিক কমিটির আহবায়ক হচ্ছেন মোহাম্মদ শাহজাহান। এ দলের মূল উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ইসলামী মতাদর্শ ভিত্তিক একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এ দল আগ্রহী।

gmwjg RvZxq 'j : ১৯৮৪ সনের ৩ নভেম্বর আইনজীবী এম এ লতিফ মজুমদারের নেতৃত্বে এ দলের সূত্রপাত। এ দল মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল, গণতন্ত্রে বিশ্বাস ও সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা প্রচার করে।

gmwjg RvZxqZvev'x 'j : অধ্যক্ষ সিরাজুল হক গোরা এ দলের সভাপতি। প্রথমে তিনি ন্যাপ করতেন। ১৯৮১ সনের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (প্রগশ) গঠন করেন। পরে এ দলেরই নাম রাখা হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল।

BmjwgK wccjm Ks‡Mm : এডভোকেট শেখ আব্দুল লতিফ এ দলের আহ্বায়ক। এ দল ইসলামী শরিয়ত আইন চালু করার পক্ষপাতী। এ দল ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠনের পক্ষে।

evsjv‡'k BmjvgxK ivR‰bwZK cwU : ১৯৮৩ সনের আগষ্ট মাসে সালাহউদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের জন্ম । এ দল কুরআন ও হাদীসের পক্ষে, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে, শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী এ দল মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কথা প্রচার করে।

RvZxq I‡jgv 'j : এ দলের নেতা মাওলানা রুহুল আমিন। দল ইসলামী রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ দল আধিপত্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরোধী।

evsjv‡'k †jevi cwU (†gvZv‡je) : দলের চেয়ারম্যান ডাঃ আব্দুল মোতালেব সিকদার। ইসলামী আদর্শই দলের আদর্শ বলে তারা প্রচার করেন।

RwgqZ-B-I jvgv-B Bmjvg I †bRvg-B-wmjvg cwU : মাওলানা আব্দুল মালেক হালিমের নেতৃত্বে এ দলদ্বয় 'হুকুমত-ই-এলাহী' অর্থাৎ আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলাম ধর্মীয় বিধান ও ইসলামী আদর্শের দ্বারা দল জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়।

evsjv‡'k RvZxq 'j (û'v) : ১৯৭৬ সনে সৈয়দ সিরাজুল হুদার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এ দল আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। তাদের নীতিসমূহ হচ্ছে: প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার, সার্বভৌমত্ব পার্লামেন্ট, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, সামাজিক নায় বিচার, গণতন্ত্র , বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

evsjv‡‘k RwgqZ-B-Djg-Bmjvgx : মাওলানা শামসুদ্দীন কাশ্মিরীর নেতৃত্বে পরিচালিত এ দল বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিকে পরিণত করার পক্ষপাতী।

Rbkw³ cwU : ১৯৮৪ সনের ২৬ মার্চ আইনবিদ আব্দুল্লাহ আল নাসেরের নেতৃত্বে এ দল গঠিত হয়। ইনি দলের সভাপতি। দলীয় নীতি হচ্ছে : বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অবাধ অর্থনীতি ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা।

Bmjvgx HK¨ Av‡›‘vjb : ১৯৭৬ সনে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের জন্ম। ১৯৮৪ সনের ২৮ নভেম্বর এ দলেরই নাম রাখা হয় ইসলামী ঐক্য আন্দোলন। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী আদর্শই তাদের মূল আদর্শ। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় তারা আগ্রহী।

Bmjvgx msnwZ cwil‘ : ১৯৮৩ সনে প্রতিষ্ঠিত এ দল গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন দলের সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ও মাওলানা মোহাম্মদ শিবলী ফোরকানী। দল ইসলামী সমাজব্যবস্থা গঠনের পক্ষপাতী। এ দল ইসলামপন্থি দলগুলোর ঐক্যের পক্ষপাতী, যে ঐক্যের ভিত্তি হবে ইসলামী ভাবাদর্শ।

evsjv‡‘k Bmjvgx cwU (gv‡jK) : আইনবিদ এম এ মালেক ১৯৭৯ সনের ২৪ এপ্রিল এ দল গঠনে নেতৃত্বে দেন। আইনবিদ আজিজুল্লাহ এ দলের সাধারণ সম্পাদক। এ দল ইসলামী রিপাবলিক গঠনের পক্ষপাতী যা চলবে কুরআন ও হাদীস মোতাবেক।

evsjv‡‘k Bmjvgx cwU (Avkivd) : এ দল ইয়াহুদীবাদ, আধিপত্যবাদ, সামন্তবাদ ও সাম্যবাদ বিরোধী। দলের মতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার।

evsjv‡‘k Bmjvûj gm‡jwgb : আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল বাশার এ দলের নেতা যিনি এজন ধর্মীয় পীর হিসেবে সুপরিচিত ব্যক্তি। দলীয় আদর্শ হচ্ছে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা।

evsjv‡‘k Bmjvgx wecøex cwil‘ : কুরআন ও হাদীসভিত্তিক ইসলামী আদর্শের উপর নির্ভরশীল এ পার্টি একটি ধর্মবাদী রাজনৈতিক দল। অর্থনীতিতে তারা সুদ প্রথা রহিত করার পক্ষপাতী। কৃষির উপর গুরুত্ব প্রদান, ইসলামী আদর্শভিত্তিক শিক্ষা এ দলের কর্মসূচীতে রয়েছে।

dviv‡qRx RvgvqvZ evsjv‡‘k : মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ১৯৮৬ সনের ১৯ মার্চ এ দলের জন্ম। ইসলাম এ দলের আদর্শ। এ দল মুসলিম জাতীয়তাবাদ, অবাধ অর্থনীতি, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের কথা বলে।

evsjv‡‘k Bmjvgx Av‡›‘vjb : দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন যথাক্রমে মেজর (অব:) জয়নাল আবেদীন ও শহীদুল্লাহ সাহিত্য রত্ন। দলীয় নীতি হচ্ছে : পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসি

Dhaka University Institutional Repository

দারুল ইসলাম- অর্থাৎ খাদ্য, কাপড়, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে রাষ্ট্র থেকে। আল্লাহর পূর্ণ সার্বভৌমত্ব, কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা, সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

evsjv‡'k he gmwjg †mvmvBwU : দলের চেয়ারম্যান মেজবাহুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত এ দল গণতন্ত্র ও ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

†fvUvi gRwjk : মূলত এটি নির্বাচনী দল। দলের প্রেসিডেন্ট কে এম কামাল। সাধারণ আইনবিদ দলিল উদ্দীন। দলের প্রেসিডেন্ট ১৯৬৫ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। এ দল ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি গণতন্ত্রবাদী দল। দলীয় নীতি হচ্ছে : কৃষিকে জাতীয়করণ অবাধ অর্থনীতি, শিক্ষার সার্বজনীনতা, ফ্রি চিকিৎসা ব্যবস্থা।

wjev‡ij †W‡gv‡µwUK cwU : ১৯৭৯ সনে এ দলের জন্ম। এ দল ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের বিরোধী, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সমর্থক।

evsjv‡'k ‡jevi cwU (gwZb) : ১৯৭৯ সনের ৬ নভেম্বর মাওলানা আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে এ দলের জন্ম। এ দল 'উমর-ই-সাম্যবাদ' এর প্রচার করে। দল রুশ-ভারত বিরোধী। এ দলের মতে বাংলাদেশ হবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জোট নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। দলীয় নীতি হচ্ছে : গণতন্ত্র, পার্লামেন্টারী পদ্ধতি, মুসলিম জাতীয়তাবাদ ।

evsjv‡'k †jevi cwU (†gv¯Ídv) : মাওলানা আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে পরিচালিত লেবার পার্টির মধ্য থেকে গোলাম মোস্তফা খানের নেতৃত্বে ১৯৮০ সনে এ দলের সূত্রপাত। মোস্তফা খান এ দলের সভাপতি। এ দলের লক্ষ্য হচ্ছে খলিফা উমরের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

evsjv‡'k †gnbZx 'j : ১৯৮৪ সনের ২৫ অক্টোবর গঠিত এ দলের আহবায়ক হচ্ছেন মোহাম্মদ এস্কান্দার আলী। আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে এ দল অন্যায়, নির্যাতন, দারিদ্র, যুদ্ধ ও অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক। এ দলের কর্মনীতিতে রয়েছে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন করা, বিনামূল্যে চিকিৎসা করা, পরিবার প্রতিপালন অনুযায়ী বেতন, গরিব ও নির্যাতিত লোকদের জন্য ভর্তুকি।

evsjv‡'k b¨vkbvj †jevi cwU : দলের প্রেসিডেন্ট ডাঃ শাহাবুদ্দিন আহমদ। বাংলাদেশ লেবার পার্টির ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে এ দলের সূত্রপাত। দলীয় নীতি 'উমর-ই-সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠা, ইসলামী আদর্শ, শোষণমুক্ত সমাজ গঠন, সমাজে সকল শ্রেণির সহ অবস্থানের পক্ষে।

Dhaka University Institutional Repository

evsjv‡‘k †bRvg-B-Bmjvg cwU : ১৯৫২ সালে এ দলের জন্ম। বর্তমানে এ দলের নেতৃত্ব করছেন। আব্দুর রহমান আজাদ। ১৯৮৬ সনে দলের সভাপতি সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসানের মৃত্যু হলে জনাব আজাদ ঐ দলের সভাপতি হন। এ দল দেশে ইসলামী আইন কানুন প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী। দল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের উপর আস্থাশীল ।

evsjv‡‘k †bRvg-B-Bmjvg cwU (e‘icix) : দলের প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল জব্বার বদরপুরী। দল ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের কথা বলে। এ দলের মতে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

evsjv‡‘k †bRvg-B-Bmjvg cwU (Avkivd) : এ দলের প্রেসিডেন্ট মাওলানা আশরাফ। আব্দুর রকিব দলের সাধারণ সম্পাদক। দলীয় নীতি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের বিরোধিতা, পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা, ইসলামী আদর্শ প্রভৃতি।

evsjv‡‘k Rwn÷m cwU : এ দলের প্রেসিডেন্ট মেজর (অব:) আফসার উদ্দিন, কবি শহীদুল্লাহ সাধারণ সম্পাদক। এ দলের মূল নীতি আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। দল ন্যায় বিচার ভিত্তিক শোষণ মুক্ত সমাজের পক্ষে এবং আধিপত্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে।

cMwZkxj MYZwšK kw³ : এ দলের প্রেসিডেন্ট শাহরিয়ার রশিদ খান, সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান। রুশ-ভারত বিরোধী এ দল কাজ, স্বাধীনতা, একতা, অধিকার ও সংগ্রাম এর কথা বলে। তারা মুসলিম বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও কুরআন সুন্নাহভিত্তিক সমাজ গঠনে আগ্রহী।

KIK kwgK cwU (†mvjvqgvb) : কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শেরে বাংলা ফজলুল হক। দলের পাচঁটি মুলনীতি হচ্ছে : ধর্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন, শোষণমুক্ত ও জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষা ও বিশ্বশক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা।

evsjv‡‘k Ijvgv mwgwZ : এ দলের আহবায়ক মাওলানা জামাল উদ্দিন সিরাজী। ১৯৮৫ সনে এ দলের জন্ম বলে জানা যায়। তাদের মতে ইসলাম শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের ধর্ম, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের ধর্ম।

Bmjvgx †LjvdZ cwU (†gvL‡jm) : এ দলের সম্পাদক মোঃ মোখলেসুর রহমান।

Bmjvg †LjvdZ cwU (gvnee) : এ দলের চেয়ারম্যান মাওলানা মাহবুবুল আলম। এ দল ব্যাপক ইসলামী মোর্চার পক্ষে।

Dhaka University Institutional Repository

Rv‡Ki cwU : হযরত শাহ্‌সূফী ফরিদপুরী (মা. জি. আ.) সাহেব ১৯৮১ সনের ১৪ই অক্টোবর জাকের পার্টি প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। আলহাজ্ব মোস্তফা আমির ফসয়ল মোজ্জাদ্দেদী চেয়ারম্যান। জাকের পার্টি কর্মসূচী ও নীতিমালাগুলো হলো : জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও মূল্যবোধ সমুন্নত ও সুরক্ষিত করা, ইসলামের তাসাউফ শিক্ষার প্রভাবে আত্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করা, দেশের বৃহত্তম স্বার্থে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সে গুলো হলো : ইসলামের সূফী আদর্শ, তথা শরিয়ত, তরীকত, হকিকত ও মারেফত প্রচার করা এবং আর্ত মানবতার সেবা করা। বর্তমানে ২৯টি অঙ্গ সংগঠন নিয়ে জাকের পার্টির কর্ম তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

Bmjvgx HK¨‡RvU : মাওলানা শায়খুল হাদিস আজিজুল হক দলীয় চেয়ারম্যান। ১৯৯০ সালে ইসলামী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে খেলাফতে রাশেদার আদর্শে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলা।

Bmjvgx kvmbZš¿ Av‡›`vjb : এ আন্দোলনের আমীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম (পীর সাহেব চরমোনাই)। ১৯৯৭ সনের ১৩ই মার্চ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমের উত্তর গেটে এ সমাবেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কর্মসূচী এবং দৃষ্টিভঙ্গি (পলিসি) জাতির কাছে পেশ করে জাতীয়ভাবে কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ দলের নীতিমালার ধারা- ৭ ও ৯ এ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা ও ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।[৪৯]

বর্তমানে বাংলাদেশে কয়েকটি ইসলামপন্থি জোটের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এ জোটগুলো হচ্ছে-সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ, ইসলামী ফ্রন্ট, ইসলামী যুক্তফ্রন্ট (জালালাবাদী) ও ইসলামী যুক্তফ্রন্ট (সোলায়মান)।[৫০]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক দল ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছেন। দেশের ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোও এ ক্ষেত্রে দলীয় ইশতেহার, ঘোষণাপত্র ও নীতিমালার উল্লেখ্যযোগ্য

৪৯। আমজাদ হোসেন, cÖv¸³, পৃ.৩৭-৩৮
৫০। cÖv¸³, পৃ.৬২

Dhaka University Institutional Repository

ধারা সমূহ সংযোজন করেছেন। তবে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম কায়েমকে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা দিলেও এদেশে জামায়াত ইসলামী ছাড়া আরও ৭৮টি ইসলামী দল রয়েছে। এ সকল দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সংগঠন হলো জামায়াতে ইসলামী।[৫১] তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, সকল দলই তাদের দলীয় নীতিমালা, ঘোষণাপত্র ও ইশতেহার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও নিশ্চিতকরণ, ইসলামী নীতিমালার আলোকে নারীদেরকে পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতনসহ নারী সমাজের সকল প্রকার অবমাননার অবসান ঘটানো এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলিক মানবিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ উল্লেখ করেছেন। একই সাথে এ দলগুলো তাদের গঠণতন্ত্র মোতাবেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাও অব্যাহত রেখেছেন।

অতএব বলা যায়, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। এখানে সন্ত্রাসীদের হামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উভয়ই আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে দল-মত, ধর্ম-বর্ণ কোন বিষয় নয়। সন্ত্রাসীর কোন দল নেই, তারা দল বদলায়, ক্ষমতায় কাছাকাছি থাকতে চায়। এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে ও পরে যে সহিংসতা হয়, তাতে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন।[৫২] বিভিন্ন স্থানে সাধারণ নির্বাচন শেষ হবার পরে বিচ্ছিন্ন কিছু রাজনৈতিক গোলোযোগ ঘটলেও তার সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের কোন যোগসূত্র নেই।[৫৩] এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের হাজার বছরের গর্বিত ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতম হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। বহির্বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশকে 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি' বলে অভিহিত করেছেন বাংলাদেশ সফরকালে।

৫১। আলী রীয়াজ (সম্পাদনা), mv¤cÖ`vwqKZv I tgŠjev`, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৫, পৃ.৪২

৫২| ˆ`wbK msMÖvg, ৭ই অক্টোবর ২০০১

৫৩। ˆ`wbK BbwKjve, ১৬ই অক্টোবর ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡”Q`

evsjv‡`‡k we`¨gvb mv¤úª`vwqK m¤úªxwZi eZ©gvb wPÎ

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ উদঘাটনে আলোচ্য গবেষণায় এদেশের মানুষের সার্বিক জীবনাচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে নিগূঢ়ভাবে।

বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামো পর্যলোচনা করলে একথা সুস্পষ্টই অনুমিত হয় যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই এখানকার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। সংঘাতমূলক পরিচয় বাংলাদেশের প্রকৃত পরিচয় নয়। ড. আবদুল মমিন চৌধুরীর ভাষায়-

"এ চিরন্তন রূপকে ধরে নিয়েই আমি বর্তমান গ্রামীণ বাংলার জনজীবনে একটা মুখ্য বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেব। গ্রামীণ জনজীবনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। সাম্প্রদায়িক বিভেদ আধুনিক রাজনীতির-হাতিয়ার, নি:সন্দেহে নগরবাসী উচ্চ শ্রেণির দৃষ্টি নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে গ্রাম-বাংলায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ কখনও পরিদৃষ্ট হয়েছে বলে জানা নেই। আজও গ্রাম-বাংলায় হিন্দু মুসলিমরা সহযোগিতা ও সম্প্রীতিতে বসবাস করছে"।[৫৪]

কোন সমাজের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে সর্বপ্রথম ঐ সমাজের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান ও নীতিমালাসমূহের বিশ্লেষণ জরুরী। বিশেষত বর্তমানের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বায়নের প্রভাবে সমস্ত রাষ্ট্রই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। মানবাধিকারের রক্ষায় বিশ্ব বিবেক উচ্চকিত ও সচেতন মহল আজ বিচলিত। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনায় ও দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় যথাযথ আদর্শের অনুপস্থিতি গোটা বিশ্বেই একটি রাষ্ট্রকে ব্যর্থ, অকার্যকর ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমাজের প্রভাবক উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ ও মাত্রা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আইনগতদিক বিবেচনায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রধান নীতিমালা হলো এ দেশের 'সংবিধান'। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হতে কার্যকর হওয়া এ সংবিধান এ দেশের সর্বোচ্চ দলিল। আন্তঃধর্মীয় ও ধর্মীয় বৈষম্যের ক্ষেত্রে এতে ছিল সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।[৫৫] বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় বৈষম্য বা নির্যাতনের কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং এ সম্পর্কে সংবিধানে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে যে- 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের

৫৪। ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, cÖv¸³, পৃ.৯০
৫৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, প্রস্তাবনা, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী’।[৫৬] সংবিধানের এ অনুচ্ছেদে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। এ মুলনীতি অনুসারে বাংলাদেশে প্রচলিত সব আইন বাংলাদেশের সকল ধর্মের নাগরিকদের জন্যই প্রযোজ্য হবে। বিশেষ করে প্রচলিত ফৌজদারী আদালতের মামলায় ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলেই সমান মর্যাদা ভোগ করবেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সৃষ্ট ধর্মের মূলনীতি অনুযায়ী বিশেষ আইনের সুবিধা ভোগ করবেন। মুসলিমদের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মুসলিম আইন ১৯০৮ ও মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ এর অন্তর্ভুক্ত হবে তা হলো বিবাহ, তালাক, ওয়াকফ, মীরাস, অভিভাবকত্ব, উইল, হেবা, শুফ’আ ইত্যাদি। আর হিন্দুদের বিশেষ ধর্মীয় আইন হিন্দু আইন ১৯০৮ মোতাবেক যে সব বিষয় বাংলাদেশের আদালতে বিচারাধীন হবে সেগুলো হলো উত্তরাধিকার, বিবাহ, ভরণপোষণ, দত্তক গ্রহণ, বিধবা সম্পত্তি, উইল, নারী সম্পত্তি, প্রত্যার্পণ সম্পত্তি, দায়ভার আইন ইত্যাদি। বিধবা পুনঃবিবাহ আইন ১৫, ১৮৫৬; হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত আইন এ্যাক্ট ১৮, ১৯৩৭ (পরবর্তীতে সংশোধিত ১৯৩৮) ইত্যাদি ও বিশেষ ধর্মীয় আইন হিসেবে বাংলাদেশে প্রচলিত।[৫৭]

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত হয়েছে রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[৫৮] আলোচ্য ক্ষেত্রে জাতি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে একই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসেবে গৃহীত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত অন্য স্থানে বলা হয়েছে, “কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হলেও তাকে অন্য কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশ গ্রহণ বা যোগদান করতে হবে না”।[৫৯]

বস্তুত সংবিধান বর্ণিত এসব নীতিমালার উপরেই বাংলাদেশের শিক্ষানীতি নির্ভরশীল। আজ পর্যন্ত প্রণীত শিক্ষানীতির কোনটিতেই ধর্মীয় কারণে বৈষম্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ শিক্ষার দ্বারা নিজ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে ও উন্নততর নৈতিকতার চর্চা করবে এটাই মূলত এ আইনের উদ্দেশ্য।

৫৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, অনুচ্ছেদ ২৭, পৃ.৮

৫৭। মোঃ আব্দুল হালিম, evsjv‡`‡ki AvBb e¨e¯'v, সিসিবি ফাউণ্ডেশন,ঢাকা : ২০০৫, পৃ.২৫

৫৮। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ১৭ ক.অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, পৃ.৫

৫৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৪১ (২), পৃ.১২

অবশ্য বাংলাদেশে ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী বা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে এবং তা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থা নেই। এর প্রধান কারণ হলো মুসলিম জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্যতা ও ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও প্রচারের ক্ষেত্রে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা। অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে এ আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা নেই তা না বললেও একথা বলা চলে যে তাদের সংখ্যাল্পতার কারণে এগুলো স্বতন্ত্র শিক্ষা মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে বেসরকারি উদ্যোগে এরূপ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বাংলাদেশে রয়েছে।

মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যকার সম্প্রীতির ছোঁয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। বিশেষত পেশাগত ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোনরূপ বৈষম্য নেই। সংবিধানে বলা আছে,"আইনের দ্বারা আরোপিত বাঁধা নিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যক নাগরিকের যেকোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইন সঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকবে"।[৬০]

এ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রশাসন চাকুরির নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ তে চাকুরি ক্ষেত্রে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে- বাংলাদেশের ২৯ নং অনুচ্ছেদের ৩ উপঅনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে এ বিধিমালার সিডিউল-২ এর বিধান মোতাবেক চাকুরিতে নিয়োগ হবে।[৬১] উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

১। প্রজাতন্ত্রের কার্য নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

২। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী, পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সে ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৩। এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-

ক) নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন। সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হবে।

খ) কোন ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হবে।

৬০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৪০, পৃ.১২
৬১। মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, PvKixi wewagvjv, রোদ্দুর প্রকাশনী , ২৬ তম সংস্করণ, ঢাকা : ২০০৩, পৃ.১৭৬

গ) যে শ্রেণির কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয় সেরূপ যে কোন শ্রেণির নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।[৬২]

এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠি, বিশেষ করে উপজাতীয়দের জন্য সরকারি বিধিমালার ০৫ (পাঁচ শতাংশ) কোটা পদ্ধতিরও বিধান বর্তমান।[৬৩] এছাড়া চাকুরিকালীন ছুটি ভোগ, উৎসব ভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অমুসলিমগণ মুসলিমদের সমান অধিকার ভোগ করে থাকেন।[৬৪]

agxq wel‡q evsjv‡`‡ki msweav‡bi †NvlYv n‡jv :

আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে-

(i)প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে।[৬৫]

(ii) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে।[৬৬]

মূলত বাংলাদেশে স্বাধীন ধর্ম পালন, উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজন, ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান ও প্রচার আনুষ্ঠানিক রচনা ইত্যাদি বেশ ভালভাবেই গৃহীত হয়। আইনগতভাবেতো নয়ই, ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় দেখা যায় না। বরং আন্তঃধর্মীয় সাহায্য-সহযোগিতার চিত্রও এদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে সুখ্যাত। স্বাধীনতার পর হতে আজ পর্যন্ত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাঁধা দেয়া হয়নি। এরূপ সম্প্রীতির নজির পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে দাবীকারী ভারতেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়াও মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের আইনগত সমতা বিদ্যমান। কোন সম্প্রদায়কেই এক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়নি। জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভ, চলাফেরা-সভা সমাবেশের স্বাধীনতা, চিন্তা বিবেক ও বাক স্বাধীনতা, সম্পত্তি-গৃহ ও যোগাযোগের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ের কোনটিতেই ধর্মীয় বৈষম্যের সুযোগ নেই।[৬৭] উপরন্তু সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে-

---

৬২। MYcRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweavb, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, অনুচ্ছেদ ২৯, পৃ.৮
৬৩। মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, cÖv¸³, পৃ.২১৩
৬৪। cÖv¸³, পৃ.৭৬
৬৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রথমভাগ, প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রধর্ম, অনুচ্ছেদ ২(ক), পৃ.২
৬৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৪১ (১), পৃ.১২
৬৭। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, অনুচ্ছেদ ২৭,৩১,৩২,৩৬,৩৭,৩৮,৩৯,৪২,৪৩ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮-১২

১. কোন ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না।

২. রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

৩. কোন ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনরূপ অক্ষমতা বাধ্যবাধকতা, বাঁধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

৪. নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।[৬৮]

বাংলাদেশে প্রচলিত আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ভিত্তি মুলত এগুলোই। কোনরূপ বৈষম্যের অনুপস্থিতি এ নীতিমালাকে করেছে সার্বজনীন। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনায় যত সংঘর্ষ, দাঙ্গা কিংবা সংঘাতের ঘটনা দেখা যায় কার্ল মার্কসের মতে তা মূলত শ্রেণি সংঘাতের ইতিহাস। আর এর জন্ম হয় বৈষম্য থেকেই। সুতরাং বৈষম্যের অনুপস্থিতি ও সমান সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসেও তা-ই লক্ষণীয়। বর্ণ প্রথার কারণে প্রাচীন বাংলায় যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তা এদেশের ধর্ম ও সমাজ জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ফলে ইসলামের সাম্য ও সমতার বাণী খুব সহজেই গ্রহণীয় হয়ে উঠে। সামাজিক অশান্তির পরিবর্তে সূচীত হয় শান্তির যুগ। এ হিসেবে বাংলাদেশের ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠি নির্বিশেষে সমতা ও সাম্যের আইনগত ভিত্তি এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহণশীলতার অন্যতম নিদর্শন। বৈষম্যের বিপরীতে পারস্পরিক সুমধুর ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক মূলত এদেশের বিধানগত সফলতাই প্রকাশ করে।[৬৯]
এদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে গুলোর স্বরূপ ও কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে নির্যাতনের মূল কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় নয়। বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এসব নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।[৭০]
কেননা ধর্মপ্রাণতার পাশাপাশি উদারতা ও সহণশীলতার মানষিকতা বাঙ্গালী সমাজের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। হাসান ফেরদৌস বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ‘সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়ণের কিছু তথ্য’ শীর্ষক দু‘খণ্ডের তালিকায় এ কথা খুবই স্পষ্ট হয়ে

৬৮। cÖv¸³, অনুচ্ছেদ, ২৮
৬৯| ˆ`wbK B‡Ëdv K, ১৬ মার্চ, ঢাকা : ১৯৮৬
৭০। হাসান মোহাম্মদ, cÖv¸³, পৃ.৫৮

Dhaka University Institutional Repository

ওঠে যে, বৈষম্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রসমূহ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত”।[৭১] সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কারণ অনুসন্ধানে তুষার রায় লিখেন "Apart from the political gain, those miscreants are making personal gains by taking forceful and illegal possessional of the properties belong to Hindus".[72]

সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও দাঙ্গার বিষয়টি নিয়ে অপপ্রচারও চালানো হয়। উপমা হিসেবে ২০০২ সালের ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ এর 'Beware of Bangladesh' শীর্ষক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখক Bertil Lintner এ রিপোর্টে বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদ ও উগ্র মৌলবাদীদের স্বর্গভূমি, মৌলবাদীদের জন্য হয় সরকারের উদাসীনতা, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, রাজনৈতিক দলসমূহের ধর্মপ্রিয়তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নেতিবাচক রিপোর্ট পেশ করে।[৭৩] এ রিপোর্টের ভিত্তিহীনতার স্বীকারোক্তিও দেন একজন বিদেশী সাংবাদিক। আমেরিকান প্রথিতযশা সাংবাদিক আরনণ্ড জেটলিন 'The Direction of News reporting and professionalism in News Media' শীর্ষক সেমিনার উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন। তার এ আগমন প্রসঙ্গে তিনি বলেন- বাংলাদেশে আসার আগে ফার ইস্টার্ন ইকোনমিকস রিভিউ'র বহুল আলোচিত সেই রিপোর্টার বার্টিল লিন্টনারের সাথে ঘটনাচক্রে আমার দেখা ও কথা হয়।

আমি বাংলাদেশে যাচ্ছি শুনে তিনি আমাকে এখানে আসতে নিষেধ করে বলেন, যেওনা, বাংলাদেশে গেলেই তুমি বিপদে পড়বে। বাংলাদেশে এসে তো কোনও সমস্যা দেখছিনা। দেখছিনা ধর্মান্ধদের কোন উৎপাতও। গণতন্ত্র চর্চায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৭৪] তিনি আরো বলেন, "এদেশের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অপপ্রচার এ দেশের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি মুসলিম হওয়ার পরও হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানসহ অন্য ধর্মাবলম্বীরা শান্তিতে বসবাস করছে। এ সম্প্রীতির নজির বাংলাদেশের প্রতি বেশি দেশগুলোতে নেই"।[৭৫]

৭১। জালাল ফেরদৌস, cÖ¸³, পৃ.২৭২

৭২। Tusher roy, *Father of the (Hindu) Minorities in Bangladesh*, Dhaka: 2009, P.2

৭৩। Bertil Lintner," Bangladesh: A coommon of terrorism," *Far Estern Economic Reviews* 7th April , Hong kong : 2002,P. 02

৭৪| ˆ'wbK gvbeRwgb, ২৮ ফেব্রয়ারী , ঢাকা : ২০০৩, পৃ . ১ ও ১১

৭৫। আরনন্ড জেটলিন, 'অপপ্রচার বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিবে', ˆ'wbK BbwKjve, ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩, পৃ.৮

বস্তুত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণই বেশি দেখা যায়। এখানে সাম্প্রদায়িক শক্তি, উগ্র মৌলবাদ, কিংবা ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদের কোনরূপ স্থান নেই। বাংলাদেশ নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি এন পিটার্স বলেন, বাংলাদেশকে কোনভাবেই কট্টর জঙ্গি মুসলমানদের আখড়া বলা যায় না। তার মতে, বাংলাদেশ সরকার সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের দৃঢ় সমর্থক।[৭৬] আরেক সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারী কে টমাস বলেন, "People of various faith are liking in Bangladesh maintaining communal harmony and mutual respect-Bangladesh is a democratic country and its communal harmony is appreciable."[৭৭]

এদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পূজা উন্নয়ন পরিষদ এর উপদেষ্টা মেজর জেনারেল সি আর দত্ত বীরউত্তম বলেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজামণ্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নতিরই প্রমাণ। উল্লেখ্য যে, তিনি ২০০৭ সালে বাংলাদেশে মোট ২২০০০ পূজামণ্ডপ (এর মধ্যে ১৩৫টি ঢাকা শহরে) দেখে এ মন্তব্য করেন।[৭৮] বাংলাদেশের বাস্তবতা এটাই। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের যেসব খবর প্রচারিত হয় তা ধর্মীয় কারণে নয় মোটেও। মাহবুব উল্লাহ লিখেন, "দেশের কোথাও নির্বাচনোত্তর পরিবেশে রাজনৈতিক বিরোধ ও অতীতের স্বার্থ সংঘাতকে কেন্দ্র করে কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত যদি ঘটনাচক্রে দু'ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের মাঝে ঘটে থাকে, তাহলে সে সব ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ না দিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। আমাদের পরম দূর্ভাগ্য যে রাজনৈতিক সংঘাতের বিছিন্ন ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক সংঘাত হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চলছে"।[৭৯] বাংলাদেশের অন্যতম বর্ষীয়ান নেতা শ্রী সুনীল গুপ্তও এসব ঘটনার কারণ পর্যবেক্ষণে বলেন, এসব ঘটনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নেই।[৮০] বর্তমান বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরতে আলোচ্য স্থানে কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করা হলো। যা দ্বারা এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৭৬। মেরি এন পিটাস, "বাংলাদেশ কোনভাবেই জঙ্গি মুসলমানদের আখড়া নয়," ˆ`wbK c_g Av‡jv, ২১ অক্টোবর, ঢাকা : ২০০২

৭৭। H.K. Thomas, *'Communal Harmony, United News of Bangladesh: Hindu Leader', http://newshopper.sulekha.com*

৭৮। Religious harmony improves in Bangladesh: Hindu Leader, *http://newshopper.sulekha.com*

৭৯। মাহবুব উল্লাহ, †h K_v ej‡Z †P‡qwQ mivmwi, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা : ২০০৫, পৃ.১৯

৮০। মাহবুব উল্লাহ, cv¸³, পৃ.১৯

Dhaka University Institutional Repository

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন, "পারস্পরিক আদান প্রদানের এ প্রক্রিয়ার প্রভাব এমন গভীর যে, আজও মুসলমানদের মসজিদ বা পীর বাবার দরগাকে হিন্দুরা দ্বিধাহীন চিত্তে নিজেদের পবিত্র স্থানের মর্যাদা দেয় এবং সেসব স্থানে তীর্থযাত্রায় যায়। একইভাবে মুসলমানরাও নির্দ্বিধায় হিন্দুদের পূজার্চনায় বা সামাজিক উৎসবে যোগদান করে"।[৮১]

সৈয়দ আমীরুল ইসলাম বলেন,

"আমরা, মুসলমান হিসেবে পরিচিতরা, জলকে পানি বলতাম, এখনো বলি, আর হিন্দু পরিচিতরা পানিকে জল বলতো, এখনো বলে অন্তত আমি আশেপাশে যতজনকে দেখেছি তাদের বেলায় মোটামুটি একথা সত্য। অবশ্য হাল আমলে বহু অমুসলিম কেবল হিন্দু নয়, জলকে মুসলমানদের সঙ্গে পানি বলে, আস্‌সালামু আলাইকুম দেয়, অগ্রজতুল্য কর্তাকে ভাই বা আপা বলে, কিন্তু গৃহে বা সমধর্মীদের সঙ্গে হয়ত জল, নমস্কার, দাদা-দিদি বলে, যেমনটা আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে, আমরা বা আমাদের পূর্বসূরিরা অমুসলিমদের আদাব দিতাম, দাদা-দিদি বলতাম"।[৮২]

ড. সুকোমল বড়ুয়া বলেন, "বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে একটি বহুমাত্রিকতার দেশ যেখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠির বসবাস এ মাটিতে সু-প্রাচীনকাল থেকেই। আমরা পারস্পরিক সুখে-দুঃখে, এবং আনন্দ বেদনায় একে অপরের সঙ্গে অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে আসছি"।[৮৩]

ড. ফাদার তপন ডি রোজারিও এর ভাষায়- "বাংলাদেশের ধর্মাপরায়নতা ও অসাম্প্রদায়িকতার রূপ হলো-অধিকাংশ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস এবং নিজ নিজ ধর্মচর্চা, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অসাম্প্রদায়িক ও সহণশীল মনোভাব। তিনি অবশ্য আরো একটি রূপ তুলে ধরেছেন যথা এক শ্রেণির লোকের ধর্মান্ধতা ও কট্টরবাদিতা; ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ও অসহণশীলতা"।[৮৪] নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক এরূপই পরমত সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা, সুখে-দুঃখে একাত্ম ও সর্বোপরি বন্ধুসলভ আচরণ দ্বারাই আবর্তিত হয়। যার প্রেক্ষিতে দেখা যায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এদেশে সাম্প্রদায়িক

৮১। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, fviZel I Bmjvg, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা : ২০০৫, পৃ .১৯

৮২। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, cÖv¸³, পৃ.২৮৮

৮৩। অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, বাংলাদেশে শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা এবং কতিপয় সুপারিশ, Inter Faith Relation National & Regional Perspective, *Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT)*,Dhaka: 2008, P.70

৮৪। ড. ফাদার তপন ডি. রোজারিও, cÖv¸³, পৃ.৮২

Dhaka University Institutional Repository

সংঘর্ষের কোন ঘটনা ঘটেনি। ছোট খাট বিচ্ছিন্ন যে সব সংঘাত ও নির্যাতন তা নিতান্তই ব্যতিক্রম। যা এদেশীয় মানুষের মন-মানষ ও চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। এককথায়, জনসংখ্যার এত আধিক্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে পরিবেশ এখানে বিরাজমান তা সত্যিই বিস্ময়কর।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বলেন, 'এদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ।' শিশুদের পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। এক্ষেত্রে কাজ করার জন্য শিশু-কিশোর সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "হাজার বছর ধরে এ ভূখণ্ডে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মের জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সুমহান ঐতিহ্য। মূল্যবান এ ঐতিহ্যকে লালন করতে শিশু-কিশোরদের মাঝে শৈশব থেকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনার বীজ বুণতে হবে যাতে করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, দেশপ্রেম ও ভালোবাসা গড়ে ওঠে"।[৮৫]

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য দেন রাষ্ট্রপতি। কাজেই বলা যায়, ইসলাম শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। কোনরূপ সহিংসতা, বিবাদ-বিসংবাদের স্থান ইসলামে নেই। ন্যূনতম শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এমন আচরণকেও ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না। অমুসলিমদের প্রতিও কোন অন্যায় আচরণ ইসলাম অনুমোদন করে না। শান্তি-সৌহার্দ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় ইসলামের রয়েছে শাশ্বত আদর্শ ও সুমহান ঐতিহ্য। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিটি আচরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল ও প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক অমুসলিম বৃদ্ধার ঘটনা ইতিহাসে আমরা জেনেছি। সে বৃদ্ধা প্রতিদিন মহানবী (সা.)-এর চলার পথে কাঁটা দিত। একদিন রাসূল (সা.) দেখলেন, পথে কাঁটা নেই, তখন তিনি ভাবলেন, হয়ত ওই বৃদ্ধা অসুস্থ্য হয়েছে বা কোন বিপদে আছে, তার খোঁজ নেয়া দরকার। এরপর দয়ার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওই বৃদ্ধার বাড়িতে পৌঁছে দেখেন ঠিকই সে অসুস্থ্য। তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। এতে বৃদ্ধা অভিভূত হয়ে গেল যে, আমি যাকে কষ্ট দেয়ার জন্য পথে কাঁটা পুঁতে রাখতাম, সে-ই- আজ আমার বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। ইনিই-তো সত্যিকার

85| *Http//: www.kalerkontho.com*

Dhaka University Institutional Repository

অর্থে শান্তি ও মানবতার অগ্রদূত। অতঃপর রাসূল (সা.)-এর এমন উদারতা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করলে কুরায়শদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মহানবী (সা.) বিজিত শত্রুদের প্রতি কোন ধরণের দুর্ব্যবহার করেননি এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ প্রতিশোধ স্পৃহাও প্রকাশ করেননি, বরং দুশমনদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। প্রতিশোধের পরিবর্তে শত্রুদের প্রতি মহানবী (সা.) এর ক্ষমতা ও মহানুভবতার এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের চিরন্তন আদর্শের জানান দেয়। পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম বিনিময়ের যে বিধান ইসলামে রয়েছে তাও সম্প্রীতির বন্ধন সুসংহতকরণের উজ্জ্বল প্রয়াস। 'সালাম' অর্থ শান্তি। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে মূলত একে অপরের শান্তিই কামনা করেন। এতে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচিত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলাম এতই সোচ্চার যে, রাসূল (সা.) নিজেদের জানমালের পাশাপাশি সংখ্যালঘু অমুসলিম সম্প্রদায়ের জানমাল রক্ষায় সচেষ্ট থাকার জন্যও মুসলমানদের প্রতি জোরতাগিদ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অন্য ধর্মাবলম্বী ও তাদের উপাসনালয়ের ওপর আঘাত-সহিংসতাও ইসলামে জায়েয নেই। সহিংসতা তো দূরের কথা অন্য ধর্মকে কটূক্তিও না করার জন্য কুরআন মজিদে আলাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন।

বিগত অক্টোবর, ২০১২ রামুতে উত্তম বড়ুয়া নামক যুবক কর্তৃক ফেসবুকে পবিত্র কুরআন অবমাননার জের ধরে রামুসহ বিভিন্নস্থানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ও বসতিতে যে সহিংসতা ঘটেছে তা ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শের চরম পরিপন্থি। তথাপি এ সহিংসতা এতদঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরায়ত ঐতিহ্যের ওপর নির্মম আঘাত। কারণ ইতিহাস সমৃদ্ধ জনপদ কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে সমাদৃত। এখানকার মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনভাবে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছে। আবহমানকাল ধরে পালন করছে স্ব-স্ব ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার ও আচার-অনুষ্ঠান। মুসলিমদের রামু কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কেন্দ্রীয় কালি মন্দির, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় সীমা বিহার নিকট দূরত্বে অবস্থিত। এছাড়াও পুরো উপজেলা জুড়ে বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও বৌদ্ধবিহার কাছাকাছি অবস্থিত। তা সত্ত্বেও এখানে অতীতে কোন দিন ক্ষুদ্রতর সহিংসতাও ঘটেনি। এমতাবস্থায়, পবিত্র কুরআন অবমাননা এবং বৌদ্ধ পল্লীতে সহিংসতার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর বয়ে যাওয়া স্মরণকালের ভয়াবহ বর্বরতায় বিবেকবান ও ধর্মপ্রাণ মানুষ মাত্রই মর্মাহত। ইসলাম এ ধরণের হামলা, জ্বালাও-পোড়াও সর্বোপরি অশান্তি সৃষ্টিকারী সকল তৎপরতার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোর বিরোধী। এ নৃশংসতা ও বর্বরতার সাথে হক্কানী আলেম সমাজ ও ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের দূরতম সম্পর্কও নেই। রাসূল (সা.)-এর ওয়ারিশ হিসেবে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম নিজেদের জানমালের মতো ভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের অধিকার ও জানমালের নিরাপত্তাকেও জরুরি মনে করেন। ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যুগ যুগ ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবতার সুমহান শিক্ষা দান করে চলেছে। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আলেম সমাজের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাসূল (সা.) ও সাহাবা যুগেও ইসলাম বিদ্বেষীরা পবিত্র কুরআন-হাদীসের অবমাননা করেছিল। এমনকি তারা মহানবী (সা.) কেও অপমাণিত, অপদস্ত করেছিল। কিন্তু এ ঘৃণ্য আচরণের প্রতিবাদে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও বসতিতে হামলার কোন নজির নেই। কারণ সংঘাত-সহিংসতা কোনক্রমেই প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না। তাই দেশের শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী নেতৃবৃন্দ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এ সহিংসতার নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন, শাস্তি দাবি করেছেন প্রকৃত দোষীদের। রামু কক্সবাজারের ওলামায়ে কেরামও ঘটনাটির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপনপূর্বক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরে সংবাদপত্রে বিবৃতি, জুমার নামাযপূর্ব ওয়াজ ও বিভিন্ন সভা-মজলিসে বক্তব্য প্রদান করেছেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ, হাটহাজারী জামিয়া আহলিয়া মঈনুল ইসলামিয়ার মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ কওমী মাদ্ররাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)-এর চেয়ারম্যান আলামা শাহ আহমদ শফি (দা. বা.) বলেন, অন্য ধর্মের অনুসারীদের ওপর আক্রমণ ইসলামের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থি। তিনি রামুতে কুরআন অবমাননার ঘটনা এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তপূর্বক প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবি জানান। সে সাথে তিনি এ ঘৃণ্য ঘটনায় নিরীহ আলেম-ওলামাকে হয়রানি না করারও আহবান জানান।[৮৬] মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (দা. বা.) বলেন, এর আগেও ইসলাম অবমাননার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এভাবে বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়নি। কারণ ইসলাম এ ধরণের হামলা-ভাংচুর ও পোড়ানোর ঘটনা সমর্থন করে না। ইসলাম শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে সমর্থন করে।[৮৭]

প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক, চট্টগ্রাম জামিয়া দারুল মা'আরিফের পরিচালক, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (ইত্তাহাদুল মাদারিস্) এর ভাইস চেয়ারম্যান আলামা সুলতান নদভী (দা. বা.) বলেছেন, রামুতে ফেসবুকে কুরআন অবমাননাকারীরা যেমন অপরাধী, যারা বৌদ্ধ মন্দির ও পল্লীতে ভাংচুর

৮৬। ˆ'wbK Avgvi †'k, ৫ অক্টোবর, ২০১২ ও ˆ'wbK ˆmKZ, ৯ অক্টোবর, ২০১২
৮৭| ˆ'wbK bqw'Mš Í, ২ অক্টোবর, ২০১২

করেছে তারাও অপরাধী। ঐ দুই অপরাধের সাথে যারাই জড়িত তিনি তাদের শাস্তির দাবি করেন। অহেতুক কোন মানুষ যাতে হয়রানির শিকার না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকার জন্য সরকারের সংশি-ষ্ট সবাইকে তিনি পরামর্শ দেন।[৮৮] মাসিক আত-তাওহীদ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম ওমর গণি এম ই এস কলেজের অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন বলেছেন, কোন ধর্মকে কটাক্ষ, অপমান ও ব্যঙ্গ করা ইসলাম অনুমোদন করে না। মূর্তি ও প্রতিমা ভাংচুর করা তো দূরের কথা তাদের গালি ও কটাক্ষ না করার জন্য মহান আলাহর হুকুম রয়েছে।[৮৯] কক্সবাজার জেলা ইসলামী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ এ সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে বলেন, আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুমহান ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে। উত্তেজনা, উস্কানি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে বা যারা এ ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চায় তারা দেশ ও জাতির শত্রু, তারা ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়। নেতৃবৃন্দ ঘটনার নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত তদন্ত করে জড়িত অপরাধী ও নেপথ্যে উস্কানি দাতাদের খোঁজে বের করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান।[৯০] অপর এক বিবৃতিতে কক্সবাজারের বিশিষ্ট আলেমগণ ও কওমী মাদরাসা প্রতিনিধিবৃন্দ রামুর বৌদ্ধ পল্লীতে হামলাকে চরম নৃশংসতা উল্লেখ করে বলেন, দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন কোন লোক এরকম ঘৃন্য কাজে জড়িত হতে পারে না। তারা বলেন, আমরা চাই রামুর বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য দায়ী পবিত্র কুরআন অবমাননাকারী বৌদ্ধ যুবক ও তার ইন্ধনদাতা এবং সহিংসতায় জড়িত অপরাধীদের শাস্তি হোক। ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হোক সেটি কেউ চায় না।[৯১]

আক্রান্ত বৌদ্ধ সমাজের দাবিও তা-ই। বৌদ্ধ ধর্ম তত্ত্ববিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া বলেছেন, যারা এ জঘণ্য কাজ করেছে তারা মুসলমান নয়, হিন্দু নয়, খ্রিস্টান নয় তাদের একটাই পরিচয় তারা দুর্বৃত্ত ; তারা মানুষ ও মানবতার শত্রু। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য বজায় রাখার স্বার্থেই এ অপরাধীদের বিচার হওয়া উচিত। বিচার হওয়া উচিত সেই উত্তম বড়ুয়ারও যার উস্কানি থেকেই ঘটনার শিকারে পরিণত হয়েছে নিরপরাধ মানুষ।[৯২] আগুনে দগ্ধ রামু কেন্দ্রীয় সীমা বিহারের সহকারী পরিচালক প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু বলেন, আমরা চাই নিরীহ, নিরপরাধ ব্যক্তিকে হয়রানি না করে দলমতের ঊর্ধ্বে থেকে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত পূর্বক প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা হউক। সুষ্ঠু তদন্তে প্রমাণিত হওয়া ছাড়া

৮৮। ^‘wbK BbwKjve I ^‘wbK wngQwo, ৭ অক্টোবর, ২০১২
৮৯। ^‘wbK Avgvi †‘k, ১৯ অক্টোবর, ২০১২
৯০। ‰‘wbK AvR‡Ki K·evRvi evbx I ^‘wbK evKLvjx, ২ অক্টোবর, ২০১২
৯১| ^‘wbK ^‘bw›‘b, ৮ অক্টোবর, ২০১২
৯২। ^‘wbK Avgvi †‘k, ৭ অক্টোবর, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

কাউকে দোষারোপ করলে ঘটনার প্রকৃত রহস্য চাপা পড়ে থাকবে এবং মূল অপরাধীরা পার পেয়ে যাবে বলে তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমরা মনে করি কুরআন অবমাননা অবশ্যই নিন্দনীয় একটি বিষয়। আমরা এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার নিন্দা জানাই।[৯৩]

কাজেই পবিত্র কুরআনের অবমাননার যেমন অমার্জনীয় ধৃষ্টতা ও তীব্র নিন্দাজনক ঘটনা তেমনিভাবে বৌদ্ধবিহার ও বসতিতে সহিংসতাও অতীব নিন্দনীয় অপরাধ। এ জন্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক উভয় অপরাধের সাথে জড়িতদের আইনের মুখোমুখি করা উচিত। ইসলামের শিক্ষা হল, অপরাধ যার শাস্তিও তার। আলাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না"।[৯৪] তাই এক বৌদ্ধ যুবক কর্তৃক পবিত্র কুরআন অবমাননার দায় তার পুরো সম্প্রদায়ের ওপর চাপানো অবশ্যই ইসলামের নীতি ও আদর্শের চরম পরিপন্থি। তেমনিভাবে বৌদ্ধ পলীতে সহিংসতায় জড়িত কতিপয় অপরাধীদের দায় মুসলিম সমাজের ওপর চাপানোও ধর্মীয় নীতি ও আদর্শ বিরোধী।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, কতিপয় উশৃঙ্খল লোকজন বৌদ্ধ পল্লীতে সহিংসতা চালালেও মুসলিম সমাজের বিশাল অংশ অধিকাংশ জায়গায় বৌদ্ধবিহার ও বসতি রক্ষায় জীবনবাজি রেখে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। রামু অফিসের চর লামার পাড়ায় অবস্থিত দেশের প্রাচীন ও বৃহৎ বৌদ্ধবিহারটি মুসলমানদের প্রচেষ্টায় অক্ষত থাকার সংবাদ দৈনিক আমার দেশ ও দৈনিক কক্সবাজারসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর এক লেখাতেও বিষয়টি এভাবে 'রামুর এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কয়েকটি বিহার রক্ষা পেয়েছে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানবতাবাদী লোকের প্রচেষ্টায়'।[৯৫]

সুতরাং কতিপয় অপরাধীদের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোন কুচক্রী মহল যাতে নিরীহ আলেম-ওলামা, ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে অহেতুক হয়রানি ও মিথ্যাচারের শিকারে পরিণত করে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য ধ্বংসের অপচেষ্টা করতে না পারে সে জন্য সরকার ও সংশিষ্ট প্রশাসনকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এ জঘণ্যতম ঘটনাচক্রের মূল রহস্য উদঘাটন করতে হবে।

৯৩। ^`wbK c_g Av‡jv I ^`wbK wngQwo, ৯ অক্টোবর, ২০১২

৯৪। আল কুরআন, ১৭:১৫, ৩৯:৭

৯৫। ^`wbK wngQwo, ৯ অক্টোবর, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

এমনই দাবি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শান্তি প্রিয় সকল মানুষের, সকল মহলের। এ দাবি বাস্তবায়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য ধরে রাখার লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপসহ জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, ধর্মের অবমাননা বন্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন বর্তমান সময়ের অনিবার্য আবেদন।

মানবতার ঐক্য ও সংহতি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধি করে, ইমানি চেতনা ও মনোবলকে সুদৃঢ় করে। দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী, সামাজিক সংহতি ও শান্তি-সম্প্রীতি যে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির একান্ত কাম্য, এতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ, দলমত-নির্বিশেষে সবাই মতৈক্য প্রকাশ করে। ইসলাম মানুষকে জাতীয় ঐক্য, সংহতি, দেশাত্মবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দান করে, আর দেশপ্রেমের মাধ্যমে এ সামাজিক সংহতি টিকে আছে। দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষায় জাতির ঐক্য ও সংহতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবতার মতৈক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আলাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো, "তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে"।[৯৬]

জগতের কোথাও এমন কোনো ধর্মপরায়ণ লোক নেই যে সন্ত্রাস-সহিংসতা, নাশকতা-বর্বতা, হানাহানি-উগ্রতা, বোমাবাজি, আত্মঘাতী হামলা, দ্বন্দ্ব-কলহ, সংঘাত-সংঘর্ষ, ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ ও হত্যাযজ্ঞকে উপকারী বা উত্তম মনে করে। তাই মতবিরোধ, বিভেদ-বিভক্তি, তিক্ততা-রেষারেষি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-ঘৃণা প্রভৃতি দূরীভূত করে সামাজিক জীবনে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা ও সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে"।[৯৭]

৯৬। আল কুরআন , ৩ : ১০৩
৯৭। আল কুরআন , ৮ : ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

wewkó evsjv‡‘kx wn›‘

হিন্দুধর্ম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, বাংলাদেশ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বত্যমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯.২ শতাংশ হিন্দু। ভারত ও নেপালের পর বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম হিন্দু অধ্যুষিত রাষ্ট্র।

বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানের দিক থেকে প্রকৃতিগত ভাবে প্রতি বেশি ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ধর্মের সমরূপ। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বে বর্তমানে বাংলাদেশ ভূখণ্ড (তৎকালীন নাম পূর্ববঙ্গ) ও পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত অঞ্চল ছিল।

বাংলাদেশ হিন্দু সমাজে দেবী দুর্গা ও কালীর পূজা বহুল প্রচলিত। এছাড়া লক্ষ্মী পূজা, স্বরস্বতী পূজা, কাত্যায়নী পূজা, বাসন্তী পূজা, শিবপূজা, প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের ও প্রচলন রয়েছে। হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম ও ইসলামী সূফী মতবাদ বাংলাদেশের পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে এমন কয়েকজন মহাত্মা ও অবতার জন্মেছেন, হিন্দুধর্মের সংস্কার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, হরিচাঁদ ঠাকুর, ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র, জগদ্বন্ধুসুন্দর, মা আনন্দ ময়ী, রামঠাকুর, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, বালক ব্রহ্মচারী শ্রী চিন্ময় প্রমুখ অন্যতম। বাংলা ভাষা এদেশের হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের প্রবীণবাহক।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বলেই এ দেশে ইসলাম ধর্মের পাশা পাশি অন্যান্য ধর্মীয় জনগণও এদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সহ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে অধিষ্টিত হতে পেরেছেন এবং রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন। কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দু জনের পরিচয় এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। নিম্নে কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দুজনের নামের তালিকা দেয়া হলো :

wewkó evsjv‡‘kx wn›‘

ivRbxwZwe‘

- সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (সাংসদ,আওয়ামী লীগ)
- নারায়ণ চন্দ্র চন্দ (সাংসদ ও মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ)
- সুধাংশু শেখর হালদার (প্রয়াত) (আওয়ামী লীগ)
- সতীশ চন্দ্র রায় (প্রাক্তন সাংসদ, আওয়ামী লীগ)
- পঞ্চানন বিশ্বাস (প্রাক্তন সাংসদ, আওয়ামী লীগ)

Dhaka University Institutional Repository

- গয়েশ্বর চন্দ্র রায় (সাবেক সাংসদ ও মন্ত্রী, বিএনপি)
- গৌতম চক্রবর্তী (সাবেক সাংসদ ও মন্ত্রী, বিএনপি)
- গৌতম কুমার মিত্র (বিএনপি)
- নিতাই রায় (বিএনপি, পূর্বে জাতীয় পার্টি)
- বিপ্লব পোদ্দার (বিএনপি)
- পঙ্কজ দেব নাথ (আওয়ামী লীগ)
- সুজিত রায়নন্দী (আওয়ামী লীগ)
- ননী গোপাল মণ্ডল (সাংসদ, আওয়ামী লীগ)
- বীরেন শিকদার (সাংসদ, আওয়ামী লীগ)
- মুকুল বসু (আওয়ামী লীগ, প্রাক্তন সচিব)
- অসীম কুমার উকিল (আওয়ামী লীগ)
- নেপাল কৃষ্ণ দাস (বিকল্প ধারা, পূর্বে হিন্দু লীগ)
- রঞ্জিত কুমার ঘোষ (সাংসদ, আওয়ামী লীগ)
- ধীরেন্দ্র নাথ সাহা (বিএনপি, পূর্বে আওয়ামী লীগ)

mvgwiK ewnbx

†jdU¨v‡b›U K‡bj I Z‘aŸ

- চিত্তরঞ্জন দত্ত (বীর উত্তম), অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল
- জীবন কানাই দাস, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল
- ড. অঞ্জন কুমার দেব, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল
- ড. বিজয় কুমার সরকার, মেজর জেনারেল। বর্তমানে ঢাকার আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপকরূপে কর্মরত।
- ড. দেবাশিষ সাহা, কর্নেল। বর্তমানে ঢাকার আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক রূপে কর্মরত।
- ড. রঞ্জিত কুমার মিস্ত্রি, লেফটেন্যান্ট কর্নেল। বর্তমানে ঢাকার আর্মড ফোর্সেস

Dhaka University Institutional Repository

মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক রূপে কর্মরত।

- ড.দীপক কুমার পাল চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল। বর্তমানে ঢাকার আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক রূপে কর্মরত।

†Ljvajv

- ব্রজেন দাস (সাঁতার)
- বিমল চন্দ্র তরফদার (অ্যাথলেটিকস)
- অমলেশ সেন (ফুটবল)
- বিপ্লব ভট্টাচার্য (ফুটবল)
- রজনী কান্ত বর্মণ (ফুটবল)
- অরূপ কুমার বৈদ্য (ফুটবল)
- বিকাশ রঞ্জন দাস (ক্রিকেট)
- অলোক কাপালি (ক্রিকেট)
- তাপস বৈশ্য (ক্রিকেট)
- ধীমান ঘোষ (ক্রিকেট)
- সৌম্য সরকার (ক্রিকেট)
- শুভাগত হোম (ক্রিকেট)
- লিটন দাস (ক্রিকেট)
- রনি তালুকদার (ক্রিকেট)
- পিনাক ঘোষ (ক্রিকেট)

Kjv

- অনিল কুমার সাহা (উচ্চাঙ্গ সংগীত)
- সুবীর নন্দী (গায়ক)
- তপন চৌধুরী (গায়ক)

Dhaka University Institutional Repository

- সুবল দাস (সংগীতস্রষ্টা)
- সুভাষ দত্ত (চিত্র পরিচালক)
- প্রবীর মিত্র (অভিনেতা)
- পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় (অভিনেতা)
- জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় (অভিনেতা)
- অঞ্জু ঘোষ (অভিনেত্রী)
- শুভ্র দেব (গায়ক)
- রথীন্দ্রনাথ রায় (গায়ক)
- আরতি ধর (গায়িকা)
- শেফালি ঘোষ (গায়িকা)
- গোবিন্দ হালদার (সংগীতস্রষ্টা)
- বিজয় সরকার (সংগীত স্রষ্টা)
- অজিত রায় (গায়ক ও সংগীত স্রষ্টা)
- কুমার বিশ্বজিৎ (গায়ক)
- নকুল কুমার বিশ্বাস (গায়ক)

mvwnZ¨ I ms¯‹wZ

- নির্মলেন্দু গুণ (কবিতা)
- মহাদেব সাহা (কবিতা)
- রামেন্দু মজুমদার (গণমাধ্যম ও বিজ্ঞাপন ব্যক্তিত্ব)
- অলীক ঘোষ
- শিশির ভট্টাচার্য (কার্টুনিস্ট)
- নিতুন কুন্ডু (চারুকলা)
- স্বরোচিষ সরকার (আভিধানিক, বৈয়াকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানী)
- মুন্নী সাহা (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব)

Dhaka University Institutional Repository

- শ্যামল দত্ত (গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব)
- দিব্যদ্যুতি সরকার (গবেষক)

weØ¾b

- রণদা প্রসাদ সাহা (মানবতাবাদী)
- বিনোদ বিহারী চৌধুরী (বিপ্লবী)
- জ্ঞানতাপস যোগেশচন্দ্র সিংহ (শিক্ষাবিদ)
- জ্ঞানভাস্কর বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য (শিক্ষাবিদ)
- জাস্টিস দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য
- অধ্যাপক অরুণ কুমার বসাক (গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
- অধ্যাপক সনত্ কুমার সাহা (গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
- অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য (গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
- ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য(অর্থনীতিবিদ)
- অধ্যাপক (ডাঃ) প্রাণগোপাল দত্ত (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য)
- অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক (গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
- অজয় রায় (অধ্যাপক)
- বিশ্বজিত চন্দ (আইনবিদ, অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
- অরোমা দত্ত (মানবাধিকার কর্মী)
- সুবিনয় নন্দী (অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রসংঘ)
- স্বপন কুমার বালা (গবেষক)
- অশোক কে. কর্মকার (প্রাক্তন জজ ও ইউএস অ্যাটর্নি)
- ড. অরুণ কুমার গোস্বামী (গবেষক)
- অমৃতলাল দে
- মনোরঞ্জন শীল (শিক্ষাবিদ)

Dhaka University Institutional Repository

- বিচারপতি এস কে সিনহা
- বিচারপতি ভবানীপ্রসাদ সিনহা

cwiK¯Ívb Avg‡j knx` ei×Rxex

- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (রাজনীতিবিদ)
- জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (গবেষক)
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার (গবেষক)
- যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল (রাজনীতিবিদ)
- গোবিন্দ চন্দ্র দেব (গবেষক)
- করুণা কাপুর (শহীদ বুদ্ধিজীবী)

সুতরাং মানুষের সামাজিক সুসম্পর্ক ও দেশে শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপনের অনিবার্য ফলস্বরূপ নাগরিকরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হতে পারে।[৯৮] পরমত সহিষ্ণুতার অতুলনীয় শিক্ষা ও নীতি-আদর্শ থেকে দূরে সরে থাকলে মানুষের জাতীয় ও দলগত জীবনে যেমন বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনও সুখকর হয় না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যখন নিজের ক্ষমতা, শক্তি, সামর্থ্য ও স্বার্থপরতার দম্ভ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে, তখন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার দলমতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ভাববিনিময় ও যোগাযোগ স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই দেশ ও জাতির অগ্রগতির স্বার্থেই সাম্পদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য। বাংলাদেশেও অনুরূপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই বিদ্যমান।

৯৮। *C/A world fact book* ,Centralintelligence Agency, USA : 2007
Bangladesh Bureaw of educational information and statistics.

Dhaka University Institutional Repository

Aóg Aa¨vq

c_g cwi‡”Q‘

Bmjv‡g mv¤c‘wqK m¤cwZi wfwË

ইসলাম শান্তি, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতির ধর্ম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দয়া, সহানুভূতি, সহণশীলতা ও সহিঞ্চুতা প্রদর্শনের শিক্ষা ইসলাম দেয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস একথাই সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেখানেই মুসলিম-অমুসলিমদের সহাবস্থান ছিল সেখানেই মুসলমানরা অমুসলিমদের প্রতি সম্প্রীতি প্রদর্শন করেছেন। তাদের কোন অধিকার খর্ব করেন নি। কাজেই বলা যায় ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। কোনরূপ অসাম্প্রদায়িকতার স্থান ইসলামে নেই। এ পর্যায়ে ইসলামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়ের মধ্যে আচরণ ও সম্পর্কগত ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। এখানে বর্ণ বিশ্বাস মানুষকে তার সামাজিক ও সার্বিক সম্পর্ক রক্ষার দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। আবার আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে আইন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদিরও অবদান লক্ষ্য করা যায়। মূলত পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ ও প্রকৃতি এমনিই গড়ে উঠেনি। বরং হাজার বছরের চিন্তা চেতনা মননশীলতা ও সমাজের প্রভাব উপাদান সমূহ মিলে গড়ে তোলা হয়েছে এর ভিত্তিমূল। ইসলাম একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ নির্দেশনা ঐশী ও সার্বিকভাবে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। ইসলামের এ নির্দেশনার ভিত্তি মূলত এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এ লক্ষ্যের বাস্তবায়নে সম্প্রদায় বর্ণ ও গোত্রগত ভেদাভেদ মানুষকে কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে কুরআন ও হাদীসের নানা বাণী তার ইঙ্গিত বহণ করছে। ইসলামের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির হেদায়ত তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে সকল ক্ষেত্রে তার আদেশ নিষেধ সংক্রান্ত বিধানাবলীর পূর্ণ প্রয়োগ করা। আর এ উদ্দেশ্য পূরণে ইসলামের প্রধানতম পদ্ধতি হলো 'দাওয়াত' বা ইসলামের প্রতি আহ্বান অমুসলিমগণের সাথে মুসলিমগণের সম্পর্ক তৈরি হওয়াটা ইসলামেরই দাবী। ইসলামই এ বিষয়ে মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে। দাওয়াত তথা ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "তোমরাই

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দান কর, অসৎকর্মের নিষেধ এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর” ।[১]

অতীত ইতিহাসে দেখা যায় যে, এ উপমহাদেশে তথা বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উন্নত চরিত্র, মানবিকতার আদর্শ ও সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির প্রভাব কোন অংশেই কম ছিল না। অমুসলিম মণীষীদের নানা বাণীতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এম.এন. রায় লিখেন, “ইসলামের অভূতপূর্ব বিজয় যতোটা তলোয়ারের জোরে। তার থেকে অনেক বেশি ইসলামের মূলমন্ত্র সাম্য ও মৈত্রীয় নীতিতে। যা সে সময় শ্রেণি ও জাতিভেদে জর্জরিত রোমান, বাইজেনটাইন, পারস্য এবং পরে ভারতবর্ষের সমাজ যে দমণমূলক আইন কানুনে শাসিত হতো তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। ইসলাম দেখা দিল জীর্ণ প্রায় প্রাচীন সভ্যতা থেকে বিদায় নেয়া সমাজ ও স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে। মুক্তি ও সাম্যের বাণীই ইসলাম অভিনব অভ্যুত্থান প্রসারের শক্তির মূল উৎস” ।[২] ঐতিহাসিক টমাস আর্ণল্ড বলেন, “আমরা যখন প্রাথমিক যুগে খ্রিস্টানদের প্রতি মুসলিমদের এমন বিস্ময়কর ন্যায় বিচার, সততা ও ধর্মীয় উদারতা দেখতে পাই, তখন দিনের আলোর মত একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তরবাবির জোরে ইসলামের প্রচার প্রসার সম্পর্কে যে প্রচারণা চালানো হয় তা আদৌ বিশ্বাস, এমনকি ভ্রুক্ষেপ করার যোগ্যতাও রাখে না” ।[৩] প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ডোজি বলেন, “অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের উদারতা ও উন্নত আচরণ তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তারা ইসলামের মধ্যে এমন সরলতা ও উদারতা দেখতে পেয়েছে, যা তারা তাদের পুর্ববর্তী ধর্মসমূহে কোনদিনই দেখতে পায়নি” ।[৪]

মানব জীবনে পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী শান্তি আনয়ন ইসলামের অন্যতম মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ শান্তি শুধু পার্থিব বা সামাজিক নয়, বরং মৃত্যু পরবর্তী অসীম জীবনের শান্তিও এর আওতাভুক্ত। আল্লাহর একত্ববাদ ও মানবজাতির ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন শান্তির সাক্ষ্য বহণ করে। ইসলামে পরকালীন শান্তির মর্ম হলো আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে শান্তি স্থাপন করা। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে পরকালীন চিরশান্তির জান্নাত লাভ করা। আর ইহকালীন শান্তির মর্ম হলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য মৈত্রীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা

১। আল কুরআন, ৩:১১০

২। মানবেন্দ্রনাথ রায়, Bmjv‡gi HwZnvwmK fwgKv, প্যরীদাস প্রকাশনী, XvKv:Zv. we., c . 38

৩। তাওফিক সুলতান, ZvixL Avnwj j wh¤§vn wdj BivK, দারুস সালাম, রিয়াদ:১৪০৩ হি.,পৃ.৭০

৪। টমাস আর্ণল্ড, ‘¨wcwPs Ae Bmjvg, (অনু: আদ দাওয়াতু ইলাল ইসলাম), মাকতাবাতুন নাহাদাহ, মিসর : ১৯৭০, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

বজায় রাখা। এ মূলনীতির আলোকেই মানুষ একজন অপরজনের কাছে নিরাপদ থাকবে। শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করে কেউ কোন জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হবে না। বস্তুত ইসলামের অনুশাসনগুলোর প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ সত্যই পরিস্ফুটিত হয়। পরিবার ও সমাজে বসবাসরত জাতি-ধর্ম, বর্ণ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলাম যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ সকল নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আসল উদ্দেশ্য মানুষের আচরণগত সীমানা নির্ধারণ, যা দ্বারা মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি স্থাপনে ইসলাম আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকে। এজন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করাও ইসলামে বৈধ তবে ইসলামে শান্তির ধারণা এতই গভীর যে যুদ্ধাবস্থায়ও অন্যায়ভাবে কারো শান্তি নষ্ট করা যাবে না, যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সাধু সন্ন্যাসী, বেসামরিক লোক যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি ইত্যাদি কারো প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এমনকি, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় আচরণ এবং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার মুসলিমদের উপর আবশ্যক। শান্তির প্রতি ইসলামের এ আকুলতা অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে উন্নত ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষাই দেয়। কেননা সাম্প্রদায়িক হিংসা বিদ্বেষ, নির্যাতন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ, তর্ক-বিতর্ক, সমালোচনা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম বাঁধা। সুতরাং এগুলো হতে বিরত থাকা এবং এর প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলামের অনুশাসন ও প্রকৃত মুসলিমগণের দৃষ্টান্ত শান্তি স্থাপনে ইসলামের সফলতাই বর্ণনা করে যুগে যুগে। এম.এন রায় বলেন,"ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কেবল বেহেশতের প্রেরণাই দেখায়নি, পার্থিক জগতের বিজয়ের জন্যও তাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এ জগতে কিভাবে আসল সুখ শান্তি পাওয়া যায় তারই ইঙ্গিত দিয়েছে আরবের নবী" ।[৫] আমেরিকান লেখক পিটারসেন বলেন,"ইসলামের নামে কঠোরতা প্রদর্শনের কোন স্থান প্রকৃত ইসলামে তো নেই; বরং তা শান্তির পতাকাবাহী ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত" ।[৬] প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের অনুশাসন, উত্তম নৈতিকতা ও মানবতাবোধের আদর্শ মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম। ঐশী নির্দেশনা হিসেবে এগুলোর অনুসরণ মানুষের পরকালীণ জীবনের শান্তি ও মুক্তির অমূল্য পাথেয়। সুতরাং বলা চলে উদ্দেশ্যগত বিচারে ইসলাম শান্তি ও দাওয়াতের স্বার্থে হলেও উত্তম নৈতিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের সর্বোচ্চ মহানুভবতায় বিশ্বাসী। প্রকৃত মুসলিমগণ বাস্তব জীবনে এরই অনুসরণ করতে সচেষ্ট।

৫। মানবেন্দ্র নাথ রায়, cv¸ ³, পৃ. ৩৮

৬। ডি ফিন্ডলী, jv mKZv evÕ'vj Bqvlwg, শারিকাতুল মাতবুআত, বৈরুত : ২০০১, পৃ . ৯১

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ইসলাম যে সব বিষয়কে মূলভিত্তি হিসেবে গণ্য করে তার সবগুলোই কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা আল কুরআন ও আল হাদীস ইসলামী বিধিবিধানের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত। ইসলামী চিন্তাবিদগণ এতদুভয় উৎস হতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও আচরণগত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য যে সব বিষয়কে ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ:

প্রথমত, নির্ভেজাল তাওহীদবাদী ধর্ম ইসলাম সম্পর্ক রক্ষার প্রথম ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে একত্ববাদকেই। বস্তুত তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ সকল ধর্মের নিকটই গ্রহণযোগ্য সত্য। যদিও পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলো পরবর্তীতে তাদের মূল শিক্ষা হতে বিচ্যুত হয়ে তাওহীদকে বর্জন করেছে তথাপি এটা অস্বীকার করার কোন জোর নেই যে, বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা একজন। তাঁরই একক নিয়ন্ত্রণে গোটা পৃথিবী চলমান, তিনি সর্বশক্তিমান উপাস্য।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ সত্যেরই ঘোষণা করে বলেছেন, "তুমি বল, হে কিতাবীগণ। আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকেও আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করি"।[৭] একত্ববাদ সম্পর্কে অমুসলিমদের ধারণা প্রসঙ্গে আল কুরআনে আরো বেশ কিছু আয়াত পরিদৃষ্ট হয়।[৮] এগুলো তাওহীদ বা একত্ববাদ সূত্রে মুসলিম অমুসলিমদের সমতা ঘোষণা করে। সুতরাং পারস্পরিক সম্পর্কন্নোয়নে তাওহীদ হলো প্রধান ভিত্তি। অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় কোন মুসলিমেরই তাওহীদ বিরোধী কোন কাজ করা সমীচীন নয়, কেননা তাওহীদই ইসলামের মূল। আর তাওহীদ ব্যতীত মুসলিম হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, নবী রাসূলদের প্রতি ইসলামী ধারণা আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে রক্ষার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ইসলাম পৃথিবীতে আগত সমস্ত নবী রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করে। তাঁদের আনীত শিক্ষা ও কিতাবের ঐশী হওয়াকে স্বীকার করে। এক্ষেত্রে ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের নবী হযরত মুসা, ঈসা (আ.) ও মুসলিমদের নিকট সমান ভাবেই সম্মানিত। কেননা তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সকল নবী আল্লাহর পরিচয় প্রদান করেছেন, মানুষকে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেছেন। আল্লাহর বাণী "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী

৭। আল কুরআন, ৩: ৬৪
৮। বিস্তারিত দ্র. আল কুরআন, ১৪: ১০, ৫২: ৩৫-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এ বলে যে তোমার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করো না"।[৯] অন্য আয়াতে এসেছে,"তোমরা বল। আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট হতে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী"।[১০]

ZZxqZ, মানুষের সত্তাগত মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার অন্যতম মুলনীতি। ইসলাম সত্তাগতভাবে প্রত্যেক মানুষকেই মর্যাদাবান মনে করে। আর এ মর্যাদা দানকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোন জাতি- ধর্ম, বর্ণ-গোত্র, কিংবা সম্প্রদায়গত পার্থক্য করেননি। বরঞ্চ পৃথিবীর সকল মানুষই তার নিকট সম্মানিত । আল কুরআনের ভাষায়, "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থল ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহণ দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি"।[১১] আল্লাহ প্রদত্ত এ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মূলরূপ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষের আবির্ভাব।[১২] তাছাড়া সৃষ্টি জগতের সবকিছুকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা, সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের অধীনস্ত করে দেয়া ইত্যাদিও মানুষের সত্তাগত মর্যাদার পরিচায়ক। সুতরাং মানুষ হিসেবে সমস্ত ব্যক্তিই মর্যাদা ও সম্মান লাভের অধিকারী, চাই তা মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ এরূপই।

PZ_Z, সৃষ্টিগতভাবে মানুষের সমতা ইসলামী সাম্যনীতির প্রধান ভিত্তি। ইসলামই প্রথম ধর্ম যেখানে মানুষের জন্মকালীন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে বিশদভাবে। এর পূর্বে কোন ধর্মেই এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়নি। এ বিশ্লেষণে সমস্ত মানুষের সৃষ্টিগত সাম্য স্পষ্টতই ধরা পড়ে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "হে মানুষ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পারো।[১৩] বস্তুত আদি পিতা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ.) এর মাধ্যমে গোটা

৯। আল কুরআন, ৪২:১৩
১০। আল কুরআন, ২:১৩৬, ২:২৮৫
১১। আল কুরআন, ১৭:৭০
১২। বিস্তারিত দ্র. আল কুরআন, ২:৩০
১৩। আল কুরআন, ৪৯:১৩, ৪:১

Dhaka University Institutional Repository

মানবজাতির জন্ম। এ হিসেবে সৃষ্টিগত উত্তরাধিকারী হিসেবে সবাই একই জাতি। আবার মানুষের জন্ম প্রক্রিয়ার বর্ণনায়ও মানুষের সমতার বিধান লক্ষনীয়। প্রথমে জমাট রক্ত, অতঃপর মাংসপিণ্ড ইত্যাদি স্তরায়নের মাধ্যমেই সকল মানব শিশুর জন্ম।[১৪] কেউই আল্লাহর সৃষ্টিনীতির বাইরে জন্ম নেয়নি। সুতরাং মানুষকে ধনী দরিদ্র, সাদা-কালো, মুসলিম-অমুসলিম ইত্যাদি ভাবে বিবেচনা না করে আচার আচরণে উত্তম আদর্শ অনুসরণ করাই উচিত। এছাড়াও ধর্মগত দিক হতেও মানব শিশু একক সমতার অধিকারী। সকলেই আল্লাহ প্রদত্ত সহজাত ধর্মের উপর জন্ম নেয়। এমনকি শিশু কালে মৃত্যুবরণকারীর পরকালীন ঠিকানাও এক জায়গাতেই। আল্লাহ তা'আলা এরূপ ক্ষেত্রেও মানব জাতির সাম্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন।

cÂgZ, ইসলাম ধর্মমতে শুধু মানুষই নয় বরং গোটা সৃষ্টি জগতই আল্লাহর পবিরার তুল্য। সুতরাং এক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণে মানুষের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না। বরং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সৃষ্টির প্রতি যে যতটা পরোপকারী, সৎকর্মশীল তার উপরই মূলত নির্ভর করছে আল্লাহর প্রিয় হওয়া বা না হওয়া। সুতরাং আচরণগত দিক নির্ধারণে এ বিষযটিও বিবেচনায় থাকা মুসলিমদের জন্য একান্ত আবশ্যক।

lôZ, ইসলাম ধর্ম বহুত্ববাদিতায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ ইসলাম নিজস্ব অস্তিত্বের পাশাপাশি অন্য ধর্মের অস্তিত্বও স্বীকার করে। যদিও ইসলামের দাবী অনুযায়ী আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম, তথাপি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও ইসলাম সম্মানের চোখে দেখে। কেননা পূর্ববর্তী নবীদের প্রচারিত ধর্মগুলোও খোদায়ী ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত । তাদের প্রচারিত ধর্মগুলোও ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রচারক।

কালক্রমে এগুলো তাওহীদের শিক্ষা হতে দূরে সরে যাওয়ায় ধর্মের পরিপূর্ণতার জন্যই ইসলামের আগমন। সুতরাং ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণেও ইসলাম অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আল কুরআনে সূরা কাফিরুনে এ প্রসঙ্গে সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "বল হে কাফিররা। আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী না যার ইবাদত আমি করি। আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছো এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের,

১৪। আল কুরআন, ২৩:১৪

Dhaka University Institutional Repository

আমার দ্বীন আমার”।[১৫] বস্তুত ধর্মসমূহের এ বহুমাত্রিকতা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই ইচ্ছাকৃত বাস্তবতা। এ সম্পর্কে আল কুরআনে এসেছে, “তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনত, তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?”[১৬] বহু ধর্মের উৎপত্তি ও বিদ্যমানতা ইসলাম এভাবেই গ্রহণ করে। সুতরাং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার বিষয়টিও স্বভাবতই কাম্য।

mßg, ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। পার্থিব জীবনে সকল ব্যক্তিরই, মুসলিম অমুসলিম, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ইসলামে সম্পূর্ণ বিরোধী। বরঞ্চ মানুষের পার্থিব স্বাধীনতা আছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি বিবেক ও জ্ঞান দিয়েই এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সাথে সাথে ভাল মন্দের নির্দেশক হিসেবে নবী রাসূল, আসমানী কিতাব ইত্যাদিও অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার নিজ ইচ্ছার উপর অবকাশ দিয়েছেন। জোর করে মুমিন বানানো আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। এজন্যই তিনি ঘোষণা করেছেন, “এ ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই”।[১৭] মানুষের উচিত সর্বপ্রকার জ্ঞান বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারা সত্য ও সুন্দরের অনুশীলন করা। অবশ্য কেহ যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ভুলপথে পা বাড়ায়। কিংবা নবী রাসূলদের শিক্ষা ত্যাগ করে ইচ্ছাধীন জীবন পরিচালনা করে তার জন্য দায়ী সে নিজেই। পরকালীন জীবনে এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তবে ইহকালীন জীবনে মানুষের ও ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা যাবে না। ধর্ম, বর্ণ, অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়েই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বীকৃতি ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত মূলনীতিগুলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন রক্ষা ও উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি। আন্তঃসাম্প্রদায়িক কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ ভিত্তিগুলো বিবেচনা করে কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে। ইসলামের নীতিমালা এটাই। অবশ্য আরো একটি বিষয় সর্বাবস্থাতেই বিবেচ্য হবে। আর তা হলো ইসলামের মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য ও শরিয়তের বিরোধিতা না করা। অর্থাৎ আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন কোন আচরণ করা যাবে না যা ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামের ক্ষতি হতে পারে এমন

১৫। আল কুরআন, ১০৯: ১-৬
১৬। আল কুরআন, ১০: ৯৯
১৭। আল কুরআন, ২:২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কটিও ইসলামে গ্রহণীয় নয়। ইসলামের গণ্ডীবদ্ধ থেকে সর্বোত্তম ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামী শরিয়তের নির্দেশ।

এক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাবিদগণ আল কুরআন ও সুন্নাহ বিশ্লেষণ করে ইসলামী নীতিমালার আলোকে অমুসলিমদের মোট ৪ প্রকারের সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এগুলো হলো :

(K) Avj gIqvjvZ ev gIqvÏv: অর্থাৎ কারো প্রতি গভীর ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা ও একেবারে নিজের করে নেয়া। এ প্রকারের সম্পর্ক একমাত্র মুসলিমদের প্রতিই প্রযোজ্য হবে।

(L) Avj g'vqvZ: অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে বন্ধুসুলভ আচরণ এবং ভালোবাসার প্রকাশ করা এবং আন্তরিকভাবে কারো কর্ম বা বিশ্বাসকে ভালো না বাসা । তবে এক্ষেত্রে তা প্রকাশ করা যাবে না। বরং বন্ধুর ন্যায় ভালোবাসা, উত্তম ব্যবহার ও সম্প্রীতি রক্ষা করা আবশ্যক। অমুসলিমদের সাথে এরূপ আচরণ করা বৈধ।

(M) Avj gIqvmvZ: এটি মূলত কর্মসংক্রান্ত ব্যবহার। কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করা, তা আর্থিক হোক বা অন্য কোন উপায়ে হোক, দুঃখ-কষ্ট দূর করা, সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দেয়া, দান-খয়রাত করা ইত্যাদি এ প্রকারে অন্তর্ভূক্ত। অমুসলিমদের সাথে এ ধরণের আচরণ ইসলামী বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তবে যে সব অমুসলিম মুসলিমদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার বৈধ নয়।

(N) gqvgvjvZ: অর্থ সংক্রান্ত ব্যবহার বিধি। কারো সাথে লেনদেন করা, বাণিজ্য করা, ধার কর্জ বিনিময় ইত্যাদি আর্থিক কার্যকলাপ করা এ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। অমুসলিমগণ এ ধরণের ব্যবহারও অমুসলিমগণের নিকট হতে লাভ করেন। তবে অর্থ সংক্রান্ত কোন কাজ যদি ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতির কারণ হয় তাহলে বৈধ হবে না।[১৮]

বস্তুত ইসলাম মানবজাতির জন্য সম্পর্ক নির্ধারণের যে চারটি স্তরের কথা বলেছে তন্মধ্যে মাত্র একটিই শুধু মুসলিমদের জন্য বিশেষায়িত করে রাখা আছে। বাকী তিনটি পর্যায়ে অমুসলিমগণও মুসলিমদের ন্যায়ই আচরণ লাভের অধিকারী। ইসলামী আদর্শের এ মহানুভবতা মুসলিম সম্পর্কের

১৮। মোস্তফা মনজুর, evsjv‡'‡k we'¨gvb gmwjg-Agmwjg m¤úK : Bmjvgx 'wôfw½, Gg.wdj Awfm›'f (AcKwkZ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : ২০১০, পৃ. ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

যথার্থ রূপের প্রতিফলণ স্বরূপ। সুতরাং বলা য়ায়, ইসলাম যেমন আল্লাহর সাথে শান্তির কথা বলে তেমনি তা বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে আগ্রহী। এর অর্থ, মানুষ একজন অন্যজন থেকে নিরাপদ থাকবে এবং কেউ কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা তথা অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হবে না। ইসলামে সন্ত্রাস সাম্প্রদায়িকতাকে মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়। পিতার প্রতি পুত্রের ও পুত্রের প্রতি পিতার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর,স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, ভৃত্যের প্রতি প্রভূর ও প্রভূর প্রতি ভৃত্যের, একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের, একজন মানুষের প্রতি অন্যজনের পারষ্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখাই এ সকল নির্দেশিত কর্তব্যের মৌলিক উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡”Q‘

Bmjvgx bxwZgvjvi Av‡jv‡K evsjv‡‘‡ki mv¤c‘wqK m¤cxwZi chv‡jvPbv I gj¨vqb

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং জনসংখ্যার দিক হতে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। শান্তি-সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিশ্বজুড়ে এ দেশের সুখ্যাতি রয়েছে। সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে এ দেশ পরিচিত। বাংলাদেশের মানুষের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ও ইতিহাস ঐতিহ্যগতভাবেই সুন্দর ও সহণশীল। এদেশের মুসলিম জনগণ যেমনিভাবে অমুসলিমদের সাথে সম্প্রীতি ও সহণশীল পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ট তেমনি অমুসলিমগণও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ১৯৭১ সালে এদেশের স্বাধীনতার পর হতে আজ পর্যন্ত কোনরূপ সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও দাঙ্গা না হওয়াই এ দেশের উন্নত সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য ধর্মের নামে ছোট খাট সংঘাত, নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচারও যে হচ্ছে না তাও নয়। বস্তুত ধর্মের ছদ্মাবরণে এগুলো পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির নমুণা মাত্র। পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহের আলোচনায় যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানভিত্তিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। মানবতাবাদী ও বাস্তবসম্মত ভিত্তিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত এসব বিধিবিধান প্রত্যেক মুসলিম মাত্রেরই মেনে চলা উচিত। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণও এ বিধানের বাইরে নন। নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলাফেরা, সম্পর্ক স্থাপন, সম্প্রীতি-সংঘাত পরিচালনা, কিংবা পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষায় ঐতিহ্যের অনুসরণ কোনটিই ইসলামে কাম্য নয়। তবে হ্যাঁ, যদি এগুলো ইসলামী আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা অবশ্যই গ্রহণীয়। বস্তুত আন্তঃমানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম কঠোরতা ও উদারতা কোনটিরই সমর্থক নয়। বরং কোমল-কঠিনের সংমিশ্রণে একটি কল্যাণকর বিধানই ইসলামের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছে। অমুসলিম কারো প্রতি অত্যাচার, নির্যাতন, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ইত্যাদি যেমন ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; তেমনি অতি উদারতা দেখিয়ে অমুসলিমদের ঐতিহ্য প্রথাকে গ্রহণ করে ইসলামী শরিয়তের সীমালংঘণও ইসলাম বৈধ মনে করে না। বরং উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বঝায় রেখে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষাই ইসলামের মূল লক্ষ্য।

অতএব পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইসলামী নীতিমালার আলোকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কাজেই ইসলামী নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। বাংলাদেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এক একটি দিক নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিশ্লেষণের পূর্বে এদেশের মানুষের ধর্মজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের জনগণের এক বিরাট অংশ, মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম, স্বীয় ধর্ম প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন না। অথচ ইসলামের অন্যতম নির্দেশিত বিষয় হলো জ্ঞান সাধনা। ইসলাম এ জ্ঞান সাধনাকে ফরয বা অবশ্য করণীয় ঘোষণা করেছে। জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে নানা ফযীলত ও পুরস্কারের ঘোষণা করে মুসলিমদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। এমনকি আল কুরআনের প্রথম বাণীও ছিল 'পড়'।[১৯] মহানবী (সা.) বলেন, "ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয"।[২০]

বস্তুত দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের মূল লক্ষ্য। আর পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের জ্ঞান লাভকারীই সর্বাপেক্ষা সফল ও সার্থক। মহানবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ্‌ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি দান করেন। বস্তুত আমি বণ্টনকারী এবং দাতা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ"।[২১] মূলত ধর্মজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ ধর্মের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারে। প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য এর বিকল্প কোন পথ নেই।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের একটি অন্যতম দিক হলো বন্ধুত্ব। পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্বাস ও ভালোবাসার দ্বারা এ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সাধারণত সমবয়সীদের মধ্যেই বন্ধুত্ব হলেও মানব সমাজে অসম বয়সী বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ইসলাম ধর্মে মানুষের ব্যক্তিগত এ পছন্দের বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা প্রদান করেছে। প্রাথমিক যুগের শরিয়া আইনবিদদের মতানুযায়ী অমুসলিমদের সাথে কোনরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয নয়। তাদের মতের সমর্থনে তাঁরা দলীল পেশ করেন নিম্নোক্ত আয়াত :

১৯। আল কুরআন, ৯৬:০১
২০। ইমাম ইবনে মাযাহ, mbvb, বাবু ফাদলিন উলাম ওয়াল হাবছু আল তলাবিল ইলমি, হাদীস নং- ২২৪
২১। আল হাদীস, উদ্ধৃত: সাইয়্যেদ মুফতী মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, KvIqvB'j wdKn, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৭৪, পৃ. ৩৬৫

Dhaka University Institutional Repository

“হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না” ।[২২]

এছাড়া আল কুরআনের আরো একটি আয়াতে এ নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ আছে।[২৩] পরবর্তীকালের ইসলামী আইনবিদগণ মনে করেন, ইসলামে ঢালাওভাবে বন্ধুত্ব নিষেধ করা হয়নি। বরং বন্ধুত্বের মাত্রাকে সীমিত করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে সমস্ত ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব করলে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি হওয়ার আশংকা বিদ্যমান শুধু সেসব ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব করা হারাম। আর উপযুক্ত আয়াতে কারীমার উদ্দেশ্যে এরূপই। তাছাড়া সূরা মায়িদার পঞ্চম আয়াতের শানে নুযুল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এটি একটি বিশেষ অবস্থানের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে।[২৪]

সুতরাং সর্বাবস্থায় একে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে বন্ধুত্বের ন্যায় গভীর ও মানবিক আবেগপূর্ণ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা যায় না। উপরোক্ত আয়াতে ‘ওলী’ শব্দটির ব্যাখ্যায়ও নানা ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। সাধারণত ‘ওলী’ শব্দটি বন্ধু, সাথী, সঙ্গী, সহকর্মী, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, স্থলাভিত্তিক ইত্যাদি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে (আল কুরআন, ৫:৫) ওলী শব্দটি বন্ধু না বুঝিয়ে বরং অভিভাবক বা পথনির্দেশ বন্ধু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৫] অভিভাবক হিসেবে ওলী অর্থের ব্যবহার ইসলামী শরীয়ার উভয় প্রকার আইনবিদদের মতামত সমন্বয় করে। উভয়ের দৃষ্টিতেই এরূপ বন্ধুত্ব, যা মুসলিমগণকে অমুসলিমদের নির্দেশ শুনতে বাধ্য করে, অবশ্যই হারাম ও অবৈধ।

অন্য দিকে সাধারভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পরিচালনার জন্য মুসলিমদেরকে শুধু উৎসাহই প্রদান করা হয়নি বরং নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে। বিশেষত ইসলামের কোনরূপ ক্ষতির সাথে জড়িত নয় যেসব অমুসলিম, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও বন্ধুসুলভ সাহায্য সহযোগিতা করা মুসলিমদের অন্যতম কর্তব্যও বটে। আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেছেন, “দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করে নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

২২। আল কুরআন, ৫: ৫১
২৩। আল কুরআন, ৩ : ২৮
২৪। মুফতী মুহাম্মদ শাফী, (অনু:মহিউদ্দীন খান), gv0Awidj KiAvb, কুরআন মুদ্রন প্রকল্প, মদীনা : ১৪২৩ হি., পৃ.৩৩৫
২৫। Dr. Muzammil Siddqi/islamonline.com/friendshiptonon-muslim/html

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো যালিম”।[২৬]

এরূপ নির্দেশনা সম্বলিত সরাসরি আয়াত না থাকলেও পবিত্র কুরআনে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের গ্রহণ করার ব্যাপারে আরো বেশ কিছু ইঙ্গিতবহ আয়াত লক্ষণীয়।[২৭] শরিয়ার বিজ্ঞ আইনবিদগণ এগুলোকেও বন্ধুত্বের দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গবেষণায় বাংলাদেশে বন্ধুত্বের যে চিত্র পাওয়া যায় ইসলামী আইনানুসারে সন্তোষজনকই বলা চলে। কেননা বাংলাদেশের অমুসলিমগণ সাধারণভাবে ইসলামের ক্ষতিসাধনে তৎপর নয়। এক্ষেত্রে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও বন্ধুসুলভ আচরণ করা ইসলামেরই দাবী।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের আরো গভীরতম অবস্থা হলো বিবাহ। বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে দু'জন মানুষের মধ্যকার সর্ববিধ বাঁধা অপসারিত হয়। আল কুরআনে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্থাপিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পরস্পরের পোষাক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যা এ সম্পর্কের সর্বোচ্চ ঘনিষ্টতার কথা প্রমাণ করে।[২৮] বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম শর্ত সাপেক্ষে অমুসলিমদের বিবাহ করা জায়েয বলে বিধান প্রদান করেছে।

এক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হলো- অমুসলিমদের আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী বা খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত- তারা নাস্তিক বা মুশরিক তথা একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাসী হতে পারবে না। তৃতীয় শর্ত-মুসলিম পুরুষের সাথে আহলে কিতাব নারীর বিয়ে হতে হবে। মুসলিম নারী এক্ষেত্রে আহলে কিতাবী পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না। চতুর্থ শর্ত-এ বিবাহ দারুল ইসলাম বা ইসলাম ও মুসলিমের জন্য নিরাপদ রাষ্ট্রে হতে হবে।[২৯] মুসলিম-অমুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে আল কুরআনের বাণী : “আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস হালাল করা হলো। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্য দ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্য দ্রব্য তাদের জন্য বৈধ; এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, যদি তোমরা তাদের মাহর প্রদান কর-বিবাহের জন্য; প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নহে। কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে

২৬। আল কুরআন, ৬০ : ৮-৯

২৭। আল কুরআন, ৩ : ২৮

২৮। Maulana Mohammad Yousuf Ludhianri, `*Marriage between Muslim and Non Muslims'* http://www.jannah.org/intermarrige.html

২৯। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী, C৷¸ ³, পৃ.৩১৩

আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে" ।[৩০] এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইউসুফ আলী বলেন, "Social intercourse, intermarriage is permitted with the people of the book. A Muslim man marry a woman from their ranks on the same terms as he would may marry a Muslim woman, he must give her an economic and moral status, and must not be actuated merely by motives of lust or physical desire."[৩১]

অবশ্য বর্তমানকালের মুফতীদের মতে আহলে কিতাব মেয়েগণ যদি পূর্ণভাবে তাওরাত বা ইঞ্জিলের অনুসারী হয় তবে বর্তমানেও তাদের বিবাহ করা বৈধ। তবে যদি তাওহীদের বিপরীত শিরকযুক্ত ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী হয় এবং আসমানী কিতাবের বিকৃত রূপের অনুসারী হয় তবে তাদেরকে বিবাহ করা হতে বিরত থাকাই কাম্য হবে।[৩২] বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম-অমুসলিমদের বিয়ে খুব একটা দেখা যায় না বললেই চলে। এ হিসেবে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান পালিত হচ্ছে একথা বলা চলে নির্দ্বিধায়। তবে ধর্মান্তর করে ইসলাম গ্রহণ করার পর বিয়ের ঘটনা বিরল নয়। সেক্ষেত্রে ইসলামের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, কেননা দু'জন মুসলিমের পারস্পরিক বিবাহ নাজায়েয হবার কোনরূপ বিধান ইসলামে নেই। বরং এটি বৈধ ও কল্যাণকর বলেই ইসলামী আইনবিদগণ মনে করেন। ইসলাম গ্রহণের পর বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী: "মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সহিত তোমরা বিবাহ দিও না" ।[৩৩]

আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য তা হলো প্রতিবেশী হিসেবে মুসলিম-অমুসলিমদের পারস্পরিক আচরণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থান বেশ চমৎকার। প্রতিবেশী, মুসলিম হোক বা অমুসলিম, এদেশের মুসলিমগণ সকলের সাথেই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রক্ষা করেই চলে। আর এটাই ইসলামের বিধান। আল কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না, এবং পিতা-মাতা,

---

৩০। আল কুরআন, ৫ : ৫
৩১। Allama Yousuf Ali, *The Holy Quran*, Amane corp, Maryland :1977, P.241
৩২। আশরাফ আলী থানবী, Zvdmx‡i eqvbj KiAvb, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৯৭৬, পৃ . ৩৫
৩৩। আল কুরআন, ২ : ২২১

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দুর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে" ।[৩৪]

নিকট প্রতিবেশী, দুর প্রতিবেশী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সদ্ব্যবহার করা ইসলামের অন্যতম নির্দেশনা। মহানবী (সা.) নানাভাবে মুসলমানদেরকে এ দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়" ।[৩৫] আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। প্রশ্ন করা হলো, হে রাসূলুল্লাহ! কে সেই ব্যক্তি? জবাবে তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না" ।[৩৬] "ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তিসহকারে খানা খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে অভুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে" ।[৩৭] প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও ইসলাম অর্পিত দায়িত্বের মাত্রা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, "জিবরাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে (এত বেশি) তাগিদ দিচ্ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল তিনি তাদেরকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন" ।[৩৮]

বস্তুত বাংলাদেশের মুসলিমগণ ভালভাবেই প্রতিবেশীকে গ্রহণ করেছেন। ইসলাম প্রদত্ত অধিকার পূর্ণরূপে প্রদান করে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। তবে যারা প্রতিবেশী হিসেবে অমুসলিমদেরকে গ্রহণীয় মনে করেননা কিংবা তাদের সাথে অশোভন আচরণ করে থাকেন তারা ইসলামের প্রকৃত অনুসারী নয়। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাদেরেকেই সচেষ্ট হতে হবে।

অমুসলিম মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও ব্যবহারিক নীতিমালা ইসলামী বিধানের পূর্ণাঙ্গতা ঘোষণা করে। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মুসলিমগণ জন্ম ও বংশগতভাবে মুসলিম সেহেতু মাতা পিতা ও আত্মীয়-পরিজনের মুসলিম হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে এদেশে যারা অন্য ধর্ম হতে ইসলাম ধর্মে নবদীক্ষিত তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের এ বিধানটি প্রযোজ্য।

৩৪। আল কুরআন, ৪: ৩৬
৩৫। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, cÖ¸ ³, পৃ. ৪৩৬
৩৬। ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী , Avm mvnxn (৩য় খ.), দারু ইবন কাসীর, বৈরুত : ১৯৮৭ ,পৃ . ১৪৫
৩৭। ইমাম বায়হাকী, mbvbj Keiï, মাকতাবাতু দারিল বায, মক্কা : ১৯৯৪, পৃ. ২৬৫
৩৮। ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, cÖ¸ ³, পৃ . ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত এদেশে এরূপাবস্থায় মাতাপিতা ও আত্মীয়-পরিজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতেই বেশি দেখা যায়। আবার নবদীক্ষিত মুসলিম সম্পর্ক রাখতে চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে অমুসলিম পরিবার হতে বাঁধার সৃষ্টি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত অবস্থাদ্বয়ের কোনটিই কাম্য নয়। বরং ইসলাম গ্রহণের পরও মাতাপিতার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখাই ইসলামের বিধান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলাও আল কুরআনে নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৩৯] মহানবী (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনীতেও এ ধরণের উত্তম ব্যবহারের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, "হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তার অমুসলিম মাতা সাহায্য প্রার্থী হয়ে মদীনায় তার কাছে আগমন করেন। অমুসলিম মায়ের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে। সে সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে তিনি রাসুলূল্লাহ (সা.) এর কাছে আসলে তাকে নিদের্শ দেয়া হলো, মা যে-ই হন না কেন? তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে"।[৪০] নিম্নোক্ত ঘটনাতেও অমুসলিম মায়ের প্রতি সম্মান ও মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) এর মা ছিলেন মুশরিক। একদা তিনি বিরক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালিগালাজ শুরু করলে হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) ব্যথিত হয়ে কেঁদে ফেলেন ও সাথে সাথে মহানবী (সা.) এর দরবারে হাজির হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমার মা আপনার শানে বেয়াদবী করতে শুরু করেছেন। আপনি তার প্রতি দোয়া করুন। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) হাত তুলে দোয়া করলেন- হে আমার রব! আবু হুরায়রাহর (রা.) মাতাকে হেদায়েত করুন। হযরত আবু হুরায়রাহ তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরলেন, ঘরের বন্ধ দরজায় ঘা দিলেন। কিছুক্ষণ পর দরজা খুললে দেখলেন তার মা গোসল করে কাপড় পড়ে আছেন ও তাকে বললেন যে আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁরই রাসূল"।[৪১] এ ঘটনায় দুটি বিষয় দেখা যায়। প্রাণাধিক প্রিয় রাসূলুল্লাহ(সা.)কে গালিগালাজ করার পরও আবু হুরায়রাহ কর্তৃক মাকে কিছু না বলা এবং তার জন্য রাসূলের নিকট দোয়া চাওয়া। আর অপরটি রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সহণশীল আচরণ ও দোয়া করা। বস্তুত এটাই ইসলামের সুমহান আদর্শ।

বাংলাদেশের জনগণ ঐতিহ্যগতভাবে অতিথিপরায়ণ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই অতিথি হিসেবে আদর-আপ্যায়ন ও সমাদর করার সংস্কৃতি এদেশের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বন্ধু-বান্ধব,

---

৩৯। আল কুরআন, ১৭: ২৩-২৪

৪০। মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী, Avm mvnxn, (2q L.) cv¸ ³, পৃ. ৮৮৪

৪১। ইমাম বায়হাকী, cv¸ ³, পৃ.৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সহকর্মী, পরিচিতজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের মাঝেই পারস্পরিক যাতায়াত বিদ্যমান থাকায় আতিথিয়তা বাংলার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকাও অপরিসীম। ইসলাম ধর্মে আতিথেয়তার গুণকে প্রশংসা করা হয়েছে নানাভাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় জীবনে এর বাস্তবায়ন করে মুসলিমদের জন্য এক অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন। ন্যায় ও সদয় ব্যবহারে তিনি কখনোই ধর্ম বিবেচনায় আনে নি। বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) বিধর্মী অতিথির মলমূত্র স্বহস্তে ধৌত করেছেন, ইসলামের অতি বড় শত্রুর অন্তোষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছেন, ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। অনেক সময় তার মধুর ব্যবহারে বিধর্মীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে।[৪২]

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন, “ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মেহমান হয়েছিলাম। মহানবী (সা.) এর ঘরে যে কয়টি বকরী ছিল সব কয়টির দুধই আমি পান করে ফেললাম। ফলে সে রাতে মহানবী (সা.) এর পরিবার পরিজন অভুক্ত অবস্থায় থাকতে বাধ্য হন। তথাপিও তিনি আমার প্রতি বিরক্ত হননি”।[৪৩] এরূপ আরো একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। একবার এক কাফির নবী (সা.) এর ঘরে এসে মেহমান হল। নবী (সা.) একটি ছাগল দোহণ করে এনে তাকে খেতে দিলেন। সে এক চুমুকেই সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলল। তারপর আর একটি ছাগল দোহণ করে আনা হল। এভাবে পর্যায়ক্রমে সে সাতটি ছাগলের দুধ পান করার পরও তৃপ্ত হলো না। কিন্তু নবী (সা.) অম্লান বদনে তাকে দুধ পান করাতে থাকলেন।[৪৪]

শুধু তা-ই নয়, যুদ্ধবন্দীদের প্রতিও রাসূলুল্লাহ (সা.) আতিথেয়তার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে এর নজীর আর দ্বিতীয়টি নেই। বদর যুদ্ধে ৭০ জন অমুসলিম বন্দী হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বন্দীদেরকে সাহাবীদের দায়িত্বে দিয়ে আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদেশে সাহাবীগণ উত্তম চরিত্রের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তারা নিজেরা খেজুর খেয়ে অর্থ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাতেন, অথচ বন্দীদের খেতে দিতেন যবের রুটি; নিজেরা পায়ে হেঁটে পথ চলতেন আর বন্দীরা উটের পিঠে সওয়ার হতেন।[৪৫] আধুনিক সভ্যতা আর মানবতার জয়গান মুখরিত এ বিশ্বে এরকম ব্যবহারের কল্পনাও কেউ করতে পারে না।

৪২। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, Bmjvg cm½, রেনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা : ১৯৬৩, পৃ .৩
৪৩। আল্লামা শিবলী নু‘মানী, wmivZbex (mv.), অনুবাদ মাওলানা মহিউদ্দিন খান, মদীনা পাবলিকেশন, ঢাকা : ১৯১০ হি., পৃ . ৫০২
৪৪। আল্লামা শিবলী নু‘মানী, cv¸³, পৃ . ৪৬৯
৪৫। ইবন জাবীর আত তাবারী, ZwiLj Dgvg Aj gjK, দারুল কলম, দামেশক : ১৯৮১, পৃ . ১৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আতিথেয়তার পাশাপাশি উপহার আদান-প্রদানেও মুসলিমদের উদারনৈতিক মানষিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদিয়া তথা উপহার দেয়া নেয়াকে সম্প্রীতি রক্ষা ও সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন "তোমরা একে অন্যকে হাদিয়া দিবে, হাদিয়া অন্তরের কলুষতা দূর করে। এক পড়ৃশি অপর পড়ৃশিকে হাদিয়া দিতে যেন অবহেলা না করে এবং কেউ যেন সামান্য মনে না করে যদিও তা এক টুকরা বকরীর ক্ষুরও হয়"।[৪৬] তিনি আরো বলেন- "যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন তাতে কিছু পানি অতিরিক্ত দিবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে"।[৪৭]

শুধু হাদিয়া প্রদানই নয় হাদিয়া গ্রহণও ইসলামে জায়েয।[৪৮] আর হাদিয়া আদান-প্রদান জাতি-ধর্ম-গোত্রের কোনরূপ বৈষম্য ইসলামে করা হয়নি। হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যাকে সুগন্ধি দান করা হয়, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা এটি হালকা জিনিস অথচ সুগন্ধযুক্ত"।[৪৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ব্যক্তিগত জীবনেও অমুসলিমদের সাথে হাদিয়া আদান-প্রদান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫০]

ধর্মপালনের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত অন্যকে ধর্মপালনে বাঁধা না দেয়া, জোর জবরদস্তির মাধ্যমে নিজ ধর্মের প্রচারণা না চালানো, অন্য ধর্মের উপাসনালয় বা ধর্মীয় স্থানকে সম্মান দেখানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ইসলামের উদার ও সহণশীল আর্দশের প্রতিফলন দেখা যায়। ধর্মমত গ্রহণে ইসলামের প্রধানতম দিক নির্দেশনা হলো যে ব্যক্তি তার নিজ ইচ্ছায় যে কোন ধর্ম পালন করতে পারবে। জোর করে কোন ধর্মমত কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ : "দ্বীন সম্পর্কে জোর জবরদস্তি নেই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তা অস্বীকার করবে ও আল্লাহতে ঈমান আনবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়"।[৫১]

"রাসূলগণের দায়িত্ব শুধু (ইসলামের দাওয়াত) পৌঁছে দেয়া"।[৫২] রাসূলুল্লাহ (সা.) ইয়ামানে নিযুক্ত শাসনকর্তা হযরত মুয়াজ বিন জাবালকে বলেছিলেন,"ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কাউকে তার

৪৬। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, cv¸ ³, পৃ. ৪৪৬
৪৭। ইমাম মুসলিম, cv¸ ³, পৃ. ৩৬৫
৪৮। ইউসুফ কারযাভী, Avj nvjvi Iqvj nvivg wdj Bmjvg, মাকতাবাতুল ইসলামী , বৈরুত : ১৯৭৮, পৃ. ৩৩২
৪৯। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, cv¸ ³, পৃ. ৪৪৬
৫০। ইমাম নাসাঈ, bvmvC kixd, কুতুবখানা রাশিদিয়া, ঢাকা: ১৯৬৫, পৃ.১৩৫
৫১। আল কুরআন, ২: ২৫৬
৫২। আল কুরআন, ১৬: ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করা যাবে না"।[৫৩] জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ যেমন ইসলামে বৈধ নয়, তেমনি অমুসলিমদের ধর্মপালনের ক্ষেত্রে বাধাঁ দানও ইসলাম স্বীকৃত নয়। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে স্বতন্ত্র্য একটি সূরাও নাযিল করা হয়েছে।[৫৪]

অমুসলিমদের স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের সুযোগ দেয়াও আল্লাহর ইচ্ছারই বাস্তবায়ন করার সমতুল্য।[৫৫] এ প্রসঙ্গে নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে মহানবী (সা.) এর কৃত আচরণটি উল্লেখযোগ্য। নাজরানের অধিবাসীদের পক্ষ হতে ৬০জন পাদ্রী পুরোহিতের এক বিশাল দল মদীনাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। যখন তারা মদীনায় আগমন করেন তখন সাহাবীদের অনেকে আপত্তি তুললেন। কিন্তু বিশ্বনবী (সা.) সে আপত্তি কানে না তুলে মসজিদে নববীতেই তাদেরকে প্রার্থনা করার অনুমতি প্রদান করলেন। একই মসজিদে কাবার দিকে মুখ করে মুসলমানগণ ও বিপরীত দিকে খ্রিস্টানগণ একই সময়ে উপাসনা করলেন।[৫৬] বিশ্বের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সম্পীতির এমন নজীর দ্বিতীয়টি নেই।

শুধু মৌখিক ভাবেই নয় বরং ইসলাম লিখিতভাবে আইনের মাধ্যমে অমুসলিমদের এ অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। মদীনা সনদের ২৫ হতে ৩৫ নম্বর ধারাগুলোতে প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কে পৃথক পৃথকভাবে নাম উল্লেখ পূর্বক তাদের ধর্মপালনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "বানু আওফ গোত্রের ইয়াহুদীগণ মুসলমানদের সাথে এক সম্প্রদায়। ইয়াহুদীরা তাদের ধর্ম পালন করে এবং মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। এ বিধান তাদেরও তাদের মাওয়ালীদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করবে তার ফল কেবল সে ও তার পরিবারের ওপর বর্তাবে"।[৫৭] তৎপরবর্তী ধারাগুলোতে আছে বানু আওফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানু নাজার গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে বানু আওফ গোত্রের ইয়াহুদীদের সাথে বানু হারিছ, বানু সাঈদা, বানু জুশাম, বানু আউস, জাফনা, বানু শুত্বনা, বানু বিতানা, বানু সালমার মাওয়ালীদের সমতা বিধান পূর্বক পৃথক পৃথক বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৫৩। মাওলানা রুহুল আমিন খান, mv¤c`wqK m¤cÖxwZ ¯vc‡b gnvbex (mv.) Gi Av`k Ges Bmjvgx mgv‡R Zvi cÖwZdjb, C‡` wgjv`bex (mv.) ¯iwYKv, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৩, পৃ . ৫৮

৫৪। আল কুরআন, ১০৯: ১-৬

৫৫। আল কুরআন, ২২:৪০

৫৬। মাওলানা রূহুল আমীন খান, cv¸³, পৃ . ৫৭

৫৭। আহমদ যাকী সাফওয়াত, RvgnvivZ ivmvBwj Avivev, (1g L.), বৈরুত : ১৯৭৩, পৃ . ৩১

Dhaka University Institutional Repository

সিনাই পর্বতের নিকটবর্তী সেন্টক্যাথরিন গীর্জার সাধু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে প্রদত্ত মহানবী (সা.) এর সনদের মূলকথা ছিল তাদের (অমুসলিমদের) শত্রুদের প্রতিরোধ করা হবে। ধর্ম পরিবর্তনে তাদেরকে বাধ্য করা হবে না। তাদের ধর্ম, প্রাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই নিরাপদ থাকবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাদের অধিকারে থাকবে। তাদের পাদ্রি, পূজারী ও পুরোহিত কাউকেও বরখাস্ত করা হবে না এবং তাদের দেবদেবীদের মূর্তি বিনষ্ট করা হবে না।[৫৮]

শুধু নবী (সা.)ই নন এবং তাঁর পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মপালন ও উপসনালয়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। হযরত আবুবকর (রা.) হিরাবাসীদের সাথে একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেন। আর তার মূলকথা ছিল তাদের খানকাহ, গির্জাগুলোর কোন ক্ষতি করা হবে না, প্রয়োজনের সময় আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা যেসব ইমারতের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে সেগুলো বহাল রাখা হবে। নকুশ ও ঘণ্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না। উৎসবের সময় ক্রুশ নিয়ে শোভাযাত্রা বের করার উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না।[৫৯]

জেরুযালেম বিজয়ের সময় হযরত ওমর (রা.) সেখানে অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় নামাযের সময় হলে খ্রিস্টান পাদ্রীরা তাকে গীর্জাতেই নামায আদায়ের কথা বলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) গীর্জায় নামায আদায় না করে খোলা ময়দানে নামায পড়লেন। কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে এ ঘটনাকে প্রামাণ্য দলীল ধরে যদি পরবর্তীতে মুসলিমগণ গীর্জায় নামাজ পড়া শুরু করে এর দখল নিয়ে নেয়। অতঃপর খলীফা ওমর (রা.) সেখানকার খ্রিস্টানদের একটি নিরাপত্তা নামা প্রদান করেন। তাতে লিখিত ছিল-

"তাদের বাসগৃহ ও উপসনালয়গুলোতে কোনরূপ পরিবর্তন ধ্বংস, ক্ষতিসাধন কিছুই করা হবে না। তাদের অধিকার হতে সেগুলো কেঁড়ে নেয়াও হবে না বরং সেগুলো তাদের দখলেই থাকবে। এগুলোকে ক্রুশশুন্য করা হবে না। তাদের ধর্মপালনে কোনরূপ বাঁধা প্রদান করা হবে না"।[৬০]

আনাত শহর বিজয়ী হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ সেখানকার অধিবাসীদের প্রদত্ত নিরাপত্তা নামায় লিখেন- তারা তাদের ঘণ্টা ধ্বনি রাত্র দিন যে কোন সময় বাজাতে পারবে, তবে মুসলিমদের নামাযের সময় তা বন্ধ রাখতে হবে। তাছাড়া তাদের ক্রুশবহণের অধিকারও বলবৎ থাকবে।[৬১] বাংলাদেশের

৫৮। সৈয়দ আমীর আলী, w' w¯úwiU Ae Bmjvg (Abev' gnv¤§' ' i‡ek Avjx Lvb), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯৩, পৃ. ১২৮

৫৯। মাওলানা রুহুল আমিন খান, cv¸³, পৃ. ৫৯

৬০। আত তাবাবী, 'viæj gvAwid (৩য় খ.) মিশর : তারিখ বিহীন, পৃ. ৬০৯

৬১ । আবু ইউসুফ, wKZve Avj LvivR : দারুল মাআরিফ, মিশর : ১৯৭৭, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষিতে ধর্মীয় স্বাধীনতা দানের এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। স্বাধীনতা পর আজ পর্যন্ত কোথাও জোরপূর্বক ধর্মান্তর, উপাসনালয় ধ্বংস, ধর্মপালনে বাঁধাদান এরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায় নি। মদীনা সনদে সকল জাতিসত্তার সমানাধিকার বর্ণনা করা হয়েছে।[৬২]

চাকুরি ও দায়িত্বপূর্ণ পদলাভের ব্যাপারে ইসলামে অমুসলিমদের কোনরূপ বাঁধা নিষেধ আরোপ করেনি। তবে ইসলামী রাষ্ট্র, যা ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত, নীতি নির্ধারণীয় ক্ষেত্রে ও প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদগুলোতে নিয়োগ লাভের জন্য বিবেচ্য হন না। কেননা অমুসলিমগণ ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিশ্বাসী না হওয়ায় ইসলামী নীতিমালায় পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী নন এবং এর প্রয়োগের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ এরূপ সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারেন না। তবে এছাড়া অন্যান্য পদে অধিকারী হবেন। তারা প্রশাসনের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ লাভ করতে পারবেন। রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করতে পারবেন।[৬৩]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এর বেশ কিছু উদাহরণ লক্ষণীয়। খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর শাসনামলের একজন গভর্ণর ছিলেন অমুসলিম, তাছাড়া মদীনাতে রাজস্ব খাতের হিসাব রাখার জন্য সিরিয়ার গভর্ণর হযরত ওমরের নিকট একজন গ্রীক খ্রিস্টানকে পাঠিয়েছিলেন বলেও জানা যায়।[৬৪]

এতদ্ব্যতীয় সামরিক বাহিনীতে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তিও ইসলামে বৈধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মদীনা সনদে সামরিক প্রয়োজনে মদীনা রাষ্ট্রের সব জাতি, বর্ণ ও গোত্রের সমান অধিকারের কথাই বলা হয়েছে। ড. সোলায়মান বলেন, "মহানবী (সা.) মদীনার অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমনের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে মুহাজির আনসার, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক অর্থাৎ মদীনার সমস্ত নাগরিকদের সমন্বয়ে একটি কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সনদের মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন"।[৬৫]

এমনকি দেশ রক্ষায় প্রয়োজনীয় সম্পদ খরচকেও সমানভাবে ভাগ করা হয়েছে মদীনা সনদে। বলা হয়েছে ইয়াহুদীগণ তাদের খরচ ও মুসলিমগণ তাদের খরচ বহণ করবে।[৬৬] হযরত ওমর (রা.) ও

৬২। ইবন হিশাম, (অনুঃ সম্পাদনা পরিষদ), mxivZbex (৩য় খ.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ পৃ.২১০

৬৩। মুহাম্মদ সালাহউদ্দীন, Bmjv‡g gvbewaKvi, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯২, পৃ. ২৯৫

৬৪। Dr. Muhammad Hamidullah, The status of non Muslim in Islam, http://www.islamonline.com/nonmuslim.htm.

৬৫। ড. মুহাম্মদ সোলায়মান, mvgwRK AwaKvi wbwðZ Ki‡Y g'xbv mb‡'i fwgKv, (৭ম খ.), ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া : ১৯৯৯, পৃ. ৫০

৬৬। আহমদ যাকী সাখাওয়াত, cv¸³, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[৬৭] তার শাসনকালে সা'দ রুযবান নামক এক অমুসলিম কারিগর দ্বারা কুফার বায়তুলমাল পুনঃনির্মাণ করেন এবং তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে হযরত ওমরের নিকট পাঠিয়ে দেন। হযরত ওমর (রা.) তার জন্য বায়তুল মাল হতে আজীবনের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন।[৬৮]

অমুসলিমদের চাকুরি ও দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আইনগত কোন বাঁধা নেই। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়ায় এদেশে একেবারে সর্বোচ্চ পদ লাভের ক্ষেত্রেও তারা অযোগ্য নন। বাংলাদেশের মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা পর্যালোচনায় প্রশাসন তথা দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে অমুসলিমদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম লেনদেন ও পারস্পরিক ব্যবসা বাণিজ্য ইসলামে নাজায়েয নয়। তবে তা ইসলামী সীমারেখার মধ্যে হতে হবে। কোনরূপ হারাম পণ্যের লেনদেন জায়েয নয়, প্রতারণা করা, ওজনে কম দেয়া, বেশি মূল্য রাখা, মজুদদারী, কালোবাজারী ইত্যাদি বিষয় থেকেও বিরত থাকতে হবে। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে জাতি ধর্মের কোনরূপ বৈষম্য ইসলামে নেই। অমুসলিমদের নিকট হতে ঋণ যেমন গ্রহণ করা যাবে তেমনি তাদেকে ঋণ প্রদানেরও কোন বাঁধা নেই।

সাহাবী আবু হারদাদ সানামীর নিকট জনৈক ইয়াহুদীর পাওনা ছিল। ইয়াহুদী তাকে ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে হাজির করল। এরপর সিদ্ধান্ত হলো যে, এ মুহূর্তে ইয়াহুদীর পাওনা পরিশোধ করতে হবে। সাহাবী তাঁর অপরগাতার কথা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইয়াহুদী তা মেনে না নিলে তাকে পুনরায় ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হলো। এমতাবস্থায় সাহাবী আরজ করলেন- খায়বর হতে ফিরে আসার পর তিনি এ কর্জ পরিশোধের সক্ষম হবেন। নবী (সা.) হারদাদের কোন কথাই শুনলেন না। বরং তিনি হারদাদের পরিধানের কাপড় খুলে ইয়াহুদীকে দিয়ে ঋণ পরিশোধ করলেন। পরবর্তীতে হারদাদ মাথার পাগড়ী খুলে পরিধান করে বাড়ী ফিরে গেলেন।[৬৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং নিজ জীবনের একটি ঘটনাও এখানে উল্লেখ করা হলো- যায়দ ইবন সাদ ছিলেন একজন ইয়াহুদী মহাজন। যিনি পরবর্তীতে মুসলিম হন। ইয়াহুদী থাকাবস্থায় অর্থলগ্নীর ভিত্তিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) তার নিকট হতে একবার কিছু ঋণ গ্রহণ করেন। পরিশোধের শেষ

৬৭। Dr. Muhammad Hamidullah, ibid, http/www.islamonline.com/non-muslim.htm
৬৮। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, C¦¸ 3, পৃ.৫৬৮
৬৯। ইবন হিশাম, C¦¸ 3, (২য় খ.), পৃ.৩০৩

Dhaka University Institutional Repository

সময়সীমা আসার পূর্বেই যায়দ তাগাদা দিতে লাগলেন। এমনকি একবার রাসূলের চাদর ধরে টেনে বলতে লাগলেন, আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানরা তোমরা সবসময়ই এরূপ করে থাক।

যায়দ এর কথায় হযরত ওমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর শত্রু। তুই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে ধৃষ্টতা দেখাচ্ছিস। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুচকি হেসে বললেন, উমর! তোমার কাছ থেকে আমি এরূপ ব্যবহার আশা করিনি। তাকে বুঝানো উচিত ছিল যেন নম্রভাবে তাগাদা দেয় এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়। অতঃপর রাসূল (সা.) হযরত উমরকে বললেন, এখনই তার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং বিশ সা' খেজুর ঋণের অতিরিক্ত দিয়ে দাও।[৭০]

সুরাকা নামক জনৈক সাহাবী এক বেদুইনের নিকট হতে একটি উট ক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করেননি। বেদুইন এজন্য তাকে নবী (সা.) এর সামনে হাজির করে। ঘটনা শুনে নবী (সা.) বেদুইনের পক্ষে রায় দেন এবং তৎক্ষনাৎ মূল্য পরিশোধ করে দিতে আদেশ দিলেন। সাহাবী আরজ করলেন যে, মূল্য পরিশোধের মত অর্থ ও সামর্থ্য তার নেই। এ প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) বেদুইনকে নিদের্শ দিলেন তোমার বিবাদীকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে তোমার পাওনা উসুল করে নাও। বেদুইন তাকে বাজারে নিয়ে যায় ও সত্যি সত্যিই বিক্রি করে দেয়। বাজারে জনৈক মুসলিম সুরাকাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন।[৭১]

বস্তুত অর্থ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে পরিস্কার ও স্পষ্ট থাকাকেই রাসূলুল্লাহ (সা.) পছন্দ করতেন। এক্ষেত্রে ধর্মভেদ কোনরূপ ভূমিকা রাখত না। ফলে অমুসলিমগণও মদীনাতে নির্বিঘ্নে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। ইসলামী বিধান মতে, অমুসলিমগণ নিজেদের পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারবে। যা দ্বারা সে নিজস্ব লোকদের কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম।[৭২] এমনকি যে সব দ্রব্য মুসলিমদের জন্য হারাম কিন্তু অমুসলিমদের জন্য হারাম নয়, যেমন মদ শুকরের মাংস, ইত্যাদি, এসব জিনিসের ব্যবসাও শুধু অমুসলিমদের জন্য বৈধ বলে ইসলাম ঘোষণা দেয়।[৭৩]

৭০। শিবলী নু'মানী, cÖv¸³, ৪৯৬
৭১। মুহাম্মদ সালাহউদ্দীন, cÖv¸³, পৃ. ৩০২
৭২। ইউসুফ কারযাভী, cÖv¸³, পৃ.৭৮
৭৩। মুহাম্মদ মতিউর রহমান, 'ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার,' BmjvwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৩, পৃ . ৩৬

এছাড়াও আর্থিক বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় প্রসঙ্গেও ইসলামে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো বেকার, এতীম ও শারীরিকভাবে অক্ষমদের জন্য অর্থভাতা প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে হযরত উমরের একটি উক্তি বিখ্যাত- "ফোরাতের কূলে একটি কুকুরও না খেয়ে মারা গেলে কাল কিয়ামতের ময়দানে সে জন্য আমাকেই দোষারোপ করা হতে পারে"।[৭৪] দামেস্ক সফরের সময় হযরত উমর (রা.) অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণের আদেশ জারী করেছিলেন।[৭৫] অমুসলিমদের কর বা জিযয়া প্রদানের ক্ষেত্রেও শিথিলতা প্রদান করা হয়েছে ইসলামী শরিয়তে। জিযয়া আদায়ে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করা সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ। হযরত উমর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা চলবে না।[৭৬]

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, "কোন অমুসলিম নাগরিক তার কাছে প্রাপ্য জিযয়া পুরো বা আংশিক দেয়ার আগেই মারা গেলে তা তার উত্তরাধিকারের কাছ থেকে বা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে আদায় করা হবে না"।[৭৭] প্রকৃত পক্ষে অর্থনীতি সামাজিক বৈষম্যের মূল উপাদান। এর সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাব সমাজে সম্প্রীতির বদলে সংঘাতেরই জন্ম দেয়। বাংলাদেশে বিদ্যমান সম্পর্কের আলোচনায় দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশে সব ধর্মের লোকজনই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে পারছে। বিশেষত ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে হিন্দুগণ ঐতিহ্যগতভাবেই বেশ ভাল অবস্থানে রয়েছেন। মুসলিমদের সাথে আর্থিক সম্পর্কের অবস্থাও তাদের নিকট সন্তোষজনক। আইনগত দিক বিবেচনায় ইসলামের সর্বপ্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক আইনের দৃষ্টিতে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান। সকলেরই ন্যায় বিচার লাভের অধিকার রয়েছে।[৭৮]

বস্তুত মুসলিম অমুসলিম যে হোক না কেন চুরি, ধর্ষণ, মানহানিসহ সবধরণের অপরাধেই সাজা-শাস্তি ভোগ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও পরবর্তী সাহাবাগণ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এ প্রেক্ষিতে নিম্নে কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হল :

৭৪। আবুল হাসান আল বালাজুরী, dZûj ej'vb, দারু ইহয়াআত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত : ১৪১১ হি., পৃ.১২৯
৭৫। মুহাম্মদ মতিউর রহমান, cÖv¸³, পৃ. ৩৬
৭৬। আবুল হাসান আল বালাজুরী, cÖv¸³, পৃ.১৩১
৭৭। আবু ইউসুফ, wKZvej LvivR, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২
৭৮। cÖv¸³, পৃ.৭০

Dhaka University Institutional Repository

- তাইমা ইবন উবাইর নামক জনৈক মুনাফিক একবার একটি বর্ম চুরি করে এক ইয়াহুদীর বাড়ীতে পুঁতে রাখে। পরবর্তীতে বর্মটি পাওয়া গেলে ইয়াহুদীকে চোর হিসেবে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। ইয়াহুদী বিষয়টি অস্বীকার করে ও তাইমাকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করেন। এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে মামলাটি নীত হলে তদন্ত সাপেক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইয়াহুদীকে নির্দোষ ঘোষণা করেন।[৭৯]
- বনু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরির দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার হাত কেটে ফেলার রায় দেন। কিন্তু কুরায়শগণ নানা মাধ্যমে এ বিব্রতকর রায়কে সহজ শাস্তিতে পরিণত করার সুপারিশ করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের প্রধান কারণ হলো তারা অপরাধের কারণে শাস্তি দান হতে উচ্চবংশীয় অভিজাতদের রেহাই দিত ও দূর্বলকে শাস্তি প্রদান করত। আল্লাহর শপথ আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবে আমি তাঁর হাতও কেটে ফেলার নির্দেশ দিতাম।[৮০]
- আরবের গাসওয়ান রাজা যুবালা ইবন আরহাম ইসলাম গ্রহণপূর্বক কাবা শরীফে হজ্জ করতে আসলেন। এসময় অসতর্ক অবস্থায় জনৈক বেদুইন তার পোষাকে ময়লা লাগালে যুবালা বেদুইনকে আঘাত করলেন। বেদুইন হযরত ওমরের নিকট বিচার দাবী করলে হযরত ওমর (রা) যুবালাকে বললেন যদি আপনি বেদুইনের নিকট হতে প্রত্যাঘাত না পেতে চান তাহলে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন। যুবালা বললেন, আপনি কি রাজা ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য খেয়াল করছেন না? জবাবে হযরত ওমর (রা.) বলেন, না ইসলামের আইনে সবাই সমান। অতঃপর যুবালা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট হতে একদিন সময় নিয়ে পালিয়ে রোমান সম্রাটের আশ্রয়ে চলে যান।[৮১]
- উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের পুত্র হিশামের বিরুদ্ধে জনৈক খ্রিস্টান অভিযোগ দায়ের করে। ফলে খলীফা ওমর বিন আবদুল আজীজ হিশামের বিরুদ্ধে সমন জারী করেন। অতঃপর আদালতের কাঠগড়ায় বাদী বিবাদী দুজনকে একই কাতারে দাঁড় করিয়ে বিচার পরিচালনা করা

৭৯। আল হাদীস, উদ্ধৃত: ফজলুল করিম,আদর্শ মানব, ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৯৪৭, পৃ.৯১

৮০। মজিবুর রহমান, Bmjv‡gi ‘vó‡Z mve‡fŠg, শাশ্বত ভাতৃত্ব সংকলন-৯১, সৌদী আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ঢাকা : ১৯৯১, পৃ . ১৪০

৮১। মুসতাফা আস সিবায়ী (অনুবাদঃ আকরাম ফারুক), ‘ইসলামী সভ্যতায় মানবপ্রেম’, gvwmK c¤_ex, মার্চ ১৯৯৫, পৃ . ২৪

Dhaka University Institutional Repository

হলো।[৮২] হযরত আলী (রা.) মিসরের গভর্ণরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন বিচার বিভাগকে অবশ্যই সকল প্রকার প্রশাসনিক চাপ থেকে প্রভামুক্ত রাখতে হবে এবং ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির উর্দ্ধে থেকে নির্ভয়ে ও কারো প্রতি আনুকুল্য প্রদর্শন না করে দায়িত্ব পালন করে চলতে হবে।[৮৩]

এরূপই ছিল ইসলামের ন্যায় বিচারের আদর্শ। সকল মানুষ একই সমতায় দাঁড়ানো। এক্ষেত্রে কোনরূপ পক্ষপাত ও অভিজাততন্ত্রের সুযোগ নেই। অমুসলিমগণ আইনগত ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্মের প্রথা ও বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদনের অধিকারেরও দাবী রাখে। তবে তা নির্দিষ্ট কতিপয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। যেমন- ব্যক্তিগত বিষয়াবলী বিবাহ, তালাক, সম্পত্তি বণ্টন, ইসলামী আইনে প্রচলিত নেই এরূপ বিষয় ইত্যাদি। হযরত ওমর ইবন আবদুল আজিজ (রা.) একবার কয়েকটি বিষয়ে অমুসলিমের সমস্যা সমাধানের ফতোয়া জানতে চেয়ে হযরত হাসান আল বসরীকে চিঠি লিখেন। বিষয়গুলো ছিল নিকটাত্মীয়দের বিবাহ, মদ, শুকর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ। হাসান বলেন, ”এক্ষেত্রে আপনি তাদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মীমাংসা করুন। এটাই ইসলামের বিধান। মনগড়া নতুন কিছু আবিষ্কার করবেন না”। [৮৪]

বাংলাদেশের আইনে এরূপ ধারাই প্রচলিত। সাধারণ ফৌজদারী মামলায় মুসলিম-অমুসলিম সমানাধিকার প্রচলিত। আর বিশেষ কিছু বিষয়ে হিন্দু মুসলিমদের প্রচলিত ধর্মীয় আইনে তার মীমাংসা করা হয়। যার সবটুকুই ইসলাম সমর্থিত। অবশ্য গ্রাম্য মজলিস বা পঞ্চায়াতের ক্ষেত্রে সাধারণত যুক্তি, ধর্ম ও প্রচলিত আইনের নিয়ন্ত্রণে একপ্রকার বিচারকার্য সম্পাদন করা হয়, যা ইসলামে অনুমোদিত নয়। বাংলাদেশ সরকার ইসলামী আইনের এরূপ অপব্যবহারের ফলে ইতি মধ্যেই গ্রাম্য ও স্থানীয় পর্যায়ে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করেছে।

জীবনযাপনের অন্যান্য দিকের ন্যায় অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানও দায়িত্বশীল মুসলিমদের যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক। অমুসলিমদের জানমাল সম্পদ সম্প্রদায়ের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা যাবে না। অন্যায়ভাবে তাদের জানমাল বা ইজ্জতের সামান্যতম ক্ষতি করাও হারাম।[৮৫] ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি বর্ণনায় মণীষীগণ বলেন, “মুসলিমদের জন্য রাষ্ট্রে যেরূপ অধিকার

৮২। Ahmed Gaimil Mazzara, `Islam democracy and sociolism,' *Islamic Review*, England :1962, p.8

৮৩। হযরত আলী, ckvmbK kPwV, (অনুবাদ খুরশীদ আলম) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৬, পৃ.৭

৮৪। Abul Ala Moududi, *The Rights of the people of Convenient in the Islamic State*, Karachi University Press, Pakistan : 1968, p.22

৮৫। আবুল হাসান আলী আল মাওয়ারদী, Avi AvnKvgj mjZwbqvn, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তা.বি, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ও সুযোগ সুবিধা থাকবে, তাদের জন্যও সেরূপ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থাকবে। মুসলিমরা যেরূপ শাস্তি বা দণ্ডের সম্মুখীন হবে তারাও অনুরূপ শাস্তি ও দণ্ডের সম্মুখীন হবে"।[৮৬] বস্তুত অমুসলিমদের প্রতি কোনরূপ হত্যা, খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, সম্মানহানি ইত্যাদি আচরণ কখনোই করা যাবে না। হযরত আলী (রা.) এর শাসনামলে একবার এক মুসলিম জনৈক অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি মুসলিমের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। এ ঘটনায় তিনি বলেন, "তারা (অমুসলিমগণ) জিযয়া দিতে সম্মত হয়েছে এ শর্তে যে তাদের ধনসম্পদ ও জীবন আমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনের মতোই সমমর্যাদা সম্পন্ন হবে"।[৮৭]

জানমালের মতো অমুসলিমদের সম্মান সম্ভ্রম নষ্ট করাও হারাম। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মন্দ নামে ডাকা ইত্যাদি করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।[৮৮] এ নিষেধাজ্ঞা শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং মুসলিম-অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন অমুসলিমকে ব্যভিচারের অপবাদ দেবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের বেত দ্বারা প্রহার করা হবে"।[৮৯] এ প্রসঙ্গে ইবনু আবিদীন বলেন,

"তার (অমুসলিমের) গীবতকরা মুসলিমের গীবত করার ন্যায়ই নিষিদ্ধ। কেননা চুক্তির কারণে তারা আমাদের অনুরূপ, সকল অধিকার তার ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। অতএব, মুসলিমের গীবত করা হারাম হলে তার গীবত করাও হারাম হবে। উপরন্ত ইমামগণের মতে, অমুসলিমের প্রতি অবিচার করা অধিকতর জঘণ্য কাজ"।[৯০] অমুসলিমদের প্রতি নির্যাতন, হুমকি ধমকি দেয়া, মানষিক অত্যাচার করা সবই নিষিদ্ধ। বরং তাদের সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করা ইসলামী বিধানমতে জরুরী। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিম্নোক্ত বাণী আমাদেরকে এ ব্যাপারে সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করে:

- "যে ব্যক্তি, কোন লোককে নিরাপত্তা দান করার পর হত্যা করল, জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত, যদিও নিহত ব্যক্তি অমুসলিম হয়"।[৯১]

৮৬। আলাউদ্দীন আল কাসানী, ev`vBqm mvbvB (৭ম খ.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত: তা.বি, পৃ . ২৮৮
৮৭। আল কাসানী, cv¸³, পৃ . ১১১
৮৮। আল কুরআন, ৪৯: ১১
৮৯। তাবারানী, Avj gÖRvgj Kvexi, `viæj wdKi, বৈরুত : তারিখ বিহীন, হাদীস নং- ১৭৬০১
৯০। মুহাম্মদ আমীন ইবন আবিদীন, ivÏj gnZvi (৪র্থ খ.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত : ১৪০৯ হি.,পৃ . ৩৫১
৯১। তাবারানী, cv¸³, হাদিস নং- ১৬৪৯৪

Dhaka University Institutional Repository

- "যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অবিচার করল কিংবা অধিকার ক্ষুন্ন করলো বা তাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দিল, বা তার সন্তুষ্টি ছাড়াই কোন কিছু তার নিকট হতে কেড়ে নিল, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হব"।[৯২]

বাংলাদেশে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক সংঘাত অর্থনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত যে কারণেই হোক না কেন, ইসলামী বিধান মতে তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদিও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খুব একটা দেখা যায় না; তথাপিও সংঘাত ও নির্যাতনের একটি ঘটনাও ইসলামে কাম্য নয়। কেননা ইসলামের মর্মবাণী হলো শান্তি, সাম্য ও বিশ্বমানবতার। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে এবং মানুষে মানুষে শান্তি স্থাপন ইসলামের মূল লক্ষ্য। ইহাজাগতিক শান্তির মধ্য দিয়ে পরকালীন শান্তি তথা মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হবার চেষ্টার মধ্যেই ইসলামের মূলসুর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত।[৯৩] ইসলামের এ মর্মবাণী অন্তরে লালন করে বলেই এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার দেশ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে এবং এ ধারা অবশ্যই অব্যাহত থাকবে। কেননা অতি সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশ ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শত শত মুসলমান শাহাদাত বরণ করার পরও এদেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেও এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্পীতি বজায় থাকবে।

৯২। আবু দাউদ সুলায়মান, Avm mbvb, 'viæj wdKi, বৈরুত: তারিখ বিহীণ, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং-২৬৫৪
৯৩। মুহাম্মদ মতিউর রহমান, cÖ¸³, পৃষ্ঠা . ১৭৯

beg Aa¨vq

c_g cwi‡”Q‘

M‡elYvi mvgwMK gj¨vqb

বিশ্লেষিত তথ্য অনুসারে চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে প্রধানত বিশেষ কোন স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক জাতীয় চেতনার বিরুদ্ধে যে কোন প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীলতা, মৌলবাদী মনোভাব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈরিতা, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রদায়িকতার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী শক্তিগুলো বর্তমানে বাংলাদেশে মোটামুটি শক্তিশালী। এরা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না এবং নারী উন্নয়ন ও প্রগতির বিরোধী। সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে যা উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠার প্রধান প্রতিবন্ধক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক প্রভাব হচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নিজেদের কালো টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক প্রভাব হচ্ছে এর ফলে সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়।

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। এ দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। তবে এর ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রভাবকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। এর ফলে জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ধর্মের চেতনা ও আদর্শকে বিকৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করে। অথচ সাম্প্রদায়িকতা কোন অর্থে ধর্মেরই লজ্ঞণ ও বিরুদ্ধাচারণ। কাজেই বলা যায়, সাম্প্রদায়িকতা সমাজ দেহের কোন একটি বিশেষ অংশের সমস্যা নয় তাই এর কোন খণ্ডিত সমাধানও নেই। সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোগুলোর সঙ্গেই এ সমস্যা সম্পর্কিত।

অতএব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এ পর্যায়ে কতিপয় সুপারিশ রয়েছে। এখানে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে এ সমস্যার সমাধানের জন্য যে সুপারিশগুলো পাওয়া গিয়েছে নিম্নে সেগুলো প্রাধান্যের ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হলো :

(১) অধিক মাত্রায় গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

(২) স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পাঠ্য বিষয় সংযুক্ত করা।

(৩) ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

(৪) পারিবারিকভাবে সন্তানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব তৈরী করা।

সুতরাং উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব হবে।

গবেষণার এ পর্যায়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার জন্য ধর্মকে কোন ভাবেই দায়ী করা যায় না। এর পশ্চাতে অনেক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণও দায়ী। তবে সাম্প্রদায়িকতা মূলত একটি মানষিক ব্যাপার। সাম্প্রদায়িকতা লুকিয়ে থাকে মানুষের মনের গভীরে। বিশেষ বিশেষ ঘটনা, পরিবেশ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রকাশ ঘটে থাকে। এর পিছনে সকল সময় জড়িত থাকে উস্কানীমূলক তৎপরতা এবং রাজনৈতিক দূরভীসন্ধি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সুদূর অতীতের রাজা বাদশাদের আমল থেকে ধর্মের নামে সংঘাতে অসংখ্য মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, অথচ এর একটি যুদ্ধও ধর্ম যুদ্ধ ছিল না। প্রকৃত অর্থে তা ছিল, ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত যে, সাম্প্রদায়িকতা কায়েমী স্বার্থবাদীদের ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি এবং সাম্প্রদায়িকতা তাদের স্বার্থসিদ্ধিরই হাতিয়ারমাত্র। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। কাজেই, সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করতে হলে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করে জনমানষিকতার পরিবর্তন সাধন করতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলো দলের রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে ঘোষণাপত্র-আদর্শ-কর্মসূচী-ইশতেহারে যা উপস্থাপন করেছেন বাস্তব কর্মকাণ্ডে তার প্রতিফলন থাকতে হবে। প্রয়োজনে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনকি আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। সুতরাং বলা যায়, গবেষণার শুরুতে গৃহীত অনুমিত সিদ্ধান্তগুলোই সঠিক ও যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল ও অনুমিত সিদ্ধান্তের মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশ বিশ্বের অনুকরণীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এ দেশ বিশ্বের বুকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যানুপাতিক দিক থেকে ভগ্নাংশ পরিমাণ হলেও জাতীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সিংহভাগ লাভকারী । শিক্ষায়, সরকারি-বেসরকারি চাকুরিতে, ব্যবসায়, শিক্ষকতায়, সংস্কৃতি চর্চায় সংখ্যানুপাতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোন দেশের সংখ্যালঘুরা এত সুযোগ-সুবিধা পায় না। এখানে সেনাবাহিনীতে, পুলিশ বিভাগে, বিচারবিভাগে, মন্ত্রীত্বে, সচিবালয়ে, রেডিও-টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মিডিয়ায় প্রতি তিনজন মুসলমানের পাশে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শতকরা ৩০ ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষক শিক্ষকতা করে থাকেন। এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোন অস্তিত্ব নেই। এদেশের সকল শ্রেণির

সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, আদিবাসী তারা সবাই দীর্ঘকাল থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছে। এ দেশে তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান রীতিমত প্রশংসার যোগ্য। বাংলা এদেশের রাষ্ট্রভাষা, জাতি হিসেবে এ দেশবাসী বাঙ্গালী। মুসলিম অধ্যুষিত এদেশের জনগণ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অধিকার ভোগের অধিকারী। এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চমৎকার। এদেশের হিন্দু, মুসলিম বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যুগযুগ ধরে সম্প্রীতির বন্ধনে বসবাস করছে। এখানে কোন সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু নেই, এখানে সবাই বাংলাদেশী।[১] অতএব, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই আজ প্রকৃত ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। মনুষ্যত্বের জন্য তথা মানব ধর্মের জন্য সংগ্রাম। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাম্প্রদায়িকতাকে একটি প্রধান অনিষ্টকারী সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং মানুষের জীবনে ধর্মের গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করা। বৃহত্তর মানব সমাজের সাম্যের কল্পনায় ধর্মকে উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করার প্রয়াস আজ ব্যর্থ হয়েছে।[২]

পবিত্র কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ । সময় ও যুগ পরিবর্তনশীল। মানব সমাজ ও সভ্যতা এক জায়গায় স্থির থাকেনা। আর এ সব পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পবিত্র গ্রন্থের আদেশ নির্দেশের ভিত্তিতে যুযোপযোগী ব্যাখ্যা দেয়া আলেম সম্প্রদায়ের দায়িত্ব।[৩] তবে যে কথাটি এখানে বলা দরকার তা হচ্ছে, যারা সত্য অর্থে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ধর্মচর্চা করেন তাদের মতাদর্শের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবন যাপনের অধিকার, কথা বলার অধিকার, দাবী দাওয়া তুলে ধরার অধিকার তাদের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার।[৪] আজকের বাংলাদেশে ধর্মচর্চার প্রচেষ্টায় ব্যাপকতা দেখা যাচ্ছে তার এদিকটিকে উপেক্ষা করা গণতান্ত্রিক এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি হতে বাধ্য।[৫] বিশ্বের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই মধ্যপন্থি ইসলামী দেশ। যা যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন তার বাংলাদেশের সফরকালে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী টনিব্লেয়ারও বাংলাদেশকে উদারপন্থি ইসলামী দেশ হিসেবে অভিহিত করেছেন। আজকের বাংলাদেশে যা ঘটছে তা হলো, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন, ধর্ম ব্যবসায়ের বা সাম্প্রদায়িকতার পুনরুজ্জীবন নয়,

---

১। মাওলানা আবদুল আউয়াল, e½eÜ I Bmjvgx gj¨‡eva, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ.৯৩

২। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), evsjv‡`‡ki ev×eË : ag- mv¤cÖ`vqKZvi msKU, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ.১৪৭

৩। মুহাম্মদ আবদুল কাদির , a‡gi bv‡g ivRbxwZ, প্রবাস মনজিল, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ.১৭

৪। মাওলানা আবদুল আউয়াল, cÖv¸³, পৃ.৯৩

৫। হাসানুজ্জামান, agwbi‡c¶Zv I evsjv‡`k HK¨g‡Zi BwZnvm AbmÜvb, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা : ১৯৯২, পৃ . ৪৬

সারা দেশে এখন অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে গভীর হতাশা ব্যঞ্জক পরিস্থিতি বিরাজ করছে ধর্মচর্চার মাধ্যমে এ হতাশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে এদেশের ৯০% মুসলিম জনগোষ্ঠি। পরিস্থিতির মধ্যে এ পরিবর্তন ঘটার ফলে বাংলাদেশে এখন যে সকল ইসলামিক রাজনৈতিক দল আছে সেগুলো ইসলামী শাসন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বললেও তার তুলনায় জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক জীবন ইত্যাদির উপরই তাদেরকে জোর দিতে হচ্ছে বেশি।[৬] বাংলাদেশে এ যাবত কতজন হিন্দু তথাকথিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়েছে তার কোন তালিকা কেউ দিতে পারবেনা। এমনকি এদেশে কোন দল বা গোষ্ঠি কখনো প্রকাশ্যে তো দুরের কথা, গোপনেও হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার কোন ঘোষণা দিয়েছিল বলে প্রমাণ করা যাবেনা। ভারতে উগ্র হিন্দুরা যেভাবে প্রকাশ্যে তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে সংখ্যালঘু মুসলমানদের হত্যা করে, এ দেশের মানুষ যদি সাম্প্রদায়িকই হতো তাহলে এর প্রতিক্রিয়ায় এ দেশে অনেক কিছু ঘটতে পারতো। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত যে, এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোন স্থান নেই এবং এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানসহ ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানব জাতির সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইসলাম একটি বিপ্লব। আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনা জর্জরিত মানব সমাজের এক বৈপ্লবিক জীবন ব্যবস্থা নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে।[৭] পবিত্র ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পরমত সহিঞ্চুতা ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শ। ইসলামে সন্ত্রাসবাদিতার কোন স্থান ও অবকাশ নেই। বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস থেকে বিরত থাকার জন্য পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "তোমরা পৃথিবীতে সন্ত্রাস বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। আরও ঘোষণা করা হয়েছে, বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়েও জঘণ্য"।[৮] "কোন (শত্রু) সম্প্রদায়ের আচরণ যেন তোমাদেরকে ন্যায়নীতি অবলম্বন বা ভারসাম্য রক্ষা না করার অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে না পারে এবং তোমরা ন্যায়নীতি ও ভারসাম্য

৬। বদরুদ্দীন ওমর, evsjv‡‘‡k a‡gi ivR‰bwZK e¨envi, চিরায়ত প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৮৯, পৃ . ৪৬

৭। মোহাম্মদ আসগর খান (সম্পাদিত), Bmjvg ivRbxwZ Ges ivó cwK¯Ívb- AwfÁZv, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা : ১৯৯২, পৃ.৬

৮। আল কুরআন, ২ : ১৯১

অবলম্বন কর, এটাই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী"।[৯] বস্তুত ধর্মীয় ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানব জাতিকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, "বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত, সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখান করুক"।[১০] বিবেক এবং নিজের মনোনিত জীবন পদ্ধতি গ্রহণের স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পবিত্র কুরআনের অপর এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই"।[১১] "যার যার ধর্ম তার নিকট"।[১২] ইসলামই পরমত সহিষ্ণুতা ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার আদেশ ও নির্দেশ দিয়েছে। মহানবী (সা.) অনেক মুশরিককে নিজের দস্তরখানে আতিথেয়তা করেছেন। মসজিদে নববীতে নাজরান এলাকার একদল পাদরীকে তিনি উপাসনা করতে দিয়েছেন। এর চাইতে পরমত সহিষ্ণুতা আর কি হতে পারে? একজন অমুসলিম মণীষী জর্জ বানার্ডস যথার্থই বলতে পেরেছিলেন, যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদ সম্পূর্ণ মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে, একনায়কের শাসনাধীনে আনা হতো তবে একমাত্র মুহাম্মদ (সা.) সর্বাপ্রেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন। এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, রাসূল (সা.) জগতের শ্রেষ্ঠ সংস্কারক।

৯। আল কুরআন, ৫: ৮
১০। আল কুরআন, ১৮ : ২৯
১১। আল কুরআন, ২ : ২৫৬
১২। আল কুরআন, ১০৯ : ৬

wØZxq cwi‡”Q‘

evsjv‡‘‡k mv¤c‘wqK m¤úxwZ ev¯Zevq‡bi m¤vebv I

w‘Kwb‡‘kbvgjK mcwikgvjv

বর্তমানে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের তেমন কোন নজীর পাওয়া যায় না। তথাপিও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন, রক্ষা ও উন্নয়নে সকলেই কাজ করে চলেছেন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার সুধীমহল, মানবতাবাদী সংস্থা সংগঠন, সুশীলসমাজ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ছাত্র-শিক্ষকসহ শিক্ষিত সমাজ সর্বোপরি সকল স্তরের জনগণের ভূমিকাও প্রশংসনীয়। বাস্তব জীবনে তাদের সম্প্রীতি ও সাম্যের আদর্শ অনুসরণ বাংলাদেশের মানুষের উদারনৈতিক মানষিকতারই প্রতিফলন। ব্রিটিশ শাসনামলের কিছু কলংকজনক ঘটনা বাদ দিলে বাংলার ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এবং সহণশীলতার অনুপম নজীর হিসেবে বিশ্ববাসীর নিকট গ্রহণীয় হবে। তথাপি সম্প্রদায় বা ধর্মের ছদ্মাবরণে সংঘটিত ছোট-খাট সংঘাত ও নির্যাতন দূর করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়ন ও রক্ষায় এদেশের মানুষের ঐকান্তিকতা প্রমাণে বেশ কিছু কাজ করা দরকার। আলোচ্য গবেষণার আলোকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষা ও উন্নয়নে যে সব বিষয়ের প্রতি সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও উন্নয়নে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোন দেশের সরকার। কেননা সরকারের কার্যাবলীর মাধ্যমেই একটি দেশ পরিচালিত হয়, বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয়, আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারকে আন্তরিক হতে হবে, উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী আদর্শ সামনে রেখে সকল ধর্মের প্রতি সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে। এমন কোন কাজ করা যাবে না যা দ্বারা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে কারো কোনরূপ মানহানি বা ক্ষতি সাধিত হয়। সরকারের সৎকর্ম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রধানতম হাতিয়ার।

২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করতে পারে। আইনগত বিবেচনায় সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকারের বর্ণনা শুধু সংবিধান কিংবা আইনের বিধানাবলীতে থাকলেই চলবে না। বরং এর যথাযথ ও সার্থক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে

বাংলাদেশের বিচারালয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রাপ্ত সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩. রাজনীতিবিদ ও রাজনীতি বিশ্লেষকদেরকেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়নে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ধর্মীয় ছদ্মাবরণে যেন রাজনৈতিক নির্যাতন না হয় সেদিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার ও ধর্মীয় বৈষম্যের কারণে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের ঘৃন্য পন্থা রাজনীতিবিদগণই বন্ধ করতে পারেন।

৪. অর্থনৈতিক বৈষম্য দুরীকরণ সম্ভব না হলে সাম্প্রদায়িক শান্তির আশা দুরাশা মাত্র। এলক্ষ্যে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ধর্মীয় বৈষম্যমূলক কোনরূপ বিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করা যাবে না। বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অনগ্রসর উপজাতি সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বীদের সুযোগ সুবিধা দানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

৫. সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক ও জটিলতর ক্ষেত্র হলো সামাজিক জীবনাচরণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত অলিখিত সামাজিক নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জরুরী। সমাজপতিগণ ও স্থানীয় প্রশাসন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হলে সামাজিক সম্পর্কের নানা দিক সম্প্রীতির চাদরে আবৃত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

৬. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও উন্নয়নে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষিত সমাজকেও অসামান্য চেতনা বিকাশের দায়িত্ব নিতে হবে। অযৌক্তিক ও কুসংস্কারাছন্ন নিয়মনীতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক বিধানাবলী সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব শিক্ষিত সমাজেরই। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও দাঙ্গার কুফল ও জাতীয় উন্নতিতে এর মারাত্মক প্রভাব প্রসঙ্গে জনগণকে সর্তক করার দায়িত্বও তাদের উপরই বর্তায়।

৭. শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তিকরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার অন্যতম উপায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্বদের জীবনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ইতিবাচক দিকগুলোর বর্ণনা উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদেরকে এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।

৮. ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা আলোচ্য ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। মসজিদের ইমাম, আলেম-ওলামা, পীর মাশায়েখ ইসলামের সুমহান আদর্শ ও সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত প্রদান করে জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এমনিভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ও অন্য ধর্মাবলম্বী পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু গুরু,

পাদ্রী, ফাদার বিশপসহ সব ধর্মীয় নেতাগণ নিজ নিজ ধর্মের সম্প্রীতি ও উদারতার আদর্শ প্রচার করতে পারেন। এতে করে ধর্মপ্রিয় বাংলাদেশের জনগণ নিজ ধর্মের সাথে পরধর্ম সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করতে সচেষ্ট হবে।

৯. শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো দরকার। নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্যধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। সকল ধর্মের উদারতা, নৈতিকতা, পরমত সহিষ্ণুতা, সহণশীলতা ইত্যাদি শিক্ষার জ্ঞান অপর ধর্মের প্রতি মানুষকে সহণশীল করে তুলবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

১০. জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি কঠোর হস্তে দমণ করা, এ লক্ষ্যে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা দরকার।

১১. সকল প্রকার দুনীর্তি অনিয়ম উৎকোচ ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। এতে করে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নৈতিকার মান উন্নত হবে।

১২. দেশের সমৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় সকল নাগরিকের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করা দরকার। সাম্প্রদায়িকতার কারণে যেন দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট না হয় এজন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার।

১৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও উন্নয়নে মিডিয়ার ভূমিকাও অপরিসীম। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এক্ষেত্রে ইতিবাচক সম্প্রীতির খবর পেশ করে জনগণকে উৎসাহিত করতে পারে। আর অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের খবরের যথাযথ ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পেশ করে জনগণের সম্মুখে সত্য প্রকাশ করতে পারে।

১৪. সভা-সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্স আয়োজনের মাধ্যমে দেশের আন্তঃধর্মীয় সামাজিক সম্পর্কের অবস্থান ও সময়োপযোগী কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা করাও আবশ্যক।

১৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। জনগণকে নানাভাবে উৎসাহ অনুপ্রেরণা প্রদান করতে স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

১৬. গবেষকগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর সময়োপযোগী ও যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সম্প্রদায়গুলোর পারস্পরিক আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক,

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পৃথক পৃথক গবেষণার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত।

সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সাম্প্রীতি রক্ষা ও উন্নয়নে এদেশের আপামর জনগণ সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ ব্যতীত এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রকৃত উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। তবে আশার কথা এ যে, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্পীতি এককথায় চমৎকার। এদেশের জনগণও এ ব্যাপারে বেশ সচেতন। সুতরাং পারস্পরিক সম্প্রীতির উন্নয়নে উপরোক্ত সুপারিশমালা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলেই বিশ্বাস করা যায়। কেন না এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিপক্ষ হিসেবে এবং সফল হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চর্চা ও চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সে কারণে পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলার) হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের মিলিত আত্মদানের মাত্র নয় মাসে স্বাধীন দেশ ও বাংলাদেশী জাতি হিসেবে বিশ্বে আত্মমর্যাদা পেয়েছিল বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষ।

Dcmsnvi

ইসলাম শান্তি, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতির ধর্ম। জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র, নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দয়া, সহানুভূতি, সহণশীলতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের শিক্ষাই ইসলাম দেয়। ইসলাম হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। বহুজাতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা একমাত্র ইসলামের বিধানানুযায়ীই সম্ভব। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম-অমুসলিম, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান। বাংলাদেশ তেমনি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট রাষ্ট্র। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিশ্বজুড়ে এর সুখ্যাতি রয়েছে। এদেশের মানুষের মনকে ধর্মের বাহ্যিক আচার বিচারের চেয়ে ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী বেশি আকৃষ্ট করেছে। তাই এদেশে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কখনও জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

এদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সূফী সাধক, পীর, দরবেশ, আউল-বাউলদের অবদান এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এসকল সাধকবৃন্দ তাঁদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য সকল শ্রেণির জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁরা যে ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন সেটা ছিল আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের ঐতিহ্য, পরমত সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য। সেটা বাংলার মন ও মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যে ধারাটি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে সেটি সংঘাত বা বিরোধের ধারা নয়। সেটি হলো বিভিন্ন মতবাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারা এবং সমন্বয়ের ধারা, স্মরণাতীত কাল থেকে প্রেরিত পুরুষ তথা মহামানবগণ, কিংবা উদারচিত্ত মানবতাবাদী শিল্পী- কবি-দার্শনিক-চিন্তাবিদ, বিপ্লবীগণ সবাই সাম্প্রদায়িকতা ঘোচানোর সাধনা ও এর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে মূলত ধর্ম সাধনাই করে গেছেন। এ কালের মানুষকেও তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনেই সাম্প্রদায়িকতার মত চরম অসভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে হবে। তাই স্বার্থান্বেষী মহলের সকল অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে নিতে হবে কঠোর ও সতর্ক পদক্ষেপ । এক্ষেত্রে বলা যায়, ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর নির্বাচন, ৬২ এর শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান সর্বোপরি ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এর সব কিছুই ছিল রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার বিজয়।

গণতান্ত্রিক রাজনীতি সমগ্র বিশ্বে অধিক জনপ্রিয় ও মানবকল্যাণের গ্যারান্টী । এ প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক

রাজনীতিতে এবং রাষ্ট্রের বিকাশ সাধনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রধান অন্তরায়। জাতীয় সংহতি ও জাতি গঠনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। কাজেই আধুনিক জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই । ইসলামও এরূপ নীতিতে বিশ্বাস করেনা। ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম প্রত্যক্ষ নির্দেশের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য তাগিদ দিয়েছে । সুতরাং এদেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম ইসলামের আলোকেই সম্ভব ।

মহানবী (সা.) ইসলামের শান্তি, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, সৌন্দর্য চেতনা ও বিশ্ব মানবতার যে অমোঘ দ্বীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন, সে আলোয় আজ এ দেশবাসী আলোকিত । যুগ যুগ ধরে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-নির্বিশেষে এ দেশে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সহাবস্থান করে আসছে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, উৎসবে-পার্বণে, একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প এদেশের নির্মল আকাশ-বাতাসকে কখনো কলুষিত করেনি। বাংলাদেশের মানুষের হাজার বছরের সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ভালোবাসা, আতিথ্য কোন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি বা দল, গুটিকতক মানুষের অশুভ বুদ্ধি বা চক্রের কারণে নষ্ট হয়ে যাবেনা। এদেশের সচেতন মানুষ অবশ্যই তা প্রতিহত করবে। কেননা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণ ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবের কারণেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী।

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার আদর্শ হচ্ছে ইসলাম সমর্থিত পথে পথচলা । আর তাই ইসলামের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে সমুন্নোত রেখে কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের মনোনিত পথে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার প্রাণের দাবী। কাজেই এদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও অনাচারমুক্ত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা ইসলামের মাধ্যমেই সম্ভব । অতএব, আধুনিক জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি নির্বিশেষে সকলের নিজস্ব কৃষ্টি স্বীকার ও অক্ষুণ্ন রেখে সকলকে একত্রিত করে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা আজ সময়েরও দাবী ।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ দেশ ও জনগণের জন্য গৌরবের বিষয়। বস্তুত এদেশ বিশ্বের সাম্প্রদায়িক সাম্প্রীতির চমৎকার উদাহরণ। এ সম্প্রীতি যুগ যুগ ধরে চলছে এবং চলবে। সুতরাং এদেশে সৃজনশীলতা অব্যাহত থাকুক সাম্প্রদায়িকতার মত যাবতীয় ভাবচিন্তার অবসান হোক । এটাই হোক আমাদের আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ় অঙ্গীকার। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রত্যয় ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায় হোন। আমিন ।

MšcwÄ

Avj KiAvbj Kvixg

Avj KiAvbj Kvixg, BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡‘k, XvKv : 2003

অজয় রায়	:	evOjv I ev½vjx, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৭৭
অমর্ত সেন	:	Rxeb hvÎv I A_bxwZ, কলিকাতা : ১৩৯৭
অতুল চন্দ্র রায় (ড.)	:	fvi‡Zi BwZnvm (২য় খণ্ড), কলিকাতা : ১৯৮৭
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী	:	mnxû j eLvix, ২য় খণ্ড, বায়তুল আফকার আদ দৌলিয়া, সৌদি আরব : ১৯৯৮
আবু দাউদ সুলায়মান	:	Avm mbvb, দারুল ফিকর, বৈরূত : তারিখ বিহীন
আবু ইউসুফ	:	wKZve Avj LvivR, দারুল মাআরিফ, মিশর : ১৯৭৭
আশরাফ আলী থানবী	:	Zvdmx‡i eqvbj KiAvb, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৯৭৬
আল্লামা শিবলী নু'মানী (অনুবাদ মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন)	:	mxivZbex (mv.), মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯১০
আবদুল মমিন চৌধুরী	:	evsjv mwn‡Z¨i BwZnvm, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৭
	:	cvPxb evsjvi BwZnvm I ms¯‹wZ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা : ২০০৯
আবদুল খালেক	:	bvix, মদিনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৯১
আবুল হাশিম	:	Bmjv‡gi gg K_v (অনুবাদ : মুসলিম চৌধুরী), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮১
আবুল মনসুর আহমেদ	:	Avgvi †‘Lv ivRbxwZi cÂvk ermi, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা : ১৯৬৮
আজিজুর রহমান আজাদ	:	†gŠjev‡‘i †Pnviv Pwi Î :GKwU agZwËK, mgvRZwËK I gb¯ÍwËK we‡køl Y, চারদিক, ঢাকা : ১৯৯৫
আব্দুল আউয়াল (মাওলানা)	:	e½ eÜ I Bmjvgx gj¨ †eva, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৯
আবুল হোসেন	:	ms¯‹wZK msKU I mv¤cÖ‘wqKZv, সন্দেশ, ঢাকা : ১৯৯৬

আবু আল সাঈদ : mvZPwjø‡ki ALÐ evsjv Av‡›`vjb cwiK¯Ívb †_‡K evsjv‡`k, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৯

আমজাদ হোসেন : evsjv‡`‡ki ivRbxwZ I ivR‰bwZK `j, ঢাকা : ১৯৯৬

আনোয়ার হোসেন : Bmjvgx wek I evsjv‡`k, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৮৫

আবদুল গাফফার চৌধুরী : Ave`j Mvddvi †PŠaixi Zx²av KjvgবAvgiv evsjv‡`kx bv ev½vjx, অক্ষর বৃত্ত প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৩

আমিনুল ইসলাম : gmwjg `kb I ms¯wZ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা : ১৯৯১

আলী রিয়াজ (সম্পাদনা) : mv¤c`wqKZv I †gŠjev`, অংকুর প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৫

আল বেরুনী (অনুঃ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ) : fviZ ZË, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা : ২০০৬

আমিনুর রহমান সুলতান : cm½: RvZxqZvev` I ms¯wZ, ঢাকা : ১৯৯৩

আবদুল হক মজুমদার : mgvRKj¨vY cwiwPwZ, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা : ২০০০

আনসার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য : mgvRweÁvb kã‡Kvl, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৭৭

আব্দুল করিম (ড.) : evsjvi BwZnvm (mjZvbx Avgj), বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৭

আসকার ইবনে শায়খ : gmwjg Avg‡j evsjvi kvmbKZv, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৮

আবদুল হান্নান (শাহ) : Bmjvgx A_bxwZ‡Z miKv‡ii fwgKv, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯১

আব্দুল কাসেম : gvbevwaKvi msi¶Y I ev¯Íevq‡Y gvbevwaKvi Kgxi fwgKv, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, ঢাকা : ১৯৯০

আবুল হাশেম : mgvR cbMV‡b c‡qvRbxq Bmjvgx gj¨‡eva, ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৭৬

আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ : Bmjvgx iv‡ó bvMwiK I miKvi, ইসলামিক ফাউনেণ্ডশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৭৬

আবদুল করিম জায়দান(ড.), (অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম) : Bmjvgx ivó e¨e¯v, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৭৯

আব্দুল করিম জায়দান (ড.) : Avj-‘vIqvZj Bmjvwgqvn, দারুল ইসলামিয়াহ, মিশর : তা. বি.

আবদুস সামাদ : AvavbK mgvRKj¨vY, পুঁথিঘর, ঢাকা : ১৯৮৭

আলিমুজ্জামান চৌধুরী : evsjv‡`‡k gmwjg AvBb, অরণি প্রকাশনী, ঢাকা : ২০০০

আবদুল মান্নান তালিব : evsjv‡`‡k Bmjvg, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৮০

আনিসুজ্জামান : gmwjg gvbl I evsjv mwnZ¨ (1757 - 1918), লেখক সংস্থা প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৬৪

আব্বাস আলী খান : evsjvi gmjgvb‡`i BwZnvm, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা : ১৯৯৪

আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভী : Avie †bŠeni, (Abev`K: ûgvqb Lvb) ২য় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৮

আর.সি. মজুমদার : evsjv‡`‡ki BwZnvm, (৩য় খণ্ড),পুস্তক বিপনী, কলিকাতা : ১৯৮১

আব্দুল হালিম মিয়া : mgvR Kj¨vY cwiµgv, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা : ১৯৯৫

আমিনুল ইসলাম (ড.) : gmwjg agZË I `kb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৫

ইমাম নাসাঈ : bvmvC kixd, কুতুবখানা রাশিদিয়া, ঢাকা : ১৯৬৫

ইমাম বায়হাকী : mbvbj Keiv, মাকতাবাতু দারুল বায়, মক্কা : ১৯৯৪

ইউসুফ কারজাভী : Avj nvjvj Iqvj nvivg wdj Bmjvg, gvKZvevZj Bmjvg, বৈরূত : ১৯৭৮

ইবনে হিশাম : mxivZbex, (অনুবাদ, সম্পাদনা পরিষদ), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৪

ইমরান হোসেন : ev½vjx gmwjg ew×Rxwe wPšÍv I Kg, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯৩

ইমাম আলী আল রিদা : gmbv`, বৈরূত : ১৯৬৬

ইমাম মুহিউদ্দিন নববী : wiqv`m mv‡jnxb, ১ম খণ্ড, (অনুদিত) বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা : ২০০১

এ.কে.এম নাজির আহমেদ	:	evsjv‡‘‡k Bmjv‡gi AvMgb, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা : ২০০৫
এম.এ রহীম (ড.)	:	†mvk¨vj GÐ KvjPvivj wn‡÷vix Ae †e½j, ভল্যুম- ১, ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক কালচার, পাকিস্তান : ১৯৬৩
এম.এ. মান্নান (ড.)	:	Bmjvgx A_bxwZ, ZË I c‡qvM, ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা : ১৯৮৩
এ.কে. ব্রোহী	:	Bmjvgx Rxe‡bi Av‘k,Bmjv‡gi ‘wó‡Z mgvR, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৭৬
এ.জি.এম বদরুদ্দোজা	:	hvKv‡Zi e¨enwiK weavb, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৬
	:	BmjwgK wgkb cwiwPZ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯০
	:	hvKvZ dvÛ cwiwPwZ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৮
ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ	:	wgkKvZj gvmwwen, কলিকাতা : ১৩৫০ হি.
ওয়াকিল আহমেদ, (ড.)	:	Dwbk kZ‡K ev½vjx gmjgvb‡‘i wPšÍv †PZbvi aviv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯৮
কে. আলী	:	gmwjg ms¯wZi BwZnvm, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৭৯
কার্তিক ঠাকুর	:	AvËqvgx ivRbxwZ I msL¨vjN m¤c‘vq, কথা প্রকাশনী, ঢাকা : ২০০১
কঙ্কর সিংহ	:	ivó I mv¤c‘wqKZv Ges msL¨vjN m¤c‘vq, অন্যান্য, ঢাকা : ১৯৯৯
কে.এম রইছউদ্দীন	:	evsjv‡‘k BwZnvm cwiµgv, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৯৬
কাজী দীন মুহাম্মদ, (ড.)	:	Avh fviZxq †mb Avg‡j evsjv: evsjv‡‘‡ki DrcwË I weKvk, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৩
	:	evsjv mwn‡Z¨i BwZnvm, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৬

খলিফা আবদুল হাকিম (অনুবাদ সাইয়েদ আবদুল হাই) : Bmjvgx fveavivv, ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক কালচার, পাকিস্তান : ১৯৭০

খন্দকার আবদুর রশীদ : e¸ovq Bmjvg, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ২০০২

গোলাম হুসাইন সলিম : wiqvR Dm mvjvZxb, কলকাতা : ১৮৯৮

গৌতম নিয়োগী : BwZnvm I mv¤c ‘wqKZv, পুস্তক বিপনী, কলকাতা : ১৯৯১

গোলাম মুরশীদ : ag wbi‡c¶Zv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৭৩

গোলাম মোস্তফা : wekbex, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা : ১৯৪৩

গাজী শামছুর রহমান : IqvKd, AvB‡bi fvl¨, j¸eK nvDm, ঢাকা : ১৯৯৭

গোলাম সাকলায়েন (ড.) : evsjv‡‘‡ki mdx mvaK, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৪

জিয়াউদ্দিন বারানী : ZwiL-B-wd‡ivR kvnx, কলকাতা : ১৮৬২

জে.এন. সরকার (সম্পা) : wn‡óvix Ae †e½j, ভল্যুম- ২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : ১৯৮৪

জর্জ টমসন : ag I mgvR,(An essay on religion এর অনুবাদ) ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা : ১৯৮৯

টমাস আর্নল্ড : ‘¨wcwPs Ae Bmjvg (Abev‘ : Av‘ ‘vIqvZ Bjvj Bmjvg) gvKZvevZb bvn‘vn, মিশর : ১৯৭০

তাওফিক সুলতান : ZvixL Avnwjm wh¤§vn wdj BivK, দারুস সালাম, রিয়াদ : ১৪০৩ হি.

তাবারাণী : Avj g¸Rvgj Kvexi, দারুল ফিকর, বৈরূত : তারিখ বিহীন

তাঁরাচাদ (এস মহিবুল্লাহ অনুদিত) : fviZxq ms¯‹wZ‡Z Bmjv‡gi cfve, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯১৮

নীহার রঞ্জন রায় : ev½vjxi BwZnvm(Aw‘ce), পশ্চিম বঙ্গ নিরক্ষরতা দূরিকরণ সমিতি, কলিকাতা : ১৯৮০

নূরুল ইসলাম মানিক (সম্পাদিত) : mšvm cwZ‡iv‡a Bmjvg, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৫

নীমচন্দ্র ভৌমিক ও বাসুদেব ধর : mv¤c'wqK ˆelg¨ Kvi ¯v‡_, শাশ্বত প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৯৮

নাজমুল করিম : mgvR weÁvb mgxÿvb, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা : ১৯৮৪

পরেশ চন্দ্র মন্ডল : wn›' ag wk¶v, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা : ২০০৮

প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস : ¯vaxb evsjv‡'‡ki Af¨'‡qi BwZnvm, গ্রাজুয়েট পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ২০১৪

প্রভাতাংশু মাইতি : fviZ BwZnvm cwiµgv, কলিকাতা : ১৯৯৮

ফরীদ উদ্দিন মাসউদ : Bmjv‡g kwg‡Ki AwaKvi, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৪

ফারহানা হক : ¯vaxb evsjv‡'‡ki Af¨Ø‡qi BwZnvm (m¤úv'bvq W. †gvt biæj Bmjvg), সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, ঢাকা : ২০১৪

ফজলুল করিম : Av'k gvbe, ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৯৪৭

: evsjv‡'‡k a‡gi ivR‰bwZK e¨envi, চিরায়ত প্রকাশ, ঢাকা : ১৯৮৯

: wbewPZ ivR‰bwZK ceÜ, সুবর্ণ, ঢাকা : ১৯৯৩

বদিউজ্জামান (ড.) : mv¤c'wqKZv ' webxZ DËiwaKv‡i, ঢাকা সেন্টার ফর বাংলাদেশ ষ্টাডিজ, ঢাকা : ২০০১

: ev½vjx RvZxqZvev' I evsjv‡'‡ki gy³ msMvg, পল্লব পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৯২

বিপান চন্দ্র : KwgDbwjRg Bb gWvb BwÛqv, বিকাশ পাবলিশিং, নিউ দিল্লি : ১৯৮৪

: mv¤cv'wqKZv I fviZ BwZnvm iPbv, কে.পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা : ১৯৭৬

: AvawbK fviZ I mv¤c'wqKZvev', কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা : ১৯৮৯

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), : ceÜvejx (‘B), উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : ১৯৮৯

আবুল হাসান আল বালাজুরী : dZûj ej ‘vb, দারূ ইহয়া আত তুরাসিল আরাবী, বৈরুতঃ ১৪১১ হি.

বদরুদ্দিন উমর : ce evsjvi fvlv Av‡›‘vjb I ZvrKvjxb ivRbxwZ, আনন্দ ধারা প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৭১

: ms¯‹…Zi msKU, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা : ১৯৭৪

: h‡×vËi evsjv‡‘k, মুক্তধারা. ঢাকা : ১৯৭৫

: evsjv‡‘k I RvZxqZvev‡‘i D‡¤§l, কাকলী, ঢাকা : ১৯৮০

: mv¤cÖ‘vwqKZv, মুক্তধারা, ঢাকা : ১৯৮০

: mvs¯‹…wZK mv¤cÖ‘vwqKZv, মুক্তধারা, ঢাকা : ১৯৮০

: h×ce evsjv‡‘k, মুক্তধারা, ঢাকা : ১৯৮১

: fvlv Av‡›‘vjb cÖm½ : KwZcq ‘wjj cÎ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৪

ভি ফিন্ডলী : jv mKZv evÔ‘vj Bqv‡lwg, শারিকাতুল মাতবুআত, বৈরূত : ২০০১

মোঃ আবদুল হক তালুকদার (ড.) : mgvRKg, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা : ২০০৫

মুশাহিদ আলী (মাওলানা) : Bmjv‡gi ivóxq I A_©‰bwZK DËivwaKvi, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯১

মুজিবর রহমান : Bmjv‡gi ‘wó‡Z mve‡fŠgË, ÔkvkZ åvZZ msKjbÕ 91, সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ঢাকা : ১৯৯১

মুস্তাফা হিলমী : Avj Bmjvg I qvj Av‘ Bqvb, দারু-ইবন জাওজী, মিশর : ২০০৫

মুহাম্মদ আমীন ইবন আবিদীন : ivÏ j gnZvi, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত : ১৪০৯ হি.

মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ(ড.), নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত : ‘সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা’,mšvm cwZ‡iv‡a Bmjvg,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা : ২০০৫

মোজাম্মেল হোসাইন চৌধুরী : evsjv‡‘‡ki A_%bwZK,AvÂwjK I gvbweK f‡Mvj, ঢাকা : ১৯৯৪

মানবেন্দ্র নাথ রায় : Bmjv‡gi HwZnwmK fwgKv, পারীদাস প্রকাশনী, ঢাকা : তারিখ বিহীন

মোস্তফা মনজুর : Gg.wdj, Awfm›‘f (অপ্রকাশিত), ইসলামের ষ্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, ঢাকা : ২০১০

মুহাম্মদ এনামুল হক : ce cwK¯Ív‡b Bmjvg, আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা : ১৯৪৮

মোঃ আতিকুর রহমান : mgvR Kj¨v‡Yi BwZnvm I ‘kb, কুরআন মহল, ঢাকা : ২০০১

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম : evsjv‡‘‡ki Af¨‘q Av_mvgwRK I ivR%bwZK KviY, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৩

মুহাম্মদ আবদুল কাদির : a‡gi bv‡g ivRbxwZ, প্রবাস মঞ্জিল, ঢাকা : ১৯৯৯

মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী : evsjv‡‘k ‘kb, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা : ১৯৯৪

মুহাম্মদ কুতুব : åwšÍi †eovRv‡j Bmjvg, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৭৮

মেহেদী হাসান পলাশ : msL¨vjN ivRbxwZ, বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা : ২০০১

: RvZxqZvev‘ Ges †gŠjev‘, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৩

: ivóxq ‘vqe×Zv, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৫

মুহাম্মদ লুৎফর : Bmjvgx ivó I mgvR, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৪

মুহাম্মদ আসাদ : Bmjvgx iv‡ó bvMwiK I miKvi, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৭৬

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ(ডক্টর) : Bmjvg cm½ : †i‡bmvm wc›Uvm, ঢাকা : ১৯৬৩

মুহাম্মদ শাফী (মুফতি) (অনুবাদ,মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন) : gvÕ Awidj KiAvb, কুরআন মুদ্রন প্রকল্প, মদীনা : ১৪২৩ হি.

মুশলিম ইবনে হাজ্জাজ	:	Avmmvnxn, ˆeiæZ : ‘viæ BnBqv AvZZiwmj Avivex, বৈরুত : ১৩৭৮ হি.
মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (মাওলানা)	:	wek mf¨Zvq cweÎ KiAv‡bi Ae‘vb, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা : ১৯৮৮
	:	Av‘k I ev¯Íevqb, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৫
মুহাম্মদ তাইয়্যাব(অনুবাদ, মাওলানা আলী আকবর হামিদ)	:	gvbeZvi ˆewkó¨, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৬
মুহাম্মদ আজরফ	:	Bmjvg I gvbeZvev‘, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮০
মুহাম্মদ আবদুর রহীম(ড.)	:	Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av‘k, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৮০
	:	Bmjv‡g A_‰bwZK wbivcËv I exgv, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৭
	:	Bmjv‡gi A_bxwZ, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৮৭
	:	Bmjvgx A_bxwZ‡Z ÔIkiÕ I ÔLvivRÕ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৫
মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ (ড.) নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত,	:	mšvm cwZ‡iv‡a Bmjvg, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৯, পৃ .১০৭
মওদুদ আহমদ,	:	evsjv‡‘k : ¯vqË kvmb †_‡K ¯vaxbZv, দি ইউনিভাসির্টি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা : ১৯৯২
মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান	:	AvZ ZvixLj Bmjvgx, ঢাকা : ১৯৮৮
মুহাম্মদ ইবন সায়দ	:	AvZZvevKvZ, দারুল ইয়াহইয়া, ৩য় খণ্ড, বৈরুত, লেবাননন : ১৯৯৬
মুহাম্মদ মুদাসসির হোসেন (সম্পাদিত)	:	gmwjg ckvmb e¨e¯vi µg weKvk, ১ম খণ্ড, রাজশাহী : ১৯৭৯

মফিদুল হক : ‡‘kfvM, mv¤ú‘wqKZv Ges m¤úxwZi mvabv, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা : ২০০৯

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (শাহ) : Bmjvgx A_bxwZ : wbewPZ ceÜ, স্কয়ার পাবলিকেশন্স, রাজশাহী : ১৯৯৬

মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : hvKvZ wK I †Kb? ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৫

মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন(ড.) : Bmjv‡gi A_%bwZK Av‘k, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৫

রইছউদ্দিন (ড.আ.ন.ম) : mdxev‘, I cvmw½K welq, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, ঢাকা : ২০০৮

রফি উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত) : Bmjvg Bb evsjv‡‘k, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮৩

রওশন আলী খোন্দকার (সম্পাদিত) : mv¤c‘wqK m¤cxwZ cwZôvq ivmj (mvt), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৫

রশিদ আল ফারুকী : ag I ivó, A¶i, ঢাকা : ১৯৮৭

রশিদুল আলম (ড.) : gmwjg ‘k‡bi fwgKv, সাহিত্য কুঠির, ঢাকা : ১৯৮৬

রুবেল লেভি(অনু: ড.গোলাম রাসুল), : †mvm¨vj óvKPvi Ae Bmjvg, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা : ১৯৯৫

রমিলা থাপার : mv¤c‘wqKZv I fviZ BwZnvm iPbv, কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা : ১৯৭৬

লতা হোসেন (সম্পাদিত) : cm½ : m¤c‘wqKZv M‘¨ weivbeŸB, সানন্দ প্রকাশ, ঢাকা : ১৯৯৩

লেনিন আজাদ : DbmË‡ii MY Af¨Ìvb mgvR I ivRbxwZ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা : ১৯৯৭

শাহরিয়ার কবির : evsjv‡‘‡k m¤c‘wqKZvi PvjwPÎ, পল্লব পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৯৩

শ.ম. শওকত আলী : Kwóqv †Rjvq Bmjvg, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯২

সফিউর রহমান আল-মুবারক পুরী : Avj iwnKj gvLZg, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, দারুল আদইয়ান লিত তুরাস, কায়রো : ১৯৮৮

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীরুল ইহসান (মুফতি) : KvIqvB‘j wdKn, ঢাকা : ১৯৭৪

সৈয়দ সুলায়মান নদভী : Avie ‡bŠ eni, (হুমানুন খান অনুদিত) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮২

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (ড.) : fviZ e‡li BwZnvm, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৯৯১

সোহরাব উদ্দিন আহমেদ : cw_ex i ag ¸‡jv, উষ্মা প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৮

সুব্রত বড়ুয়া : Avgv‡‘i evsjv‡‘k, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা : ১৯৯০

সুকুমার সেন : evsjv mvwn‡Z¨i BwZnvm (২য় খন্ড) কলিকাতা : ১৯৯৩

সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : ms¯‹Z mvwn‡Z¨ ev½vjxi Ae‘vb, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা : ১৩৬৯

সৈয়দ সুলায়মান নদভী (অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব), : ÒkvkZ bexÓ BmjwgK dvD‡Ûkb evsjv‡‘k, ঢাকা : ২০০৫

সালাহউদ্দিন আহমেদ : Kwe gwZDi ingvb, চতুর্থ স্মারক বর্ক্তৃতামালা, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, ঢাকা : ১৯৯১

: evsjv‡‘k : RvZxqZvev‘ ¯vaxbZv MYZš, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৯৩

: evsjv‡‘‡k ewx×ewË : ag -mv¤ú‘wqKZvi msKU, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৯৯

সুলতানা নাহার : msL¨v jN m¤c‘vq, ঢাকা প্রকাশন, ঢাকা : ১৯৯৪

সাইদ উর রহমান : ce evsjvi mvs¯wZK Av‡›‘vjb, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৮৩

সাইদুজ্জামান রওশন : 1971 NvZK ‘vjvj‡‘i e³Zv I weewË, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা : ১৯৯৩

সাইয়েদ হাসান মুসান্না (অনুবাদ মাওঃ শফিউদ্দিন)	:	Bmjvgx mgvR e¨e¯v, BmjwgK dvD‡Ðkb evsjv‡'k, ঢাকা : ১৯৮০
সম্পাদনা পরিষদ,	:	^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg BmjwgK dvD‡Ûkb evsjv‡'k, ঢাকা : ২০০০
সুজিত সেন (সম্পাদিত)	:	RvZcv‡Zi ivRbxwZ, পুস্তক বিপনী, কলকাতা : ১৯৯১
	:	mv¤c'wqK mgm¨v I D‡ËviY, পুস্তক বিপনী, কলিকাতা : ১৯৯১
সৈয়দ বদরুদ্দোজা	:	nhiZ gnv¤§' (mvt) Zvnvi wk¶v I Ae'vb, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৭
সৈয়দ আমির আলী (অনুবাদ : মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান),	:	w' w¯úwiU Ae Bmjvg, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৩
সু প্রকাশ রায়	:	fvi‡Zi KlK we‡'vn I MYZwšK msMvg, কলিকাতা : ১৯৭২
	:	fvi‡Zi ˆecøweK msMv‡giBwZnvm, ডি.এম.বি.ব্রাদার্স, কলিকাতা : ১৯৭০
সৈয়দ শওকতুজ্জামান	:	mgvR Kj¨v‡Yi BwZnvm I 'kb, সোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ২০০৫
হযরত আলী (রাঃ) (অনুঃ খালেদ চৌধূরী)	:	ckvm‡bi gjbxwZ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৭৬
হাসান উজ্জামান	:	ag wbi‡c¶Zv I evsjv‡'k HK¨g‡Z¨i BwZnvm AbmÜvb, পল্লব পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৯২
হাসান জামান (ড.)	:	mgvR mwwnZ¨ I ms¯wZ, ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকাঃ ১৯৮৩
হুমায়ুন আবদুল হাই,	:	gmwjg ms¯viK I mvaK, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৭৬
হাসান মোহাম্মদ	:	Rvgv‡Z Bmjvgx evsjv‡'k †bZZ, সংগঠন ও আদর্শ, একাডেমিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৯৩
হাবিবুল্লাহ	:	বাংলার মুসলমান সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঢাকা : ১৯৭৪
হিফজুর রহমান (আবদুল আউয়াল অমুদিত),	:	ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

wcGBP.wW Awfm›‘f (AcKwwkZ)

evsjv‡‘‡k Bmjvg cPv‡i mdx‡‘i Ae‘vb(1757-1857), W. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : ১৯৯৬

ivRbxwZ I mgvR †mevq evsjv‡‘kx AvwjgM‡Yi fwgKv (1935-1971),ড. আবুল মাসাকিন মোহাম্মদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : ২০০১

HwZnwwmK †cÿvc‡U AvawbK mgvR Kj¨vY ‘k‡Yi weeZb I Bmjvgx gj¨‡ev‡ai chv‡jvPb,ড. মোঃ আবুল বাসার,ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : ২০০৬

Av‘k mgvR MV‡b Bmjvg : †cÿvcU evsjv‡‘k, আবুল কালাম আজাদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : ২০০৬

gvbweK gj¨‡eva cwZôvq Bmjvg : †cÿvcU evsjv‡‘k (1971-2001),ড. মোঃ সামছুল আলম, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা:২০০৭

mvgwwRK AbvPvi cwZ‡iv‡a Bmjvg : †cÿvcU evsjv‡‘k,ড. মোঃ আব্দুল আজিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : ২০০৭

Bs‡iRx Mšvewj

Aziz Ahmed : *Studies in Islamic Culture in India Environment*, Clerendon Press, Oxford : 1964

Abdul Karim : *Social History of the Muslims in Bengal* Down to A.D 1338 , Baitus Sharaf Islamic Research Institute,Chittagong : 1985

Asim Roy : *The Islamic Syncrestistic Tradition in Bengal,* Princeton University Press, USA : 1983

Akbar Ali Khan : *Discovery of Bangladesh,An Explanation into Dynamics of a Hidden Nation,* University Press Ltd, Dhaka : 1996

A. Michacls : *Hinduism: Past and Present,* Princeton University Press, USA : 2004

A.L. Basham : *A Cultural History of India*, Oxford University Press,USA : 1999

A.R. Mullick : *British polity and the Bengal,* Asistic society of Bengal, Dhaka : 1961

Barrie M. Morison : *Political Center and Cultural Regions in Early Bengal,* Tucson,USA: 1970

B Peter Clarke (ed) : *The Religions of the world : Understanding the liking Faiths,* Marshal Editions Ltd. USA :1993

Chimpa Lama, and D. Chattopadhyaya : *Taranatha's History of Buddhism in India*, India :1970

D. Barbosa : *The book of Duarte Barbosa,* (Eng tr. By) U.I. Dares Vol . ii, London : 1921

Dan Cohn-Sherbok : *Judaism: History, Belief and practice*, Routledge : 2003

Dr. B.R. Ambedkar : *The Buddha and his Dharma,* Buddha Bhoomi Publication, India : 1997

David Forenzen : *Who Invested Hinduism*?, New Delhi, 2006

David Hazong : *The Ten Commandments Scribner,* , New York: 2010

Edward Conze : *Buddhism,Its Essence and development*, London : 1978

Filip Hitti : *History of the Arabs,* Sent martine, London : 1951

H.P.R. Finbery (ed) : *Approaches to History,* London: 1962

Herbert Risely : *Tribes and Castes of Bengal,* Calcutta: 1981

Helmut Koester : *Introduction to the New Testament,* Philadelphia Publication, USA :1982

Ibn Battura (trans, Mahdi Hussain) : *The Rehela of Ibn Battura,* trans,Oriental Institute , Baroda: 1936

J. Rennl : *Memories of a map of Hindustan,* London | :1783

John Deyell, : *Living Without Silver, The Monetary History of early Medieval North India,* Oxford University Press, Delhi: 1990

Jagadish Narayan Sarkr	:	*Hindus Muslim Relation in Bengal (Mediieval period),* Idarah-i-Adariyat-i-Delhi: 1985
Jeffrey, S. Gurock	:	*American Zionism: mission and politics,* New York : 1988
K. Sur	:	*Pre-History and Beginnings of Civilization in Bengal,* Calcutta:1969
Keder Nath Tiwari	:	*Comparative Religion,* Motilal Banarsidass, Delhi: 1983
K.A Nizami	:	*Comprehensive History of India, Peoples Pubs Hosue*, New Delhi: 1982
K.F. Rubbee (translated by Abdur Razzaqqe)	:	*Banglar Musulman (in Bangali),* Bangla Academy, Dhaka : 1986
K.M. Sen	:	*Hinduism*, Penguin Books, Delhi : 1986
Mohammad Enamul Haq	:	*A History of Sufism in Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka : 1975
Million Steinberg	:	*Basic Judaism,* Harcourt Brace Invanovich, New York : 1947
Maurice Stack in Walter	:	*A Friedlander,Introduction to Social Welfare,* Prentice Hall, USA : 1968
Michael Ramsey	:	*Jesus and the Living Past,* Oxford University Press,USA: 1980
Methnew Arlen Price & Michael Collins,	:	*The story of Chrishtianity,* Dorling Kindersley, New York: 1999
O' Leary Delacy,	:	*Arabia Before Muhammad*, London : 1927

Peter Clark	:	*Zoroastrianism,An Introduction to an ancient faith,* Sussex Academic Press,USA. 2009
Pratins Bowes	:	*The Hindu Religious Tradition & Philosophical approach,* Allied Pub. Delhi : 1976
RC Manjumdar	:	*History of Ancient Bengal, Dhaka University, Dhaka* : 1974
Richard Symonds	:	*The Making of Pakistan Faber and Faber,* Russell square, , London : 1951
Rafiuddin Ahmed	:	*The Bengal Muslim 1817-1906,A quest for identity*, Delhi : 1981
Richard m. Eaton	:	*The Rise of Islam and the Bengal Frontier,* Oxford University Press, USA : 1994
Rupert Gethin	:	*Foundations of Buddhism,* Oxford University Press, Delhi : 1988
Robertson	:	*Smith, Kinship and Marriage in early Arabia,* Cambridge University Press, London : 1903
S. Beal	:	*Buddhist Record of the Western World II,* London : 1884
Syedur Rahman	:	*An introduction to Islamic culture and philosophy,*Mullick Brothers, Dhaka : 1963
Sir H.M. Elliot and Prof. John Dawson	:	*The History of India,* as told by its own Historians, Vol .1, Allahbad: Kitab Mahal, India :1964
S.V. Deshika Char	:	*Hindusim and Islam in India,* Caste, Religion and Society from Aniquity to Early Modern times, Markus Wiener Publisher, Princeton, USA : 1997

Trevor Ling : *Buddhist Bengal and After D. Chattaadhayaya (ed) History and Society,* Calcutta : 1978

Teffilin : *The Book of Jewish Knowledge,* Crown Publisher, New York: 1964.

Tinda Woodhead : *Christianity: a very short Introduction,* Oxford University Press, USA : 2004

W. W. Lenter : The Indian musulmans, Calcutta : 1945

W. Kenneth Morgan (ed) : *The Religion of the Hindus,* Motilal Bararasidas, Delhi: 1987

Walpola Rahula, : *What the Buddha thaught*, Grove press, UK : 1974

wek‡Kvl

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, msw¶ß Bmjvgx wek‡Kvl, ১ম খন্ড, ৫ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৭

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, msw¶ß Bmjvgx wek‡Kvl, ২য় খন্ড, ৩য় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৫

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, msw¶ß Bmjvgx wek‡Kvl, ১৪শ খন্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৭

evsjv wek‡Kvl, ৩য় খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা : ১৯৭৩

mgvR weÁvb kã †Kvl, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৫

Awfavb

evsjv Awfavb, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা : ১৯৯৮

e¨enwiK evsjv Awfavb, পরিমার্জিত সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৪১৩

J.L Hanson, *A dictionary of economics and commerce*, London : 1976

Hans wehr, *A dictionary of modern written Arabic*, Sopken Language Services, Inc, New York : 1976

T.P. Hughes, *Dictionary of Islam*, Oriental books reprint corporation, New Delhi : 1976

Bengali- English Dictionary, Bangla Academy Dhaka : 2003

Encyclopedia and Jounal

The encyclopedia Americana, Bunbury	:	Grolier Incor porrated, International Edition : Vol. 23, USA : 1980
The encyclopedia of Islam, Leeden	:	E.J. Brill. 1971
The new encyclopedia Britannica, William Benton	:	15th Edition, Vol. 6, USA : 1986
encyclopedia of Social work in India	:	Vol. 2, 1967
Journal of Islamic administration	:	Vol. 1, No. 1, 1995
Social Science Review	:	Vol . 13, No. 1, 1996
Journal of Islamic administration	:	Vol . 3, No. 1, 1997
Encyclopedia of Religion and Ethics,	:	Vol. 4, (Toleration),Oxford Press, USA : 1993
International Encyclopedia of Social Science	:	The Macmillan Company, USA, 1968
World Book of Encyclopedia	:	New York, 1984
Journal of the Asiatic Society of Bengal,	:	Vol .16, P. 76, 1847
The Encyclopedia of Americana	:	Vol. 30, USA : 1963
The Journal of Social Development Begum Rokeya	:	Vol. 2, No. 1, 1997

Research Report

BBS, Statistical Pocket Book of Bangladesh, Dhaka ministry of planning Govt. of Bangladesh.Dhaka:1989

Census of India, 1901, Vol-6, The lower provinces of Bengal and their Feudatories, Bengal Secretarial Press, Calcutta: 1902

H Beverly, *Report on The census of Bengal 1872*, Secretarial Press, Calcutta:1872

CIA World Fact book, Central Intelligence Agency, USA : 2007,

Statistical Pocket Book of Bangladesh 2008, Bangladesh Bureau of Statistics January,Dhaka: 2009

Bangladesh Population Census, National Series, Vol-1, Analytical Report : 2001

Bangladesh Economic Review 2007, Economic Advisers wing, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, March-2008

Statistical Year Book of Bangladesh (28th edition), Bangladesh Bureau of statistics : 2006

World Development Report, 1997

Population Census 2001 Preliminary report, Bangladesh Bureau of Statisticks, Statistics Divison, Ministri Of Planning, August-2001

UNESCO seminar Report, Bankok :1964

Who Expert Committee on drug Dependence, World Health Organization *Technical Report Series*, No- 407, Report, Geneva, 1969.

Women for Women, A Research and Study Group, 1997, Regional Overview on Violence Against Women : A working Paper for Expert Group Meeting, Dhaka 1997

Report on the Sensus of Bengal 1871

Report on the Sensus of Bengal 1881

Report on the Sensus of Bengal 1891

Population Census 2001 Preliminary Report, Bangladesh Bureau of Statistics, statistics Division, Ministry of Planning, August 2001

Population Census 2001, BBS, Planning Division, Ministry of Planning Government of the Peple's Republic of Bangladesh, July 2003

"*Original USCIRF Report,* United States Commission on International Religious Freedom" Uscirf.gov. Retrieved 2013-10-25

"Bangladesh Wave of violent attacks against Hindu minority" Press releases Amnesty International Retrieved 8 March 2013.

cÎ cwÎKv/g¨vMwRb

AMcw_K, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪

AMcw_K, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা : ১৯৮৮

BmjwgK dvD‡Ðkb cwÎKv, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৭

BmjwgK dvD‡Ðkb cwÎKv, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৭

BmjwgK dvD‡Ðkb cwÎKv, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮

gwmK g‘xbv, ঈদ সংখ্যা এপ্রিল, ১৯৯৩

evsjv‡‘k BwZnvm cwil‘, একাদশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শ্রাবন-চৈত্র, ১৩৮৪ বাং

evsjv mwnZ¨ cwÎKv, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫

Bmjvg ‘kb, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৭ বাং

mwnZ¨ cwÎKv, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯০ বাং

gwmK †gvnv¤§‘x, ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩৭১ বাং

‰‘wbK B‡ËdvK, ৩০ জানুয়ারী, ১৯৯১

‰‘wbK msev‘, ৩ জানুয়ারী, ১৯৯২

‰‘wbK BbwKjve, ৩১ অক্টোবর, ১৯৯২

‰‘wbK msev‘, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

‰‘wbK †fv‡ii KvMR, ২৮ আগষ্ট, ১৯৯৬

‰‘wbK BbwKjve, ২৮ মার্চ, ১৯৯৭

‰‘wbK †fv‡ii KvMR, ২০ মার্চ, ১৯৯৭

‰‘wbK msev‘, ১৪ আগষ্ট, ১৯৯৭

‰‘wbK msev‘, ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৭

‰‘wbK msev‘, ১৪ জুলাই, ১৯৯৮

‰‘wbK msMvg, ৭ অক্টোবর, ২০০১

‰‘wbK BbwKjve, ১৬ অক্টোবর, ২০০১

‰‘wbK BbwKjve, ১ ডিসেম্বর, ২০০১

‰‘wbK evsjv, ২০ এপ্রিল, ১৯৮৬

‰‘wbK msMvg, ৭ অক্টোবর, ২০০১

‰‘wbK BbwKjve, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০

‰‘wbK BbwKjve, ১৬ অক্টোবর, ২০০১

‰‘wbK B‡ËdvK, ১৬ মার্চ, ১৯৮৬

‰‘wbK gvbeRwgb, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

‰‘wbK Avgvi †‘k, ৫ অক্টোবর, ২০১২

‰‘wbK bqv w‘Mš Í, ২ অক্টোবর, ২০১২

‰‘wbK BbwKjve, ৭ অক্টোবর, ২০১২

‰‘wbK ˆ‘bw›‘b, ৮ অক্টোবর, ২০১২

‰‘wbK c_g Av‡jv, ৯ অক্টোবর, ২০১২

v

evsjv‡‘‡k mv¤c‘wqKm¤cxwZ I Bmjvg : †c¶vcUevsjv‡‘k

(1900 - 2000)

BmjwgK ÷wWRwefvM, XvKwekwe‘¨vjq

†m‡Þ¤i, 2014

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিবিষয়েএকটিজরীপকাজেরপ্রশ্নমালা (সংগৃহীত তথ্য কেবলগবেষণারকাজেব্যবহারকরাহবে।)

মতামতের গোপনীয়তারক্ষাকরাহবে।	প্রয়োজনীয় স্থানে (√) টিকচিহ্নদিন।

সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ : --

নমুণানং --

১। সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীরনাম : বসবাসেরএলাকা :

২। সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীরবয়স ও লিঙ্গ :

বয়স :	লিঙ্গ : পুরুষ/মহিলা	ধর্ম :

৩। সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীরমাসিকআয় (ব্যয়)

৪। সাক্ষাৎকারপ্রদানকারীর পেশা :

(ক) ছাত্র/ছাত্রী (খ) শিক্ষক/ শিক্ষিকা

(গ) রাজনীতিবিদ (ঘ) ব্যবসায়ী

(ঙ) অন্যান্য পেশাজীবী

৫। সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিবিরোধী শক্তিগুলোরঅবস্থানসম্পর্কে আপনারধারণাকি।

ক. তাদের ক্ষমতাঅত্যাধিক

খ. মোটামুটি শক্তিশালী

গ. শক্তি আছে, তবেসামান্য

ঘ. ক্ষমতা নেই

৬। ধর্মের সাথে সাম্প্রদায়িকতারসম্পর্ক কি।

ক. দু'টিইওতপ্রোতভাবেজড়িত

খ. জড়িততবেসামান্য

গ. দু'টিসম্পূর্ণ ভিন্ন

৭। সাম্প্রদায়িকতারসর্বাধিকক্ষতিকারকরাজনৈতিকপ্রভাব কোনটি।

ক. গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকরূপলাভকরতেপারছেনা

খ. রাজনৈতিকআধুনিকায়নক্ষতিগ্রস্তহয়

গ. উন্নতরাজনৈতিকসংস্কৃতিগড়ে উঠতে পারেনা

ঘ. এরফলেরাজনৈতিকব্যবস্থায়সন্ত্রাসএকটি স্থায়ীআসন দখলকরে

ঙ. জাতীয়সংহতিহয়হুমকির সম্মুখীন

চ. রাজনীতিরধর্ম নিরপেক্ষমূল্যবোধ স্বকীয়তালাভকরতেপারেনা

ছ. সাম্প্রদায়িকতারাজনৈতিক অস্থিতিশীলতারসৃষ্টিকরেফলেরাজনৈতিকব্যবস্থা তারসক্ষমতাহারায়।

জ. একাধিকউত্তর

৮। সাম্প্রদায়িকতারসর্বাধিকক্ষতিকারক অর্থনৈতিকপ্রভাব কোনটি।

ক. সাম্প্রদায়িকতারদ্বারাসৃষ্টসন্ত্রাসে দেশেরবিপুলপরিমাণসম্পদের ক্ষয়ক্ষতিহয়যা দেশেরঅগ্রগতিতেবিরূপপ্রভাব ফেলে।

খ. এরদ্বারাসৃষ্টরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতারকারণেউৎপাদনবিঘ্নিতহয়, ফলে অর্থ নৈতিকঅগ্রগতিব্যহতহয়।

গ. এদেরদ্বারাসৃষ্টজাতিগতঅসন্তোষেরকারণে দেশীয় ও বিদেশীপুজিপতিরা বিনিয়োগেউৎসাহহারায়

ঘ. সাম্প্রদায়িকতারসুযোগগ্রহণকরেকিছুকায়েমী স্বার্থবাদীমহলনিজেদের

কালোটাকারপাহাড় তৈরীকরে।

ঙ. সংখ্যালঘু শ্রেণির অর্থনৈতিকভিত্তি ভেঙ্গে যায় অর্থনৈতিকভাবে তেমন কোনপ্রভাব রাখেনা

চ. একাধিকউত্তর

৯. সাম্প্রদায়িকতারসর্বাধিকক্ষতিকারকসামাজিকপ্রভাব কোনটি।

ক. সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিক্ষতিগ্রস্তহয়

খ. বিভিন্নধর্মীয়সম্প্রদায়েরমধ্যে পারস্পরিকবিশ্বাসেরবন্ধন ক্রমশঃশিথিলহয়ে পড়ে

গ. সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাবিঘ্নিতহয়

ঘ. সমাজেরসার্বিকমূল্যবোধবিনষ্টহয়

ঙ. মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়

চ. একাধিকউত্তর

১০. সাম্প্রদায়িকতারসর্বাধিকক্ষতিকারকধর্মীয়প্রভাব কোনটি।

ক. বিভিন্নধর্মীয়সম্প্রদায়েরধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতিতেআঘাতহানে

খ. জনগণেরএকটিবৃহৎ অংশ সাম্প্রদায়িকতাকেধর্মেরই অংশ মনেকরে।

১১. সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিবিরোধী শক্তিগুলোনারী স্বাধীনতাসম্পর্কে কিধারণা পোষণকরেবলেআপনিমনেকরেন।

ক. এরানারী স্বাধীনতায়বিশ্বাসকরেনা

খ. এ ব্যাপারেতাদের কোনসুস্পষ্ট বক্তব্য নেই

গ. নারী স্বাধীনতারপ্রতিএরাযথেষ্ট সোচ্চারএবংইতিবাচকমনোভাব পোষণকরে।

১২. সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিবিরোধীদের মূলচালিকা শক্তি কোনটি।

ক. রাজনৈতিক দল

খ. কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণি

১৩. সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিবিরোধীদের বর্তমানক্ষমতাসম্পর্কে মন্তব্য করুন।

ক. এদেরক্ষমতাদিনদিনবৃদ্ধি পায়

খ. এদেরক্ষমতা যেমনআছে তেমন থাকবে

গ. এদের শক্তি বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান

১৪. কোনসাম্প্রদায়িক শক্তির পক্ষেকিঅদূরভবিষ্যতে বাংলাদেশেররাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকরা সম্ভব?

হ্যাঁ		না

১৫. বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিবিষয়েমন্তব্য করুন।

ক. সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিক্ষতিগ্রস্ত

খ. বিভিন্নরাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িকতাকেনিজেদের স্বার্থে ব্যবহারকরছে

গ. কায়েমী স্বার্থবাদীমহলনিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাছিলেরউদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদদ যোগায়

ঘ. বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিআছে

১৬. বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিবজায়রাখারউপায়কি।

	ক.	ব্যাপকভিত্তিকসামাজিক আন্দোলনগড়ে তোলা
	খ.	স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েসাম্প্রদায়িকতাবিরোধীপাঠ্যবিষয় সংযুক্ত করা।
	গ.	সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতিবৃদ্ধিরজন্য সরকার কর্তৃক উদ্যোগগ্রহণকরা।
	ঘ.	পারিবারিকভাবেসন্তানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধীমনোভাব তৈরীকরা।
	ঙ.	অধিকমাত্রায়গণসচেতনতাসৃষ্টিকরা।
	চ.	একাধিকউত্তর

‘ প্রশ্নেরউত্তর দেয়ারজন্য এবংসময় দেয়ারজন্য ধন্যবাদ’।